শ্রীরূপ ও পদাবলীসাহিত্য

ডক্টর শুকদেব সিংহ, এম্‌-এ., ডি-ফিল
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাবিভাগের অধ্যাপক

ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

গ্রন্থে ব্যবহৃত সঙ্কেতসমূহ

উজ্জ্বল	...	...	উজ্জ্বলনীলমণি
কী	...	...	কীর্তনানন্দ
কী. গী. র. বা			
গীতরত্নাবলী	...	...	কীর্তনগীতরত্নাবলী
কৃ. গ. দী.	...	...	শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা
গী. বা গী. চ.	...	...	গীতচন্দ্রোদয়
গো. রতিমঞ্জরী	...	...	গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী
গোবিন্দদাসের পদাবলী		...	গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ
গৌ. তর, গৌ. তরঙ্গিণী বা তরঙ্গিণী			গৌরপদতরঙ্গিণী
চৈ. চ.	...	...	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
তরু	...	...	পদকল্পতরু
মজুমদার	...	...	ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার কৃত গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ
মাধুরী	...	...	পদামৃতমাধুরী
মিত্র-মজুমদার	...	...	খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি'
সমুদ্র	...	...	পদামৃতসমুদ্র
সংকীর্তন বা সং	...	...	সংকীর্তনামৃত
ক্ষণদা	...	...	ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি

সূচীপত্র

॥ ভূমিকা ॥

সাধারণলোকে যে ভাষায় কথাবার্তা বলিত সেই কথ্যভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া কবিতা লেখার প্রচেষ্টা হইতে পদাবলীসাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণা-গোদাবরী-বিধৌত অন্ধ্রপ্রদেশে সাতবাহন-নরপতি হাল তাঁহার সঙ্কলিত গাথাসপ্তশতীতে পোট্টিস অথবা পাইরিকম্মি নামক কবির লেখা এই গাথাটি ধরিয়াছেন—

মুহ-মারুএণ তং কণ্হ গো-রঅং রাহিআএঁ অবণেন্তো।
এত্তাণঁ বল্লবীণং অন্নণে বি গোরঅং হরসি ॥

১।৮৯

হে কৃষ্ণ, তুমি ফুঁ দিয়া (মুখ-মারুত দ্বারা) রাধিকার চোখ হইতে ধূলি বাহির করিয়া দিয়া সাম্নে যে সব গোপী আছে তাহাদের গৌরব হরণ করিতেছ। সাহিত্যে শ্রীরাধার প্রাচীনতম উল্লেখ এই কবিতাটিতে পাওয়া যায়। একদল পণ্ডিত কুতর্ক তোলেন যে রাধার অস্তিত্ব অত প্রাচীনকালে থাকিতে পারে না; সেইজন্য উহা প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু পদটি সঙ্কলনের প্রথম শত শ্লোকের মধ্যেই স্থান পাইয়াছে। তাছাড়া ঐ গ্রন্থে বৃন্দাবনলীলার আরও কয়টি পদ আছে। ২।১৪ গাথাতে দেখা যায় যে রাসে কৃষ্ণ গোপীদের সহিত নাচিতেছেন, তাঁহার প্রতিবিম্ব তাহাদের মসৃণ কপোলে পড়িয়াছে দেখিয়া কোন চতুরা গোপী সখীর নৃত্য-নিপুণতার প্রশংসার ছলে তাহার কপোলে চুম্বন করিলেন। সখী উপলক্ষ্য মাত্র, কৃষ্ণকে চুম্বন করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। অন্য একটি পদে (২।১২) আছে যে মা যশোদা যখন গোপীদের সাম্নে বলিলেন যে আজপর্যন্তও দামোদর বালকই রহিয়া গিয়াছে, তখন ব্রজবধূরা কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাইয়া গোপনে হাসিলেন। সঙ্কলনের শেষের দিকে (৭।৫৫) একটি গাথায় আছে যে মধুমথন কৃষ্ণের বয়স বাড়িলে যখন তাঁহার বিবাহ দিবার সময় নিকটবর্তী হইল, তখন তরুণী গোপীরা যশোদার সহিত তাঁহাদের নিকট সম্বন্ধ গোপন করিয়াছিলেন।

হালের গাথাসপ্তশতীতে এমন কয়েকটি পদ পাওয়া যায় যে তাহাতে বৃন্দাবনলীলার পরিবেশ, যথা যমুনা, কদম্ববন, ময়ূরপুচ্ছ, গিরিপ্রদেশ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। একটি পদে আছে—যেখানে ঘনসন্নিবিষ্ট কদম্বরক্ষসমূহ পুষ্পবিকাশে প্রোৎফুল্ল, শিলাতলসমূহ জলধারা বিধৌত, ময়ূরকুল আনন্দিত এবং যাহা প্রসৃত নির্ঝরগুলির (শব্দে) মুখরিত, সেই গিরিগ্রামসমূহ (ভোগের জন্য মানুষকে) উৎসাহিত করিতেছে। এই প্রাকৃত ভোগলালসাকে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপনরূপে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন।

গাথাসপ্তশতীতে পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, আক্ষেপানুরাগ, মান, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ও প্রোষিতভর্তৃকার বর্ণনামূলক যে সব গাথা ধৃত হইয়াছে তাহা পদাবলীসাহিত্যের ভবিষ্যৎবিকাশের সূচনা করে। পূর্বরাগের বর্ণনা করিয়া এক কবি লিখিয়াছেন—সেই তরুণী লক্ষ্য বিনা দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে, শূন্য হাসি হাসিতেছে, অস্পষ্টার্থ কি সব যেন বিড়বিড় করিতেছে,—এসব দেখিয়া মনে হয় তাহার হৃদয়ে কি যেন সংস্থিত রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের "রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে

না শুনে কাহারো কথা॥"

ইত্যাদি পদটির সহিত ইহার অনেকটা মিল দেখা যায়। একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যাকর তাঁহার সঙ্কলিত সুভাষিতরত্নকোষগ্রন্থে (১০৩) "আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা" ইত্যাদি শ্লোকটি ধরিয়াছেন। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের সঙ্কলন সদুক্তিকর্ণামৃতে (৫৯৭) এবং পরবর্তীকালের বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী (৩৪৮৫), শার্ঙ্গধরপদ্ধতি (৩৪২৩), এবং জল্হনের সূক্তিমুক্তাবলীতে (৩৯১৩) ঐ শ্লোকটির রচয়িতারূপে রাজশেখরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে (২০৮) উহা উদ্ধৃত করিলেও রচয়িতার নাম উল্লেখ করেন নাই। সেইজন্য কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন যে শ্রীরূপ গোস্বামীই ঐ শ্লোকটির লেখক এবং চৈতন্যোত্তর কোন এক চণ্ডীদাস তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া উহা রচনা করিয়াছিলেন। শ্লোকটি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের অন্তত: চারশত বৎসর আগে যে রচিত হইয়াছিল তাহা বিদ্যাকরের সুভাষিতরত্নকোষ হইতে জানা যাইতেছে। তবে ঐ শ্লোকও গাথা-সপ্তশতীর পূর্বোদ্ধৃত গাথার ভাবানুসরণে রচিত।

সুচরিত নামে এক কবি লিখিয়াছেন—"আজ এই ঘন অন্ধকারেও আমাকে সেই সুভগজনের নিকট (অভিসারে) যাইতে হইবে; (এই মনে করিয়া) এক আর্যা চোখ বুজিয়া ঘরের মধ্যে চলা অভ্যাস করিতেছেন।" (গাথাসপ্তশতী ৩।৪৯)। ইহাই বিদ্যাকরের সংগ্রহে (৮২৬) "মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দসংচারকং" শ্লোকের এবং গোবিন্দদাসের সুপ্রসিদ্ধ "কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল" (পদকল্পতরু ১০০১) ইত্যাদি পদের উপজীব্য হইয়াছিল। গাথাসপ্তশতীতে দেখা যায় যে নায়ক-নায়িকার সঙ্কেতস্থান ছিল বেতসকুঞ্জে অর্থাৎ সাদা কথায় বেতের বনে, যেখানে নায়িকার গায়ে কাঁটা ফোটা একরকম অপরিহার্য ছিল (৫।২২); কমলবনে, যেখানে কাদা ও কাঁটা মিলিত প্রচুর এবং সাপ থাকাও অসম্ভব ছিল না (৬।৭৪); হেমন্তকালে শালিধানের ক্ষেতে (৬।৬৭); কাপাসগাছের ক্ষেতে (৬।৪৯); বটতলায় (৬।৫৬) এবং করঞ্জগাছের তলায় (৬।৫৩)। ঐ সব জায়গা নিভৃত ছিল বটে, কিন্তু সুন্দর ও

সুখদায়ক ছিল না। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার স্থান শ্রীরূপ গোস্বামী নির্দেশ করিলেন সুখদ যমুনার তীরে পুষ্পিত কুঞ্জকুটীরে। তাঁহাকে অবশ্য পথ দেখাইয়াছিলেন জয়দেব।

বিপ্রলব্ধা বৈষ্ণবদেরই নিজস্ব কল্পনা নহে। অজ্ঞ নামধেয় কোন কবি গাথা-সপ্তশতীতে লিখিয়াছেন (৪।৮৫)—সেই রমণী তুমি আসিবে মনে করিয়া রাত্রির প্রথম অর্ধেক জাগিয়া কাটাইয়াছে; আর শেষ অর্ধেক তোমার বিরহবশে সন্তপ্ত হইয়া (দীর্ঘ) বৎসরের মতন মনে করিয়া কাটাইয়াছে। সকালে নায়ক আসিলে বিদুষী খণ্ডিতা নায়িকা নায়ককে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া নমস্কারপূর্বক বলিতেছেন—"হে দিনপতে, তোমাকে নমস্কার করিতেছি; তুমি প্রত্যূষে আগত হও, তোমার দেহ আরক্ত, তোমার প্রকাশ (সকলের) প্রিয়, তুমি লোচনের আনন্দ-বিধায়ক, তুমি অন্যলোকে রাত্রি কাটাইয়াছ এবং তুমি আকাশমণ্ডলের ভূষণস্বরূপ। ইহাই কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া শ্রীরূপের রাধিকার উক্তিতে দাঁড়াইয়াছে—

> মাধব পরিহর পটিমতরঙ্গং
> বেত্তি ন কা তব রঙ্গং॥
> আঘূর্ণতি তব নয়নং যাহি ঘটীং ভজ শয়নং।
> অনুলেপং রচয়ালং নশ্যতু নখপদজালং॥

মাধব! যাও যাও আর চালাকি করিও না, তোমার রঙ্গ কোন্ তরুণী না জানে? তোমার চোখদুটি ঢুলু ঢুলু করিতেছে, যাও কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া লও; শরীরে ভাল করিয়া চন্দন লাগাও, তাহা হইলে নখচিহ্নসমূহ মিলাইয়া যাইবে। (গীতাবলী ২৯।২)।

কলহান্তরিতার ভাবও গাথাসপ্তশতীতে বিরল নহে। সখী নায়িকাকে বলিতেছেন (৫।৩২)—"সে পাদপতিত হইলেও তুমি তাহাকে গণ্য কর নাই, সে প্রিয় বাক্য বলিলেও তুমি অপ্রিয় কথা শুনাইয়াছ; সে চলিয়া গেলেও তুমি তাহাকে ঠেকাও নাই; বল তো কাহার জন্য মান করিয়াছ?" আক্ষেপানুরাগের পদরচনা করিয়া চণ্ডীদাস বিখ্যাত হইয়াছেন; কিন্তু ইহারও সূত্রপাত সাতবাহন-নৃপতি হালের সংগ্রহে দেখা যায়। এক নায়িকা সখীকে বলিতেছেন—"ওগো প্রিয় সখি, যাহার জন্য সত্যই আমি লজ্জা ত্যাগ করিয়াছি, চরিত্র খণ্ডিত করিয়াছি এবং অযশের ঘোষণা প্রসারিত করিয়াছি, সেই (প্রিয়) জনই এখন উদাসীন হইয়াছে (৬।২৪)।"

গাথাসপ্তশতীর সঙ্কলনের কাল যদি সঠিকভাবে নিরূপণ করা যাইত তাহা হইলে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয় করা সহজ হইত। কিন্তু হাল স্বয়ং খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক হইলেও, তাঁহার গ্রন্থ একে একে সাতবার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। ঐ সাতসংস্করণের মধ্যে ৪৩০টি গাথা সকল সংস্করণেই আছে; বাকী ২৭০টি গাথা বিভিন্ন সংস্করণে পৃথক্ পৃথক্। বর্তমানে বহুল

প্রচলিত সংস্করণে ৭১৫ হইতে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন এমন বাক্‌পতিরাজের গাথাও (১১৯৫) দেখা যায়। চতুর্থ শতকের কবি সর্বসেন (৩৩০—৩৫৫ খ্রীঃ) এবং মানাঙ্ক (৩৭৫—৪০০ খ্রীঃ) এবং পঞ্চম শতাব্দীর দেবরাজ (৪০০—৪২৫ খ্রীঃ) ও দ্বিতীয় প্রবরসেনের (৪২০—৪৫৫ খ্রীঃ) রচনাও ইহাতে পাওয়া যায়। বাক্‌পতিরাজের কবিতাটি নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিলে, গাথাসপ্তশতীর গাথাগুলির বয়স খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কম নহে—অধিকাংশই তাহার চেয়ে অনেক প্রাচীন।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মালদহজেলায় অবস্থিত জগদ্দল মহাবিহারের বৌদ্ধভিক্ষু বিদ্যাকর সুভাষিতরত্নকোষ নামে একখানি সংগ্রহগ্রন্থে ১৭৩৮টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সংস্কৃত কোষগ্রন্থগুলির মধ্যে এইখানিকে প্রথম বলা যাইতে পারে। ইহাতে বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, সম্ভোগ, মান, প্রোষিতভর্তৃকা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর শ্লোক আছে। ইহাতেই সর্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রিয় কবিতা "যঃ কৌমারহরঃ" (৮১৫) দেখা যায়। উহাতে 'রেবারোধসি'র পরিবর্তে 'কিং মে রোধসি' আছে। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীধরদাস সদুক্তিকর্ণামৃতে রেবানদীর নামযুক্ত পাঠ ধরিয়াছেন (৫৩৩)। জল্হনের সূক্তিমুক্তাবলীতে এবং শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে শ্লোকটি শীলাভট্টারিকার রচনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরকীয়া প্রেমের এই পদটি অনুসরণ করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। উহা পদ্যাবলীতে (৩৮৩) এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (২।১) উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয় প্রেম যে অধিকতর আস্বাদ্য ইহাই উভয় শ্লোকে বলা হইয়াছে। স্বকীয় প্রেমকে ধিক্কার দিয়া একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ গৌড়দেশীয় লক্ষ্মীধর লিখিয়াছেন—"যেখানে চন্দ্রকে নিন্দা করা হয় না, যেখানে দূতীর মধুর বচন শোনা যায় না, যেখানে আলাপ অশ্রুনিরুদ্ধ হয় না, তনু ক্ষীণ হয় না, কিন্তু যেখানে নিজের বাড়ীতে স্বীয় অধীন পতিকে বা নিজের গৃহিণীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করা হয় তাহা কি প্রেম নামের যোগ্য? সে তো কষ্টের সহিত আচরণীয় গৃহাশ্রমব্রত মাত্র।"[১] নিম্বার্কসম্প্রদায়ে রাধাকৃষ্ণ স্বামীস্ত্রী; কিন্তু বাংলাদেশের লোকে যে তাঁহাদের পরকীয় সম্বন্ধ ধরিয়াছিলেন তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে শ্রীচৈতন্য ও রূপ গোস্বামীর চারিশতাধিক বৎসর পূর্ববর্তী এই লক্ষ্মীধর কবির কবিতার দিকে মন দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষ্মীধর যেখানে

১। ইন্দুর্যত্র ন নিন্দ্যতে ন মধুরং দূতীবচঃ শ্রূয়তে
নালাপা নিপতন্তি বাষ্পকলুষা নোপৈতি কার্শ্যং তনুঃ।
স্বাধীনামনুকূলিনীং স্বগৃহিণীমালিঙ্গ্য যৎ সুপ্যতে
তৎ কিং প্রেম গৃহাশ্রমব্রতমিদং কষ্টং সমাচর্যতে॥ (সুভাষিতরত্নকোষ ৮২৩)

প্রাকৃত প্রণয়ের কথা বলিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার নিজের জীবনের সাধনায় তাহাকে অপ্রাকৃত করিয়া তুলিয়াছেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামী সেই অপ্রাকৃত প্রেমকে পরম সাধ্য রূপে স্থাপন করিয়াছেন।

সংস্কৃত কোন কোষকাব্যে অথবা পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাসের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। এ বিষয়েও আমরা সর্বপ্রথমে প্রাকৃত ভাষায় রচিত পদ পাইতেছি। আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত প্রাকৃত-পৈঙ্গলে আছে—

অরেরে বাহিহি কাহ্ন নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি।
তুহঁ এখনই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি॥

হে কৃষ্ণ! নৌকা চালাও। নৌকা দোলাইও না; আমাদের দুর্গতি করিও না। তুমি এখনই পার করিয়া দাও, তারপর যা চাও তাই লও।

শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে (২৬৮—২৮০) নৌকাখণ্ডের তেরটি কবিতা তুলিয়াছেন। তাহার মধ্যে পাঁচটি তাঁহার নিজের রচনা; দুইটির লেখক কে জানা নাই; বাকী ছয়টির মধ্যে একটি সঞ্জয় কবিশেখরের, একটি জগদানন্দ রায়ের, একটি সূর্যদাসের, দুইটি মনোহরের এবং একটি মুকুন্দ ভট্টাচার্যের রচনা। ইঁহাদের কাহাকেও শ্রীচৈতন্যের পরিকর বলিয়া ধরা যায় না। সুতরাং ইঁহারা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় (১০।৩৩।২৬) "শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি"র উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে প্রাক্‌চৈতন্য যুগে ঐ দুইটি লীলা লইয়া পালাগান প্রচলিত ছিল। পদ্যাবলীতে দানলীলার কোন শ্লোক ধৃত হয় নাই। কিন্তু গুজরাতের কবি নরসিংহ মেহ্‌তা দানলীলার পদ রচনা করিয়াছেন এবং শ্রীরূপ স্বয়ং দানকেলিকৌমুদী নামে ছোট একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক রঘুনাথদাস গোস্বামী দানকেলিচিন্তামণি কাব্য লেখেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে যে নিত্যানন্দ প্রভু দানখণ্ড গান শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন—

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূতসিংহ পরমসন্তোষ॥ (৩।৫)

গানের সময়ে নিত্যানন্দ গদাধর দাসের সঙ্গে নৃত্য করিতেন—

সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে।
দানখণ্ড-নৃত্য প্রভু করে নিজ রঙ্গে॥ (৩।৫)

প্রাক্‌চৈতন্যযুগে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহাদের পদ আস্বাদন করিয়া আনন্দ পাইতেন বলিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে। তিনি ভাবের আবেশে নিতান্ত প্রাকৃত প্রণয়ের পদকেও যে আধ্যাত্মিক সুষমায় মণ্ডিত করিতে পারিতেন তাহা "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক হইতেই বুঝা যায়। প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের অথবা বিদ্যাপতির পদে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা খুব বেশি ছিল না। বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার কবি। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রণয় ও দৈহিক সম্ভোগের আলেখ্য অঙ্কনেই তাঁহার সমধিক কৃতিত্ব দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপলীলায় কখনো শ্রীকৃষ্ণভাবে, কখনও রাধাভাবে বিভাবিত হইতেন। নীলাচললীলায় তিনি রাধাভাবেই বিভোর থাকিতেন। তাঁহার ভাবোন্মাদ দেখিয়া তাঁহার পরিকরবৃন্দ রাধাকৃষ্ণপ্রেমের অলৌকিক মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থাদিরচনার পূর্বে ও সমসময়ে মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বংশীবদন, গোবিন্দ আচার্য, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ, রামানন্দ বসু, বলরাম দাস, সুন্দরানন্দ প্রভৃতি কবিগণ পূর্বরাগ, অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, গোষ্ঠ, কুঞ্জভঙ্গ, মাথুর প্রভৃতি লীলা লইয়া কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত পদের অতি অল্প অংশই আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা হইতে জানা যায় যে গোবিন্দ আচার্য রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার একটিমাত্র পদাংশ রামগোপাল দাসের রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীতে স্থান পাইয়াছে। যথা—

ঘন ঘন বরিখে বিজুরি ললপে।
তাহা দেখি প্রাণ মোর থরহরি কাঁপে॥
ছোড় ছোড় অঞ্চল নিলজ মুরারি।
লাজ নাহিক তোর হাম পরনারি॥ (পৃঃ ১৫৬)

মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ আচার্য প্রভৃতি যে সব কবি শ্রীচৈতন্যের সাহচর্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন তাঁহারা কেহই বিদ্যাপতির আলঙ্কারিক রীতি অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা চণ্ডীদাসের ধরণে সাদা কথায় মর্মস্পর্শী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও কাব্যনাটকাদি যখন বাংলাদেশে প্রচারিত হইল তখন হইতে পদাবলীসাহিত্যে নূতন ভাব ও রীতি দেখা গেল। নরোত্তমঠাকুর মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে ছয় গোস্বামী যখন বৃন্দাবনে

বসতি স্থাপন করিলেন সেই সময় হইতে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা প্রকাশিত হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট ভূতলে স্থাপিত করেন বলিয়া তাঁহাকে স্তুতি করা হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণলীলার উপর ভক্তজনের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করিবার কৃতিত্ব অধিকাংশই রূপ-সনাতন-রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীর প্রাপ্য। ইহাদের মধ্যে আবার শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত।

শ্রীরূপ গীতাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, নন্দোৎসব, রূপ, পূর্বরাগ, অভিসার, উত্তরগোষ্ঠ, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা, মান, ঝুলন, বসন্তক্রীড়া প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া পদাবলীসাহিত্যের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্দেশ করিয়া দিলেন। তাঁহার রচিত সেই সংস্কৃত পদগুলি কি ভাবমাধুর্যে, কি ভাষার অপূর্ব ভঙ্গীতে অতুলনীয়। প্রাচীন পদকর্তাদের মধ্যে কেহ এগুলির ভাবানুবাদ করিতেও সাহসী হন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একজন অক্ষম কবি উহার কিরূপ অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন শ্রীমান্ শুকদেব সিংহ দেখাইয়াছেন।

'পদ্যাবলী'র সঙ্কলন করিয়াও শ্রীরূপ বাংলার পদাবলীসাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তাহার বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুকদেব সিংহ গ্রন্থমধ্যে দিয়াছেন। তিনি কেবল যে মুদ্রিত ও প্রচলিত গ্রন্থরাজিই দেখিয়াছেন তাহা নহে, অনেক অপ্রকাশিত পুঁথি ও অধুনাদুষ্প্রাপ্য ছাপা বইও তিনি অত্যন্ত নিপুণতার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের সহিত রসগ্রাহিতার অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে। তাঁহার জন্ম নবদ্বীপে এবং বাড়ী শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের ঠিক পাশের গলিতে। এরূপ পরিবেশে মানুষ হইয়াছেন বলিয়া বৈষ্ণবীয় রসাস্বাদনক্ষমতা তাঁহার পক্ষে সুলভ হইয়াছে। তিনি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে গবেষণা করিয়াছেন তাহা পণ্ডিত ও রসিকজনের আস্বাদ্য হউক এই প্রার্থনা করি।

বাংলায় লিখিত বৈষ্ণবপদাবলীর সংখ্যা বার হাজারেরও বেশি। ঐ সব পদের প্রথম চরণের বর্ণানুক্রমিক সূচী ও তাহাদের প্রত্যেকের আকর উল্লেখ করিয়া আমি আমার সুযোগ্য ছাত্র ডাঃ নরেশচন্দ্র জানা এম্-এ, ডি-ফিলের সহায়তায় একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি। শ্রীমান্ শুকদেব সিংহের গ্রন্থ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে ঐ বার হাজার পদের মধ্যে অন্ততঃ নয় হাজার পদই শ্রীরূপ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া লেখা।

২।৯।৬৭
গোলা দরিয়াপুর
পাটনা ৪

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

মুখবন্ধ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, কাব্য ও রসশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরূপ গোস্বামী। শ্রীচৈতন্যোত্তর পদাবলীসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও সুগভীর। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'পদকল্পতরু' সম্পাদনাকালে কচিৎ দুই-চারিটি পদের টীকায় শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনার প্রভাব কিছু দেখাইয়াছেন। ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে তাঁহার 'পদ্যাবলী'র পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণে, 'History of Sanskrit Poetics' ও 'Early History of the Vaishnava Faith and Movement of Bengal'—গ্রন্থদ্বয়ে শ্রীরূপের প্রতিভার মৌলিকতা বিচারের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস-পদাবলী'তে, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় 'শ্রীরাধার ক্রম-বিকাশ'-এ, ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 'চণ্ডীদাসের পদাবলী', 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' এবং 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীসাহিত্য' গ্রন্থে প্রসঙ্গ-ক্রমে দুই-এক স্থানে শ্রীরূপের রচিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গোবিন্দদাসাদি মহাজনের উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর এ পর্যন্ত কোন ধারাবাহিক আলোচনা হয় নাই।

শ্রীরূপের লেখা গ্রন্থরাজি আলোচনা করিয়া বিশাল পদাবলীসাহিত্যের উপর কোথায় কিভাবে কতটা তাঁহার প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা নির্ণয় করাই এই নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা নির্ণীত হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত গোবিন্দদাস, রায়শেখর, যদুনন্দন দাস, ঘনশ্যাম, রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি পদকর্তার প্রতিভা কতটা মৌলিক তাহা বিচার করা অসম্ভব। এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টির উপর যাহাতে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়া বিদ্যার অগ্রগতি সাধন করা যায়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

'গীতাবলী'র পদ্যানুবাদ কোন সঙ্কলন-গ্রন্থে এ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪-সংখ্যক পুঁথিতে 'গীতাবলী'র অনেকগুলি গীতের পদ্যানুবাদ আবিষ্কার করিয়া মূলসহ সেইগুলির বিচার-বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে উপস্থাপিত করিয়াছি। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার পাঁচথুপির সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া ৺রামগোপাল আচার্যের প্রাচীন পদের পুঁথি সংগ্রহ করেন। আচার্য মহাশয় পুঁথিতে লিখিয়াছেন যে, উহার অধিকাংশ পদই দুইশত আড়াইশত বৎসর পূর্বেকার পুঁথির পত্র হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। ডক্টর মজুমদারের নিকট হইতে পুঁথিখানি লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উহার ফটো-ফিল্ম তুলিয়া রাখিয়াছেন। ওই পুঁথিতে

কতকগুলি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে। যদুনন্দন দাসের 'রসকদম্ব' গ্রন্থ এখন একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। বহুপূর্বে বটতলা হইতে উহা মুদ্রিত হইয়াছিল এবং উহার দুই-চারিটি মাত্র পদ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কেহ ওই মূল্যবান কাব্যখানির বিশুদ্ধ রূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করেন নাই। আমরা বরাহনগর পাঠবাড়ীর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের ১০৭ (২, ৬ ও ১৮)-সংখ্যক পুঁথি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৯৯ ও ১২১২-সংখ্যক পুঁথি দেখিয়া পাঠান্তরাদিসহ উদ্ধৃতি দিয়াছি। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৫০ নম্বর শোভাবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে অরুণোদয় ঘোষ কর্তৃক বিদ্যারত্ন যন্ত্রে 'রসবিলাসবল্লী' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশক উহার নাম দিয়াছিলেন "শ্রীশ্রীমৎ উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থঃ (তথা রসবিলাসবল্ল্যাং শ্রীমৎ উজ্জ্বলরস সার-সংগ্রহঃ)"। এই গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বরাহনগর পাঠবাড়ী বা নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার—কোথাও নাই। বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস গায়েন মহাশয়ের নিকট উহার একখানি প্রতিলিপি আছে। তাহাই আমরা ব্যবহার করিবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা ; কেননা উহাতে ঘনশ্যাম-ভণিতা-যুক্ত পদ রহিয়াছে ৫০টি, চণ্ডীদাস-কৃত ১টি, গোবিন্দদাস-কৃত ৩টি, নটবর-যদুনন্দন ও বল্লভদাস-কৃত এক-একটি পদ উদ্ধৃত আছে। আর কোন পদকর্তার পদ ধৃত হয় নাই। গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বলিয়া উহা হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়াছি। মনে হয় ঘনশ্যাম কবিরাজ 'গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী'র পরিপূরকরূপে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর মঞ্জরীভাবের সাধনা গোবিন্দদাস কবিরাজের পদের মাধ্যমে সুপ্রচারিত হইয়াছিল। আর তাঁহার সুযোগ্য পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজের দ্বারা 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে ব্যাখ্যাত প্রধান প্রধান ভাবগুলি রত্নের ন্যায় সমুজ্জ্বল বাংলা পদের মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে।

বিপুল পদাবলীসাহিত্যের মধ্যে যেখানে যেখানে শ্রীরূপের প্রভাব স্পষ্টভাবে পড়িয়াছে, তাহাই আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু কোন কোন স্থানে বিশেষ কোন ভাবের প্রভাব কেন পড়ে নাই, তাহারও কারণ অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

অতঃপর ঋণ-স্বীকারের পালা। বহুশাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপক ও পদাবলীসাহিত্যের নিপুণ ভাষ্যকার ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ (দুই বিষয়), পি-আর-এস্, পি এইচ-ডি, ভাগবতরত্ন মহোদয়ের পরিচালনায় আমি এই দুরূহ বিষয়ে গবেষণা করিতে সক্ষম হইয়াছি। কেবল সুনিপুণ নির্দেশনা ও বিরলদৃষ্ট গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াই তিনি আমাকে সাহায্য করেন নাই, সস্নেহে কাছে ডাকিয়া লইয়া নিজগৃহে

মাসাধিক কাল বিনাব্যয়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া এ-যুগেও আমার গুরুগৃহবাস সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। আমার গবেষণালব্ধ এই গ্রন্থখানি অচিরে যাহাতে প্রকাশিত হয় সেই বিষয়েও তাঁহার আগ্রহ সর্বাধিক। তিনি নিজের অমূল্য সময় ও শ্রম নিয়োজিত করিয়া এই গ্রন্থের দীর্ঘ একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া নিঃসন্দেহে ইহার মর্যাদা বহুগুণ বর্ধিত করিয়াছেন। অদ্বৈতবংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীসীতানাথ গোস্বামী শাস্ত্রী মহোদয় তাঁহার সংগৃহীত বৈষ্ণবগ্রন্থাদি ব্যবহার করিতে দিয়া এবং সুপরামর্শ-দানে আমাকে প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন। নবদ্বীপের প্রাক্তন পৌরপতি রায় পূর্ণচন্দ্র বাগচী বাহাদুর ও শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়—দুইজনেই আমার পিতৃদেবের বাল্য-বন্ধু; তাঁহারা স্নেহ-বাৎসল্যে বহু বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। নিজ দায়িত্বে বহু গ্রন্থ পড়িতে দিয়া আমার গবেষণা বহুদূর অগ্রসর করিয়া লইয়াছেন নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি বাগচী মহোদয়। ইঁহাদের কাহারও সহিত মৌখিক ঋণস্বীকারের সম্পর্ক আমার নয়, তাই কৃতজ্ঞচিত্তে সকলকে শ্রদ্ধা জানাইয়া নীরব রহিতেছি।

এই গবেষণাগ্রন্থের পরীক্ষক ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত সুপণ্ডিত ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, ডি-লিট্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক স্বর্গত ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, পি-আর-এস্, পি এইচ-ডি এবং ডক্টর শ্রীমজুমদার। পণ্ডিত-তিনজন গ্রন্থখানি পরীক্ষার পর যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরামর্শে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ডক্টর অব্ ফিলজফি' উপাধি দিয়া আমাকে সংবর্ধিত করিয়াছেন তাহার জন্য পণ্ডিতত্রয়কে আমি সভক্তি প্রণাম জানাইতেছি।

অধিক নাম লইয়া মুখবন্ধ আর দীর্ঘ করিতে চাহি না। তবু দুইজনের নাম অবশ্য-উল্লেখ্য। আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী আনন্দময়ী সিংহ, বি-এ গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি রচনায় আশানুরূপ সাহায্য করিযাছেন। শোভনহৃদয় প্রকাশকগণের মধ্যে অন্যতম জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ শ্রীহৃষীকেশ বারিক মহোদয় গ্রন্থটির সুমুদ্রণ ও প্রকাশনার দায়িত্ব লইয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহাদেরও ধন্যবাদ দেওয়ার উপায় নাই, তাই এইটুকু মাত্র বলি ইঁহাদের সহায়তায় আমি ধন্য।

যোগনাথতলা রোড
নবদ্বীপ, নদীয়া
১১ই আশ্বিন, ১৩৭৪

গ্রন্থকার

॥ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ও সাহিত্যে শ্রীরূপের স্থান ॥

শ্রীচৈতন্যের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে যে বিপুল বৈষ্ণবসাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার দুইটি ধারা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। গৌড়মণ্ডলে, বিশেষ করিয়া রাঢ়দেশের বরাহনগর হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবানগোলার নিকটবর্তী বুধুরীগ্রাম পর্যন্ত গঙ্গার উভয় তীরস্থ ভূখণ্ডে পদাবলীসাহিত্য রচিত হইয়াছিল ; আর ব্রজমণ্ডলে, বিশেষতঃ বর্ষাণ নন্দগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া গোকুল মহাবন পর্যন্ত ভূখণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূত লীলাক্ষেত্রে ভক্তিরসের সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলি লিখিত। শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার সঙ্গীদের মধ্যে নরহরি সরকার, গোবিন্দানন্দ ঘোষ, মাধবানন্দ ঘোষ, বাসুদেবানন্দ ঘোষ, বসু রামানন্দ, শঙ্কর ঘোষ, বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি গয়া-প্রত্যাগত নিমাইপণ্ডিতের ভাবমাধুর্য দেখিয়া পদরচনা করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এই সময় ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত ইঁহাদের পদগুলির মধ্যে সজীব উচ্ছল প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ দেখা যায়। ইঁহাদের পদগুলির মধ্যে কোন আলঙ্কারিক কৃত্রিমতা নাই, সাহিত্যদর্পণাদি রসশাস্ত্রের আনুগত্য প্রকাশের জন্য বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা নাই ; ইঁহাদের প্রবর্তিত ধারা অনুসরণ করিয়া নিত্যানন্দ সঙ্গী 'সঙ্গীতকারক বলরাম দাস', অনাথিনী শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত বংশীবদন প্রভৃতি কবিও সহজভাবে সরল ভাষায় প্রাণের নিবিড়তম আবেগকে পদে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

পদাবলীসাহিত্যের এই সহজস্ফূর্ত নিরলঙ্কার অথচ ভাবঘন ধারার পরিবর্তন ঘটিল গোবিন্দদাস কবিরাজের সময় হইতে। গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য; রূপ-সনাতনের তিরোভাবের অল্প কয়েক মাস পরে শ্রীনিবাস প্রথমবার বৃন্দাবনে গমন করেন। তিনি গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গোস্বামীদের রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজি বাংলাদেশে লইয়া আসেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজকে ঐ সব গ্রন্থ পড়াইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের ছোট ভাই গোবিন্দদাস কবিরাজ। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রভাবে পরিণত বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার পদাবলীর পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনাবলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপের 'পদাবলী'তে সংগৃহীত অনেক শ্লোক এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত শ্রীরূপের অনেক

কবিতার তিনি প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেন। তাঁহার পদাবলীর মুখ্য বিষয়গুলি শ্রীরূপের প্রদর্শিত রস-বিশ্লেষণের অনুসরণ করিয়া লিখিত। গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ, তাঁহার (ঘনশ্যামের) বংশসম্ভূত বলরামদাস কবিরাজ—(দ্বিজ বলরাম দাস নহেন), হরিবল্লভ নামধারী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীনিবাস আচার্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্যের পুত্র নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি কবি গোবিন্দদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীরূপ কর্তৃক বিশ্লেষিত উজ্জ্বলরসের বিচার অনুসারে পদ রচনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস উজ্জ্বলাদিগ্রন্থের যে যে প্রকরণের দৃষ্টান্ত দিয়া পদ রচনা করেন নাই, ইঁহারা সেই সেই বিষয়ের উপর পদ লিখিয়াছেন। ইঁহারা শ্রীরূপের গ্রন্থাদিকে এমন দৃঢ়রূপে অনুসরণ কেন করিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীরূপের কি স্থান তাহা জানা প্রয়োজন।

শ্রীরূপ বহু স্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতন গোস্বামীকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র মঙ্গলাচরণে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—'এই গ্রন্থ মদীয় ইষ্টদেবতা সদাস্বরূপ সংপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণেরই নানা রূপ প্রকাশিত তনুসমূহের মধ্যে যে সনাতন নামক তনু, তাহারই বিশ্রাম-মন্দিররূপে সুখকর হউক।' (শ্লোক—৩) পুনরায় ঐ গ্রন্থেরই পঞ্চম শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন, 'স্ফুরতু সনাতনং সুচিরং তব ভক্তিরসামৃতাম্ভোধিঃ'—'হে সনাতন, এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তোমারই আস্বাদনীয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার মানসে নিত্য উদিত হউক।' 'উজ্জ্বলনীলমণি'র প্রথমেও শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

নামকৃষ্ট রসজ্ঞঃ, শীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দম্।
নিজরূপোৎসবদায়ী, সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি ॥ (উজ্জ্বল ১।১)

এই শ্লোকে শব্দশ্লেষের দ্বারা শ্রীরূপ বলিতেছেন যে, তাঁহার গুরুদেব সনাতন নিজ রূপনামক সহোদরের উৎসবদায়ী বা আনন্দবিধায়ক। যে সনাতনকে এইভাবে প্রভু বা গুরু বলিয়া শ্রীরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সনাতন গোস্বামী 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে'র মঙ্গলাচরণে (১।১।১১) লিখিতেছেন—

ভগবদ্ ভক্তিশাস্ত্রাণাময়ং সারস্য সংগ্রহঃ।
অনুভূতস্য চৈতন্যদেবে তৎপ্রিয়রূপতঃ ॥

অর্থাৎ—এই গ্রন্থ ভগবদ্ভক্তি শাস্ত্রসমূহের সারভূত এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা হইতে অনুভূত কিংবা তাঁহার প্রিয় রূপ হইতে অনুভূত বলিয়া তাঁহারই সংগ্রহ। শ্লোকটির টীকায় সনাতন গোস্বামী স্পষ্ট লিখিয়াছেন—'তস্য প্রিয়ো রূপনামা মহাশয়

স্যাৎ ইতি।' পুনরায় ঐ গ্রন্থের টীকার প্রারম্ভে তিনি তাঁহার মাতা ও শিষ্যের কথা সগৌরবে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

নমশ্চৈতন্যদেবায় স্বনামামৃতসেবিনে।
যদ্রূপাশ্রয়না দৃযস্য ভেজে ভক্তিময়ং জনঃ॥

অর্থাৎ—যাঁহার শ্রীরূপের আশ্রয় করিলে আমার মত লোকও তাঁহার প্রতি ভক্তিলাভ করে, সেই নিজনামামৃত সেবনকারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে নমস্কার। বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের দিগ্‌দর্শিনী টীকা শেষ করিবার সময় সনাতন গোস্বামী আবার বলিয়াছেন—

স্বয়ং প্রবর্তিতৈঃ কৃৎস্বৈর্মমৈতল্লিখনশ্রমৈঃ।
শ্রীমচ্চৈতন্যরূপোঽসৌ ভগবান্ প্রীয়তাং সদা॥

এখানেও শ্লেষের দ্বারা চৈতন্যনামে প্রসিদ্ধ শচীনন্দন এবং তাঁহারই স্বরূপ বা অভিন্ন মূর্তি শ্রীকৃষ্ণকথা এবং শ্রীচৈতন্যের যিনি প্রিয় সেবক সেই রূপের কথা বলা হইয়াছে; কেননা, তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—'শ্রীমান চৈতন্যস্য তস্যৈব প্রিয়সেবকো রূপ স্তৎসজ্ঞকো বৈষ্ণববরঃ।'

১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবতের 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী' লিখিবার সময় শ্রীসনাতন বহু স্থলে অত্যন্ত গৌরবের সহিত শ্রীরূপের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেমন—১০।১৯।১৬ শ্লোকের টীকায় আছে—"শ্রীমদনুজবরৈর্বিরচিতোজ্জ্বলনীলমণাবলোকনীয়ঃ।" আবার রাসলীলার সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক "কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতী র্গোপযোষিতঃ" (১০।৩৩।১৯) ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন—'এতচ্চ শ্রীললিতমাধবাদৌ মদনুজবরৈঃ স্পষ্টং লিখিতম্।' শ্রীরূপের এইরূপ সসম্মান উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার গ্রন্থগুলি রচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

রূপ-সনাতনের পরে ছয় গোস্বামীর মধ্যে রঘুনাথদাস গোস্বামীর স্থান। রঘুনাথ-দাস শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎসেবা করিবার সুযোগ যেরূপ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পাইয়াছিলেন, রূপ-সনাতন তাহা পান নাই। শ্রীচৈতন্য ও স্বরূপ দামোদরের তিরোভাবের পর রঘুনাথদাস গোস্বামী ব্রজমণ্ডলে যাইয়া রূপ-সনাতনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি 'স্তবাবলী'র অন্তর্গত বিশাখানন্দ-স্তোত্রে (১৩৪ সংখ্যক শ্লোকে) নিজেকে 'শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলীমাত্রৈক সেবিনা' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। 'অভীষ্টসূচনে'র শেষ শ্লোকে 'রূপোঽবতু' শ্রীরূপ তাঁহাকে রক্ষা করুন, এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন। 'মনঃশিক্ষা'র তৃতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন—

স্বরূপং শ্রীরূপং মন্ত্রণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বংশৃণু মনঃ॥

কবিকর্ণপুর "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"তে শ্রীরূপকে শ্রীরূপমঞ্জরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৮০)। রঘুনাথদাস গোস্বামী 'ব্রজবিলাসস্তবে' (৩৮ শ্লোকে) এবং 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'তে (১৪ ও ৭২ শ্লোকে) রূপমঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন। শেষোক্ত শ্লোকটিতে আছে—

> শ্রীরূপমঞ্জরি করার্চ্চিত পাদপদ্ম
> গোষ্ঠেন্দ্র নন্দন ভুজার্পিত মস্তকায়াঃ।
> হা মোদতঃ কনকগৌরি পদার-বিন্দ,
> সম্বাহনানি শনকৈস্তব কিং করিষ্যে॥

ইহার অনুবাদ—

> শ্রীরূপমঞ্জরী যখন প্রীতিতে,
> আসিয়া ত্বরায় শ্রান্তি ঘুচাতে,
> কৃষ্ণের পদযুগল সেবিবে
> অতীব ধীর হস্তেতে—
> মস্তক রাখি শ্যামের বাহুতে
> কনকগৌরি রহিবে সুখেতে
> তখন সেবিব চরণ তোমার
> ইহা কি ঘটিবে ভাগ্যেতে ?

কবিকর্ণপুর—"চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকে (৯।২৯) লিখিয়াছেন—

> প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
> নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥

অর্থাৎ—স্বরূপ গোস্বামীর প্রিয়পাত্র, প্রভুর প্রিয়স্বরূপ প্রেমময় মূর্তি স্বভাবতঃ সুন্দর রূপ, প্রেম প্রচারে শ্রীচৈতন্যতুল্য মুখ্যরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণবিলাস নিরূপণকারী শ্রীরূপ গোস্বামীতে মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও কবিকর্ণপুরের উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন—

> 'রূপগোসাঞিকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া। (চৈ.চ. ২।১৯)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে 'শিক্ষাষ্টক' ছাড়া আর কিছুই লিখেন নাই। তিনি রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে অনুপ্রেরণা দিয়া প্রেমধর্মের অভিনব ব্যাখ্যা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এইজন্য নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপ কদামহ্যং দদতি স্বপদান্তিকং ॥

অর্থাৎ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনের অভীষ্ট যাঁহার দ্বারা ভূতলে স্থাপিত হইয়াছে, সেই রূপ গোস্বামী কবে তাঁহার চরণের নিকট আমায় স্থান দিবেন? ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনাতে লিখিয়াছেন—

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজনপূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন ॥

পুনরায় অন্য একটি প্রার্থনার পদে তিনি লিখিয়াছেন—

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্বজন।
শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগলচরণ ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয় ॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম সখিগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

পুনরায় আরেকটি প্রার্থনার পদে (তরু ৩০৬১) আরও স্পষ্ট করিয়া নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেবো নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্রমহৌষধি ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী দেবী মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ছায়া ॥

'পদরত্নাকর'-ধৃত (৩৪৮) ঠাকুর মহাশয়ের অন্য একটি পদে আছে—

হরি হরি কতদিনে হেন দশা হব।
শ্রীমণিমঞ্জরী সঙ্গে শ্রীরূপমঞ্জরী রঙ্গে
রূপের অনুগা পদ পাব ॥

এইরূপে বৈষ্ণব-প্রধানেরা সকলেই সম্ভ্রমভরে শ্রীরূপের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি, শ্রীরূপের নিকট সকল সাধকেরই ঋণ সুপ্রচুর। সাধারণভাবে কোন কোন বিষয়ে এই ঋণ, অর্থাৎ শ্রীরূপের প্রভাব বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনে সাধারণতঃ কী কী ভাবে পড়িয়াছে, এখন তাহাই আলোচনা করিতে হইবে।

বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যে শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রভাব সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে, সমগ্র বিষয়টি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়াই সমীচীন। প্রথমতঃ রসতত্ত্ব-চিন্তা।

বেদে এক ও অদ্বিতীয় ভগবৎসত্তা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'রসো বৈ সঃ', অর্থাৎ—তিনি রসস্বরূপ। এই রসের প্রকৃতি কিরূপ? তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতেই বলা আছে—'রসং হ্যেবায়ং লব্‌ধ্বানন্দী ভবতি', অর্থাৎ রসপ্রাপ্ত হইলেই আনন্দযুক্ত হয়। সেইজন্য আমরা দেখি, উপনিষদের বহু স্থানেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে আনন্দরূপে চিন্তা করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে বলা হইয়াছে—'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ,—এষ হ্যেবানন্দয়তি।' বাংলায় অর্থ—কেবা বাঁচিতে চাহিত, কেবা প্রাণধারণ করিত, যদি ভগবান আনন্দস্বরূপ না হইতেন: ইনিই জগৎকে আনন্দযুক্ত করিয়া থাকেন। পূর্বোক্ত উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে রহিয়াছে—'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ॥ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে॥ আনন্দেন জাতানি জীবন্তি॥ আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥' অর্থাৎ—আনন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়া মানিলেন। আনন্দ হইতে উদ্ভূত এই ভূতজগৎ আনন্দের দ্বারাই বিধৃত থাকে এবং সর্বশেষে আনন্দেই বিলীন হইয়া যায়। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কী! আমরা দেখিতেছি, শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলা হইলেও তাঁহার আনন্দস্বরূপত্বের উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বেদের ভাষ্যকার আচার্যেরাও ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপত্বেরই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন নাই। এই আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই। সেখানে কী ঐশ্বর্য! কী সৌন্দর্য! সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল; সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে

প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দরূপে নিজেকে নিয়তই দান করিতে বসিয়াছেন—লোকে লোকান্তরে সে দান আর ধারণ করিতে পারিতেছে না, যুগে যুগান্তরে তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না।' (ধর্ম, পৃঃ ১৬০) বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার সর্বাতিশায়ী প্রভাবের কথাই বলিয়াছেন, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ কেন সেই তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের পূর্বের চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্যতম সনক-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক নিম্বাদিত্য বা নিম্বাকাচার্য পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু তিনিও রসস্বরূপত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেন নাই। সর্ব-বেদান্ত সার নিখিল-প্রমাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতে কিন্তু পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের রসরূপত্ব ও রসবৈচিত্র্যের সুন্দর আভাষ রহিয়াছে—

মল্লানমশনি র্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতে র্বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাম্
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥ (১০।৪৩।১৭)

বাংলায় অর্থ—যিনি মল্লদিগের নিকট বজ্রতুল্য, সাধারণ লোকের নিকট নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণ সকাশে মূর্তিমান কামদেব, গোপকুলের নিকট স্বজন বা বন্ধু, অসতের নিকট পৃথিবীর শাসনকর্তা, নিজ পিতার নিকট শিশু, যিনি কংসের নিকট (সাক্ষাৎ) মৃত্যু, অজ্ঞের নিকট বিরাট পুরুষ, যোগিদের নিকট পরমতত্ত্ব, বৃষ্ণিবংশীয়দের কাছে পরদেবতা বলিয়া জ্ঞাত, সেই (শ্রীকৃষ্ণ) অগ্রজের (বলরামের) সহিত সভায় প্রবেশ করিলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র রূপে প্রতিভাত হইয়াছেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট তাঁহার এই রূপ এতই গভীরভাবে অনুভূত হইয়াছে যে, তাহা শেষ পর্যন্ত রসে পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়।

এই বিষয়ে শ্রীরূপই প্রথম স্পষ্ট করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আনুগত্যে তিনি পরব্রহ্মের রসস্বরূপত্বের তাৎপর্য সবিস্তারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র আদিশ্লোকে শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'অখিল-রসামৃতমূর্তিঃ'। শ্রীজীব গোস্বামী দুর্গমসঙ্গমণী-টীকায় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন—'অখিলাঃ রসাঃ বক্ষ্যমাণাঃ শান্তাদ্যাঃ দ্বাদশ যস্মিন্ তাদৃশমমৃতং পরমানন্দ এব মূর্তির্যস্য সঃ', অর্থাৎ—আলোচ্যমান শান্ত প্রভৃতি দ্বাদশটি রস যাহাতে বিদ্যমান, তিনি এমনতর পরমানন্দ মূর্তি।

রস শব্দের দুইটি অর্থ—আস্বাদ্য বস্তু ও আস্বাদক বা রসিক। শ্রীরূপ গোস্বামী এই দুইভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি দেখাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের মনে শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা কৃষ্ণরতি বা ভাবের উদয় হয়। এই কৃষ্ণরতিই ভক্তি, ইহা স্বয়ং আনন্দস্বরূপ—'রতিরানন্দরূপৈব (রসামৃতসিন্ধু ২।১।৪)। কিন্তু ইহার আস্বাদনে আনন্দ-চমৎকারিত্ব নাই, সেইজন্য ইহা মূলেই রস নহে। দধির যেমন নিজস্ব একটি স্বাদ থাকা সত্ত্বেও ইহা চিনি-কর্পূর প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হইলেই বেশ রসাল হয়, তেমনি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারীভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া আস্বাদন-চমৎকারিত্ব লাভ করিলেই কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয়।

ভক্তের রুচি ও অধিকার অনুযায়ী একই কৃষ্ণরতি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ প্রকার রূপ ধারণ করে। এইগুলিই আলঙ্কারিক পরিভাষায় স্থায়িভাব। এমন স্থায়িভাব হাস প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবকে স্ববশে রাখিয়া গাঢ়তা লাভ করে। পাঁচ প্রকার রতি নিজেদের অনুকূল বিভাব প্রভৃতির সংযোগে পরিপুষ্ট ও আস্বাদনীয় হইয়া পাঁচটি রসে পরিণত হইয়া যায়। হাস্য প্রভৃতি সাতটি গৌণীরতিও বিভাবাদির সংযোগে সাত প্রকার গৌণরসে পরিণত হয়; যেমন—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক।

ভক্ত এইসব রসের মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করেন, সেইজন্য পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণকে রসিকবর রূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। গ্রন্থের সুরুতে নায়কভেদ-প্রকরণে শ্রীরূপ দেখাইয়াছেন, উজ্জ্বল বা মধুর রসে নায়কশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণই বিষয়ালম্বন। রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতার কিংবা নারায়ণ এই উজ্জ্বলরসের নায়ক হইতে পারেন না।

শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, নায়ক চারি প্রকার—ধীরোদাত্ত, ধীর-ললিত, ধীরোদ্ধত ও ধীরশান্ত। ইহারা প্রত্যেকে আবার পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণভেদে মোট বার প্রকার। ইহার পরও প্রত্যেক প্রকারের আবার পতি ও উপপতিভেদ, সুতরাং নায়ক দাঁড়াইল চব্বিশ প্রকার। এই চব্বিশ প্রকার নায়ক অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্টভেদে ছিয়ানব্বই প্রকার। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণেই ছিয়ানব্বই প্রকার নায়কের গুণ বিদ্যমান।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির সারভূতা শ্রীরাধাকে শ্রীরূপ নায়িকারূপে নির্দিষ্ট করিয়া তাঁহারও বহুবিধ ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণে এই নায়ক-নায়িকার মধ্যে যেসব বিচিত্র রসের উৎসার ঘটে, শ্রীরূপ তাহারই সুনিপুণ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, শ্রীরূপ সার্থকভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে রসিকবর প্রমাণিত করিতে পারিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই যে ভগবৎ-তত্ত্ব চিন্তা, ইহারই প্রভাবে পরবর্তী কালে শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথায় বিভিন্ন রসের সমাবেশ সম্ভব হইয়াছে।

আমরা এতদূর যে আলোচনা করিয়া আসিলাম, ইহাতে ভক্তির রসাপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখি, প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণ ভক্তির এই রসাপত্তি স্বীকার করেন নাই। ভরতের নাট্যসূত্রে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই আটটি নাট্যরস ও কাব্যরসের উল্লেখ রহিয়াছে, ভক্তিরসের কোন স্থান নাই। 'কাব্যপ্রকাশ'-কার মম্মটভট্ট দেবাদিবিষয়া রতিকে ভাব বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন—

'রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তঃ।'

বঙ্গভাষায়ঃ—দেবাদিবিষয়া রতি ও ব্যঞ্জিত ব্যভিচারীকে ভাব বলে। ইহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে টীকাকার ঝাল্‌কিকার লিখিয়াছেন—'রতিরিতি সকলভাবোপলক্ষণম্। দেবাদিবিষয়েত্যপি অপ্রাপ্তরসাবস্থোপলক্ষণম্। তথা শব্দাশ্চার্থে। তো দেবাদিবিষয়া সর্বপ্রকারা, কান্তাদি-বিষয়াপি অপুষ্টা রতিঃ, হাসাদয়শ্চ অপ্রাপ্তরসাবস্থাঃ, বিভাবদিতিঃ প্রাধান্যেনাঞ্জিততা ব্যঞ্জিতো ব্যভিচারী চ ভাবঃ প্রোক্তঃ ভাবপদাভিধেয়ঃ কথিত ইতি সূত্রার্থঃ।' অর্থাৎ—'রতি-শব্দের দ্বারা সমস্ত স্থায়িভাবই এখানে উপলক্ষিত হইয়াছে। দেবাদিবিষয়া পদেও অপ্রাপ্তরসাবস্থা উপলক্ষিত। তথা-শব্দ চ-কারের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং দেবাদিবিষয়া সর্বপ্রকার পুষ্ট ও অপুষ্ট রতি, কান্তাদিবিষয়া অপুষ্টা রতি, অপ্রাপ্তরসাবস্থা হাসাদি এবং বিভাবাদি দ্বারা প্রধানভাবে ব্যঞ্জিত ব্যভিচারীও ভাবপদবাচ্য। ইহাই সূত্রের অর্থ।

ভক্তি যে রস নহে, ভাবমাত্র তাহা সাহিত্যদর্পণ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ প্রভৃতি গ্রন্থেও বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রসগঙ্গাধর-প্রণেতা আচার্য জগন্নাথের উক্তি উদ্ধৃত করা যায়—'অথ কথমেত এব রসাঃ। ভগবদালম্বনস্য, রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিরনুভাবিতস্য, হর্ষাদিভিঃ পোষিতস্য, ভাগবতাদিপুরাণ শ্রবণসময়ে ভগবদ্‌ভক্তৈরনুভূয়মানস্য, ভক্তিরসস্য,

দূরপহ্নবত্বাৎ। ভগবদ্‌পুরাণরূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেঽন্তর্ভাবমর্হতি। অনুরাগস্য বৈরাগ্যবিরুদ্ধত্বাৎ। উচ্যতে। ভক্তের্দেবাদি-বিষয়রতিত্বেন ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুপপত্তেরিতি।'

অর্থাৎ—এই কয়েকটি মাত্রই। শৃঙ্গারাদি নয়টি। রস ইহা এখন কি করিয়া বলা যায়? ভগবান যাহার আলম্বন, রোমাঞ্চাশ্রুপাত প্রভৃতি যাহার অনুভাব, হর্ষ প্রভৃতি যাহার ব্যভিচারীভাব, ভাগবতাদি-পুরাণ শ্রবণের সময় ভগবদ্‌ভক্তগণ যাহার অনুভব করেন। অর্থাৎ, ভাগবতাদি শ্রবণ যাহার উদ্দীপনা। সেই ভক্তিরসকে অস্বীকার করা অসম্ভব। এখানে ভগবদ্‌-অনুরাগরূপা ভক্তি স্থায়িভাব। এই ভক্তিকে শান্তরসের পর্যায়ভুক্ত করাও সম্ভব নহে, কারণ অনুরাগ নৈরাশ্যের বিরুদ্ধ বিষয়। (সুতরাং ভক্তিরস স্বতন্ত্র রসরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে রসগঙ্গাধরের যুক্তি।) ভক্তি দেবাদিবিষয়া রতি, এই রতি ভাবের অন্তর্ভুক্ত; এইজন্য ভক্তি কখনও রসে উন্নীত হইতে পারে না।

রসের সর্বপ্রকার সাধনগুলি বর্তমান থাকা সত্বেও ভক্তিকে রস বলা যায় না, তাহা ভাবের পর্যায়ভুক্ত, এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আচার্য জগন্নাথ কোনক্রমে পূর্বসূরিদের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, ঠিক বিচার করিতে পারেন নাই।

প্রাচীন আচার্যদের মধ্যে শ্রীধরস্বামী, বোপদেব, হেমাদ্রি, সুদেব, শ্রীলক্ষ্মীধর প্রভৃতি ভক্তির রসাপত্তির কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ভক্তিরসের বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। শ্রীরূপ গোস্বামীই প্রথম 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে ভক্তিরসের বিস্তৃত আলোচনা করেন।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-র দক্ষিণবিভাগে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

> বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
> স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামনীতা শ্রবণাদিভিঃ।
> এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥ (১।২)

বঙ্গার্থ:—এই স্থায়িভাবরূপ কৃষ্ণরতি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারীভাব দ্বারা শ্রবণ প্রভৃতির মাধ্যমে ভক্তজনের হৃদয়ে আস্বাদ্য হইলে ভক্তিরস বলিয়া কীর্তিত হয়।

ভক্তিরসকে এইভাবে স্বীকৃতি দিয়া শ্রীরূপ বিস্তৃতভাবে ইহার আলম্বন (নানা-গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ) ও উদ্দীপন (শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি) বিভাব, নৃত্যাদি অনুভাব, স্তম্ভস্বেদাদি সাত্ত্বিকভাব এবং নির্বেদ প্রভৃতি ব্যভিচারীভাবের বিশদ্‌ বিবরণ দিয়াছেন।

শ্রীরূপ প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের মত অগ্রাহ্য করিয়া কোন্ যুক্তিতে ভক্তি বা দেবাদিবিষয়া রতিকে রস বলিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রীজীব গোস্বামী 'প্রীতিসন্দর্ভে' লিখিয়াছেন—

'যৎ তু প্রাকৃতরসিকৈঃ রসসামগ্রীবিরহাদ্ ভক্তো রসত্বং নেষ্টং তৎ খলু প্রাকৃত-দেবাদিবিষয়মেব সম্ভবেৎ।' বাংলায় অর্থঃ—প্রাকৃত-রসবিদ্‌গণ যে বলিয়া থাকেন রসসামগ্রী (আনুষঙ্গিক উপাদান) নাই বলিয়াই ভক্তি কখনও রস হইতে পারে না, ইহা প্রাকৃত দেবাদিবিষয়ে সম্ভব। শ্রীজীব বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে ভক্তি তাহাতে রসসামগ্রী পূর্ণমাত্রায় আছে, সুতরাং তাহা অবশ্যই রসরূপে গণ্য হইতে পারে।

যাহা হউক, শ্রীরূপের এই ভক্তিরস স্থাপনের ফলে কবিপ্রতিভাসম্পন্ন বৈষ্ণব সাধকেরা পদরচনাকেও সাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলাবিলাস বর্ণনা করিয়া পদকারগণ যখন পদ রচনা করিয়াছেন, তখনও তাঁহাদের বিশ্বাস সাধনাই হইতেছে। আবার শ্রোতারা যখন পদগুলি গীত হইতে শুনিয়াছেন, তখন তাঁহাদেরও অন্তঃকরণে অধ্যাত্মচিন্তা জাগরূক হইয়াছে। শ্রীরূপের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে পদরচনা ও শ্রবণের ক্ষেত্রে এইরূপ কোনক্রমেই হয় নাই। 'গীতগোবিন্দম্'-রচয়িতা জয়দেব তাঁহার কাব্যে বলিয়াছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো,
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীং। (প্রথম সর্গ, ৩ শ্লোক)

অর্থাৎ—যদি হরিকে স্মরণ করায় মন সরস হয়, যদি বিলাসকলায় কৌতূহল থাকে, তাহা হইলে জয়দেবসরস্বতীর মধুর কোমল ও সুন্দর পদাবলী শ্রবণ করুন। এখানে কাহারা তাঁহার পদাবলী পাঠ করিবেন, সেকথা বলিতে গিয়া কবি জয়দেব রসিক ও বিলাস-লিপ্সুদেরই উল্লেখ করিয়াছেন, সাধক বা ভক্তের কথা বলেন নাই। ভগবানের দশাবতার বর্ণনা-প্রসঙ্গে জয়দেব লিখিয়াছেন—

শ্রীজয়দেব কবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারং। (১ম সর্গ, ১১ শ্লোক)

অর্থ—শ্রীজয়দেব কবির এই উদার, সুখ ও মঙ্গলপ্রদায়ী, সংসারের সারভূত বাক্যাবলী শ্রবণ করুন।

অন্যত্র কবি বলিয়াছেন—

শ্রীজয়দেব ভণিতমিতি গীতং।
সুখয়তু কেশবপদমুপনীতং॥ (৪র্থ সর্গ, ৮ শ্লোক)

অর্থ—শ্রীজয়দেবের প্রণীত এই গীত শ্রীকৃষ্ণচরণেপ্রণতকে সুখী করুক। এই সমস্ত কথায় আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, কবি জয়দেব অধ্যাত্মবাদীদের জন্য সাধন-সঙ্গীত রচনা করেন নাই, গীতের দ্বারা সংসারী মানুষেরই সুখবিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্যে শ্রীভগবানের উদ্দেশে উজ্জলরসের উপাসনার কিছু আভাস দিয়াছেন মাত্র। 'লীলাশুক' বিল্বমঙ্গল ঠাকুর গ্রন্থের চতুর্থ শ্লোকে ভগবৎসত্তার 'জ্যোতি'র দিক, পঞ্চম ও একাদশ শ্লোকে 'ধাম', অষ্টপঞ্চাশৎ ও সপ্ত-সপ্ততিতম শ্লোকে 'মহঃ' এবং ষট্সপ্ততিতম শ্লোকে 'তেজঃ' বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে বৈষ্ণবসাহিত্যবেত্তা ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় তাঁহার প্রকাশমান গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন— "চৈতন্যদাস মহঃ মানে কান্তি এবং কবিরাজগোস্বামী ব্রহ্মাসমূহের মহঃ বা প্রকাশ যাঁহা হইতে বলিয়াছেন। তেজঃ শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া গোপাল ভট্ট লিখিয়াছেন, উহা নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতি নহে, কেননা উহার বিশেষণ হইতেছে ধেনু-পালক এবং 'রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়ী'। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে, লীলাশুক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরূপগোস্বামীর আবির্ভাবের বহুপূর্বেই উজ্জলরসের উপাসনার কিছু সূচনা করিয়াছিলেন।"

গ্রন্থে উজ্জলরসের কিছু আভাস থাকিলেও, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের যথোচিত সম্ভ্রম ও নিষ্কলুষ অধ্যাত্মদৃষ্টি 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে' অনুপস্থিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ৮৫তম শ্লোকে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিয়াছেন—'মুখাম্বুজং চুম্বতি মানসং মে' অর্থাৎ আমার মন মুহুর্মুহু তোমার মুখপদ্ম চুম্বন করিতেছে। গোপাল ভট্ট 'চুম্বতি' কথার অর্থ 'স্বায়ত্তীকরোতি' লিখিয়াছেন, কবিরাজগোস্বামী জানাইয়াছেন 'চুম্বতি' অর্থে 'নেত্রভৃঙ্গদ্বারা নিপীয় আস্বাদয়তি'। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৈষ্ণব ব্যাখ্যাতাগণ স্বকপোলকল্পিত ভাষ্যে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কথাগুলির সহজার্থ প্রচ্ছন্ন করিতে চাহিয়াছেন। ৩৫তম শ্লোকে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর 'উপগূহন' অর্থাৎ আলিঙ্গনের কথা বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের এই যে চুম্বন ও আলিঙ্গন করার ইচ্ছা—ইহা নিঃসন্দেহে সাধনার গাম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিকতা সপ্রমাণ করে না।

কবি বিদ্যাপতিও ভক্তিগদগদ চিত্তে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলা স্মরণ করিয়া

অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হইতে চান নাই। সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণের বিরহিণী শ্রীরাধাকে সান্ত্বনা দিয়া কবি বলিয়াছেন—

বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ।
সুপুরুষ কবহুঁ না তেজয় নেহ।

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, (হে রাধে) ধৈর্য ধারণ করুন, সুপুরুষ অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তি কখনও ভালবাসা পরিত্যাগ করে না।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের মুহূর্তে বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
তুহুঁ মুগধিনি সোই লুবধ মুরারি॥

বলাই বাহুল্য, এখানে শ্রীরাধাকে মুগ্ধা এবং মুরারিকে লুব্ধ বলার পিছনে রস-বোদ্ধার অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু ভক্তের ভগবল্লীলারস আস্বাদনের শ্লাঘ্য পরিতৃপ্তি অভিব্যঞ্জিত হয় নাই। বিদ্যাপতির পদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর-লীলা বর্ণনার মধ্যে ভক্তের অনমুকরণীয় ভঙ্গীটি প্রচ্ছন্ন নাই, আছে সহচর সুরসিকের লীলাবিলাস আস্বাদনের প্রসন্নতা। ইহার পরে শ্রীরূপের কাল হইতে পদকর্তাদের পদরচনার ভঙ্গীটিই যে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ পদাবলীসাহিত্যে সুস্পষ্ট। নরোত্তম ঠাকুর শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

মধুর বৃন্দাবনে শ্যাম-গোরী-তনু
তুহুঁ নব কিশোরী কিশোর।
নরোত্তম দাস আশ চরণে রহুঁ
শ্রীবল্লভ-মন ভোর। (কীর্তনপদাবলী, পৃঃ ১৮৮)

এখানে ভক্তের আকুতিই যে উদ্‌গ্রীব হইয়াছে, তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া ভক্তকবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

কঞ্জ-লোচন কলুষ-মোচন
শ্রবণ-রোচন-ভাষ।
অমল-কোমল চরণ-কিশলয়
নিলয় গোবিন্দদাস। (কীর্তনপদাবলী, পৃঃ ৩৫)

পদে আমরা দেখিতেছি, পদকর্তা গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কলুষ কোমল চরণ-কিশলয়ে আশ্রিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের অধ্যাত্ম-সাধনার পরিচয়ও সুব্যক্ত।

যদুনাথ দাস মিলন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

কুঞ্জভবন দুহুঁক মিলন
অনুপম সুখ সোহিনী।
যদুনাথ দাস চিত অভিলাষ
হেরি শ্যাম মনমোহিনী॥ (কীর্তনপদাবলী, পৃঃ ৯৩)

'চিত অভিলাষ' কথাটির মধ্য দিয়া পদকর্তা তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তি ও ভক্তের আন্তরিক ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরাধার জন্মলীলা-প্রসঙ্গে শশিশেখর বলিয়াছেন—

পুরাইল গোপাল তোমার আমার বাসনা।
এ শশিশেখর দিল নগরে ঘোষণা॥ (কীর্তনপদাবলী, পৃঃ ২১৩)

শ্রীকৃষ্ণের দানলীলায় শ্রীরাধা যেখানে ঈষৎ রুষ্ট হইয়াছেন, সেই বিষয়ে বর্ণনা দিতে গিয়া শ্রীনিবাস আচার্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন—

কো ইহ ভাব ভরহি ভরমাইত
কিঞ্চিত পটল আঁখি।
রাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুবব
ও রস-মাধুরী দেখি॥ (কীর্তনপদাবলী, পৃঃ ২৮৮)

শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গে ভক্তের এই সমুদয় ভাবই শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসস্থাপনার ফল। ভক্ত কবিরা পদাবলীর মাধ্যমে সাধন-সঙ্গীতই[১] রচনা করিয়াছেন।

১। বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে এই সাধন-সঙ্গীত রচনা শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। কিন্তু হুসেন শাহের অন্যতম মন্ত্রী আর্বী-ফার্সীতে পারঙ্গম শ্রীরূপ এই বিষয়ে অন্ততঃ অনুপ্রাণিত হইয়াছেন সূফী সাধকদের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববরেণ্য মনীষী-অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—'Divine worship by means of songs and chants and with music was nothing new in India. But an almost frenzied worship through singing, music and dancing seems to have been a new thing in the medieval religious life of India, particularly in Vaishnava Bengal; and although I do not insist that herein we have an incidence of influence from Sufism on Bengal Vaishnavism, yet it appears quite reasonable to assume that a form of Sufi worship through a sort of frenzied singing or repetition of a divine name (Sikr or Zikr), which raised religious emotion to the highest pitch, acted as a stimulus upon a similar path or line of Vaishnava religious sadhan in Medieval India.'

(Islamic Mysticism, Iran & India : Pp. 29,
Indo-Iranica, Vol. I, Oct. 1946)

সাত্ত্বিকভাবের বিশ্লিষ্ট চিন্তাতেও শ্রীরূপ পথিকৃৎ। এই ভাবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ। (সিন্ধু ২।৩।১০২)

বাংলায় অর্থ: সাক্ষাদ্‌ভাবে কিংবা কিছু ব্যবহিতভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাবগুলির দ্বারা চিত্ত যখন আক্রান্ত হয়, তখন সেই চিত্তকে বলা হয় সত্ত্ব। এই সত্ত্ব হইতে উদ্ভূত ভাবসমূহই সাত্ত্বিকভাব। 'চিত্ত যখন সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া আপনাকে প্রাণবায়ুতে সমর্পণ করে এবং প্রাণও যখন বিকারাপন্ন হইয়া অতিশয়রূপে দেহের ক্ষোভ উৎপাদন করে, তখনই ভক্তদেহে সাত্ত্বিকভাবসকল উদিত হইয়া থাকে।' (গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব —শৈলেশ্বর সান্যাল)।

সাত্ত্বিকভাব সংখ্যায় আটটি। যথা—স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম), রোমাঞ্চ (পুলক), স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

প্রলয়ে বাহিরের চেষ্টা লোপ পায়, কিন্তু মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হয় না। এই অবস্থাতেও অন্তরে ভগবৎস্ফূর্তি বিদ্যমান থাকে। সাত্ত্বিকভাবগুলি অনুভাবেরই প্রকাশবিশেষ, কিন্তু বিনা চেষ্টায় স্বয়ং উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

শ্রীরূপ এই সাত্ত্বিকভাবসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক আবার দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ। যখন শান্ত, দাস্য প্রভৃতি পাঁচটি মুখ্যরতির কোনটির দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হয়, তখন তাহা হইতে উদ্ভূত ভাবকে বলে মুখ্য স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক। হাস্য, বিস্ময় প্রভৃতি সাতটি গৌণরতির যে-কোন একটির দ্বারা আক্রান্ত চিত্তের ভাবসমূহকে গৌণ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক বলা হয়। যদি মুখ্য ও গৌণ রতি ভিন্ন অন্য রতিবহুল মন ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সেই ভাব রতির অনুগমন করে, তবে তাহাকে বলে স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক। মধুর ও আশ্চর্য ভগবৎকথা শোনায় কখনও যদি ভক্তের মতো অথচ রতিশূন্য মনে ভাবের উদয় হয়, তবে এই ভাবকে বলা যায় রুক্ষ সাত্ত্বিক।

এইরূপে শ্রীরূপ সাত্ত্বিকভাবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। পরবর্তী কালে বৈষ্ণবসাধনায় ও পদাবলীসাহিত্যে এই ভাবের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এখানে পদাবলীসাহিত্য হইতে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত গৌরাঙ্গের ভাবচিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া পদকর্তা গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব ॥

শ্রীকৃষ্ণের মেঘরূপ চক্ষু দুইটি হইতে ঘন বারি (অশ্রু) বর্ষিত হওয়ায়, দেহ পুলকরূপ (রোমাঞ্চ-সম্বলিত) মুকুলে পর্যবসিত হইয়াছে। এই দেহ-মুকুল হইতে স্বেদরূপে মধু বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইতেছে। এবং এই সমস্তের ফলে অন্তরে ভাবরূপ কদম্ব-ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে। বলাই বাহুল্য, এখানে সাধককবি গোবিন্দদাস অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের কথা মনে করিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গের বহির্বিকার বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রেমদাস নামান্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

সখীর বচনে অথির কান।
বুঝল সুন্দরী তেজল মান ॥
অরুণ নয়ানে ঝরয়ে লোর।
গদগদস্বরে বচন বোল ॥ (গীতরত্নাবলী, পৃঃ ১১৬)

মিলনদৃশ্যে এই 'ঝরয়ে লোর' এবং 'গদগদস্বরে বচন' নিঃসন্দেহে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের পরিচায়ক।

গৌরকিশোরের কথায় নিমানন্দ লিখিয়াছেন—

কনক কমল জিনি গৌরবরণখানি
আর তাহে পুলকের পাঁতি।
বচন নাহিক কয়, অবনত মাথে রয়,
কি লাগিয়া হইল আন ভাতি ॥

আরে মোর গৌরকিশোর।
এমন হইলে কেনে ধারা বহে দু নয়নে
অবিরত ভাবে বিভোর ॥
নিতি নিতি পুন পুন, ধরণী লোটায় ঘন,
প্রিয় পরিষদে গুণ গায় ॥ (কীর্তনপদাবলী, পৃঃ ১৩০)

'পুলকের পাঁতি' অর্থাৎ পুলক, 'হইল আন ভাতি' অর্থাৎ বৈবর্ণ্য, 'ধারা' অর্থাৎ অশ্রু, ধরণীতে লুটান অর্থাৎ প্রলয়, ঘন ঘন কম্প—এই সমস্তই শ্রীরাধার ভাবে ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে দেখা হইয়াছে।

পূর্বরাগ-লিপ্তা শ্রীরাধার ভাব শ্রীগৌরাঙ্গে আরোপ করিয়া পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুরও লিখিয়াছেন—

> ছল ছল নয়ন-কমল সুবিলাস।
> নব নব ভাব করত পরকাশ॥
> পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ। (কীর্তনপদাবলী, পৃঃ ১১৯)

এইগুলি শ্রীরূপ গোস্বামীর সাত্ত্বিকভাবচিন্তার ফলশ্রুতি নয় কি?

'জীবের সাধন-চিন্তা।'

শ্রীরূপের দ্বিতীয় গ্রন্থ-প্রভাব জীবের সাধন-চিন্তা বিষয়ে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১০।৮৭।৩০) স্পষ্টই বলা হইয়াছে, জীব বিভু-স্বভাব ভগবানের অংশ, অস্বতন্ত্র। ভগবানের তুলনায় এই জীব যে কত ক্ষুদ্র, তাহা বলিতে গিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতকার লিখিয়াছেন—

> কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
> জীবঃসূক্ষ্মস্বরূপোঽহং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥ (১০।৮৭।৩০)

অর্থাৎ—কেশাগ্রের শত ভাগের শতাংশের সদৃশ জীব সূক্ষ্মস্বরূপ সংখ্যাতীত চিৎকণা।

জীব ভয় পায় কেন, তাহার কর্তব্যই বা কি, এই বিষয়ে ওই শ্রীমদ্‌ভাগবতেই বলা হইয়াছে—

> ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা
> দীশদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
> তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
> ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ (১১।২।৩৭)

বাংলায় অর্থঃ ভগবদ্বহির্মুখজনের নিজরূপ অর্থাৎ কৃষ্ণদাসত্ব অনুসন্ধান না করার ফলে অহংবুদ্ধি জন্মে এবং তাহার জন্যই দ্বৈতাভিনিবেশের হেতু ভয় উপস্থিত হয়। এই কারণে বুদ্ধিমান ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বর ও আত্মদৃষ্টি করিয়া একান্ত ভক্তিতে সেই ভগবানের ভজনা করিবে।

শ্রীচৈতন্যের আনুগত্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পরম শ্রদ্ধেয় ও আকর গ্রন্থরূপে গণ্য করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে নির্দেশ—জীবের

একমাত্র অবলম্বনীয় শ্রীকৃষ্ণভজনা সেইখান হইতেই চিন্তা সুরু করিয়াছেন। ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণভজনার মূল। এই ভক্তির শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন শ্রীরূপ। তাঁহার মতে, ভক্তি প্রধানতঃ তিন প্রকার—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা সাধনীয় ভক্তির নাম সাধনভক্তি। সাধনভক্তির নিয়ত অনুশীলনে চিত্ত যখন নির্মল হয়, তখন সেই বিশুদ্ধ চিত্তে প্রথমতঃ ভাবভক্তির, পরে প্রেমভক্তির উন্মেষ ঘটে। প্রেমভক্তির উন্মেষে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে মমতা বা আপন-জ্ঞান থাকে না। যে জন্য সাধন করা হয় তাহাই সাধ্য। সাধ্যভক্তি হইতেছে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধন করার অবস্থায় ভক্তি সাধনভক্তি, কিন্তু সিদ্ধ-অবস্থায় ভক্তি হয় প্রেমভক্তি, ভাবভক্তি প্রেমভক্তির পূর্বস্তর মাত্র।

সাধনভক্তিকে শ্রীরূপ আবার দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—'বৈধীরাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা' (সিন্ধু পৃঃ ৩৩) অর্থাৎ—বৈধী ও রাগানুগাভেদে দুই প্রকার।

বৈধী প্রসঙ্গে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধীভক্তিরুচ্যতে॥ (সিন্ধু, পৃঃ ৩৩)

অর্থ—যেখানে অনুরাগ উৎপন্ন হয় নাই, শাস্ত্র-শাসনে প্রবৃত্তি জন্মে, সেইখানে ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলে।

বৈধীভক্তির নিয়ত অনুশীলনে সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণানুরাগী সাধুর সঙ্গলাভ হইলে এবং সেই সাধুর প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণদেবের লোভ জন্মিলে, সেই লোভপ্রযুক্ত যে ভজন তাহাই রাগানুরাগ বা রাগভক্তি। এই বিষয়ে শ্রীরূপ আরও বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্‌ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥ (সিন্ধু, পৃঃ ১৬২-৬৩)

অর্থাৎ—অভিলষিত বিষয়ে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা হেতু প্রেমময় তৃষ্ণাকে রাগ বলে, সেই রাগময়ী ভক্তিকেই বলা হয় রাগাত্মিকা।

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামানুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥ (সিন্ধু, পৃঃ ১৬২)

অর্থ—ব্রজবাসিগণের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া বিরাজমানা যে রাগময়ী ভক্তি তাহার অনুবর্তিনী ভক্তির নাম রাগানুগা ভক্তি।

শৃঙ্গাররসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রসমাধুর্যের আকর্ষণে ব্রজবাসিগণের চিত্ত সর্বদাই রাগময়। ব্রজবাসিগণ যাহা-কিছু করেন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য। তাঁহারা নিজেদের সুখ-সুবিধার প্রতি কণামাত্র লক্ষ্য দেন না। শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কে এই ব্রজবাসি-

গণের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। তাঁহাদের নব নব আকাঙ্ক্ষা, নব নব আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অমিত আকাঙ্ক্ষার পূরণে তাঁহারা অমিত পরিমাণেই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ত দেখিয়াও তাঁহাদের সাধ মিটে না, মুহূর্তের জন্য না দেখিলে প্রাণ যেন ফাটিয়া যায়। পুত্রকে দেখামাত্রই গোপরাজ নন্দের নয়নযুগল হইতে অবিরত আনন্দাশ্রু বর্ষিত হয়, পুত্রকে অবলোকন করামাত্র মাতা যশোমতীর স্তনযুগল হইতে দুগ্ধধারা স্বতঃই উৎসারিত হইতে থাকে। গোপাঙ্গনারাও শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া পড়েন। ব্রজবাসীর এই রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা ভক্তি।

শ্রীরূপের মতে রাগাত্মিকা ভক্তি দ্বিবিধ—কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা। যে ভক্তি সম্ভোগ-তৃষ্ণাকে বিশুদ্ধ প্রেমে পরিণত করে, তাহাই কামরূপা। যেমন—ব্রজগোপীদের ভক্তি। এই ব্রজগোপীরা আপাতদৃষ্টিতে যেন কামক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু কিছুটা চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে, তাঁহাদের সমুদয় কাজ আত্ম-পরিতৃপ্তির জন্য নহে, বরং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধানের জন্যই নিয়োজিত। এইজন্যই তাঁহাদের প্রেম অকৈতব।

রাগাত্মিকা ভক্তির অন্যরূপ—সম্বন্ধরূপা। যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র বা সখারূপে চিন্তা করা হয়, সেখানেই ভক্তি সম্বন্ধরূপা হইয়া থাকে। যেমন—নন্দ বা যশোমতী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের 'দুধের বাছা' গোপাল চিন্তা করেন, সুবলাদি চিন্তা করেন পরাণসখা।

কামরূপা বা সম্বন্ধরূপা কোন প্রকার রাগাত্মিকা ভক্তিই জীবের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ বিভু-স্বভাব ব্রজবাসিগণে রাগ স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু অণুস্বভাব জীবের পক্ষে রাগ সাধনা-সাপেক্ষ। জীব সেইজন্য রাগাত্মিকা ভক্তির অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে, তাহার ভক্তি রাগানুগা। কোন সখী বা ব্রজবাসীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় রাগ অনুভব করিবার চেষ্টা করে, তখনই রাগানুগার সৃষ্টি হয়। এই রাগানুগা ভক্তিতে শাস্ত্র বা যুক্তির কোন প্রয়োজন নাই। রাগানুগার সাধক শ্রীকৃষ্ণকে নিতান্ত আপন ভাবিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবার লোভে সাধনায় প্রবৃত্ত হন।

বাহ্য ও আন্তরভেদে রাগানুগার ভজন দ্বিবিধ। বাহ্যে সাধক দেহে শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান এবং অন্তরে নিজ সিদ্ধদেহে ভাবনা করিয়া নিজ ভাবনানুকূল কোন শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরের আনুগত্যে দিবানিশি ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-চিন্তা ও সেবারস-আস্বাদনের প্রয়াস।

শ্রীরূপের নির্দেশিত রাগানুগা ভজন-পদ্ধতিই আজ বৈষ্ণব সাধকদের সকলেরই আদর্শ। সেইজন্যই আমরা দেখি, রাগানুগা ভক্তির বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করিতে গিয়া 'রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা'র আদি-শ্লোকেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয় এই পথের আদি-আচার্য শ্রীরূপের কথা সম্ভ্রমে স্মরণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যেও রাগানুগা ভজন-পদ্ধতির প্রভাব সুপ্রচুর। বৈষ্ণব পদকারগণ কোথাও যে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ, এমন কি কোন গোপগোপীর ভূমিকা লইয়াও মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই, সেখানেই আমরা রাগানুগার ফলশ্রুতি লক্ষ্য করি। শাক্ত-সাধনার ক্ষেত্রে রাগানুগা ভক্তি নাই, সেইজন্য শাক্তপদে রামপ্রসাদ প্রভৃতি সরাসরি জগজ্জননীর কাছে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে কখনও তাহা সম্ভব নয়। প্রাক্‌চৈতন্যপর্বের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদে, পদকর্তার যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার ভূমিকা গ্রহণ করার ঈষৎ লক্ষণ আছে, কিন্তু শ্রীরূপের রাগানুগা ভক্তি নির্দেশের পরে সেই ভাব কোন পদকারের মধ্যেই আর দেখা যায় না।

রাগানুগা ভক্তির অন্য প্রভাবও দেখা যায়। অনেক সাধক-কবি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার যে অভিলাষ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে রাগানুগা ভক্তিই অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। নরোত্তম ঠাকুর লিখিয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন।
রতনবেদীর পরে বসাব দুজন॥
শ্যাম গোরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দন গন্ধ।
চামর ঢুলাব করে হেরব মুখচন্দ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥

(কীর্তনপদাবলী, পৃঃ ৪২৭)

উপরি-ধৃত পদে ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীবৃন্দের আজ্ঞায় পদকার যে (শ্রীরাধা-কৃষ্ণের) চরণারবিন্দের সেবা করিবেন বলিতেছেন, তাহাতেই রাগানুগা ভক্তি সুব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে।

গৌরসুন্দর দাস লিখিয়াছেন—

রাধানাথ করুণা করহ আমা।
সাধন ভজন কিছু না করিলুঁ
ব্রজে বা না পাই তোমা॥
রাধানাথ, এ লাগি আকুল চিত।
রহি রহি মোর সংশয় হইছে
ভাবিতে হইলুঁ ভীত॥

(কীর্তনপদাবলী, পৃঃ ৪৩০)

এখানে সাধন ভজন কিছু না করা সত্বেও পদকারের রাধানাথের প্রতি যে অনুরাগ জন্মিয়াছে, ইহাই রাগানুগা ভক্তি।

শ্রীরূপ গোস্বামী বৈষ্ণবীয় সাধন-প্রণালীর মধ্যে একটি নূতন ধারার প্রবর্তন করেন, তাহার নাম মঞ্জরীভাবের সাধনা। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড (আনন্দাশ্রম সংস্করণের ৮৩ অধ্যায় ও বঙ্গবাসী সংস্করণের ৫২ অধ্যায়) হইতে দেখাইয়াছেন যে, উহাতে মঞ্জরীভাবের সাধনার মর্মকথা নিহিত আছে—"শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিতে হইলে আপনাকে কৃষ্ণসেবিনী রমণীদিগের মধ্যবর্তিনী রূপযৌবনশালিনী মনোরমা কিশোরীরূপে চিন্তা করিতে হইবে। ভাবনার দ্বারা আপনাকে বিবিধ শিল্পবিদ্যানিপুণা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহবাসের উপযোগিনী রমণী করিয়া তুলিতে হইবে, আরও মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে, আমি রাধিকার পরিচারিকা, কৃষ্ণ আমাকে সম্ভোগার্থ আহ্বান করিতেছেন, তথাপি আমি তাঁহার নিকট গমন করিতেছি না—এইরূপ চিন্তা করিয়া সখীভাবে সর্বদা রাধিকার সেবা করিবে, কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধিকার উপরে সমধিক ভক্তি করিবে। প্রতিদিন যত্ন করিয়া ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণের মিলনসাধনে যত্নবান হইবে এবং তাঁহাদের যুগলমূর্তির সেবা করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিবে। আপনাকে এইরূপ রাধিকার সহচরীরূপে ভাবনা করিয়া ব্রাহ্ম-মুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মহানিশা পর্যন্ত ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবে" (ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীসাহিত্য, পৃঃ ১৭৩ হইতে উদ্ধৃত)। মূল পদ্মপুরাণে প্রথম হইতেই এইরূপ সাধন-প্রণালীর ইঙ্গিত ছিল,

একথা বিশ্বাস করা কঠিন; যদি রূপ গোস্বামী এই সাধন-প্রণালীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পদ্ম-পুরাণে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি কোথাও না কোথাও ইহা উদ্ধৃত করিতেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে তিনি পদ্মপুরাণ হইতে ৩০টি উদ্ধৃতি দিয়াছেন, কিন্তু এইভাবের উদ্ধৃতির কোন আভাস দেন নাই। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তেও পদ্মপুরাণ হইতে চারবার উদ্ধৃতি দিয়াছেন, সেখানেও এইরূপ কথার কোন আভাস দেখা যায় না। এই যুগে আমরা যেমন সব-কিছুকে নিজের মৌলিক আবিষ্কার বলিয়া চালাইবার জন্য ব্যগ্র হই, বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ তেমনি অনেক নূতন বিধি-প্রণালীকেও শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিতে ব্যগ্র ছিলেন। পদ্মপুরাণে এইরূপ মঞ্জরীভাবের সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকিলে শ্রীরূপ যে তাহার উল্লেখ করিবেন না, ইহা সম্ভব মনে হয় না। পুণা ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুটে সংগৃহীত প্রাচীন পদ্মপুরাণের পুঁথিগুলির অনুসন্ধান করিয়া দেখা প্রয়োজন যে, উক্ত শ্লোকগুলি কয়খানি পুঁথিতে আছে।

পদ্মপুরাণে যদি সত্যই মঞ্জরীভাবের সাধনার ইঙ্গিত থাকিত, তাহা হইলে সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্ভাগবতামৃতে উহার কিছু-না-কিছু ইঙ্গিত দিতেন; কিন্তু বৃহদ্ভাগবতামৃতে দেখা যায় যে, গোপকুমার বৈকুণ্ঠাদি সমস্ত ধাম ঘুরিয়া আসিয়া যখন ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি গোপবেশেই রাধাকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করিলেন। শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারকে সঙ্গে করিয়া ভোজন করিতে বসিয়াছেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে মনোহর নামক একপ্রকার লাড্ডু খাইতে দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ একটুখানি মুখে দিয়াই মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—"রাধে, এই লাড্ডু তোমার ওই ভ্রাতৃবংশজাত সরূপেই যোগ্য।" এই বলিয়া উহা গোপকুমারের পাতে দিলেন। গোপকুমার উহা খাইয়া দেখিলেন, উহা পরম সুস্বাদু। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে পরিহাস করিয়াছেন এবং গোপকুমারকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। (বৃহদ্ভাগবতামৃত, ২।৬।১২৯—৩১)

মনে হয় 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' রচনার পরে শ্রীরূপ গোস্বামী মঞ্জরীভাবের উপাসনা-প্রণালীর প্রবর্তন করেন। এই উপাসনা-প্রণালীর মূল কথা হইতেছে এই যে, সাধক নিজেকে ব্রজের নিত্যসিদ্ধা কোন সখীর অনুগতা কিশোরীরূপে চিন্তা করিবেন। তাঁহার একমাত্র কার্য হইবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবা করা, তাহার মধ্যে নিজের ভোগবাসনার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকিবে না। শ্রীরূপ গোস্বামী 'স্তবমালা'র বহু স্থানে এইরূপ সেবার কথা বলিয়াছেন। 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি'তে (১৯ শ্লোক) আছে যে, মাধব

যখন মাধবীফুল দিয়া শ্রীরাধার দেহকে সাজাইতেছেন, তখন তাঁহার করস্পর্শে শ্রীমতীর সাত্ত্বিকভাবজনিত স্বেদ বাহির হইতেছে। এমন অবস্থায় কবে তাঁহাকে শ্রীরূপ বীজন করিবেন?—'স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা।' কেলিবিলাসের ফলে শ্রীরাধার কুটিল কেশপাশ বিস্রস্ত হইলে তাহা ঠিক করিয়া দিবার জন্য শ্রীরাধা কবে শ্রীরূপকে আদেশ করিবেন (২০ শ্লোক)। পুনরায় তিনি প্রার্থনা করিতেছেন—"হে বিম্বোষ্ঠী, আমি তোমার মুখকমলে তাম্বুল দিব, শ্রীকৃষ্ণ উহা তোমার মুখ হইতে কাড়িয়া খাইবেন, তোমাদের এই ভাব আমি কবে দেখিব, (২১ শ্লোক)। 'নামযুগাষ্টকে' শ্রীরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন—তোমাকে নীলাম্বরী শাড়ি পরাইয়া চরণ হইতে নূপুর খুলিয়া লইয়া কবে যে ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিকট অভিসার করাইব (৪ শ্লোক)। আমি কবে তোমাদের শয্যায় নানাবিধ ফুল সাজাইয়া দিব; উভয়ে তোমরা নর্মবিলাসে রত থাকিবে, আর আমি তোমাদের চরণযুগল সেবা করিব (৫ শ্লোক)। 'কার্পণ্যপঞ্জিকা স্তোত্রে' শ্রীরূপ কিশোর-কিশোরীর দৌত্য করিবার প্রার্থনা জানাইয়া লিখিতেছেন—তোমরা গুরুজনের নিকট যখন অবস্থান কর, তখন তোমাদের পরস্পরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ কঠিন হয়, সেই সময়ে আমি তোমাদের পরস্পরের সন্দেশ-বাক্যরূপ অমৃত দান করিয়া কবে তোমাদিগকে আনন্দদান করিব (শ্লোক ৩৪)। পুনরায়—লতাগৃহে মিলনের সময় রাধামাধবের কণ্ঠকুসুম ছিঁড়িয়া গেলে কবে উহা গাঁথিবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিবে (৩৭ ও ৩৮ শ্লোক)। 'কার্পণ্যপঞ্জিকা স্তোত্রে'র অন্যান্য শ্লোকে শ্রীরূপ শ্রীরাধার আলুলায়িত কেশপাশ বন্ধন করিবার, শ্রীকৃষ্ণের বিস্রস্ত শিরোভূষণ ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা পুনরায় সাজাইবার, উভয়ের তিলকশূন্য ললাটে পুনরায় তিলক রচনা করিবার এবং কজ্জলশূন্য নয়নে কজ্জল পরাইবার দুর্লভ সৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেছেন। ১৪৭১ শক বা ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'উৎকলিকা বল্লরি'তে শ্রীরূপ ললিতা ও বিশাখার নিকট রাধাকৃষ্ণের দাসত্ব প্রার্থনা করিতেছেন। ঐ স্তবেরই ৫০ শ্লোকে শ্রীরূপ প্রার্থনা করিতেছেন যে—সন্ধ্যার সময় নিকুঞ্জের বিলাস-শয্যায় বসিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ যখন পাশা খেলিবার সময় পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া হাস্যপরিহাস কৌতুক করিবেন, তখন ঐ সময়ে তিনি যেন মৃদু মৃদু পদসংবাহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। উহার ৫৯ শ্লোকে আছে, যে, শ্রীরাধিকা মানিনী হইয়া শ্রীরূপকে যেন বলিতেছেন, সেই শঠের মুখ আর আমি দেখিব না, সেই সুবলসখা (শ্যামের নামও আর করিবেন না বলিয়া রাধিকা এইরূপ ইঙ্গিতে বলিতেছেন) স্ত্রীবেশ ধরিয়া আসিতেছে; তাহাকে নিষেধ কর, তোমার এই কথা শুনিয়া আমি কবে শ্রীকৃষ্ণকে কঠোর বাক্যদ্বারা নিবারণ করিব? এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীরাধার আনুগত্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে

কঠোর কথা বলিতেও শ্রীরূপের সঙ্কোচ হয় না। আবার ৬৩ শ্লোকে তিনি বলিতেছেন —তোমরা দুইজন পরস্পর মান করিয়াছ, নিজের নিজের গৌরব রক্ষার জন্য মিলিত হইতে পারিতেছ না, এইরূপ পরিস্থিতিতে 'শ্রীকৃষ্ণ! বারবার আমার দিকে তাকাইতেছ কেন, ক্ষান্ত হও, রাধিকা তোমার কথায় কান দিবেন না' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে কবে আমি হাস্য করাইব?

'উজ্জ্বলনীলমণি'র সখীপ্রকরণে অভিসার করান, বেশরচনা করা, চামরাদিদ্বারা সেবা করার কথা, দৌত্য করা বা খবর দেওয়া ও সময়মত একের বা উভয়ের প্রতি তিরস্কার করা সখীর কার্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীরূপের উল্লিখিত প্রার্থনা-গুলির বিশ্লেষণ করিলে সখীর কার্যের সহিত মঞ্জরীর সেবাভিলাষের অনেক সাদৃশ্য দেখা যাইবে ; কিন্তু একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, সখী ও মঞ্জরীর মধ্যে গুরুতর পার্থক্য আছে। ক্বচিৎ কদাচিৎ সখীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ঘটে, কিন্তু মঞ্জরীর সহিত কখনই সম্ভোগ ঘটে না। সেইজন্য সখীদের যেখানে সঙ্কোচ, মঞ্জরীদের সেখানে নিঃসঙ্কোচ সেবাধিকার। শ্রীরূপের অনুসরণ করিয়া গোবিন্দদাস কবিরাজ, রায় শেখর প্রভৃতি মহাজনগণ লিখিয়াছেন যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাসে প্রবৃত্ত হইবেন ভাবিয়া সখীরা সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিলাসকালেও যে মঞ্জরী চামর ব্যজন করিবার প্রার্থনা জানান, তাহা শ্রীরূপের রচনা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া পূর্বেই দেখাইয়াছি।

শ্রীরূপ-প্রবর্তিত মঞ্জরীভাবের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া রঘুনাথদাস গোস্বামী 'বিলাসকুসুমাঞ্জলি'তে শ্রীরূপের 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি' কথিত ভাবের ন্যায় সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন। কবি রাধাবল্লভ দাসের অনূদিত 'বিলাসকুসুমাঞ্জলি' (বরাহনগর পাঠবাড়ীর অনুবাদ-পুঁথির সংখ্যা—১৯) হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতেছে—

হে ভামিনি কবে পদাম্বুজ দুই তব।
জলধার দিয়া তাহা প্রক্ষালন করিব॥
গৃহান্তরে বসাই নিজ বেশ দিঞা।
মার্জ্জন করিব তাহা আনন্দ করিঞা॥
প্রাতঃকালে কর্পূর মিশ্রিত সুবাসিত।
যত্ন করি আনি জল মৃত্তিকা সহিত॥

এই সব সেবা দেখি কবে দিবা মোরে।
সেবা করি বসাইব পুন গৃহান্তরে ॥
দন্তকার্য্য করি পুন পাদ প্রক্ষালিঞা।
গৃহান্তরে বসাইব পুন স্নান লাগিয়া ॥
অভ্যঙ্গ্য করিব আজ গন্ধতৈল পুরি।
উঘটন করিব কবে এ নব কিঙ্করি ॥
গন্ধকর্পূর পুষ্প দিয়া সুবাসিত বারি।
কলসি কলসি করি সুবাসিত জল ভরি ॥
প্রণয়ে ললিতা সখি আগে আনি দিব।
তব বর অভিষেক হা কবে করিব ॥
শুষ্ক বস্ত্রে অল্পে অল্পে রম্য মৃদু অঙ্গে।
সে জল মুছিব যত্নে অতি বড় রঙ্গে ॥
আনন্দেতে দিগে দিগে ফিরাইবে আঁখি।
চঞ্চল নয়ান মীন খঞ্জনিয়া পাখি ॥
নিতম্ব উপরে রক্তবস্ত্র পরাইব।
তাহার উপরে চারু নীলবস্ত্র দিব ॥
মস্তক হইতে ঢাকা সর্বাঙ্গ হইব।
প্রমোদে পুলক হঞা সব নিয়োজিব ॥

(শ্লোক ১৯—২২ এর অনুবাদ) [১]

১। আধুনিক কবি শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী ঐ শ্লোকগুলির নিম্নোক্তরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

কৃত্য তোমার সমাপি প্রভাতে।
আসিবে যখন আমার আগেতে,
কর্পূর বাসিত মৃত্তিকা তবে
যতনে লেপিয়া পদেতে,
সুবাসিত জল করি আহরণ
গৃহান্তরে আনি করিয়া যতন
পাদপদ্ম ক্ষালন করিয়া
মুছাব কি আমার বেশেতে

শ্রীরূপের ন্যায় রঘুনাথদাস গোস্বামীও শ্রীরাধার অন্তরঙ্গা সেবিকা হইবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মঞ্জরীভাবের উপাসনার যে পথ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রদর্শন করিয়াছেন, রঘুনাথদাস গোস্বামী সেই পথে আলোকসম্পাত করিয়াছেন। সেইজন্যই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলেন—

রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

নরোত্তমঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনায় রূপ রঘুনাথের অনুসরণ করিয়া তাঁহার গুরু লোকনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

তোমার সহিত থাকি সখীর সহিতে।
এইত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে॥
সখীগণ জ্যেষ্ঠ যেঁহ তাঁহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে॥

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় মঞ্জরীভাবের উপাসনার মর্মকথা অতি সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

রাগের ভজন পথ কহি এবে অভিমত
লোকবেদসার এই বাণী।
সখীর অনুজা হইয়া ব্রজে সিদ্ধ দেহ পায়্যা
সেই ভাবে জুড়াতে পরাণী॥

সিদ্ধদেহ বলিতে এখানে শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্তরে চিন্তিত শ্রীরাধিকার কিঙ্করীরূপ গোপকিশোরী-শরীর ; এই শরীর কল্পিত হইল পারমার্থিক সত্য হিসাবে, কারণ ভৌতিক দেহের ধ্বংসের পর ঐ কল্পিত দেহই বর্তমান থাকিবে, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন। সে কথা নরোত্তম ঠাকুর আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধদেহে পাব তাহা
রাগ-পথের এই সে উপায়।
সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধদেহে তাহা পাই
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার॥

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হয়—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাং॥
কৃষ্ণং স্মরণ্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎ কথাবতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসাং ব্রজে সদা॥

তারপর তুমি দন্ত শোধিয়া
অন্য ভবনে স্নানের লাগিয়া
বসিবে আসনে হৃষ্ট মানসে
তবে আসি সেথা ত্বরাতে
সুগন্ধ তৈল লই পাত্র ভরি
মাথায় পুলকে অঙ্গে তোমারি
এই সেবাভার দিবে কি সুমুখি
চাহিয়া শুভ দৃষ্টিতে ?

অর্থাৎ—নিজেকে সখীদের সঙ্গিনী এবং সখীদের আজ্ঞায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাপরায়ণা বলিয়া তাঁহাদের প্রসাদী বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা গোপকিশোরীরূপে চিন্তা করিবে। নিজ ভাবোচিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার প্রিয়জনকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদের কথায় রত হইয়া সদা ব্রজে বসে করিবে। টীকাকারগণ বলেন যে, সশরীরে ব্রজে বাস করিবার সামর্থ্য না থাকিলে অন্তশ্চিন্তিত শরীরে ব্রজে বাস করিবে।

শ্রীরূপ গোস্বামীর আনুগত্য করিয়া কিভাবে শ্রীরাধামাধবের সেবা করিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় দুইটি পদ লিখিয়াছেন। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাঁহার গুরু লোকনাথ যেন শ্রীরূপের পাদপদ্মে তাঁহাকে সমর্পণ করেন।

এই নবদাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আর।
সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়॥
আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞাবলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিবে তৎকালে॥
সেবার সামগ্রীরত্ন থালাতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পুরিয়া

দোঁহার সম্মুখে লয়্যা দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি॥

ইহার পরবর্তী প্রার্থনার পদে আছে—

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুন কহিবেন আমা পানে চায়্যা॥
সদয় হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ এই নব দাসী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহো বাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য্য দিয়া হবে হেথায় রাখিল॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥

শ্রীরূপের কৃপা ভিন্ন রাধাকৃষ্ণের সেবা কবিবার সৌভাগ্য পাওয়া যায় না, তাই মঞ্জুলালীরূপ লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমকে শ্রীরূপের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপের 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি'র সেবাভিলাষের অনুসরণ করিয়া নরোত্তম ঠাকুব মহাশয় লিখিতেছেন—

যমুনাপুলিন কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর পব বসাব দুইজন॥
শ্যামগোরী অঙ্গে দিব চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব সেই হেরব মুখচন্দ॥
মালতী ফুলের মালা গাঁথিয়া দিব গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে॥

(সমুদ্র ১৯৭)

'পদরত্নাকর' পুঁথির ৩৪৭ পদে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—

বৃষভানু কিশোরী গৌরী তার প্রিয় সহচরী
সেই দিঠে হইবে গণন।
নিকুঞ্জকুটির বনে মিলাইব দুইজনে
প্রেমানন্দে হইবে মিলন॥

শ্রীমণিমঞ্জরী কবে সেবায় নিযুক্তি দিবে
সময় বুঝিব অনুমানে।
লীলা পরিশ্রম জানি মলয় চন্দন আনি
লেপন করিব দুইজনে॥
মালা গাঁথি নানাফুলে দিব দোঁহাকার গলে
মৃদুমন্দ করিব বীজনে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পুরি
যোগাইব দোঁহার বদনে॥

ঐ 'পদরত্নাকরে'র ৩৪৮ পদে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ভাবনা করিতেছেন যে, শ্রীরাধামাধব যখন সুশীতল বৃন্দাবনে মনিময় সিংহাসনে বসিবেন এবং ঠাকুর মহাশয় মল্লিকা মালতী যুঁথীর মালা গাঁথিয়া তাঁহাদের গলে পরাইবেন তখন—

রসের আলাপ কালে বসিব চরণ তলে
সেবন করিব দোঁহাকার।

শ্রীরাধামাধব পরস্পরের কর ধরিয়া সখীদের মণ্ডলীমধ্যে নৃত্য করিয়া বেড়াইবেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কুতুহলী হইয়া তাহা দর্শন করিতে থাকিবেন অবশেষে যখন তাঁহারা পরিশ্রান্ত হইবেন—

অলস বিশ্রাম ঘর গোবর্দ্ধন গিরিবর
রাইকানু করাব শয়নে।
নরোত্তম দাসে কয় এই যেন মোর হয়
অনুক্ষণ চরণ-সেবনে॥

(গৌ. তরঙ্গিনী ৫৭৭)

অন্তরঙ্গ সেবা করিতে চইলে সাধারণ গোপী হইয়া জন্মিলেই চলিবে না, সাধকের পক্ষে শ্রীরাধিকার পিত্রালয় বর্ষাণে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং জটিলা ও আয়ানের বাসস্থল জাবটে বিবাহিতা হওয়ার প্রয়োজন—

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে আহীর গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব॥

জাবটে আমার কবে এ পাণিগ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ যে হয় তাঁহার শ্রেষ্ঠ
সেবন করিব তাঁর পায়॥
তিহোঁ কৃপাবাণ হৈয়া রাতুল চরণে লৈয়া
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা পূরিবে মনের আশা
সেবি দুঁহার যুগলচরণ॥
... ...
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি
রাখিবে রাতুল দুটি পায়।
নরোত্তম দাসের মনে প্রিয় নম সখীগণে
কবে দাসী করিবে আমায়॥

(তরু ৩০৬৫)

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অনুসরণ করিয়া নরোত্তমও বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণকে তিনি পীতবসন পরাইয়া দিবেন এবং রাধাকে নীলাম্বরীতে সাজাইবেন। অবশ্য এ সেবা পুরুষ দেহে নয়, পরিণীতা গোপকিশোরী দেহে—

ত্যাজ্য করি মায়ামোহ ছাড়িয়া পুরুষদেহ
কবে হাম প্রকৃতি হইব।
টনিয়া বান্ধিব চূড়া নবগুঞ্জা তাহে বেড়া
নানাফুলে গাঁথি দিব হার।
পীত বসন অঙ্গে পরাইব সখীসঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর॥
দুহুঁ রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন ভরি
নীলাম্বরে রাইকে সাজায়া।

(গৌ. তর. পৃ. ৫২৮)

শ্রীরূপ গোস্বামী কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রচারিত মঞ্জরীভাবের সেবার আদর্শ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ

শতাব্দীর কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, প্রভু জগবন্ধু প্রভৃতি পদকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ পদের ভণিতায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভণিতা দেওয়ার রীতি বোধ হয় জয়দেবের পূর্বেও জৈন কবিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু প্রাগ্-রূপগোস্বামী যুগের কোন পদে কবির সেবাভিলাষ প্রকাশ পায় নাই। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হইবে। প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাস কখনও কখনও শ্রীরাধাকে উপদেশ দিয়াছেন—

কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যজনে পাইবে চেতনে
ঘুচিতে অঙ্গের জ্বালা॥ (তরু ১৩৫)

কখনও বা চণ্ডীদাস সাধারণ মন্তব্য করিয়াছেন, যেমন—

চণ্ডীদাস কয় কলঙ্কে কি ভয়
যে জনা পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া মরয়ে ঝুরিয়ে
কি তার আপন পরে॥ (তরু ২৬)

অথবা—

চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগ সকল সিধি॥ (সমুদ্র ৪২৩)

কিংবা—

চণ্ডীদাস কহে তুমি যাবে বোলো ভূত।
শ্যাম চিকণ সে নন্দের ঘরে পুত॥
(গীতচন্দ্রোদয় ১৪৬)

বিদ্যাপতিতেও এইরূপ সাধারণ মন্তব্যযুক্ত ভণিতা দেখা যায়, সেবার কথা পাওয়া যায় না। যথা—

বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেয়ানি।
তুহুঁ এক জোগ ইহ কে কহ শয়ানি॥
(মিত্র-মজুমদার, ৬১৪)

অথবা—

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যৌবতি
তাহি কহব কিএ বাধে।
যে কিছু পহু দেল আঁচর ঝাঁপিলেল
সখীসব কর উপহাসে॥

(মিত্র-মজুমদার, ৩০০)

অথবা—

বিদ্যাপতি কহ কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তহিঁ দুহুঁ কান॥

(মিত্র-মজুমদার, ৭৩৩)

শ্রীগৌরাঙ্গের সহচরদের মধ্যে যাঁহারা পদ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের রচনাতেও মঞ্জরীভাবের সেবার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। মুরারি গুপ্তের সুপ্রসিদ্ধ পদ—"সখীহে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও" (সমুদ্র পৃঃ ২৪৭) ইত্যাদির ভণিতা—

মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হইলে
তার গুণ তিন লোকে গায়।

এ যেন চণ্ডীদাসী ধরনেরই অনুসরণ। ইহার মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের কোন ইঙ্গিত নাই। নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের পদেতেও কোথাও সেবার ভাব প্রকাশ পায় নাই। যেমন—"গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে" (ক্ষণদা, ২৭।১) ইত্যাদি পদের ভণিতা—

ভাব বুঝি পণ্ডিত রহয়ে বাম পাশে।
না বুঝয়ে হেন রঙ্গ নরহরি দাসে॥

অথবা—

"দেখি গোরা নীলাচলনাথ" (তরু ১১৯) ইত্যাদি পদের ভণিতা—

অপরূপ গৌরঙ্গ বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস॥

শ্রীনরহরি সরকারের কৃষ্ণলীলার পদগুলির ভণিতাতেও এরূপ সাধারণ উক্তি দেখা যায়; যেমন—"ধিক রহু নারীর যৌবনে" ইত্যাদি পদের ভণিতা—

এ পাপ পিরীতি নাহি আশ।
শুনি কহে নরহরি দাস॥ (তরু ৮৩৩)

মাধব ঘোষ গ্রীষ্মকালে মা যশোদা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক দেখিয়া শুধু বলিহারি দিয়াছেন—

শিরোপর ঢারত বারি।
মাধব ঘোষ বলিহারি॥ (তরু ১৫৩৯)

কুঞ্জভঙ্গের সময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্র্যের অপূর্ব নিদর্শন দেখিয়া মাধব ঘোষ তাঁহাদের সেবা করিতে অগ্রসর হন নাই ; শুধু বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে বলিয়াছেন—

মাধব ঘোষ অবহু নাহি সমুঝল
উদ্‌ভট মুগধ চরিত। (তরু ৬৬০)

শ্রীরাধার বিরহদশার কথা যখন দূতী মথুরায় মাধবকে শুনাইতেছেন, তখন মাধব ঘোষ সহানুভূতি দেখাইয়া বলিতেছেন—

মাধব ঘোষ কালিদহে পৈঠব
বুঝিও বেয়াধিক অন্ত।

বাসু ঘোষের পদেও কোথাও সেবার কথা নাই। যেমন—

বাসু কহে আহা মরি রাধাভাবে গৌরহরি
ধরিতে না রয় নিজ হিয়া। (তরঙ্গিণী ১৮৭)

অথবা—

প্রেমজলে করই সিনান।
কহে বাসু বিদরে পরাণ॥ (ক্ষণদা ১২।১)

বাসু ঘোষের দানের পদ—কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চস্বরে॥ ইত্যাদির ভণিতা—

বাসুদেব ঘোষ কহে দধির পসারিণী।
পাতিয়া মঙ্গলঘট বসিয়াছে দানী॥ (তরু ১৩৬৯)

ইহাতে কেবলমাত্র সংবাদ দেওয়া ভিন্ন কিছুই বলা হয় নাই। বংশীবদন আরেকটু অগ্রসর হইয়া শ্রীরাধার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন—

বংশীবদন কহে কহিলে সে ভাল।
বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল॥

অন্য একটি পদে দানীর বাড়াবাড়ি দেখিয়া বংশীবদন যেন হতাশ হইয়া বলিতেছেন—

বংশী কহয় বুঝি অরাজক হইল।
পথে বাটোয়ারি করা নহিবেক ভাল॥ (তরু ১৩২৭)

রামানন্দ বসু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পদ—'তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।' ইত্যাদির ভণিতায় লিখিয়াছেন—

কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চেয়াইল তায়। (তরু ১৪৫)

এখানে পদকর্তা শুধু আক্ষেপ করিয়াছেন যে, এমন সুখের স্বপ্ন ভাঙাইয়া বিধাতা কেন শ্রীরাধাকে জাগাইয়া তুলিলেন। 'মলু মলু শ্যাম-অনুরাগে' ইত্যাদি পদেরও ভণিতায় দেখি, কবি অনুরাগিণীর সহিত একাত্ম হইয়া বলিতেছেন—

বসু রামানন্দের বাণী দিবানিশি নাহি জানি
গোপতে গুমরি মরি মরি। (তরু ৭৮৬)

শ্রীরাধামাধব নিকুঞ্জের বিলাসসুখে রাত্রিযাপন করিয়া দেখিলেন যে, সকাল হইয়া গিয়াছে। তখন রামানন্দ বসুর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন তাঁহাকে সখা সুবলের বেশে সাজাইয়া দেন। এই পদের ভণিতাতেও পাই—

বসু রামানন্দ ভণে এমন পিরীতি।
ব্যাঘ্র-হরিণে যেন তোমার বসতি॥ (তরু ৬৫৯)

জটিলা, কুটিলা প্রভৃতি বাঘিনীর মধ্যে যেন শ্রীরাধা অসহায়া হরিণী। তাহা দেখিয়া পদকর্তার মনে দুঃখ হয়, কিন্তু প্রতিকার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

এই জাতীয় ভণিতাগুলির সহিত শ্রীরূপের গ্রন্থাদি প্রচারের পরে রচিত পদের ভণিতায় বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি'তে (৫০ শ্লোক) শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার পক্ষ হইয়া কঠোর বাক্য বলিতেছেন দেখা যায়। জ্ঞানদাস দানী শ্রীকৃষ্ণকেও তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—

জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত নহিলে।
কি লাগি বাহু পসার। (বৈষ্ণব পদলহরী, পৃঃ ২৩৩)

শ্রীকৃষ্ণ নিজের রূপের গৌরব করিতেছেন দেখিয়া জ্ঞানদাস তীব্র শ্লেষ করিয়া বলিতেছেন—

জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম।
আপনা না ভাব অনুপাম॥ (তরু ১৪০০)

আবার, শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণকে তুচ্ছ করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি গোয়ালা, কিছুই বুঝ না, কাচকে কাঞ্চন বলিয়া মনে কর, তখন জ্ঞানদাসের মনে শ্যামের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়াছে,—তিনি বলিতেছেন—

শুনি জ্ঞান দাস কহ ছিয়ায় কষিয়া লহ
কাচ নহে কষটি পাষাণ। (তরু ১৩৮৯)

মাধব ঘোষ যেখানে বিরহিণী শ্রীরাধার বিরহ-ব্যথা শুনিয়া কালীদহে ডুবিয়া মরিতে চাহিয়াছেন, জ্ঞানদাস সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে আনিতে ছুটিয়া মধুপুরে যাইতেছেন।

শুনিয়া রাধার এত বিরহ হুতাশ।
চলিল ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস॥

"জ্ঞান দাস রাধার সুখে সুখী, তাঁহার দুঃখে দুঃখী। রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া এমনই গভীর-ভাবে ভালবাসিয়াছেন যে, তিনি লাজ ভয় সব হারাইয়াছেন। রাধার এমন ভাব দেখিয়া 'জ্ঞানদাস কম্প অনিবার'—জ্ঞানদাসের বুকের কাঁপুনি আর থামে না। রাধা একা একা নিজের মনে দুঃখের ভার বহিতেছেন দেখিয়া জ্ঞানদাস অনুনয় করিয়া বলেন, তুমি তোমার দুঃখের কারণ আমাকে বল—'কহিলে ঘুচিবে তাপ'। জ্ঞানদাসের ভণিতার ভঙ্গী হইতেই শ্রীরাধার ভয় পাওয়ার কথা অনুমান হয়—

জ্ঞানদাস কহে আমরা থাকিতে
কিবা পরমাদ তোরে॥

ননদিনীর মধ্যে কি—জ্ঞানদাস থাকিতে রাধাকে কোনরকমে হেনস্তা করিতে পারে।"

(ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের প্রবন্ধ—'জ্ঞানদাসের সাধনা',
উদ্বোধন—আশ্বিন, ১৩৬৮)

জ্ঞানদাসের উপর শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনার প্রভাব খুব বেশী পড়ে নাই। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য। জাহ্নবীদেবীর সহিত তিনি যে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। জাহ্নবীদেবী স্বয়ং অথবা তাঁহার অনুচরবৃন্দ শ্রীরূপের কোন কোন রচনা হয়তো বাংলা দেশে আনিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে জ্ঞানদাস মঞ্জরীভাবের সাধনার হদিশ পাইয়াছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের উপর কিন্তু শ্রীরূপের প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ ও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সম্মিলিতভাবে শ্রীজীব গোস্বামীকে অষ্টকালীয় লীলা স্মরণের প্রণালী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লেখেন। তাহার উত্তরে শ্রীজীব গোস্বামী ঐ তিনজনকে সম্বোধন করিয়া লেখেন—

অথ যন্মুহু নিত্য স্মরণ প্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্ রসামৃতসিন্ধৌ ব্যক্তমেবাস্তি 'সেবা সাধক—রূপেণ' ইত্যাদিনা, অত্র সাধকরূপেণ বহির্দেহেন, সিদ্ধরূপেণ নিজেষ্ট সেবানুরূপ চিন্তিত দেহেনেত্যর্থঃ (ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ১০৪৬)। অর্থাৎ—আপনারা যে নিত্য স্মরণকার্যের প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র সেবা

সাধকরূপেণ……ইত্যাদি শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে। এ-বিষয়ে সাধকরূপে বাহ্য দেহের দ্বারা এবং সিদ্ধরূপে নিজ ইষ্টসেবার অনুরূপ অন্তশ্চিন্তিত দেহের দ্বারা ইহাই অর্থ।

সম্ভবতঃ শ্রীজীব গোস্বামীর এই পত্র পাইবার পর গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা সম্বন্ধীয় পদগুলি লেখেন। কেননা, ঐ সমস্ত পদে আমরা গোবিন্দদাসকে শ্রীরূপের আদর্শ অনুসারে মঞ্জরীভাবের সেবায় নিযুক্ত দেখি। শ্রীরাধা-মাধব মধ্যাহ্নে মিলিত হইয়া বিলাস করিলেন। মাধব যখন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তখন রাধা সখীদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার মুরলীটি চুরি করিয়া লইলেন। গোবিন্দদাস অন্তশ্চিন্তিত দেহে সেই লীলাস্থলে উপস্থিত ছিলেন—এক পল সময় ঘুমাইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন উঠিলেন, তখন গোবিন্দদাস তাঁহার মুখ ধুইবার জল যোগাইলেন—

পল এক জাগি বৈঠল পীতবাস।
জল সেবন করু গোবিন্দদাস॥ (তরু ২৭৮৪)

রসালসে রাধা মাধবের কোলে শয়ন করিয়াছেন। সেই ঘরের নিকটেই তাঁহাদের পদতলে গোবিন্দদাস শুইলেন। শুইবার পূর্বে তিনি দুইটি ঝারি ভরিয়া সুবাসিত জল রাখিয়া দিয়াছেন; তাঁহারা উঠিলেই তিনি মুখ ধুইবার জল যোগাইবেন—

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত
মন্দিরে দুহুঁ জন পাশ।
মন্দির নিকটে পদতলে শুতলি
অনুচরী গোবিন্দদাস॥ (তরু ২৭৮৫)

বিলাসের সময় শ্রীরূপ গোস্বামী যেরূপ কিশোর-কিশোরীকে বাতাস করেন, গোবিন্দ-দাসও ঠিক সেইরূপ করেন—

নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস
বীজন করতহি গোবিন্দদাস॥ (তরু ১১১১)

সন্ধ্যা হইলে যখন সখীরা নিজের নিজের গৃহের কাজ ও গুরুজনের সেবা করিতেছেন, তখন শ্রীরাধার ঘরে প্রদীপ জ্বালাইবার কাজটি করিতেছেন গোবিন্দদাস।—

নিজ গৃহ কাজ সমাপল সখিগণ
গুরুজন-সেবন বেল।
গোবিন্দদাস দীপতহিঁ সাজাওল
বেলি অবসান ভই গেল॥ (তরু ২৮৬৬)

সন্ধ্যাবেলা শ্রীরাধা স্বর্ণথালিতে ভরিয়া বিবিধ মিঠাই ক্ষীর-সর-নবনী চিনি কদলী প্রভৃতি উপহার এক সহচরীর হাত দিয়া নন্দমহারাজের গৃহে পাঠাইলেন। সহচরী

শ্রীকৃষ্ণকে খাওয়াইয়া তাঁহার মুখে কর্পূর-তাম্বুল দিলেন। পাতে যাহা-কিছু অবশিষ্ট পড়িয়া থাকিল, গোবিন্দদাস তাহা থালিতে তুলিয়া লইয়া গেলেন—

ভোজন করাওল বহু সুখ পাওল
কর্পূর তাম্বুল দেল।
যো কিছু অবশেষ রহল থারি পর
গোবিন্দদাস লই গেল॥ (তরু ২৮০৭)

অন্য একটি পদে গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দনন্দন
ভোজন করু দোনো ভাই।

ঐ সময়ে রোহিণী দেবী পরিবেশন করিতেছিলেন, ভুক্তাবশিষ্ট শ্রীরাধা স্বয়ং ভোজন করিলেন আর গোবিন্দদাস হাতে জল ঢালিয়া দিলেন এবং কিছুক্ষণ চামর ঢুলাইলেন।

যো কুছ শেষে রহিল থারি পর
ভোজন করল হি গোরি
গোবিন্দদাস ঝারি লেই ঠারহি
চামর ঢুলাওত থোরি॥ (তরু ২৭৭০)

শ্রীরাধার সুখ-সম্পদের কালে যিনি এমন অন্তরঙ্গভাবে সেবা করিয়াছেন, তিনি বিরহিণী শ্রীরাধাকে শুধু মুখের কথায় সান্ত্বনা দিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া শ্রীরাধা যখন মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন গোবিন্দদাস আস্তেব্যস্তে শ্রীরাধার মূর্ছিত দেহ নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন—

আহা প্রাণ-রাই ভেল অচেতন
গোবিন্দদাস করু কোর। (তরু ১৬১৫)

গোবিন্দদাস শ্রীরাধার বিরহ-ব্যথা দূর করিবার জন্য স্বয়ং মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে প্রস্তুত। শ্রীকৃষ্ণ যে যাইবার সময় বলিয়াছেন—আবার দেখা হইবে, এই প্রবোধ-বচনের কথা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য গোবিন্দদাস মথুরায় চলিলেন—

জানাইতে কানুক সো অশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস॥ (তরু ১৬৬৪)

নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য শেখর রায় বা রায়শেখর গোবিন্দদাসের সমসাময়িক কবি। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অনুষ্ঠিত খেতরীর মহোৎসবে

রঘুনন্দন গোবিন্দদাসাদির সহিত উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তি-রত্নাকরে' কিংবা 'নরোত্তমবিলাসে' রায়শেখরের উপস্থিতির কথা লেখেন নাই। সুতরাং মনে হয় যে, রায়শেখর গোবিন্দদাসের অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট হইবেন। গোবিন্দদাসের অষ্টকালীয় লীলার ৫১ পদ দেখিয়া রায়শেখর তাঁহার অষ্টকালীয় লীলার পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। রায়শেখরের পদেও শ্রীরূপ-প্রদর্শিত মঞ্জরীভাবের সেবার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রীরাধার প্রেরিত বিবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন দাসগণ তাঁহার চরণসেবা করিতে লাগিল, কিন্তু রায়শেখর তাঁহাকে বীজন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন—

নন্দের নন্দন করি আচমন
পালঙ্কে ঢালিলা গা।
চরণ সেবন করে দাসগণ
শেখর করয়ে বা॥ (তরু ২৫৫৯)

রাঁধিবার সময় সখীরা শ্রীরাধাকে যোগান দিতেছিলেন, শেখরও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, কেননা ঘি যোগাইবার ভার ছিল তাঁহার উপর।—

মোহিনী সহিতে রন্ধন করিতে
বসিলা রাজার ঝি।
সব সখিগণ যোগায় যোগান
শেখর যোগায় ঘি॥ (তরু ২৫৫৬)

রাঁধার কাজে সহায়তা করিলে প্রসাদ জুটিবে জানাই ছিল, তাই শ্রীরাধার ভোজনের পর—

পালঙ্ক উপরি বসিলা সুন্দরী
বালিশে হেলন দিয়া।
রাইয়ের ইঙ্গিতে যে ছিল থালীতে
ভুঞ্জল শেখর গিয়া॥ (তরু ২৫৬০)

সন্ধ্যাবেলায় সখীরা শ্রীরাধাকে সাজাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শেখরও ছিলেন। তিনি শ্রীরাধার পায়ে নূপুর পরাইয়া দিলেন—

মঞ্জীর পঞ্চনি করিয়া যতন
শেখর পরায় পায়। (তরু ২৫৬১)

শ্রীরাধামাধবের বিলাস-সময় সখীরা দূরে চলিয়া যান অথবা লুকাইয়া লীলা দর্শন করেন। কিন্তু সে-সময়ও মঞ্জরী সেবা করিবার জন্য উপস্থিত থাকেন—

শ্রমজল পূরল দুঁহুজন গায়।
বীজন বীজএ শেখর রায়॥ (তরু ২৬৪২)

অন্য একটি বিলাসের পদেও রায়শেখর লিখিয়াছেন—

স্বেদবিন্দু চুয়ত দুহুঁজন গায়।
শেখর করু তহিঁ চামর বায়॥ (তরু ২৭৪৩)

শ্রীরাধামাধবের সেবা করাই মঞ্জরীর একমাত্র অভীষ্ট, তাঁহার নিজের পৃথক সত্তা থাকিলেও উহা কেবলমাত্র সেবাকার্যের জন্যই নিয়োজিত ; নিজের সুখ বা দুঃখ, লজ্জা বা সঙ্কোচ কিছুই তিনি গণনার মধ্যে আনেন না। সখীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস অসম্ভব নহে বলিয়া, তাঁহারা শ্রীরাধামাধবের কেলিবিলাসের সময় সঙ্কোচবশতঃ দূরে থাকেন। শ্রীজীব গোস্বামী 'ভক্তিসন্দর্ভে' (২৮৬ অনুচ্ছেদ) লিখিয়াছেন—ভগবৎ-সেবাই যাঁহাদের একমাত্র পরম পুরুষার্থ, সেই সকল শুদ্ধ ভক্তগণের পক্ষে নিজ ভাবানুকূল সেবার উপযোগী ভগবৎপার্ষদ্ দেহের ভাবনা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে (পৃঃ ৩৫৮—৫৯) শ্রীরাধার মুখে বলাইয়াছেন—মণিমঞ্জরী কদাপি অভিসারে স্পৃহা করে না, যদিও আমি তাঁহাকে বহু প্রলোভন-বাক্যে প্রলুব্ধ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখ ব্যতীত অন্য কোন সুখই অধিক নহে। তাহার অনিচ্ছা হইতে বুঝিলাম যে, সে শুদ্ধধী। রায়শেখর এমন শুদ্ধধী হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলা মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—

পরিরম্ভণ বেরি মুদনু আঁখি।
তাহে যে ভৈ গেল শেখর সাখি॥ (তরু ২৫২৩)

শ্রীরাধা সখীদের নিকট রসোদ্গারকালে বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন তখন তিনি চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার কথা পাছে সখীরা বিশ্বাস না করেন, তাই তিনি শেখরকে সাক্ষী মানিলেন।

গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ পিতামহের ন্যায় মঞ্জরীভাবে আবিষ্ট হইয়া ভণিতা দিতে পারেন নাই। অধিকাংশ পদের ভণিতাতেই তিনি 'কহ ঘনশ্যাম দাস' এইরূপ সাধারণ ভণিতা দিয়াছেন। কচিৎ কখনও লীলা-দর্শন করিবার কথা লিখিয়াছেন—

শুনইতে রাই কৈছন ভাব।
জর জর ভেল ঘনশ্যামর দাস॥ (গো. রতিমঞ্জরী ১৭ পদ)

কিন্তু কদাচিৎ তিনি সেবা করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন, রাধা কিঙ্কিণী ও নূপুর পরিয়া অভিসার করিতেছেন, কবি ঘনশ্যাম তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন আর বলিতেছেন—কিঙ্কিণী নূপুর পরিলে গোপন অভিসারের কথা সকলে জানিয়া ফেলিবে, সেইজন্য ওই দুইটি খুলিয়া আমার হাতে দাও; সঙ্কেতকুঞ্জের নিকটে যখন পৌঁছিবে, তখন তোমার দয়িতের সহিত দেখা করিবার পূর্বে আমি আবার ওই দুইটি পরাইয়া দিয়া তোমার শোভা বর্ধন করিব—

গুপত বেকত কর কিঙ্কিণী নূপুর
এ দুহুঁ রহু মুঝ পাশ।
কেলি নিকুঞ্জ নিকটে পহিরাওব
কহ ঘনশ্যামর দাস ॥

(গো. রতিমঞ্জরী ১০, কীর্তনানন্দ ১৮৯)

লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ করার, শ্রীরাধামাধবের মিলনের সহায়তা করার অথবা মিলনকালে সেবা করিবার কথা ঘনশ্যামের পরবর্তী কোন কবির রচনায় বড় একটা দেখা যায় না। রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদসমূহে ভণিতা দিবার সময় কোথাও গোবিন্দদাস বা রায়শেখরের মতো সাক্ষাৎ সেবা করিবার কথা বলেন নাই। তিনি অধিকাংশ পদেই নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়াছেন অথবা আশা করিয়াছেন যে, একদিন ঐ রসমাধুরী দর্শন করিতে পাইবেন। যথা—

রাধামোহন দাস না বুঝয় ও রস
নিজ দোষ ভাবিয়া কান্দে। (সমুদ্র, পৃঃ ২৬৩)

অথবা—

রাধামোহন কিয়ে আনন্দ ডুবব
ওরস মাধুরি দেখি। (সমুদ্র, পৃঃ ২৫৩)

অথবা—

এ রাধামোহন দাস কি শুনব
এ সব প্রেমতরঙ্গ ॥ (সমুদ্র, পৃঃ ২৪০)

পদকর্তা দীনবন্ধুদাস, জগদানন্দ, শশিশেখর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতিও ভণিতায় মঞ্জরীরূপে সেবা করিবার কথা বলেন নাই। শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কবিবৃন্দ যেরূপ সাহসের সহিত সেবাভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন, পরবর্তী কালে কবি মহাজনগণ সেরূপ করিতে পারেন নাই।

বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে শ্রীরূপের তৃতীয় প্রস্থ প্রভাব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা তত্ত্ব বিষয়ে।

॥ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ॥

বেদ-উপনিষদের একমাত্র প্রতিপাদ্য আনন্দস্বরূপ যে ভগবান, তিনিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চিন্তায় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের পুতনাবধ, কেশী প্রভৃতি দৈত্যনিধন, রুক্মিণী-জাম্ববতী প্রভৃতিকে বিবাহ, গোপীগণের সহিত রাস-বিলাস—এইরূপ বহুবিধ লীলাই শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত লীলার মধ্যে যেমন মাধুর্য আছে, তেমনি ঐশ্বর্যের বিকাশও কম নহে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অমিত শক্তির অধিকারী, তাহা পূর্বোক্ত লীলাগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এমন শক্তি বা ঐশ্বর্যের প্রকাশে মাধুর্যের অনেকখানি হানি ঘটে, এ-কথা বলিতেই হইবে।

কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের কেবল রসোপভোগের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মাধুর্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় সত্য, কিন্তু ঐশ্বর্যের কথাও এখানে-ওখানে কিছু আছে। কাব্যমধ্যে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুদ্র রূপ হইতে হঠাৎ যে বিরাট আকৃতি ধারণ করিয়া শ্রীরাধার সহিত সঙ্গমে প্রয়াসী হইলেন, তাহাতে নিঃসন্দেহে ঐশ্বর্যের প্রকাশ। তাহা ছাড়া, শ্রীকৃষ্ণের দশাবতার-বর্ণনা প্রভৃতিতেও ঐশ্বর্য প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তার এইরূপ ঐতিহ্য পিছনে রাখিয়া শ্রীচৈতন্যের আনুগত্যে শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পরমমাধুর্যময় রূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা চিন্তার ক্ষেত্রে ঐশ্বর্যকে যে কিছুমাত্র স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, সে-কথা শ্রীরূপ বহুভাবে বুঝাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্যময় রূপ চিন্তা না করিয়া প্রথমতঃ শ্রীরূপ তাঁহাকে ‘অখিলরসামৃতমূর্তিঃ’ বলিয়াছেন। ভক্তিরসের শ্রেণী-বিভাগ করিতে গিয়া ‘ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু’তে শ্রীরূপ মধুর ভক্তিরসকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। সর্বোপরি শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ মূর্তি—পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ রূপ কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন—

> হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
> শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈ র্নাট্যে যঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৩২৪)

অর্থাৎ—হরি পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ এই তিন রূপ, নাট্যশাস্ত্রে তাঁহাকেই কনিষ্ঠ, মধ্য ও উত্তম শব্দে প্রতিপাদন করে।

হরির এই তিন রূপ কিভাবে প্রকাশ পায়, তাহাও শ্রীরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ববাঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৩২৪)

অর্থাৎ—অখিল গুণ যাঁহাতে প্রকাশিত তিনি পূর্ণতম, তাহা অপেক্ষা অল্পগুণ প্রকাশক পূর্ণতর, তদপেক্ষাও অল্পগুণ যাঁহাতে প্রকাশিত তিনি পূর্ণ, পণ্ডিতেরা এই তিন রূপ কীর্তন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই তিনটি রূপ তিনটি স্থানে যে প্রকটিত, শ্রীরূপ তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন—

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥ (সিন্ধু, পৃঃ ৩২৫)

অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা গোকুলে, পূর্ণতরতা মথুরায়, পূর্ণতা দ্বারকায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, ঐশ্বর্যের যত হ্রাস, অপরপক্ষে মাধুর্যের যত বৃদ্ধি ততই শ্রীরূপের স্বীকৃতি।

শ্রীরূপ গোস্বামী অন্যভাবেও শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের চারিটি অসাধারণ গুণ, স্বরূপ ভিন্ন অন্য কোন ভগবৎস্বরূপে এই গুণগুলির সব-কয়টি বিদ্যমান নাই। ব্রজ ব্যতীত অন্যত্রও অসমোর্ধ্ব এই মাধুর্যভাবের প্রকাশ অনুপস্থিত। কেবল তত্ত্বগ্রন্থেই নহে, শ্রীরূপ তাঁহার 'গীতাবলি' ও নাট্যগুচ্ছে এই মাধুর্যভাবেরই একমাত্র বিস্তার প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইহার প্রভাবেই পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাধক ও দার্শনিকগণ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যময় রূপ ও মধুরলীলাতত্ত্ব ধ্যান করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলার সুন্দর বর্ণনা দিয়া রস-ঋদ্ধ অসংখ্য পদ প্রণয়ন করিয়াছেন। পদকারগণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের অসুরবধ লীলার যে বর্ণনা দেন নাই, তাহার প্রকৃত কারণ শ্রীরূপের পূর্বোক্ত তত্ত্বনির্ণয়।

॥ শ্রীরাধাতত্ত্ব ॥

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরাধাতত্ত্বেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রধানা যূথেশ্বরীর মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীকেই তিনি শ্রেষ্ঠা বলিয়াছেন। এই শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে আবার শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠা। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ (উজ্জ্বল, রাধা-৩)

অর্থাৎ—তাঁহাদের দুইজনের (শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর) মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা, তিনি মহাভাবস্বরূপা এবং গুণে অত্যন্ত বরীয়সী।

শ্রীরাধা কিরূপে মহাভাবস্বরূপা, তাহা শ্রীরূপ গোস্বামী সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তীক্ষ্ণধী মনস্তাত্ত্বিকের ন্যায় প্রেমের স্তরভেদ নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীরূপ জানাইয়াছেন, শ্রবণ কীর্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, সেই বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবৎকৃপায় রতি বা ভাবের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে এই রতি বা ভাব প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা বিচলিত না হইলে, প্রেমে রূপান্তরিত হয়। প্রেমের উদয়ে প্রিয়তমের দোষকে গুণ বলিয়া প্রতীতি হয়, প্রিয়তম অশেষ দুঃখ দিলেও তাহা অমৃতের ন্যায় বোধ হয়, আরও প্রিয়তমের কণামাত্র দুঃখও সহ্য করা যায় না। পুরুষার্থ-শিরোমণি এই প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীরূপের আদর্শে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ (চৈ. চ. ২।১৯।১৫২)

প্রেম ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে রূপ পায়। প্রথম স্নেহের পর্যায়ে চিত্তদ্রবত্বই লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ে প্রিয়জনকে দেখিলে, প্রিয়জনের কথা শুনিলে কিংবা প্রিয়জনের স্মরণে চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া পড়ে, চক্ষু হইতে অঝোরধারে নামে অশ্রু। এই স্নেহকে আবার শ্রীরূপ দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—মধুস্নেহ ও ঘৃতস্নেহ। মধুর ন্যায় মধুস্নেহ সর্বদাই দ্রব থাকে, কিন্তু ঘৃতস্নেহ ঘৃতের ন্যায় জমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, মধু যেমন স্বয়ং আস্বাদ্য, মধুস্নেহও তদ্রূপ ; কিন্তু ঘৃতস্নেহকে ঘৃতের ন্যায় সামগ্রীর সংযোগে আস্বাদ্য করিয়া তুলিতে হয়।

স্নেহ পর্যায় হইতে প্রেম অধিকতর গাঢ়তা লাভ করিলে হয় মান। এই অবস্থায় মনের ভাব সঙ্গোপন করিবার জন্য এবং অভিনব রসমাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত প্রেম আপাত-বিরূপতা লইয়া কিছুটা কুটিলতা প্রাপ্ত হয়।

মান যখন গৌরব-রহিত হইয়া বিস্রম্ভ ভাব বা বিশ্বাসের ভাব ধারণ করে, তখন তাহার নাম হয় প্রণয়। এই অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞান ঘুচিয়া যায়। প্রণয়ের ঘনীভূত অবস্থা হইতেছে রাগ। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটং।
তৎসম্বন্ধলবেঽপ্যত্র প্রীতিঃ প্রাণব্যয়ৈরপি॥

(সিন্ধু, পৃঃ ৬৬৫—৬৬)

অর্থাৎ—যে স্নেহে স্পষ্টতঃ দুঃখকেও সুখ বলিয়া মনে হয়, তাহাকেই রাগ বলে। ইহাতে নিজের প্রাণনাশ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধনে প্রবৃত্তি হয়।

রাগের প্রগাঢ় অবস্থার নাম অনুরাগ। অনুরাগ অবস্থায় প্রিয়জনকে নিয়ত দর্শনাদি করিয়াও, তাঁহাকে নিত্য নূতন বলিয়া মনে হয়।[১] এই সময় তৃষ্ণার অতিরেকের ফলে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, মনে হয় প্রিয়জনকে এই প্রথম দেখিলাম, প্রথম অনুভব করিলাম।

অনুরাগ উৎকর্ষ লাভ করিয়া আস্বাদ্য হইয়া উঠিলে, তাহা ভাবে পর্যবসিত হয়। এই ভাব আবার ঘনীভূত রূপ ধারণ করে মহাভাবে। শ্রীরূপের মতে, এমন মহাভাবের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরাধা। তিনি মহাভাবস্বরূপা। এই বিষয়ে শ্রীরূপকে অনুসরণ করিয়াই কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা, নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনী কৃষ্ণকান্তশিরোমণি ॥
কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায় ॥ (চৈ. চ. ১।৪)

শ্রীরূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে প্রেমভক্তিকে 'শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা' বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে ব্রহ্মসংহিতার 'আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভিঃ' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীরূপ ব্রজগোপীদের স্বরূপশক্তিত্ব ও আনন্দচিন্ময় রসরূপত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীরূপের উক্তি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শ্রীজীব গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি'র টীকায় বলিয়াছেন, রুক্মিণী প্রভৃতি দ্বারকার পট্টমহিষীগণের স্বরূপশক্তিত্বের হ্লাদিনী-বৃত্তিত্ব থাকিলেও তাঁহাদের ভিতর মহাভাবরূপত্ব নাই। আবার ব্রজের অন্যান্য গোপীরা শ্রীরাধার অংশভূত বলিয়া তাঁহাদের মহাভাবের অংশ-রূপত্ব থাকিলেও মহাভাবের যে সারবস্তু মাদনাখ্য মহাভাব তাহা তাঁহাদের মধ্যে নাই। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, যেমন নদনদী তড়াগাদির জলাশয়ত্ব থাকিলেও তাহাদের কাহারও জলধিত্ব আছে বলা যায় না, সেইরূপ অন্যান্য গোপীরা মহাভাবরূপা হইলেও কেবলমাত্র শ্রীরাধাই মহাভাবস্বরূপা। শ্রীরূপ গোস্বামী গৌতমীয় তন্ত্র হইতে পরপৃষ্ঠায় লিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন—

১। রূপ গোস্বামী— সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে ॥ (উজ্জ্বল)

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনীপরা ॥

এই ভাব লইয়া চৈতন্যচরিতামৃতে (১।৪) বলা হইয়াছে—

জগতমোহন কৃষ্ণ—তাহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥
রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্পষ্ট করিয়া শ্রীরাধার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। 'অনয়া রাধিতো নূনং' ইত্যাদি শ্লোকে ইঙ্গিতে শ্রীরাধার উল্লেখ আছে স্বীকার করিলেও দেখা যায় যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রেয়সীর মধ্যে একজন—যদিও সকলের চেয়ে প্রিয়তমা। কিন্তু ভাগবতের রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য গোপীর সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার অন্তর্ধানে সকল গোপী মিলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহার পুনরাবির্ভাবে সকলে মিলিয়া আনন্দ করিতেছেন—এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যখন গোপীদের সংবাদ লইবার জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইলেন, তখন উদ্ধব সকল ব্রজগোপীরই অসাধারণ প্রেমের মহিমা উপলব্ধি করিলেন। এইসব লীলার মধ্যে স্পষ্ট করিয়া শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য বা প্রাধান্য দেখানো হয় নাই। জয়দেবের গীতগোবিন্দের নায়িকা শ্রীরাধা হইলেও, ঐ কাব্যের বহু পদে শ্রীকৃষ্ণকে অন্যান্য গোপীদের সহিত বিলাসে মত্ত দেখা যায়। কিন্তু শ্রীরূপোত্তর পদাবলীতে শ্রীরাধাই একমাত্র নায়িকা। যাঁহারা শ্রীরাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন, তাঁহারা প্রায়শঃই শ্রীরাধার সখীরূপে পরিণত হইয়াছেন। বিপুল পদাবলীসাহিত্যের মধ্যে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অন্য গোপীদের সহিত লীলাবিলাস করিতে দেখা যায় না। একমাত্র খণ্ডিতায় চন্দ্রাবলীর সহিত রাত্রিযাপনের ইঙ্গিত আছে। শ্রীরূপকে অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, শ্রীরাধা তাঁহার সখীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটাইতে উৎসুক; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর রঘুনন্দন গোস্বামীর পূর্বে কোন পদকর্তা ললিতা-বিশাখাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বর্ণনা করেন নাই। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের উদ্ভট শ্লোকের অনুসরণ করিয়া কোথাও কোথাও

এক-আধজন পদকর্তা, যেমন বিদ্যাপতি, শ্রীরাধার দূতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ধরনের পদ চৈতন্যোত্তরযুগের সাহিত্যে অত্যন্ত বিরল। ফলতঃ বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরূপোত্তর পদাবলীসাহিত্যে একমাত্র রাধিকাবল্লভ করিয়াই অঙ্কিত করা হইয়াছে। পরিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আকারে ইঙ্গিতে পরোক্ষভাবে কখনও কদাচিৎ অন্যের সহিত বিলাস করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তিনি শ্রীরাধাগতপ্রাণ। রায় বসন্তের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

আনন্দ-মন্দির তুমি জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছা-কল্পলতা মোর কামনামুরতি ॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধানাম ॥
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ॥ (তরু ২৯৫৫)

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের শ্রীরাধা অনেকটা যেন কবি ও সাধকদের মানসলোকের সৃষ্টি। শ্রীচৈতন্যের সাধনার মধ্যে সেই শ্রীরাধা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিলেন। আর শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট স্থাপন করিতে যাইয়া শ্রীরূপ তাঁহাকে উপাস্যা দেবীরূপে স্থাপন করিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবজনের নিকট শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীরাধা অধিক আপনার। নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবেরা নিজের উপস্থিতি অপরকে জানাইতে হইলে 'রাধে রাধে' শব্দ উচ্চারণ করেন।

এতদূর আসিয়া আমরা দেখিলাম, শ্রীরূপের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সঙ্গিনী শ্রীরাধা একটি তত্ত্বরূপ লাভ করিয়াছেন, পরবর্তী কালের সমস্ত বৈষ্ণব সাধক ও কবি এই তত্ত্বমূর্তি ধ্যান করিয়াছেন। শ্রীরাধা যেমন তত্ত্বরূপ লাভ করিয়াছেন, তেমনি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পরকীয়া-তত্ত্বও স্বীকৃতি পাইবার স্তরে আসিয়াছে। শ্রীরূপের পূর্বে এইরূপ হয় নাই।

শ্রীরূপের আবির্ভাবের পূর্বে রাধাপ্রেম কেমনভাবে নির্দিষ্ট ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিয়া সুপণ্ডিত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—'কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ে রাধাপ্রেমের কবিতাকে অসতী-ব্রজ্যার ভিতরেই গ্রহণ করা হইয়াছে। পরবর্তী কালের সংগ্রহেও কুলটা-প্রেমের দৃষ্টান্তরূপে রাধাপ্রেমের কবিতার উল্লেখ দেখিতে পাই। এইসব হইতে আমরা একটি অনুমান খাড়া করিতে পারি যে, লৌকিক ক্ষেত্রে অবৈধ প্রণয়ে আকর্ষণ খুবই বেশী থাকে বলিয়া শ্রীরাধাকেও সাধারণভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত দেখানো হইয়াছে, ইহার পিছনে গভীরতর কোন তত্ত্ব দাঁড় করানো হয় নাই।

শ্রীরূপ তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থে মধুররস প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিবিধ নায়কত্বের কথা বলিয়াছেন—পতি ও উপপতি। উল্লিখিত গ্রন্থের নায়কভেদ-প্রকরণে (২১) উপপতির লক্ষণ বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥

অর্থাৎ—মধুররসে উপপত্য-বিষয়ে যে লঘুত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত-নায়ক সম্বন্ধে, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে নহে; কারণ রসনির্যাস আস্বাদন করিতেই শ্রীকৃষ্ণ (স্বয়ং ভগবান) ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীরূপ নায়িকাভেদ-প্রকরণেও (২) লিখিয়াছেন—

নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে।
তত্তু স্যাৎ প্রাকৃতক্ষুদ্রনায়িকাদ্যনুসারতঃ॥

অর্থ—মুখ্যরসে নাট্যশাস্ত্রে যে পরোঢ়া রমণী নিষিদ্ধা হইয়াছে, সেই নিষেধ কেবল প্রাকৃত ক্ষুদ্র নায়িকা সম্পর্কে। সুতরাং এই কথার ব্যঞ্জনায় আমরা বুঝিতে পারি, শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনারা অপ্রাকৃত নায়িকা, তাঁহাদের সম্পর্কে পরোঢ়ার নিষিদ্ধীকরণ সম্ভব নহে। এইরূপে কেবল নায়ক ও নায়িকাকে অপ্রাকৃত বলিয়াই তাঁহাদের পরকীয়াত্বকে একটা তত্ত্বরূপ দিতে শ্রীরূপ সচেষ্ট হন নাই। অন্যভাবেও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য ব্রজগোপের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্য নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করেন কিরূপে? কেমন করিয়া তাঁহারা স্বামীপার্শ্ব হইতে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে যাত্রা করেন? এইসব প্রশ্নের সমাধানকল্পে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

মায়াকলিততাদৃক্-স্ত্রীশীলনেনানুসূয়িভিঃ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥ (উজ্জ্বল, কৃষ্ণবল্লভা, ১৯)

অর্থাৎ—যোগমায়া-কল্পিত স্ত্রীগণই স্বামীদের নিকট থাকিতেন, তাহাতে স্বামীরা পরিতৃপ্ত হইতেন বলিয়া (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) অসূয়া প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু এইসব স্বামীর সহিত (প্রকৃত, যাহা যোগমায়া কল্পিত নহে) ব্রজদেবীদের কখনও সঙ্গম হইত না। শ্রীরূপের এই তাৎপর্য-বিশ্লেষণে পরকীয়া-ভাব লৌকিক স্থূলতা পরিহার করিয়া একটি ঐশ্বরিক তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীরূপ তাঁহার ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটকে শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনাদের পরকীয়া-ভাবের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

ললিতমাধব-নাটকের প্রথমাঙ্কের ২৪-সংখ্যক শ্লোকে ভগবতী পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিবাহের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে গার্গী তাঁহাকে বলিয়াছেন—"আর্যে,

আপনিই অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ দিয়াছেন, তবে আবার কেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহের ইচ্ছা করিতেছেন ?" ইহার উত্তরে পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন— "পুত্রি, মায়াবিবর্তোঽয়ম্"। অর্থ—বৎসে, ঐ (অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার) বিবাহ কেবল মায়াকৃত বিবর্তমাত্র।

বিদগ্ধমাধব-নাটকেও শ্রীরূপ অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই নাটকের প্রথমাঙ্কে নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিয়াছেন—'ভগবতি, মুখরা তাঁহার নাতিনী শ্রীরাধাকে গোকুলে আনিয়া জটিলানন্দন অভিমন্যুর হস্তে অর্পণ করিতে চলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপরের সহিত শ্রীরাধার করস্পর্শ সম্ভব হইতে চলিয়াছে। ইহাতেও আপনি কি করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন ?' উত্তরে পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন—'তদ্বঞ্চনার্থমেব যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম্। নিত্যপ্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য' (২৪-২৫)। অর্থাৎ—অভিমন্যুকে বঞ্চনা করার জন্যই যোগমায়া একান্ত মিথ্যা এই বিবাহকে সত্যরূপে দেখাইতেছেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যপ্রেয়সী।

এতদূর আলোচনায় আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে বলিতে পারি, শ্রীরূপ পরকীয়া-তত্ত্ব কৌশলে যে অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা সর্বথা সত্য নহে। শ্রীরূপ পরকীয়া-ভাবকে একটি রূপক হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহার মাধ্যমে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-চাতুর্যের একটি দিক উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। পরকীয়া-ভঙ্গীতে অপ্রাকৃত ভক্তিরসেরও যে গাঢ়তা জন্মে, সে-কথা বুঝাইতে শ্রীরূপ কুণ্ঠিত হন নাই।

শ্রীরূপের এই পরকীয়া-তত্ত্ব চিন্তার প্রভাবেই পরবর্তী কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক, দার্শনিক ও কবিগণ ভগবৎ-লীলার প্রসঙ্গে অসঙ্কোচে পরকীয়া বিষয়ের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। শ্রীজীব তাঁহার ব্রহ্মসংহিতা, উজ্জ্বলনীলমণি ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকায়, বিভিন্ন সন্দর্ভে এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের নিত্য স্বপতি এবং ব্রজগোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী। কেবল প্রকট লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের উপপতি-ভাব এবং ব্রজগোপীদের পরকীয়াত্ব। এই সমস্ত যোগমায়ার প্রভাবে সৃষ্ট, প্রাতীতিক মাত্র।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি রচনা করিয়া দিয়াছেন—

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥

এই বিষয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য—'এখানে কিন্তু মনে হয়, যোগামায়ার প্রভাবে গোপীগণের উপপতিভাব লইয়া যে লীলা উহা প্রকট লীলারই বৈশিষ্ট্য, বৈকুণ্ঠাদিতে এই জাতীয় উপপতিভাবের লীলা নাই, এবং এইজন্যই বৈকুণ্ঠাদির লীলা হইতে কৃষ্ণাবতাররূপে অবতার-লীলাতেই লীলার অধিকতর রসপুষ্টি।' (শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃঃ ২৩২ পাদটীকা)

শ্রীরূপ-শ্রীজীবের আনুগত্যে উপরের চিন্তাটি পুরাপুরি মনে থাকায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরকীয়া-তত্ত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া লিখিতে পারিয়াছেন—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজ বধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥

(চৈ. চ. আদি, ৪র্থ)

বৈষ্ণব পদকারগণ শ্রীরূপ-প্রদর্শিত পরকীয়া-তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া অনেক পদ রচনা করিয়াছেন।

চৈতন্যোত্তরকালের চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

হেদে লো নিলাজ বঁধু আজ নাহি বাসো।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আইস॥

(কীর্তনপদাবলী, পৃঃ ২৪৯)

মানবতী শ্রীরাধা এখানে শ্রীকৃষ্ণকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন, অন্যের সহিত রসবিলাসের পর তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) কোন্ লজ্জায় বিকালে পরের বাড়ী আসেন। নিজের গৃহকে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরের বাড়ী বলিতেছেন, সুতরাং এই কথার ব্যঞ্জনায় নিজেকেও তিনি পরনারী বলিয়া অভিহিত করিতে চাহিতেছেন।

গোবিন্দদাসের দানলীলার একটি পদে রহিয়াছে, শ্রীরাধা দানী শ্রীকৃষ্ণকে ঈষৎ ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন—

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা নিলাজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পর-পুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি॥

পদকর্তাদের এই সমস্ত বর্ণনার পিছনে শ্রীরূপের প্রদর্শিত পরকীয়া-তত্ত্বের প্রভাব অনস্বীকার্য।

শ্রীরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুরলীলার ক্ষেত্রেও বহুবিধ বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছেন। শ্রীরূপের পূর্বে কবি জয়দেব শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্ভোগাদির যে বর্ণনা গীতগোবিন্দে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আর যাহাই থাকুক বৈচিত্র্য তেমন নাই। বিদ্যাপতির পদাবলীতে লীলাবৈচিত্র্য কিছু আছে সত্য; কিন্তু সেই বৈচিত্র্য নিতান্তই কবিকল্পনা হইয়া রহিয়াছে, কোন আখ্যায়িকা বা তত্ত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়ায় নাই। শ্রীরূপ মধুরলীলার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে গিয়া পৃথক পৃথক আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন, যেমন শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবে আমরা ক্ষুদ্র খণ্ড বহু আখ্যায়িকার সম্মুখীন হই। শ্রীরূপ কোথাও বা তত্ত্ব বুঝাইতে দৃষ্টান্ত হিসাবে ছোট ছোট ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এইরূপ বহু ঘটনা দেখা যায়। এইসবের প্রভাবেই পরবর্তী কালের পদকর্তৃগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য বর্ণনা করিয়া বহু পদ লিখিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃষ্ণলীলার বহু পাত্রপাত্রীকেও স্বয়ং আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীরূপ 'সম্মোহন তন্ত্র' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া 'কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, শ্রীরাধার প্রধানা সখীদের নাম লীলাবতী, সাধিকা, চন্দ্রিকা, মাধবী, ললিতা, বিজয়া, গৌরী এবং নন্দা। কিন্তু তিনি 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে পরমশ্রেষ্ঠ প্রিয়সখী বলিয়া নিম্নলিখিত আটজনের নাম করিয়াছেন—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী। ইহাদের মধ্যে ললিতা-বিশাখার নাম প্রাচীনতর গ্রন্থে থাকিলেও (ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের প্রবন্ধ—'ব্রজের সখা ও সখীদের নামের ঐতিহ্য', সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৩৬৪), তাঁহাদের বেশভূষা, স্বভাব ও পিতৃপরিচয়াদি শ্রীরূপ কর্তৃক প্রথম প্রদত্ত হয়। 'কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা' মতে, ললিতা শ্রীরাধা হইতে বয়সে ২৭ দিনের বড়, তিনি বামপ্রখরস্বভাবা। প্রয়োজন অনুসারে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বেশ কড়াকড়া কথা শুনাইয়া দিতে পারেন। তাঁহার গায়ের রঙ গোরোচনার মতো, পরণের শাড়ির রঙ ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়। বিশাখার গায়ের রঙ বিদ্যুতের মতো, ইনি রাধিকার সমবয়সী অর্থাৎ রাধিকার সহিত একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বভাবও রাধিকার ন্যায়। চম্পকলতা শ্রীরাধার চেয়ে বয়সে একদিনের ছোট, তাঁহার গায়ের রঙ পুষ্পিত চম্পকের মতো, বাক্যযুক্তিতে তিনি দক্ষা, কার্যসাধনে নিপুণা, কারু ও চারু শিল্পে সিদ্ধহস্তা (কৃ. গ. দী. ১৭০—৭২ শ্লোক)। চিত্রা কাশ্মীর বর্ণা, কাচাম্বরা, তিনি বয়সে শ্রীরাধার চেয়ে ২৫ দিনের ছোট। তুঙ্গবিদ্যা শ্রীরাধা অপেক্ষা বয়সে ৫ দিনের বড়, সখীদের মধ্যে

তিনি সর্বাপেক্ষা বিদুষী, কেননা তাঁহাকে অষ্টাদশ বিদ্যায়[১] পারগামিনী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দুলেখা শ্রীরাধা অপেক্ষা বয়সে ৩ দিনের ছোট, তিনি একদিকে যেমন জ্যোতিষ-বিদ্যা জানেন, অন্যদিকে সেই রকম সাপের মন্ত্রও জানেন, রত্ন পরীক্ষা করিতে তিনি পারদর্শিনী। তাঁহার বর্ণ হরিতালের মতো, আর তিনি দাড়িম্বপুষ্পবর্ণের বস্ত্র পরিতে ভালবাসেন। রঙ্গদেবী শ্রীরাধা অপেক্ষা বয়সে ৩ দিনের ছোট, পদ্মফুলের পাপড়ির মতো তাঁহার গায়ের রঙ, আর জবাফুলের রঙের বসন তিনি পরিধান করেন। তিনি পরিহাস-কৌতুকপ্রিয়া এবং বাদ্যযন্ত্রে স্বরসংযোগে সমর্থা। তাঁহার ছোট বোনের নাম সুদেবী, কিন্তু রঙ্গদেবী ও সুদেবী যমজ দুই ভগিনী। চুল বাঁধিতে, চোখে অঞ্জন লাগাইতে ও তৈলাদি মর্দন করিতে তিনি পটীয়সী, আবার সারিকাদের স্বরশিক্ষা, নৌকাখেলা, কুক্কুটখেলা প্রভৃতিতেও তিনি নিপুণা। এই অষ্টসখীর কথা পদাবলী-সাহিত্যের বহু স্থানে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসে আরোপিত নিম্নলিখিত পদটিতে অষ্টসখী কিভাবে শ্রীরাধাকে সাজাইয়া দিতেছেন তাহার বর্ণনা আছে—

ললিতা উল্লাসপ্রাণী সুবর্ণের চিরুণি আনি
মনসাধে আঁচরিল চুল।
বিশাখা কবরী বাঁধে করি মনোহর ছাঁদে
সারি সারি দিল নানা ফুল ॥
চিত্রা সময় জানি সুবর্ণের সিঁথি আনি
যতনে দেওল সিঁথি মূলে।
চম্পক লতিকা ধনী অপূর্ব সিন্দূর আনি
যতনে পরাওল ভালে ॥
নানা রত্ন কর্ণমূলে রঙ্গদেবী পরাইলে
শোভা অতি কহনে না যায়।
সুদেবী হরিষ হৈয়া গজমোতি হার লৈয়া
গলে দিয়া নিরখিয়া রায় ॥
বাকী বাকী আভরণ ছিল তুঙ্গবিদ্যা পরাইল
ইন্দুরেখা পরায় নূপুর।
গোবিন্দদাস অভিলাষী হৈতে রাধার দাসী
তবহি মনোরথ পূর ॥ (মাধুরী ১।৪৮৭)

১। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত জ্যোতিষ, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন, পুরাণ ধর্মশাস্ত্র ও সঙ্গীত—এই অষ্টাদশ বিদ্যা।

শ্রীরূপ যেমন অষ্টসখীর প্রত্যেকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়া কোন পদ রচিত হইতে দেখি নাই। উদ্ধৃত পদটিতে সব সখী এই রকম কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের চরিত্রগত বিভিন্নতা ইহা হইতে বুঝিবার উপায় নাই। অন্য একটি পদে শ্রীরূপের অনুসরণে বিভিন্ন সখীর বিভিন্ন রূপ কাজ বর্ণিত হইয়াছে—

উৎকণ্ঠিতা অবস্থাতে ললিতা সুন্দরী।
রাখয়ে রাধার প্রাণ অতি যত্ন করি॥
আপনি রাধিকা যবে করে অভিসার।
সহায় বিশাখা দেবী করেন তাহার॥
কলহান্তরিতাগুণে রাধা নিতম্বিনী।
রাখয়ে রাধার প্রাণ কান্ত দিব আনি॥
অবস্থা বাসকসজ্জা হয় শ্রীরাধিকা।
সহায় করেন তাকে চম্পকলতিকা॥
বিপ্রলব্ধাগুণে রাধা হয়ে জাগরণ।
নানা কথায় রঙ্গ দেবী রাখয়ে জীবন॥
খণ্ডিতা অবস্থাতে রাধা হর্ষবিষাদ।
সুদেবী সহায় করে না হয় বিবাদ॥
প্রোষিতভর্তৃকাগুণে রাধা বিরহিণী।
সাবধানে রহে তুঙ্গবিদ্যা ঠাকুরাণী॥
স্বাধীনভর্তৃকা রাধা হয়েন যখন।
নৃত্যগীতে ইন্দুরেখা করয়ে তোষণ॥
এই অষ্ট অবস্থাতে এই অষ্ট সখী।
করেন সহায় তাহে কেহ না উপেখি॥

(সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১৬০)

শ্রীরূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধমাধবে' বিদূষকরূপে মধুমঙ্গলের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। মধুমঙ্গল ভোজনরসিক, বচনে সুপটু কিন্তু কার্যকালে অতিশয় ভীত। গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীরূপের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মধুমঙ্গলের চরিত্র একটি পদে অঙ্কন করিয়াছেন—

আওত রে মধুমঙ্গল ভালি।
হেরি সখাগণ দে করতালি॥

চলইতে চরণ পড়য়ে তৃণ বঙ্ক।
ভালে কলঙ্কিত কালিন্দী পঙ্ক ॥
কহইতে বদনে কহত কত ভঙ্গ।
নাচত সঘনে বাজাওত অঙ্গ ॥
ভোজনসরবস সব অনুবন্ধ।
অবিরত প্রাতে লাগাওত দ্বন্দ্ব ॥
মধু গুড় লোভিত বাউল চিত্ত।
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত ॥
কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন চালি।
করইত প্রীত দেই দশ গালি ॥
গোবিন্দদাস শুনি অছুগুণ গাম।
দ্বিজপায়ে কয়ল লাখ পরণাম ॥ (তরু ২৫৪২)

মধুমঙ্গল একটু মধু ও গুড় পাইবার জন্য যে পৈতা পর্যন্ত বাঁধা দিতে রাজী আছেন, এমন কথা অবশ্য শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন নাই। মধুমঙ্গলকে লইয়া পদকর্তা উদ্ধবদাস-ও অনেক রহস্য করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পাশা খেলিতে বসিয়া মধুমঙ্গলকে পণ রাখিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ হারিয়া গেলেন দেখিয়া মধুমঙ্গল পলাইয়া গেলেন।

ললিতা বিশাখা, ধাইয়া তাহারে
বাঁধিয়া রাখিতে চায়।
শ্রীমধুমঙ্গল হাসি খল খল
সখা জয় বলি ধায় ॥
তোর সখা তোরে খেলাতে হারিলে
আর কি করিতে পারে।
রাধিকার নিজ পরিজন করি
নিকটে রাখিব তোরে ॥
এত কহি তার করেতে ধরিয়া
রাইয়ের নিয়ড়ে আনে।
হেরি সুবদনী ঈষৎ হাসিয়া
চাহে তার মুখ পানে ॥

সুদেবী কহয়ে দ্বিজের কুমার
ইহারে ছাড়িয়া দেহ।
আর প্রিয়সখা সুবল আছয়ে
তাহারে বান্ধিয়া লেহ॥ (তরু ২৬৭০)

গোবিন্দদাসে আরোপিত শ্রীরাধার সূর্যপূজার পালায় আছে যে, সূর্যপূজার ঘণ্টার বাদ্য শুনিয়াই মধুমঙ্গল ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—

হাত নাড়ি দম্ভ করি মধুবটু বলে।
ভূদেবে ভুঞ্জাও সব হইবে সফলে॥
(ডঃ মজুমদার সম্পাদিত গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ: ৮২৯ পদ)

মধুমঙ্গলকে সখীরা পেটুক বলিয়া ঠাট্টা করিলে মধুমঙ্গল পাল্টা জবাব দিলেন—আমি তো গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, পেটুক তো বটেই, কিন্তু নন্দনন্দন যুবরাজ হইয়া ননী চুরি করেন বা কেন, আর ইন্দ্রপূজার সব উপকরণই বা শৈলপূজাচ্ছলে ভক্ষণ করেন কেন? তোমাদের এই কপট সূর্যপূজার কথা আমি যদি কুটিলাকে বলিয়া দিই, তাহা হইলেই তোমাদের সব জারিজুরি ভাঙ্গিয়া যায়। এই কথা শুনিয়া—

হরি কহ পরিবেশ সহিত মিষ্টান্ন।
বটুরে সাদরে দেহ করি পরিপূর্ণ॥
(ডঃ মজুমদার সম্পাদিত গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ: ৮৩০ পদ)

শ্রীরূপ 'দানকেলিকৌমুদী'তে কুন্দলতার চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কুন্দলতা সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের বৌদিদি। কুন্দলতা পরিহাস-রসিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখ্যভাবে অনুপ্রাণিতা। যদুনন্দনদাস সূর্যপূজার ঘটনা লিখিতে যাইয়া কুন্দলতার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। জটিলা পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন কিন্তু পুরোহিত পাইতেছেন না, এই অবস্থায় কুন্দলতা পুরোহিত খুঁজিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া লইয়া আসিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অবশ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সাধন করা—

জটিলা আসিয়া তবে কহয়ে সভারে এবে
পুরোহিত আনহ যাইয়া।
শুনি পুন কুন্দলতা হৈলা অতি হর্ষচিতা
সেইক্ষণে চলিলা ধাইয়া॥

দেখ কৃষ্ণের অপরূপ লীলা।
ধীরে শান্ত কলেবর সাক্ষাৎ বিপ্রবেশ ধর
কেহ নাহি লখিতে পারিলা॥
আমি কুন্দলতা দেবী কহয়ে বৃন্দারে ভাবি
মাথুর দেশীয় গর্গছাত্র।
ব্রহ্মচর্য সদা ধরে না দেখি অবলা কারে
আমার সাধনে আইলা মাত্র। (তরু ২৬৭৫)

পদাবলীসাহিত্যের বহু স্থানে পৌর্ণমাসী দেবীর উল্লেখ আছে। তিনি যোগমায়া-স্বরূপিণী। শ্রীরাধামাধবের মিলন ঘটানোই তাঁহার কার্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা-গুরু সন্দীপনী মুনির মাতা, সুতরাং সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ঠাকুরমা। এই পৌর্ণমাসী চরিত্র শ্রীরূপের সৃষ্টি। 'বিদগ্ধমাধব নাটকে' শ্রীরূপ গোস্বামী মুখ্যতঃ পৌর্ণমাসী দেবীর দ্বারাই রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধন করাইয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী 'স্তবমালা'তে—

অচ্যুত জয় জয় আর্ত কৃপাময়
ইন্দ্রমখাত্রণ ঈতি বিশাতন
উজ্জ্বল বিষম উর্জিত বিক্রম
ঋদ্ধি ধুরোঙ্কুর ঋভুদয়াপর। ইত্যাদি

অক্ষরময়ী গোবিন্দবিরুদাবলী রচনা করিয়াছেন। ইহাতে অকারাদি ক্রমে সমস্ত অক্ষরগুলি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার শেষ শ্লোকটি এই—

রম্য মুখাম্বুতা ললিত বিশারদ
বল্লবরঙ্গদ শর্মদ চেষ্টিত
ষটপদ বেষ্টিত সরসিরুহ ধর
হলধরসোদর ক্ষণদগুলোহকর।

ইহার পরেই ক-অক্ষর ব্যবহার করিয়া 'কর্ণে কল্পিত-কর্ণিকঃ' ইত্যাদি শ্লোক লিখিয়াছেন। উহাতে প্রত্যেকটি শব্দই ক-অক্ষর দিয়া আরম্ভ। শ্রীরূপের এই রীতি অনুসরণ করিয়া গোবিন্দদাস কবিরাজ চিত্রগীত—অবনত আনন আচরে গোই (মজুমদার, পদ ১১৪) হইতে আরম্ভ করিয়া—

হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই (মজুমদার, ১৪৮ পদ)

ছত্রিশটি চিত্রগীত রচনা করিয়াছেন (গোবিন্দদাসের পদাবলী, মজুমদার)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পদসংকলন গ্রন্থগুলিও শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা নির্দিষ্ট রসপর্যায় অনুসরণ করিয়া সংকলিত হইয়াছে। 'সংকীর্তনামৃতে' দীনবন্ধু দাস লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ভক্তিশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন—

স্তবমালা স্তবাবলী বিদগ্ধমাধব।
গোবিন্দলীলামৃত আর ললিতমাধব॥
বিল্বমঙ্গল—কর্ণামৃত রসামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মসংহিতা ভাগবতামৃত নানা ছন্দ॥ (সংকীর্তন, পৃঃ ১৭০)

এই তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, নিষ্ঠাবান ভক্তদের ঘরে শ্রীরূপের গ্রন্থ কিরূপ স্থান পাইত।

শ্রীনিবাস-শিষ্য পদকর্তা রাধাবল্লভ দাস লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবন নিত্যধাম সর্বোপরি অনুপাম
সর্ব-অবতারী নন্দ-সুত।
তার কান্তা-গণাধিকা সর্বারাধ্য-শ্রীরাধিকা
তার সখীগণ সঙ্গ যূথ॥
রাগ মার্গে তাহা পাইতে যাহার করুণা হইতে
বুঝিল পাইল যত জনা।
এমন দয়ালু ভাই কোথাও দেখিয়ে নাই
তার পদ করহ ভাবনা॥
শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা পাঞা ভাগবত বিচারিয়া
যত ভক্তি সিদ্ধান্তের খনি।
তাহা উঠাইয়া কত নিজ গ্রন্থ করি যত
জীবে দিলা প্রেম চিন্তামণি॥
রাধাকৃষ্ণ-রস-কেলি নাট্যগীত পদ্যাবলি
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি স্থাপন করিলা খিতি
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরি॥ (তরু ২৩৬৩)

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ভণিতায় লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুছ পদযুগে গান॥

অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ যে সকল ভক্তের, সেই সব ভক্তের শ্রীচরণসমীপে বৃন্দাবনদাস গান করিতেছেন। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই স্থানে প্রায় প্রতি অধ্যায়ের শেষে লিখিয়াছেন—

শ্রীরূপ ও রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, বৈষ্ণব সাধন-ভজন ও সাধন-সঙ্গীত সব-কিছুর উপরেই শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রভাব অসামান্য। তাঁহার উল্লেখযোগ্য প্রত্যেকখানি গ্রন্থের প্রভাব পদাবলীসাহিত্যের কোথায় কতখানি পড়িয়াছে, অতঃপর তাহারই বিশ্লিষ্ট পরিচয় লইতে হইবে।

॥ হংসদূতের প্রভাব ॥

মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্যের আদর্শে বহু কবি বহুবিধ দূতকাব্য রচনা করিয়াছেন; শ্রীরূপের 'হংসদূতম্' ইহাদের অন্যতম। শ্রীরূপ এই খণ্ডকাব্যখানি শ্রীচৈতন্যের পূত সান্নিধ্যে আসিবার পূর্বেই রচনা করিয়াছেন ; আমাদের এই সিদ্ধান্ত করিবার কারণ কাব্যের মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যের নমস্ক্রিয়া নাই এবং উপান্ত শ্লোকে শ্রীসনাতনের মুসলমান সুলতান-প্রদত্ত উপাধিই ব্যবহৃত হইয়াছে। হংসদূতে শ্রীরাধার পটভূমিকায় শ্রীরূপ একটি আখ্যান কল্পনা করিয়াছেন। গোপীগণের প্রাণনিধি শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের অনুরোধে গোকুল ছাড়িয়া যখন মথুরায় গিয়াছেন, তখন বিরহিণী শ্রীরাধা একদিন বিরহ-জ্বালা কিছু পরিমাণে প্রশমিত করিবার জন্য যমুনাতীরে গেলেন। সেখানে পূর্বপরিচিত কুঞ্জ-কুটির প্রভৃতি দেখিয়া অধিকতর শোকাবেগে শ্রীরাধা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সখীরা নানা উপায়ে তাঁহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিয়া চলিলেন। পদ্মপত্র-রচিত শয্যায় শ্রীমতীকে শয়ন করাইয়া সখী ললিতা যখন ঘাটের সোপান-শ্রেণীতে পা দিয়াছেন, তখন তিনি একটি শুভ্রবর্ণ হংসকে আসিতে দেখিলেন। মুহূর্তে ললিতা শ্রীরাধাকে বাঁচাইবার একটি উপায় চিন্তা করিয়া ফেলিলেন। তিনি হংসটিকে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের সভায় দূত করিয়া পাঠাইবেন বলিয়া মনে করিলেন। হংসকে কোমলহৃদয় বলিয়া সম্বোধন করিয়া ললিতা শ্রীরাধার বিরহ-জ্বালার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন এবং সমস্ত কিছু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নিবেদন করিতে অনুরোধ জানাইলেন। মথুরায় যাওয়ার সময় হংস যে সমস্ত স্থানের উপর দিয়া যাইবে, সেই শ্রীকৃষ্ণলীলা-

বিজড়িত বস্ত্রহরণঘাট, রাসস্থলী, গিরিগোবর্ধন, ভাণ্ডীরবন, ব্রহ্মার স্তবের স্থান, কালীয় হ্রদ, কেকা-মুখরিত বৃন্দারণ্য সমস্ত-কিছুর বিষয়ে হংসকে ললিতা বলিয়া দিলেন। সর্বশেষে বিরহিণীদের চক্ষে রাজধানী মথুরার অসহ্য যে সুখচিত্র জাগে তাহার বিষয়ে, আরও মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়া ললিতা তাঁহার কথা শেষ করিলেন।

শ্রীরূপের হংসদূতের এই যে আখ্যান, ইহা রচয়িতার সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি। শ্রীমদ্‌ভাগবতে মথুরাবাসী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে উদ্ধবকে দূত করিয়া বিরহব্যাকুলা গোপাঙ্গনাদের কাছে বৃন্দাবনে পাঠাইবার উল্লেখ আছে। ভ্রমর-দূতও কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু সখীপক্ষে কোন হংসকে দূত করিয়া প্রেরণ করার কথা কোথাও নাই।[১] নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা হিসাবে কোন এক হংসকে একসময় দূত হইতে দেখা যায়, কিন্তু সেই দূতও নায়ক নলের পক্ষে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, নায়িকাপক্ষে হংসকে এমন করিয়া দূত হিসাবে পাঠানো 'মেঘদূতম্' প্রভৃতি যাবতীয় দূতকাব্য হইতে শ্রীরূপের 'হংসদূতম্'-এর স্বাতন্ত্র্যই সূচিত করিতেছে।

শ্রীরূপের হংসদূতের প্রভাব পদাবলীসাহিত্যে দুইভাবে পড়িতে দেখা যায়।

প্রথমতঃ, ঘটনা-পরম্পরার অনুধাবন।

রাধামোহন ঠাকুর হংসদূতের ঘটনাগুলি নিজ পদের মধ্যে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

কানু যাঁহা কেলি কয়ল কত কৌতুক
সো পুন কুঞ্জ নেহারি।
ভাবে ভরল মন নবমি দশা পুন
হোয়ল ও সুকুমারি॥
সখিহে অনুভবি মরমক শেল।
তৈখনে কান্দি সখীগণ ঘেরল
কোই পুন হৃদি পর নেল॥

১। অবশ্য দ্বাদশ আলোয়ারের সর্বশেষ কবি তিরুমঙ্গৈ (খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী) তাঁহার একটি পদে নিজেকে বিরহিণী নায়িকারূপে চিন্তা করিয়া তিরুকুরপুরম্-প্রবাসী প্রিয়তম রক্তলোচন বিষ্ণুর নিকট তরুণ একটি হংসকে দূতরূপে প্রেরণ করিতেছেন দেখা যায় (পেরিয় তিরুমোলি ৫।৮।১)। কিন্তু সেখানেও নায়িকা তাঁহার ভালবাসার কথা বিষ্ণুসমক্ষে নিবেদন করিতে বলিয়াছেন মাত্র, নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বিকতার বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই, কোন আখ্যানও এই সূত্রে গড়িয়া উঠে নাই।

শ্রীভাষ্যের 'তত্ত্বটীকা'কার শ্রীবেদান্ত মহাদেশিকাচার্যের রচনা-তালিকায় 'হংস-সন্দেশ' নামক একখানি গ্রন্থের উল্লেখমাত্র পাওয়া যাইতেছে।

তৈখনে কৈছনে চলিত কণ্ঠ হেরি
নলিনিক শেজহি রাখি।
যমুনা-তীর নীর-হরণে চলু
তহিঁ দেখি এক বর পাখী॥
মাথুর দূত করি প্রেমহি মানল
নিবেদই সব দুখ-ভাখি।
অদভুত বচন রচন উহ যৈছন
রাধামোহন পহুঁ সাথী॥ (তরু ১৬৭৫)

এই পদের মধ্যেও সুকুমারী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা-বিজড়িত কুঞ্জ দেখিয়া নবমীদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ মূর্ছা গিয়াছেন। শ্রীরূপের গ্রন্থের বর্ণনার মতোই সখীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহাকে বুকের উপর লইয়াছেন। ইহাতে শ্রীরাধাকে বাঁচাইবার প্রচেষ্টাই প্রকাশ পাইয়াছে। হংসদূতের বর্ণনার সহিত পদটির বর্ণনার বিষয়ের বিশেষ লক্ষণীয় সাদৃশ্য এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই পদ্মের শয্যা রচনা করিয়া শ্রীরাধাকে শয়ান করানো হইয়াছে এবং ললিতা যমুনাতীরে গিয়া বিহঙ্গবরকে দেখিতে পাইয়াছেন।

শ্রীরূপের কাব্যে যেমন হংসকে প্রথমতঃ সহৃদয় বলিয়া সম্বোধন করিয়া ললিতা নিজেদের বিরহ-দুঃখের বিষয় জানাইয়াছেন, রাধামোহন ঠাকুরের পদেও সেইরূপ ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে—

সজনি অদভুত প্রেমক রীত।
তিরযক জঙ্গম ইহ নাহি জানত
কহতহি কত বিপরীত॥
তুহুঁ অতি নিরমল অন্তর কোমল
পরম-হংস দয়াশীল।
পিয়ক বিরহ হৃদি কীল॥
যো হরি গোপিগণ বিসরি রহল পুন
মথুরা নগরহি ভোর।
এ সব আধি- পয়োধি-বর তো বিনু
কো জানে অব করু ওর॥

যো কছু বচন হৃদয়ে অবধারণ
করি অব করহ পয়াণ।
রাধামোহন আগে যাই তুহুঁ
পুন করু তৈছন গান॥ (তরু ১৬৭৬)

কেবল কি নিজেদের দুঃখের কথা? তাহা তো বলা হইল, কিন্তু কথাগুলি বলিতে মথুরায় গিয়া হংসবর কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারিবে? শ্রীরূপের হংসদূতে সেইজন্য ললিতা হংসের কাছে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়ও বিস্তৃতভাবে দিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুরও তাঁহার আর একটি পদে ইহার অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

কী ফল পরিচয় কথন অনেক।
জানবি তব যব হব পরতেক॥
যো দরশনে হোয় পরম আনন্দ।
সো অবধারবি যতুকুল চন্দ॥
শুন তভু কহি কছু নিরুপম রূপ।
জগ জন লোচন অমিয়া স্বরূপ॥
লাবণি লহরি লভিত সব অঙ্গ।
ভ্রূ ধনু-নটন মদন-ধনু-ভঙ্গ॥
দাড়িম দশন হসন সুধা-কেলি।
বদন তুলনা নহ চাঁদ শত মেলি॥
কত মরকত জিতি বাহু সুদণ্ড।
গোপী পটল হরণ হঠ চণ্ড॥
পরিসর উর কিয়ে মরকত ঠাট।
বিধি নিরমিল জনু কাম-কপাট॥
ততহি লোল বন-মাল বিটঙ্ক।
হেরইতে সতিগণ মদন-আতঙ্ক॥
নাভি-সরোবর সরজ-নিধান।
রমণিক নয়ন সফরি জনু জান॥
উরু যুগ রাম-কদলি অনুমান।
কিয়ে রমণী-মন-করিণি-আলান॥

পাদ পঙ্কজ কত পঙ্কজ বিলাস।
নারি মন মধুকরি করতহি আশ॥
ততহি বিরাজত দশ নখচাঁদ।
যুবতিক যৈছন মন-শশ-ফাঁদ॥
তাকর কি কহব অবলা বাখান।
রাধামোহন পহুঁ রূপ নিধান॥ (তরু ১৬৭৭)

এই পদে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা কবিপ্রসিদ্ধি-সম্মত সাধারণ হইলেও, বিরহিণীর পক্ষে বর্ণনা দেওয়ার ঘটনা ও ভঙ্গীটিও শ্রীরূপের রচনার সম্পূর্ণ অনুসরণেই যে হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট।

শ্রীরূপের হংসদূতে বর্ণিত ঘটনার পরেও কিছু ঘটনা নিজ কল্পনাবলে পদকারগণ চিন্তা করিয়া লইয়াছেন।

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

মাথুর-দূত করি গরুতহি মানি।
কহবি কানুর পায় যত কিছু বাণি॥
এত কহি আওল পড়ি যাঁহা রাই।
কানু কানু করি চেতায়ল তাই॥
অদভুত হেরলুঁ প্রিয়সখি-প্রেম।
নিজসখি-দুখে দুখি সুখে মানে ক্ষেম॥
পিয়াক বিরহে মরণ অনুবার।
ফিরায় করিয়া কত মত উপচার॥
চেতন পাইলে যবে করয়ে বিলাপ।
আওল বন্ধু কহি দূর করে তাপ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
তুরিতহিঁ মীলব প্রেমবশ কান॥ (তরু ১৬৯১)

সখী বলিতেছেন, হে গরুত্মান অর্থাৎ হংস, তোমাকে মাথুরের দূত মনে করিতেছি! যত-কিছু কথা সব তুমি শ্রীকৃষ্ণের চরণে বলিও। এই বলিয়া সেই সখী যেখানে শ্রীরাধা পড়িয়াছিলেন সেইখানে আসিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে শ্রীরাধাকে চৈতন্যযুক্তা করিলেন।

রাধামোহনের পদেও রহিয়াছে—

এতহুঁ বিলাপ করল ললিতা সখি
উড়ি চলল বর হংস।
কানুক পাশ চলল অনুমানিয়া
তবহি বহুত পরশংস॥
আওল পুন যাহাঁ কিশলয় সেজহি
শুতি আছয়ে ধনি রাই।
চৌদিকে সহচরি-গণ তহি বেড়িয়া
রোয়ত আনন চাই॥
হেরি ললিতা সবহুঁ পরবোধই
কহতহি মৃদু মৃদু ভাষ।
এ দুখ কহিতে বর দূত পাঠায়লুঁ
মধুপুর কানুক পাশ॥
এত শুনি বিরহিণী চেতন পাওল
হোয়ল জিবনক আশ।
এ সব প্রলাপ বচন কিয়ে বোলব
দুখি রাধামোহন দাস॥ (তরু ১৬৭৯)

পদটির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ললিতা হংসকে দূতরূপে মথুরার উদ্দেশে পাঠাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শ্রীরাধা কিশলয়ের শয্যায় শুইয়া আছেন। সহচরীরা শ্রীরাধাকে ঘিরিয়া রোদন করিতেছিলেন, ললিতা তাঁহাদের প্রবোধ দিয়া মৃদুমন্দ বাক্যে বিরহের প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই জানাইলেন। শ্রীরূপের বর্ণনায় কোথাও ললিতার অসীম সহিষ্ণুতার ইঙ্গিত না থাকিলেও, রাধামোহন ঠাকুর সঙ্গতভাবেই তাহা চিন্তা করিতে পারেন; কারণ, সখীদের মধ্যে একমাত্র ললিতাই অন্তর-দুঃখ ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন হংসের কাছে, সেইজন্য তাঁহার অন্তরের পরিস্ফীত দুঃখ অনেকখানি লঘু হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য বিষয়টিতে আমাদের একটু অসুবিধায় পড়িতে হয়। শ্রীরূপের রচনায় কিংবা রাধামোহনের পূর্বের একটি পদে আমরা দেখিয়াছি, মূর্ছিতা শ্রীরাধাকে পদ্মের দ্বারা নির্মিত শয্যায় শোয়ান হইয়াছে, তাহা হইলে এই পদে হঠাৎ কিশলয়-শয্যা আসে কিরূপে?

যাহা হউক, এই জাতীয় পদে গোবিন্দদাস ও রাধামোহন ঠাকুর শ্রীরূপের হংস-দূতের ঘটনাবলীকে প্রাক্‌পর্বরূপে ধরিয়াই কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটা বিস্তার করিয়াছেন; সুতরাং এক্ষেত্রে শ্রীরূপের পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যই চিন্তা করিতে পারি।

হংসদূতের দ্বিতীয় প্রকার প্রভাব—ইহার শ্লোকানুসরণে পদ রচনা। ঘনশ্যাম কবিরাজের অন্ততঃ এমন দুইটি পদ আমরা পাইতেছি, যে দুইটি নিঃসন্দেহে হংসদূতের শ্লোককে উপজীব্য করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

শ্রীরূপ হংসদূতের ২-সংখ্যক শ্লোকে লিখিয়াছেন—

যদা যাতো গোপীহৃদয়মদনো নন্দসদনা-
মুকুন্দো গান্দিন্যাস্তনয়মনুবিংদন্ মধুপুরীম্।
তদামাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈ
রগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধা বিরহিণী॥[১]

অর্থাৎ—গোপীজনের হৃদয়ানন্দ শ্রীকৃষ্ণ যখন অক্রূরের অনুরোধে তাঁহার সহিত নন্দালয় হইতে মথুরায় গমন করেন, তখন বিরহিণী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হইয়া ঘন আবর্তসঙ্কুল অগাধ পীড়াপরিপূর্ণ চিন্তা-নদীতে মগ্ন হইলেন।

ঘনশ্যাম কবিরাজ শ্লোকটি অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

সজনি কহইতে ঝরয়ে নয়ান।
সুখ মাঝে দুখ দৈব উপজায়ল
এতহু কি সহয়ে পরাণ॥
অক্রুর সঙ্গয় রঙ্গ রসে আগরি
নিশি পরভাতক বেল।
ব্রজবধূ হৃদয় মদন সুখদায়ক
যব হরি মাথুর গেল॥
চিন্তা দুরূহ জলধি মাঝে ডুবল
ঐছে কমলমুখি রাধা।
ঘূর্ণা ঘুরুলি তাহি ঘন সঞ্চরু
রাধা নীর অগাধা॥

১। আধুনিক কালে শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরূপের এই শ্লোকটির নিম্নোক্তরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

শ্যামল সখা বিহনে আজ
কুঞ্জভবন অন্ধকার,
কোমল-হিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া
সইতে নারে দুঃখভার।
সেই বিরহ সাগরতলে
ডুব্‌ল সারা পরাণমন,
ঘূর্ণাঘন ব্যথার চাপে
অশ্রু ঝরে অনুক্ষণ। (হংসদূত, পৃঃ ৩)

নয়ন বয়ন সব ভরল কলেবর
যতনে না পায়ই থেহ।
ঘনশ্যাম দাস কহই ধনি সমুঝবি
ঐছন কানুক লেহ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৯২)

পদটির মধ্যে শ্রীরূপের শ্লোকের কথাগুলি অধিকাংশই আছে। নন্দালয় হইতেই শ্রীকৃষ্ণ যে গমন করিয়াছেন, সেই কথা পদকর্তা শ্রীরূপের ন্যায় বলিতে না পারিলেও, অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যে মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। শ্লোকে আছে অক্রূরের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ গিয়াছেন, পদকর্তা কিন্তু বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, অক্রূরের সঙ্গে রঙ্গরসে মত্ত হওয়াই শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় যাওয়ার কারণ। বিরহিণী শ্রীরাধার চিন্তা-জলধিতে নিমগ্ন হওয়ার কথা পদকর্তা শ্লোকানুসরণেই ব্যক্ত করিয়াছেন। পদটির মধ্যে যে কেবলমাত্র শ্লোকের অনুসরণ আছে তাহা নহে, পদকর্তার সুন্দর মৌলিকতাও প্রকাশ পাইয়াছে। পদের প্রথম স্তবকটি স্বাধীনভাবে রচনা করিয়া পদকর্তা বিরহিণীর অন্তর্জ্বালাকে অপূর্ব বাঙ্ময় রূপ দিয়াছেন। শ্রীরাধার চোখ, মুখ, সমস্ত দেহ যে অশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছে, সে-কথাও পদের শেষ-স্তবকে সংযোজিত করায় পদকর্তার কবি-নিপুণতা ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীরূপের হংসদূতের ১০৪৩-সংখ্যক শ্লোকটি এইরূপ—

মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি কিমহং হন্ত করবৈ
ন পারং নাবারং কিমপি কলয়াম্যস্য জলধেঃ।
ইয়ং বন্দে মূর্ধ্না সপদি তমুপায়ং কথয় মাং
পরামৃশ্যে যস্মাদ্‌ধৃতিকণিকয়াৎপেক্ষণিকয়া॥[১]

১। শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় অনুবাদকল্পে লিখিয়াছেন—

বিরহ আগুনে জ্বলে মরি সই
সহিতে না পারি আর;
করিব কি বল? এ যে যাতনার
সীমাহীন পারাবার।
চরণে তোমার জানাতেছি নতি
সুমুখি মরম-পিয়া,
করগো উপায় যাহে ক্ষণকাল
ধৈরয মানিবে হিয়া। (হংসদূত, পৃঃ ৫১)

বাংলায় ভাষান্তরিত করিলে দাঁড়ায়—হে সুমুখি, হায়, আমার মন বিরহরূপ অনলের তাপে জ্বলিয়া যাইতেছে। এখন আমি কি করিব? এই সন্তাপময় বিরাট বিরহসাগর আমি পার হইতে পারিতেছি না। এখন তোমার চরণে নতমস্তক হইয়া প্রণাম করি। তুমি শীঘ্র কোন উপায় বলিয়া দাও, যাহাতে আমি ক্ষণকালের জন্যও ধৈর্য ও শান্তি লাভ করিতে পারি।

শ্রীরূপের এই শ্লোক অনুসরণ করিয়া ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

সজনি ধিক ধিক জীবন হামার।
পহিলহি অঙ্কুর গহন দহন ভেল
আতপ কিরণ বিথার॥
কি করিব তনুমন জ্বলত অনুক্ষণ
সহই না পারই রাধা।
চিন্তা জলধি পার নাহি পায়ই
না পূরল হৃদয়ক সাধা॥
ক্ষণ এক ধৈর্য কলা অবলম্বনে
যৈছে জীবন পথ হোয়।
তুয়া পায়ে বন্দি শরণ হাম পৈঠলু
আদেশব মোয়॥
ঐছন পিরিতি করত জনি কো পুন
কানুক বচনে ভোলাই।
কহ ঘনশ্যাম জন দুঃখ তাকর
তিল এক কো ন বড়াই॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৯৩)

এখানেও শ্লোকের অন্তর্গত চিন্তা-জলধির কথা, শ্রীরাধার নিরুপায় অবস্থা এবং ক্ষণকালের জন্য ধৈর্য প্রার্থনা সবই অনুস্যূত হইয়াছে। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও, পদকর্তার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ কল্পনা-বিস্তার লক্ষ্য করা যায় পদের প্রথম ও শেষ স্তবকে। শ্রীরূপের প্রভাব সত্ত্বেও, মোট বিচারে পদটিকে রসোত্তীর্ণ একটি মৌলিক পদ না বলিবার কোন কারণ নাই।

মণীন্দ্রমোহন বসু সংকলিত 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী'তে শ্রীরাধার সহিত হংসের কথোপকথন লইয়া অনেকগুলি পদ স্থান পাইয়াছে। শ্রীরাধা বলিতেছেন—

আর কি সফল হব মোর।
কাহ্নুরে করব কোর ॥
... ...
... ...
সফল হইবে এই আঁখি।
কহ হংস কি উপেখি ॥
হংস কহে—কহিল নিশ্চয়ে।
দিন ক্ষিণ চণ্ডীদাসে কহে ॥ (পদ ৪৯১)

যদিও শ্রীরূপের হংসদূতের অনুসরণ করিয়াই এই পদগুলি লিখিত হইয়াছে, তথাপি দীন চণ্ডীদাস হংসকে শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

হংস বলে শুন রাজার কুমারী
দেখিতে আপন মনে।
উঠিতে বসিতে শয়নে স্বপনে
নিরবধি করে মনে ॥
মোরে পাঠায়ল তোমা সান্ত্বাইতে
কহিবে রাধার পাশে। (ঐ পদ ৪৯৬)

॥ উদ্ধবসন্দেশের প্রভাব ॥

হংসদূতের পরিপূরক কাব্য উদ্ধবসন্দেশ। ইহার রচনাকাল লইয়া পণ্ডিতমহলে কিছু মতবিরোধ আছে। একদল পণ্ডিত বলেন, গ্রন্থটির উপক্রম-উপসংহার-শ্লোকে কোথাও পতিতপাবণ শ্রীচৈতন্যের নমস্ক্রিয়া নাই, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীরূপের সাক্ষাৎকারের পরে যদি ইহা রচিত হইত, তাহা হইলে কখনই এইরূপ হইতে পারিত না। শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবনের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাই গ্রন্থাদি রচনার ক্ষেত্রে আশীর্বাদলাভের জন্য শ্রীচৈতন্যকে স্মরণ না করিয়া পারেন নাই। শ্রীরূপ এই বিষয়ে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিবেন কিরূপে? অন্যদল বলেন, শ্রীচৈতন্যকে

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়া চিন্তা করা হইত, সেক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের নমস্ক্রিয়া করিয়াই শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কাব্যের উপান্ত শ্লোকে শ্রীরূপ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ নামটি ব্যবহার করিয়া লিখিয়াছেন 'ভূয়ো রূপাশ্রয়পদ-সরোজন্মনঃ' ইত্যাদি। রূপনামটি যদি শ্রীচৈতন্য কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাব্যখানি সাক্ষাৎকারের পূর্বে রচিত হয় কি করিয়া তাহা বুঝা দুষ্কর। এক্ষেত্রে আমরা দুইটি যুক্তি উপস্থাপিত করিতে পারি। প্রথমতঃ, উদ্ধবসন্দেশ হংসদূতের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংপৃক্ত কাব্য। এখন হংসদূত কাব্যখানি সংসারের বিষয়কর্মে লিপ্ত থাকিবার সময়ে রচনা করিয়া শ্রীরূপ অনেক পরে সংসার ছাড়িয়া যাইবার পর কিংবা তাহার প্রাক্কালে উদ্ধবসন্দেশ লিখিয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করা অসঙ্গত। প্রথম জীবনে কালিদাসের কবিখ্যাতিতে লুব্ধ হইয়া শ্রীরূপের পক্ষে যেমন হংসদূত রচনা সম্ভব হইয়াছে, তেমনি সম্ভব হইয়াছে উদ্ধবসন্দেশের পরিকল্পনা। শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকারের পর শ্রীরূপের জীবনে বিরাট রকম পরিবর্তন আসিয়াছে, সেই সময় হইতে সাহিত্য-রচনায় কালিদাস প্রভৃতির আদর্শ আর থাকিতে পারে না, শ্রীরূপের রচনাও তাই বৈষ্ণব সাধনার অনুকূল এক অভিনব দিকে ধাবিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্যন্ত সংসারে শ্রীরূপের কি নাম ছিল, তাহা লইয়া যখন এখনও সমস্যা রহিয়াছে, তখন রূপনামটি শ্রীচৈতন্য-প্রদত্তই এমন ধরিয়া লইয়া কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা চলে না।

হংসদূতে যেমন নায়িকা শ্রীরাধার পক্ষে সখী ললিতা হংসকে দূত করিয়া মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়াছেন, সেইরূপ উদ্ধবসন্দেশে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের কথা স্মরণ করিয়া সখা উদ্ধবকে দূতরূপে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছেন বিরহিণী গোপাঙ্গনাদের কাছে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়া দিয়াছেন, তিনি যেন গোপিনীদের জানান যে, মথুরায় যত সুখই থাকুক না কেন, বৃন্দাবনই শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান। মথুরার সিংহাসন-পার্শ্বে মহিষীরা অবস্থান করিলেও, গোপিনীদের প্রগাঢ় প্রীতিই তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) কাম্য। উদ্ধব কোন্ কোন্ পথ দিয়া যাইবেন এবং বৃন্দাবনে গিয়া নন্দ-যশোমতী গোপ-গোপী কাহাদের কিরূপ সম্ভাষণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণ সবই জানাইয়া দিয়াছেন।

উদ্ধবকে এইরূপ দূত করিয়া পাঠানোর পরিকল্পনাটি শ্রীরূপের নিজস্ব নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের 'তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ' ইত্যাদি শ্লোকে (ভা. ১০।৪৬।২-৩) শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধবকে দূত করিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণের যে কথা রহিয়াছে, তাহার অনুসরণেই শ্রীরূপ উদ্ধবসন্দেশ কাব্যের নামকরণ ও বিষয়-বস্তু নির্ণয় করিয়াছেন।

উদ্ধবসন্দেশের ব্যাপারটি শ্রীরূপের মৌলিক কিছু নহে বলিয়া পদাবলীসাহিত্যে তাহার প্রভাব অনুসন্ধান করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। তবে এই কাব্যের কোন কোন শ্লোক অনুসরণ করার ফলে কিছু পদ রচিত হইয়াছে আমরা দেখিতেছি। সেই-গুলির আলোচনা করিলেই বোধ করি পদাবলীসাহিত্যে এই উদ্ধবসন্দেশের প্রভাব কতখানি পড়িয়াছে তাহা স্থির করা সম্ভব হইবে।

শ্রীরূপ তাঁহার কাব্যের ৫৫-সংখ্যক শ্লোকে লিখিয়াছেন—

মদ্বক্ত্রাম্ভোরুহ-পরিমলোন্মত্ত সেবানুবন্ধে
পত্যুঃ কৃষ্ণভ্রমর কুরুষে কিন্তরামমন্তরায়ম্।
তৃষ্ণাভিস্ত্বং যদি কলরুত ব্যগ্রচিত্তস্তদাগ্রে
পুষ্পৈঃ পাণ্ডুচ্ছবিমবিরলৈর্যাহি পুন্নাগকুঞ্জম্॥

অর্থাৎ—আমার মুখরূপ পদ্মের পরিমলে উন্মত্ত হে কালভ্রমর, স্বামীর সেবায় তুমি বিঘ্ন ঘটাইতেছ কেন? যদি তৃষ্ণার জন্যই ব্যাকুলহৃদয় হইয়া তুমি (এমন) গুঞ্জনধ্বনি করিতে থাক, তাহা হইলে সম্মুখের পুন্নাগকুঞ্জ, যাহা অবিরাম ফুলে ফুলে সাদা হইয়া গিয়াছে, সেখানে গমন কর।

শ্রীরূপ অসামান্য কবি-চাতুর্যে এই শ্লোকে দ্ব্যর্থবোধক কথা লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন গোপযুবতীর সহিত মিলিত হইবার জন্য ভ্রমরগুঞ্জন করিয়া সঙ্কেত করেন। গোপযুবতীটি স্বামী কাছে থাকায় তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাইতে পারে না, অপার চাতুর্যে নিজ মত জানাইয়া দেয়। সে কালভ্রমর, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছে যে, গুঞ্জনধ্বনিতে (ভ্রমরপক্ষে সত্যকার গুঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণপক্ষে আহ্বান) তাহার গৃহকাজে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছে। গোপী ভ্রমরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছে, তাহার যদি তৃষ্ণা পাইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সম্মুখের পুষ্পধবলিত পুন্নাগকুঞ্জে যাইতে পারে। ইহার মধ্য দিয়া গোপী কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া দিয়াছে যে, যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমতৃষ্ণা সত্যই প্রবল হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিকটবর্তী পুষ্পবহুল সুন্দর কুঞ্জে গিয়া তিনি অপেক্ষা করুন, অচিরে গোপী সেই কুঞ্জে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবে।

গোবিন্দদাস শ্রীরূপের এই সুন্দর শ্লোকটি লইয়া পদ রচনা করিয়াছেন—

মঝু-মুখ-বিমল-কমল-বর-পরিমলে
জানলু তুহুঁ অতি ভোর।
স্বামিক নিয়ড়ে কতই কর কলরব
না জানি কৈছে দিল তোর॥

দূরে রহু শ্যাম ভ্রমর-বর-রায়।
স্বামিক সেবন করইতে ঐছন
জানি করহ অন্তরায়॥
এতহুঁ তিয়াসে হোত যব আকুল
কী ফল মন্দিরে গুঞ্জ।
তাহিঁ চলহ যাহাঁ কুসুম বিথারল
মঞ্জুল মাধবি-কুঞ্জ॥
এতহুঁ সঙ্কেত কয়ল যব কামিনী
কানু চলল সোই ঠাম।
গোপ-গোঙার ভ্রমর বলি খোজত
গোবিন্দদাস রস গান॥

(তরু ৪৬৪, সমুদ্র ২১৭)

গোবিন্দদাস শ্রীরূপের শ্লোকের প্রত্যেকটি কথা পদের মধ্যে লিখিয়াছেন। কথাগুলি যে সঙ্কেত ভিন্ন কিছু নহে, তাহাই নিজ-উক্তিতে পদের শেষ স্তবকে ধরিয়া দিয়াছেন। ইহাতে রসিক মানুষের পক্ষে কথাগুলির অর্থ বোঝা অনেক সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

উদ্ধবসন্দেশের ভাবী বিরহ-সম্পর্কিত ৬৭-সংখ্যক শ্লোকে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

এষ ক্ষত্তা ব্রজনরপতেরাজ্ঞয়া গোকুলেঽস্মিন্
বালে! প্রাতর্নগরগতয়ে ঘোষণামাতনোতি।
দুষ্টং ভূয়ঃ স্ফুরতি চ বলাদীক্ষণং দক্ষিণং মে
তেন স্বান্তং স্ফুটতি চটুলং হন্ত ভাব্যং ন জানে॥

অর্থাৎ—হে বালিকা, ব্রজরাজের আজ্ঞায় এই দ্বারপাল গোকুলের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিতেছে যে, (শ্রীকৃষ্ণকে) প্রভাতে মথুরানগরে যাইতে হইবে। অমঙ্গলসূচক আমার ডান চোখটি বারবার নাচিতেছে, সেইজন্য চঞ্চল মনও ফাটিয়া যাইতেছে। হায়, ভবিষ্যতে কি হইবে জানি না।

শ্লোকটির অনুসরণে গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

নগর দিগরে অমঙ্গল ঘোষই
ব্রজপতি পাইয়া দ্বেষ।
প্রাতরে সরহু চলব মথুরাপুর
ঐছন কহন বিশেষ॥

সজনি কি ভেল পাপ পরাণ।
তব ধরি হৃদয় বিদরেত ঘন ঘন
ফুকরয়ে দক্ষিণ নয়ান॥
কি এ ঘর বাহির নগর চরাচর
মঝু মনে একু না ভাওয়ে।
দগদগি প্রাণ প্রবোধ না মানই
বয়নে বচন না আওয়ে॥
মনহি মনোরথ কত উপজায়ত
ভালমন্দ একুই না জান।
কহ ঘনশ্যাম দাস ইথে সুন্দরি
ধৈরয পরম বিধান॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৮৯-৯০)

পদকর্তা শ্লোকটির অর্থ তাঁহার পদের মধ্যে কোনক্রমে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেক্ষেত্রেও কিছু কিছু কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। শ্লোকে ঘোষকের কথা আছে, কিন্তু পদের মধ্যে অনুপস্থিত; ব্রজপতির আদেশ পাইবার বিষয়টিও ভালভাবে বলা হয় নাই। অবশ্য, পদকর্তা তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক স্বাধীনভাবেই রচনা করিয়াছেন, তাহাতে পদের মধ্যে কিছু কাব্যসুষমাও আসিয়াছে।

উদ্ধবসন্দেশের ৮৫-সংখ্যক শ্লোকে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

কামং দূরে সহচরি! বরীবর্ত্তি যৎ কংসবৈরী
নেদং লোকোত্তরমপিবিপদ্দুর্দিনং মাং তুনোতি।
আশাকীলো হৃদিকিল ধৃতঃ প্রাণরোধী তু যো মে
সোঽয়ং পীড়াং নিবিড়বড়বাবহ্নিতীব্র স্তনোতি॥

অর্থাৎ—হে সহচরি, কংসারি (শ্রীকৃষ্ণ) যখন দূরে স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছেন, তখন আমার এই পীড়া পৃথিবীর সব-কিছু ছাড়াইয়া গেলেও আমাকে আর (নূতন করিয়া) কষ্ট দিতে পারে না। বরং হৃদয়ে যে আশার খুঁটি পুতিয়াছি, তাহা আমার প্রাণকে যাইতে দিতেছে না, উহা ভয়ঙ্কর ও তীব্র বাড়বানলের মতো বাড়িয়া যাইতেছে।

শ্লোকটিকে নিজ ভাষায় ধরিতে গিয়া ঘনশ্যাম কবিরাজ লিখিয়াছেন—

গিয়া দূর দেশ রহব কিয়ে আওব
করু যব যো মন মানে।
সো অতি বিষম বিরহ জন দুঃসহ
মঝু মনে অধিক ন জানে॥
সজনি দৈব শকতি দুরবার।
এক চাহিতে আনি আন ঘটায়ই
অব কিয়ে করব বিচার॥
আশা কিল হৃদয়ে ধরি রোপল
জীবন বন্ধ প্রতি আশে।
সো যব দহই অধিক বড়বানল
আশা ভেল নিরাশে॥
গমনক বেরি তুয়ারি কর শিরপর
যত কিছু কহল মাধাই।
সো অব বিফল সফল মথুরাপুর
ঘনশ্যাম দাস দুখ গাই॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৯০-৯১)

বিরহিণী শ্রীরাধা বলিতেছেন, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ দূর দেশ হইতে ফিরিয়া আসিবেন, কি সেখানে থাকিবেন, তাহার বিষয়ে যখন যেমন মনে হয় শ্রীরাধা তাহাই সত্য বলিয়া ধরেন; ফলে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্যে তাঁহাকে দোল খাইতে হয়। সকলের কাছে বিরহের জ্বালা বড় দুঃসহ, কিন্তু শ্রীরাধা তাহা বুঝেন না; কারণ, এখনও তিনি প্রিয়তমের আগমনের আশাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অবশ্য, শ্রীরাধা এ-কথা মানেন যে, একরূপ চাহিলে অন্যরূপ ঘটে; সর্বত্রই দৈবের অমোঘ শক্তি কাজ করে। সেইজন্য তাঁহার যে কি হইবে, তাহাও তিনি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন না। শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণ আবার ফিরিয়া আসিবেন এইরূপ চিন্তা করিয়া আশার কীলক হৃদয়ে প্রোথিত করিয়াছিলেন তাহা বাড়বানলের আকার ধারণ করিয়া অসহ্য কষ্ট দিতেছে।

আমরা দেখিতেছি, ঘনশ্যাম শ্রীরূপের শ্লোকের যথাযথ অনুবাদ করেন নাই। শ্রীরূপ তাঁহার শ্রীরাধাকে দিয়া মথুরায় কংসবৈরীর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করার কথা জানাইয়াছেন, ইহার মধ্যে হয়তো অস্ফুট ঈর্ষার ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইয়াছে; সেইজন্য ঘনশ্যাম পদের

মধ্যে সে-কথা লিখেন নাই। শ্রীরাধার দোদুল্যমান মনোভাবের স্পষ্ট অভিব্যক্তি পদের মধ্যেই সম্ভব হইয়াছে। শ্লোকে তেমন নহে। শ্লোকের অনুসরণেই ঘনশ্যাম শ্রীরাধার মনের আশা-কিলকের প্রসঙ্গ পাড়িয়াছেন; কিন্তু মূল বা অনুসরণ দুই ক্ষেত্রেই কিলক বাড়বাগ্নির রূপ লওয়ায় কিছু অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। আমরা জানি, সমুদ্রে জলে বাড়বানল, বনে দাবাগ্নি। শ্রীরাধার হৃদয়-স্থিত কিলকটি আমাদের মনে কাষ্ঠখণ্ডের প্রতিভাস আনে, সেক্ষেত্রে কিলকের পক্ষে দাবাগ্নিতে রূপান্তরিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। যাহা হউক, ঘনশ্যাম পদটিতে নিজের মতো করিয়া সব-কিছু বলিয়া ইহার মাধুর্য অনেকখানি বাড়াইয়াছেন।

কাব্যের ১১৫-সংখ্যক শ্লোকে শ্রীরূপ বাণীবিন্যাস করিয়াছেন এইভাবে—

সোঢ়ব্যং তে কথমপি বলাচ্চক্ষুষী মুদ্রয়িত্বা
তীব্রোত্তাপং হতমনসিজোদ্দামবিক্রান্তচক্রম্।
দ্বিত্রৈরেব প্রিয়সখি! দিনৈঃ সেব্যতাং দেবি! শৈব্যে!
যাস্যামি ত্বৎপ্রণয়চটুলভ্রূযুগাড়ম্বরাণাম্॥

বাংলা অর্থ—দেবি শৈব্যা, তুমি কি প্রকারে দুর্দান্ত কামের তীব্র সন্তাপকারী পরাক্রম চোখ বুজিয়া সহ্য করিয়া গেলে আমি তাহা জানি। হে প্রিয়সখি, দুই-তিন দিনের মধ্যে তোমার প্রণয়-চঞ্চল ভ্রূ-বিলাসের সেবা করিবার জন্য আমি উপস্থিত হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ কথাগুলি অষ্টসখীর অন্যতমা শৈব্যার উদ্দেশে বলিয়াছেন।

ঘনশ্যাম শ্লোকটির অনুসরণ করিয়া পদ লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবন বন স্মঙরি স্মঙরি মন
অনুক্ষণ উনমত ধাব।
সো বৃকভানু সুতা ললিতা সহ
পুনকিয়ে দরশন পাব॥
সজনি প্রিয়ারে কহবি সমুঝাই।
লোচন মোদি মদন সব কথদিন
ঠারই মঝু মুখ চাহি॥
যতনহি মিনতি জানায়বি বহুতর
সাদরে মৃদু মৃদু হাসে।
দুয় এক দিবস মাঝে হাম আওব
ঐছে করবি আস আসে॥

তুহু সে চতুরা তোহে হাম কি জানায়ব
বেদন তুহু কিনা জান।
নিশি দিশি প্রাণ প্রেম পঙে রোয়ত
ঘনশ্যাম দাস পরমাণ ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৯১)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বলিতেছেন—বৃন্দাবনের বনরাজির কথা স্মরণ করিয়া সর্বদাই আমার মন উন্মত্তের ন্যায় সেই দিকে ধাবিত হয়। ললিতাদি-সহ সেই শ্রীরাধার কি আবার দর্শন পাইব? বন্ধু, প্রিয়াকে বুঝাইয়া বলিও, আমার জন্য তাঁহার চক্ষু বুজিয়া কষ্ট সহ্য করার ন্যায় কৃচ্ছ্রসাধনের সব কথাই আমি জানি। হাস্যসহকারে তাহাকে জানাইও, দুই এক দিবসের মধ্যেই আমি যাইতেছি। তুমি বুদ্ধিমান, আমার বেদনার কথা তোমাকে আর কি জানাইব।

আমরা দেখিতেছি, শ্লোকের শৈব্যাকে পরিহার করিয়া পদকর্তা শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলি শ্রীরাধার উদ্দেশেই নিয়োজিত করিয়াছেন। বৃন্দাবনের কথা যে শ্রীকৃষ্ণের মনে হইতেছে, তাহা শ্লোকে না থাকিলেও পদকর্তা প্রাসঙ্গিকভাবেই পদমধ্যে লিখিয়াছেন। উদ্ধবকে যে কথাগুলি বৃন্দাবনে গিয়া বলিতে অনুরোধ করা হইতেছে, সেই ভাবটি পদের মধ্যে মৌলিক ভাবে সৃষ্ট শেষ স্তবকে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। পদটি শ্লোকের সরস মৃত্তিকায় সৌন্দর্যের স্থলপদ্মরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

॥ 'গীতাবলী'র প্রভাব ॥

'গীতাবলী' প্রসঙ্গে প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা হইতেছে এই যে, 'গীতাবলী' প্রকৃত কাহার রচনা। শ্রীজীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরহরি চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য ও গ্রন্থ-প্রণেতৃগণ শ্রীসনাতনের গ্রন্থগুলির তালিকায় 'গীতাবলী'র উল্লেখ করেন নাই; অথচ শ্রীজীব-সংকলিত 'স্তবমালা'য় ধৃত 'গীতাবলী'র ৪২টি গীতের ভণিতাংশে সুকৌশলে শ্রীসনাতনের নাম সংযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। ভণিতা হইতে এইরূপ অনুমিত হয় যে, গীতগুলি শ্রীসনাতনের রচিত। পদকর্তাগণও কেহ কেহ 'গীতাবলী' যে শ্রীসনাতনের দ্বারা রচিত তাহা লিখিয়াছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, গোপীকান্ত দাস লিখিয়াছেন—

শ্রীল সনাতন কয়ল গীতাবলী
বিবিধ ভকতরঙ্গী ॥

'কীর্তনানন্দে'র সংকলয়িতা গৌরসুন্দর দাসও লিখিয়াছেন—

গোসাঞি সনাতন কয়ল গীতাবলী
শুন ইতে উনমিত চিত।

বৈষ্ণব তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'গীতাবলী' রচনা-বিষয়ে শ্রীসনাতন পক্ষে অভিমত দিয়াছেন।

যে 'স্তবমালা' গ্রন্থে 'গীতাবলী' ধৃত হইয়াছে, তাহা সংকলন করিতে গিয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রথমে লিখিয়াছেন—

শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃত কৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যতা ॥ (স্তবমালা ১)

ভাষান্তরে—প্রভু শ্রীরূপের দ্বারা রসামৃত যে স্তবগুলি রচিত হইয়াছিল, তদীয় শিষ্য (আমার) জীবের দ্বারা সেইগুলি সংগৃহীত হইল।

এই কথাগুলিতে বুঝা যায়, 'গীতাবলী' শ্রীরূপের রচিত। পদকল্পতরুতে গীতাবলীর ৩৩টি গীত[১] সন্নিবেশিত হইয়াছে; এই পদগুলি শ্রীরূপের রচিত বলিয়াই সুপণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় অভিমত দিয়াছেন।

এই বিষয়ে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় তাঁহার গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'-এ (২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৪২) যথেষ্ট আলোকসম্পাত করিয়াছেন। আমরা তদ্দৃষ্টান্তে সমস্যার সমাধানকল্পে দুইটি যুক্তির অবতারণা করিতেছি। প্রথমতঃ, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সাক্ষাৎ শিষ্য। শ্রীরূপের রচনা-বিষয়ে শ্রীজীব অবশ্যই অবহিত ছিলেন। তিনি যখন শ্রীরূপের রচনা সংকলন করিতে গিয়া 'স্তবমালা'য় 'গীতাবলী' সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তখন 'গীতাবলী'ও শ্রীরূপের রচনাই বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভণিতাংশ পরীক্ষা করিলেও 'গীতাবলী' যে শ্রীসনাতনের নহে, তাহা বুঝা যায়। ৩-সংখ্যক গীতে 'সুহৃৎ সনাতন', ১৩-সংখ্যক গীতে 'সনক-সনাতনবর্ণিত চরিতে', ২০-সংখ্যক গীতে 'গিরিশ সনাতন সনক সনন্দন' প্রভৃতি রহিয়াছে। সনাতন গোস্বামী গীতগুলির রচয়িতা হইলে, তিনি নিজেকে সনক সনন্দন প্রভৃতির সমপর্যায়ভুক্ত করিতেন না। শ্রীরূপের ললিতমাধব নাটকের প্রথমাঙ্কের সপ্তম শ্লোকে শ্রীসনাতন

১। পদকল্পতরুতে শ্রীরূপের মোট ৩৭টি পদ উদ্ধৃত হইলেও, ৪টি পদ অন্য গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে।

প্রসঙ্গে অনুরূপ কথাই রহিয়াছে—'সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা।' সুতরাং শ্রীরূপ তাঁহার অগ্রজকে সম্মান দেখাইবার জন্য গীতগুলিতে ঐভাবে সনাতনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

রচয়িতা সম্পর্কে সমস্যার জটিলতা অতিক্রম করিয়া 'গীতাবলী'র আভ্যন্তরীণ বিষয়ে যখন আমরা মনোনিবেশ করি, তখন গীতগুলির রচনাশৈলী ও ছন্দ আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রীরূপ তাঁহার 'গীতাবলী'তে জয়দেবকে অনুসরণ করিয়াছেন। জয়দেব 'গীত-গোবিন্দে' যেমন অতি শ্রুতিমধুর শব্দাবলীকে পাশাপাশি সমাস-সূত্রে সাজাইয়া অপূর্ব সুরঝঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন, শ্রীরূপও 'গীতাবলী'তে তদ্রূপ করিয়াছেন। 'বলিত', 'কলিত' প্রভৃতি শব্দ জয়দেবের মতো শ্রীরূপের রচনাতেও আসিয়াছে। জয়দেব বাঙালীর স্বাভাবিক আবেগপ্রবণতাকে শ্রীকৃষ্ণমুখী করিয়া যেমন পদ রচনা করিয়াছেন, তেমনি করিয়াছেন শ্রীরূপ। কিন্তু ইহাই শ্রীরূপের 'গীতাবলী' সম্বন্ধে শেষ কথা নহে। 'গীতাবলী'তে জয়দেবের প্রভাব কিছু পরিমাণে থাকিলেও, শ্রীরূপের মৌলিকতাও কম প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীরূপ 'গীতাবলী'তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বহুবিধ লীলাবিলাসের পরিকল্পনা যেমন করিয়াছেন, সেইগুলি প্রকাশ করিতেও সেইরূপ অপূর্ব নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। ১৩-সংখ্যক গীতে শ্রীরূপ শরৎকালীন মহারাসের বর্ণনা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

মণ্ডিত-হল্লীশকমণ্ডলাং।
নটয়ন্ রাধাং চলকুণ্ডলাং॥
নিখিল কলাসম্পদি পরিচয়ী।
প্রিয়সখি পশ্য নটতি মুরজয়ী॥

অর্থাৎ—হে সখি, দেখ নিখিলকলাসম্পদে সুপণ্ডিত মুরজয়ী (শ্রীকৃষ্ণ) রাসমণ্ডলস্থিতা চঞ্চলকুণ্ডলা শ্রীরাধাকে নৃত্য করাইতে করাইতে (স্বয়ং) নাচিতেছেন।

এখানে শ্রীরূপের রচনাশৈলীর গুণে নর্তকরাসের নৃত্যচ্ছন্দটি স্পষ্টই যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। ৩২-সংখ্যক গীতে শ্রীরূপ আবার বিরহের বিষাদময়তা প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন—

কুর্বতি কিল কোকিলকুল উজ্জ্বলকলনাদং।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি জল্পতি সবিষাদং॥
মাধব ঘোরে বিয়োগতমসি নিপপাত রাধা।
বিধুরমলিন মূর্তিরধিকমধিরূঢ়বাধা॥

অর্থাৎ—কোকিলকুল উজ্জ্বল কলনাদ করিলে (শ্রীরাধা) বিষাদে জৈমিনি জৈমিনি বলেন (বিরহিণী শ্রীরাধা কোকিল-কূজনকে বজ্রনির্ঘোষ বলিয়া মনে করেন, সেজন্য আত্মরক্ষার্থ জৈমিনিকে স্মরণ করেন)। হে মাধব, শ্রীরাধা বিয়োগান্ধকারে পতিত হইয়া বিধুরমূর্তি হইয়াছেন, (কিন্তু) বাধা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে অতি বিলম্বিত লয়ের কথাগুলির গুণে শ্রীরাধার বিরহ-বিষণ্ণতা মূর্ত হইয়াছে, প্রথম দৃষ্টান্তের সহিত ইহার সবদিক হইতেই পার্থক্য রহিয়াছে। অধিক দৃষ্টান্ত না দিয়া আমরা এই পার্থক্যের আলোকেই বুঝিয়া লইতে পারি, 'গীতাবলী'তে শ্রীরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বহুবিধ লীলার উপযোগী পরস্পর পৃথক প্রকাশ-ভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তেই গোবিন্দদাস প্রভৃতি পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদকারগণ বিভিন্ন ভঙ্গীর পদ রচনা করিয়াছেন।

জয়দেব তাঁহার পদাবলীর ভণিতাংশে 'বর্ণিতং জয়দেবকেন', 'শ্রীজয়দেবভণিতমিদম্', 'ভণতি কবিজয়দেবে' প্রভৃতি লিখিয়াছেন। এই সব ভণিতায় জয়দেব যে রচয়িতা, তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে, কোনরূপ কৌশলের অবতারণা করা হয় নাই। শ্রীরূপ কিন্তু 'গীতাবলী'র ভণিতাংশে অগ্রজ শ্রীসনাতনের নামটি সরাসরি ব্যবহার করেন নাই, অধিকাংশ স্থলে সনাতনাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণচ্ছলেই নামটি দিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তে পরবর্তী কালের বহু পদকর্তা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

শ্রীরূপ বাংলা ভাষায় 'গীতাবলী' না লিখিয়া সংস্কৃতে লিখিয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। সর্বভারতের বৈষ্ণবদের জন্যই শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, সেইজন্য আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় না লিখিয়া তিনি সংস্কৃতকেই মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, 'হংসদূতম্' ও 'উদ্ধবসন্দেশঃ' প্রমাণ করে যে, শ্রীরূপের সংস্কৃতানুরাগ প্রথম হইতেই ছিল। শ্রীরূপের অন্য সমস্ত রচনার মতো 'গীতাবলী'ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কিন্তু ভাষা এতই সরল, সমাসবদ্ধ হওয়ার জন্য এমনি বিভক্ত্যাদিবর্জিত যে, ইহাকে প্রায় বাংলা বলিলেই চলে। দৃষ্টান্ত—

(১) যামুনজলকণিকাভিরূপেতে।
সঙ্গতমুজ্জ্বল কুঞ্জনিকেতে ॥
ভজ সখি বল্লবরাজকুমারং।
করমিততারকসঙ্গ বিহারং ॥ (গীতাবলী, ২২)

(২) সৌরভসেবিত পুষ্প বিনির্মিত
নির্মলবনমালাপরিমণ্ডিত।

মন্দতরস্মিতকান্তিকরম্বিত

বদনাম্বুজনববিভ্রমপণ্ডিত ॥ (গীতাবলী, ২১)

শ্রীরূপ সংস্কৃতে লিখিলেও তাঁহার অনুপ্রাসবহুল ও শব্দঝঙ্কারময় রচনা পরবর্তী কালের গোবিন্দদাস প্রভৃতি বহু পদকর্তাকে পথ দেখাইয়াছে।

সংস্কৃতে লিখিলেও শ্রীরূপ জয়দেবের ন্যায় সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণ না করিয়া প্রাকৃত ভাষার গাথা জাতীয় ছন্দের যে আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাতে শ্রীরূপের মৌলিকতা নাই। কিন্তু অন্যদিক হইতে দেখিলে শ্রীরূপের স্বকীয়তা সুপ্রচুর। আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে ত্রিপদী ছন্দের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করি। দৃষ্টান্তস্বরূপ (শ্রীরূপোত্তর) চণ্ডীদাসের একটি পদে—

হাম সে অবলা হৃদয় অখলা

ভাল মন্দ নাহি জানি।

বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া

বিশাখা দেখাল আনি ॥ (তরু—১৪৩)

গোবিন্দদাসের পদে—

চল চল সজল জলদ তনু শোহন

মোহন আভরণ সাজ।

অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক জিতি

দগধল কুলবতিলাজ ॥

(বৈ. প., পৃঃ ৫৭৭, প.—৩৫)

শ্রীরূপকে গীতাবলীতে এই ত্রিপদী ছন্দের পথপ্রদর্শক বলা যায়। শ্রীরূপের কয়েকটি গীতের কিয়দংশ একটু সাজাইলেই ত্রিপদী রূপটি প্রকটিত হইবে। যেমন—

(১) অভিনব কুট্মল গুচ্ছ সমুজ্জ্বল-

কুঞ্চিত কুন্তলভার।

প্রণয়িজনেরিত- বন্দন সহকৃত

চূর্ণিত বর ঘন সার ॥ (গীত—৩)

(২) গোপীচুম্বিত রাগকরম্বিত

মানবিলোকন লীন।

গুণবর্গোন্নত রাধাসঙ্গত

সৌহৃদ সম্পদধীন ॥ (গীত—১৭)

(৩) তরুণীলোচন তাপবিমোচন
হাসসুধাঙ্কুরধারী।
মন্দমরুচ্চল পিঞ্ছকৃতোজ্জ্বল
মৌলিরুদারবিহারী॥ (গীত—২৩)

কেবল ত্রিপদী ছন্দোরূপের দ্বারাই নহে, শ্রীরূপ-ব্যবহৃত উপরি-উক্ত মিত্রাক্ষরের দ্বারাও পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ প্রভাবিত হইয়াছেন।

শ্রীরূপের 'গীতাবলী' অল্প-বিস্তর অধিকাংশ পদাবলী-সংকলন-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। মোট ৪২টি গীতের মধ্যে 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে ১১টি, 'পদামৃতসমুদ্রে', 'গীতচন্দ্রোদয়ে', 'কীর্তনানন্দে' কয়েকটি এবং 'পদকল্পতরু'তে ৩৩টি ধৃত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নির্ভরযোগ্য সমস্ত পদাবলী সংকলনেই 'গীতাবলী'র স্থান। বোধ করি ইহা কীর্তনপ্রসঙ্গে 'গীতাবলী'র অপরিহার্যতাই প্রমাণ করিতেছে। সকল কীর্তনের আসরেই 'গীতাবলী' অন্ততঃ দুই-একটি করিয়া গাওয়া হইত; সাধারণ শ্রোতারা কিভাবে কতখানি বুঝিত, আজ তাহা বলা কঠিন; তবে 'গীতাবলী'র যে সমাদর ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গীতাবলীর গীতগুলিকে লোকে সাধ্যমতো যে বাংলা করিয়া লইয়াছিল, তাহার প্রমাণ-পঞ্জী পাওয়া যাইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন অনুবাদ যে হইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। লণ্ডন-স্থিত ইণ্ডিয়া হাউসের গ্রন্থতালিকায় শ্রীরূপের 'গীতাবলী'র বঙ্গানুবাদের কথা রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৮৫৯ অব্দে ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কলিকাতা হইতে ৪৮ পৃষ্ঠাবহুল গীতাবলীর বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উপস্থিত সেই গ্রন্থ ইণ্ডিয়া হাউসের গ্রন্থাগারেই আছে, এদেশে কোথাও আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমরা এদেশে দুইটি ক্ষেত্রে কিছু অনুবাদ পাইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথি-বিভাগের ৬২০৪-সংখ্যক পুঁথিতে মোট ২৭টি গীতের অনুবাদ রহিয়াছে; 'কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে ধৃত হইয়াছে ৯টি গীতের অনুবাদ; উভয় ক্ষেত্রেই অনুবাদকের কোন নাম নাই। অনূদিত পদ-গুলি আমরা মিলাইয়া দেখিতেছি ৮টি পদ পুঁথি ও কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু—উভয়ত্রই ধৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে ১৯টি গীতের অনুবাদ এবং কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধুতে অন্য একটি গীতের অনুবাদ রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'গীতাবলী'র ৪২টি পদের মধ্যে আমরা মোট ২৮টির অনুবাদ পাইতেছি। ১, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৯, ৪০ ও ৪২ সংখ্যক গীতের অনুবাদ পাওয়া

গিয়াছে। এখন বিভিন্ন লীলা-পর্যায়ে বিন্যস্ত করিয়া গীতাবলীর অনুবাদ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

গীতাবলীর ১-সংখ্যক গীতে 'পুত্রমুদারমসূত যশোদা' ইত্যাদি বলিয়া নন্দোৎসব বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীরূপ যাহা সংস্কৃত শ্লোকে লিখিয়াছেন, তাহা বাংলায় অনুবাদ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—যশোদা সর্বসুলক্ষণযুক্ত উদার পুত্র প্রসব করিলে, গোপগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কেহ নানারকম উপহার আনিলেন, কেহবা আনন্দে বারবার নৃত্য করিতে লাগিলেন। কেহ মধুরস্বরে গান আরম্ভ করিলেন, অন্য কেহবা দধি-দুগ্ধ-নবনী অপরের গায়ে ছুঁড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে কোন ব্যক্তি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, অন্যেরা সেই সনাতনমূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের প্রসঙ্গে বসুদেব-দেবকীর কথা আনিয়া মাধুর্যের ব্যাঘাত ঘটান নাই, যশোদাই উদার পুত্রকে (শ্রীকৃষ্ণকে) প্রসব করিলেন বলিয়াছেন। এই গীতটির অনুবাদে রহিয়াছে—

যশোদা প্রসবে পুত্র উদারচরিত।
হইল সকল গোপ অতি আমোদিত ॥
কেহ দান করে গিয়া নানা উপহার।
কোনজন নর্তন করয়ে বার বার ॥
কেহ সুমধুর সুরে করেন সঙ্গীত।
কেহ ছড়াএল দধিসহ নবনীত ॥
কোনজন মনোরথ করয়ে পূরণ।
সনাতন মূর্তি কেহ করে দরশন ॥

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ পুঁথির ১ পৃঃ;
কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু—পৃঃ ৩)

যদিও উপরি-ধৃত অনুবাদে শ্রীরূপের গীতের সেই শব্দ-ঝঙ্কার নাই, তথাপি অনুবাদটি আক্ষরিক বলিতে হয়। এই অনূদিত পদের মূলে 'গীতাবলী'র গীতটির প্রভাব তো রহিয়াছে, অধিকন্তু বহু পদকর্তাই শ্রীরূপের আদর্শে যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণ-জননী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কীর্তনানন্দ'-এর ২-সংখ্যক পদে রহিয়াছে—

যশোদাপ্রসূত ভৈল সুন্দর নন্দন।
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পা মেঘের বরণ ॥

পদকর্তা যদুনাথ লিখিয়াছেন—

যশোদার পুত্র হৈল পড়ি গেল সাড়া।
মহানন্দে ধায়্যা আল্য যত গোয়াল পাড়া ॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ২০১)

নন্দোৎসব বিষয়ে শ্রীরূপের অন্য প্রভাবও রহিয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের যেখানে নন্দোৎসব বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে ব্রজবাসীদের আনন্দ করার সম্পর্কে এইমাত্র বলা হইয়াছে—

সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।
গায়কাশ্চ জগুর্নেদুর্ভের্যো দুন্দুভয়ো মুহুঃ ॥ (১০।৫)

অর্থাৎ—বিপ্র, সূত, মাগধ ও বন্দীরা মাঙ্গলিক বাক্য বলিয়াছেন, গায়কেরা গাহিতেছিলেন এবং মুহুর্মুহু দুন্দুভি বাজিতেছিল।

গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ।
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ ॥ (১০।১৪)

অর্থাৎ—গোপেরা পরস্পর আনন্দিত হইয়া দধি, ক্ষীর, ঘৃত ও জল ছুঁড়িতে লাগিল, (পরস্পরের গায়) লেপিয়া দিল এবং (কাহাকেও বা) নবনীতে নিক্ষেপ করিল।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণনা এই পর্যন্ত আছে; সুতরাং নৃত্যের যে অবতারণা নাই তাহা আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করিতেছি। শ্রীরূপ কিন্তু গীতাবলীর মধ্যে নন্দোৎসবের বর্ণনায় নৃত্যের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার প্রভাবেই পরবর্তী কালের পদকারগণ সকলেই নন্দোৎসব উপলক্ষে গোপ-গোপীদের নৃত্যের সাড়ম্বর বর্ণনা দিয়াছেন। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিতেছি।

যদুনাথ দাস লিখিয়াছেন—

নন্দের মন্দিরে রে গোয়াল আল্য ধায়্যা।
হাতে কড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ২০১)

নিমাই-এর পদে রহিয়াছে—

উপানন্দ অভিনন্দ, সুনন্দ নন্দন নন্দ
পাঁচ ভাই নাচে বাহু তুলিয়ারে।
যশোধর যশোদেব সুদেবাদি গোপসব
নাচে তারা আনন্দে ভুলিয়ারে ॥

(কীর্তনানন্দ, পৃঃ ৭)

পদকার কিশোর লিখিয়াছেন—

এত বলি নাচে দিয়ে করতালি।
নড়ি হাতে ভার কান্ধে বলে ভালি ভালি ॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ১০৮২)

কেবল গোপ-গোপীদের নৃত্যই নহে, আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পদকর্তৃগণ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোপলক্ষে দেবদেবীদের নৃত্যও বর্ণনা করিয়াছেন।

'গীতাবলী' হইতে শ্রীরাধার পূর্বরাগ সম্বন্ধীয় তিনটি গীত অনূদিত হইয়াছে। ৭-সংখ্যক গীতে শ্রীরূপ যে লিখিয়াছেন—'রাধে নিগদ নিজং গদমূলং' ইত্যাদি, তাহার বঙ্গানুবাদ—হে রাধে, তুমি তোমার ব্যাধির নিদান বল। দেখ, তোমার শরীর হইতে তুঁষের আগুনের মতো উত্তাপ বাহির হইতেছে; রক্তবর্ণ অতি-সূক্ষ্ম তোমার কঞ্চুলিকা তোমার বুকের উপর থাকিয়া ইন্দ্রগোপকীট অপেক্ষাও শোভা বর্ধন করিতেছে; তুমি তাহা বারংবার দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছ কেন? তুমি এখন কর্পূর-দেওয়া পানও ভালবাসিতেছ না, সুন্দর চম্পকমালা সীমন্তমণির সহিত নিক্ষেপ করিতেছ। সখি শ্রীরাধা, তোমার যে হৃদয় সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক বিধান করিয়াছে, তুলার মতো ক্ষীণ হইয়া এখন তাহা অধৈর্য ও শূলব্যথার আকররূপে প্রতীত হইতেছে।

শ্লোকটির পদ্যানুবাদে পাওয়া গিয়াছে—

বল রাধা আপনার পীড়ার কারণ।
উঠিতেছে দেহে কেন তুঁষ হুতাশন ॥
চন্দ্রগোপকীটবর্ণে করি তিরস্কার।
কান্তিময় হইয়াছে কাঁচনি তোমার ॥
অহরহ বক্ষ যেই হয় অনুকূল।
ক্ষেপণ করিছ দূরে এমন দুকূল ॥
কর্পূরমিশ্রিত মিষ্ট সুখাদ্য তাম্বুলে।
সুরচিত মালা যাহা গাঁথা চাঁপাফুলে ॥
এ সকলে দূরে তুমি করিছ ক্ষেপণ।
হেন অনবস্থা কারু না দেখি কখন ॥
ষষ্ঠ (?) স্থানে তব চিত্ত অধৈর্য হইয়া।
তুলনারহিত দুখে রয়েছ ডুবিয়া ॥

যদি হয় সনাতন কৌতুকের স্থান।
স্ফূর্তি পাইতেছে যেন শূলের সমান ॥
(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ৪৩৪)

'অহরহ' বলিতে সাধারণতঃ সর্বদা বুঝায়; সুতরাং শ্রীরূপ যেখানে 'মুহুরপি' শ্রীরাধার দুকূল ত্যাগের কথা বলিয়াছেন, সেখানে অনুবাদক 'অহরহ' কথাটি ব্যবহার করিয়া ধ্বনিটি ঠিক ফুটাইতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরূপ শ্রীরাধা কর্তৃক উৎকৃষ্ট চম্পকদাম-পরিবেষ্টিত সীমন্তভূষণ দূরে নিক্ষেপ করার কথা বলিয়াছেন, অনুবাদক কিন্তু লিখিয়াছেন 'সুরচিত মালা যাহা গাঁথা চাঁপাফুলে' তাহাই শ্রীরাধা দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। এখানে অনুবাদক সাধ্যমতো একটা কিছু লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। ১০ম হইতে ১২শ চরণের মধ্যে অনুবাদক শ্রীরূপকে অনুসরণ করেন নাই, স্বাধীনভাবে লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এবম্বিধ কিছু অসামঞ্জস্য চোখে পড়িলেও, শ্রীরূপানুসরণে পূর্বরাগে অনুলিপ্তা 'শ্রীরাধার ব্যাধিদশাটি অনুবাদক ঠিকমতই পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছেন। ৭-সংখ্যক গীতে বিরহতাপিনী শ্রীরাধার ব্যাধিদশার কথা সখীরা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ৮-সংখ্যক গীতে তাহারই যেন উত্তর দিয়াছেন শ্রীমতী। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—'কুটিলং মামবলোক্য নবাম্বুজমুপরি চুচুম্ব সরঙ্গী' ইত্যাদি। অর্থাৎ —সেই রঙ্গী আমার দিকে কুটিল নয়নে চাহিয়া একটি পদ্মকোরককে চুম্বন করিলেন। তাহাতে সহসা আমার অঙ্গ কম্পাকুল হইল। সখি, আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করিও না। হায়! সেই গোপরাজকুমারকে দেখিয়া আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ফলভার-নমিত দাড়িম্বশাখায় হস্ত রাখিলেন, তাহা দেখিয়া কুলবতী আমি আমার ধৈর্যরত্ন হারাইলাম। তারপর তিনি একটি পল্লবময় অশোকলতা দংশন করিলেন, তাহাতে আমি বহুক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহধর্ম ভুলিয়া গেলাম। পদ্যানুবাদক ভাষান্তরিত করিয়াছেন—

করোনা জিজ্ঞাসা আর সখি বার বার।
মন মোহিয়াছে মোর ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
কুটিল কটাক্ষে মোরে করিয়া ঈক্ষণ।
নবাম্বুজ ধরি করে করেন চুম্বন ॥
সহসা তাহাতে মোর অঙ্গ সঞ্চালন।
হইল ক্ষণেক পরে দেহ প্রকম্পন ॥

অশোক পল্লব লতাময় সনাতন।
পরিহাস সুরসিক মদনমোহন॥
সেই রূপ হেরে আমি হয়েছি এমন।
তাহাতেই দেহকর্ম হলো বিস্মরণ॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ৪৪২; কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ১৪৭)

এই অনুবাদে কয়েকটি বিষয়েই মূলের সহিত পার্থক্য ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, শ্রীরূপ গীতারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের কুটিল কটাক্ষের কথা বলিয়া পরে শ্রীরাধার মন মোহিত হইয়াছে জানাইয়াছেন, অনুবাদক এই ক্রম রক্ষা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, সুবর্তুল দাড়িম্বফলে শ্রীকৃষ্ণের হস্তার্পণ দেখিয়া শ্রীরাধা তাঁহার ধর্মোজ্জ্বল ধৈর্যধনও হারাইয়াছেন, এ-কথা শ্রীরূপ গীতের মধ্যে বলিয়াছেন, অনুবাদক ইহার অনুবাদ না করিয়া স্বাধীনভাবে লিখিয়াছেন শ্রীরাধার অঙ্গ-সঞ্চালন ও দেহ-প্রকম্পনের কথা। তৃতীয়তঃ, শ্রীরূপ যেখানে লীলাচতুর শ্রীকৃষ্ণের অশোকপল্লব দংশনের প্রসঙ্গ পাড়িয়াছেন, অনুবাদক সেখানে লিখিয়াছেন—'অশোক পল্লব লতাময় সনাতন।' এ-কথার সঙ্গত অর্থ কিছু হয় কিনা, হইলেও এখানে তাহার সার্থকতা কি বুঝা কঠিন।

শ্রীরূপের পদটি গোবিন্দদাস কবিরাজের নিম্নলিখিত ব্যঞ্জনাপূর্ণ পদ-রচনায় অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে—

চন্দন-চান্দ লিখি চুম্বই কানু।
লাজে কমলমুখি তেরছ বয়ান॥
কিশলয়-দলে করু দশনকি ঘাত।
কিশলয় হেরি ধনি হেট রহু মাথ॥
ঘন নখরেখ দেই কনয়া কটোর।
উহুঁ উহুঁ করি ধনি মোড়ই কোর॥
চম্পকদাম আলিঙ্গই কান।
লাজে গোরি সুখে হরল গেয়ান॥
নীল পীত কিয়ে গলিত পিধান।
গোবিন্দদাস তুহুঁক গুণ গান॥ (সং ৯২, তরু ১৮০)

গোবিন্দদাস অপেক্ষা শ্রীরূপের কবিত্ব-শক্তি যে অধিক, তাহা এই পদের দুইটি ইঙ্গিত হইতে বুঝা যায়। শ্রীরূপ যেখানে পদ্মকোরকের চুম্বনের কথা বলিয়াছেন, গোবিন্দদাস সেখানে চন্দনে-আঁকা চাঁদ চুম্বন করার কথা লিখিয়াছেন। শ্রীরাধা

পদ্মকোরকের মতো কিশোরী, তিনি পদ্মমুখীও বটেন, চন্দ্রবালাও বটেন, কিন্তু পথের মধ্যে চন্দন দিয়া চাঁদ আঁকা কঠিন, আঁকিলেও তাহার দ্বারা মুকুলিকা বয়সী রাধার ব্যঞ্জনাও হয় না। পথের মধ্যে সোনার বাটি হাতে করিয়া চলার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না, কিন্তু ফলভারনম্র ডালিমগাছ থাকা স্বাভাবিক। সেইজন্য শ্রীরূপের বর্ণনার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নাই। শ্রীরূপ যেখানে রাধার ধৈর্য হারাইবার কথা বলিয়াছেন, গোবিন্দদাস সেখানে রাধাকে অত্যন্ত প্রগল্‌ভার মতো উহুঁ উহুঁ বলিয়া পাশ ফিরাইতেছেন।

অবশ্য অপর একটি পদে গোবিন্দদাস শ্রীরূপের গীতটির অনেকটাই অনুসরণ করিয়াছেন—

* * * *

না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল
কিশলয়দলে করু দংশ ॥
অতয়ে সে মঝু মন জ্বলতহি অনুখন
দোলত চপল পরাণ। (তরু ৭৩, সমুদ্র ৪২)

ইহাতে শ্রীরূপের রচনার প্রতিরূপ কি লক্ষ্য করা যাইতেছে না?—

অদশদশোক-লতা-পল্লবময়মতনু-সনাতন-নর্মা।
তদহমবেক্ষ্য বভূব চিরং বত বিস্মৃত-কায়িক-কর্মা ॥

অর্থাৎ—অতনু সনাতননর্মা ইনি (শ্রীকৃষ্ণ) অশোকলতার পল্লবে দংশন করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি বহুক্ষণ কাজ ভুলিয়া রহিলাম।

৯-সংখ্যক গীতে শ্রীকৃষ্ণসমীপে পূর্বরাগিণী শ্রীরাধার অন্তর্বেদনার কথা সখীরা নিবেদন করিয়াছেন। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—'অনধিকতাকস্মিকগদ কারণ মথিত মন্ত্রৌষধি নিকুরম্বং' ইত্যাদি, অর্থাৎ—হে কৃষ্ণ, সমস্ত আত্মীয়-স্বজন শ্রীরাধার হঠাৎ রোগ হইবার কারণ জানিতে না পারিয়া সর্বদা শোক করিতেছেন, অবিরত ক্রন্দন করার জন্য তাঁহাদের চক্ষু লাল হইয়াছে। অতএব তুমি এখন করুণাপর হও। আমাদের প্রিয় সখী নিশ্চিত তোমার কটাক্ষশরে আহত হইয়া কেবলমাত্র জীবনধারণ করিয়া আছেন, সুখের কণামাত্রও তিনি এখন অনুভব করিতেছেন না। শ্রীরাধার অন্তরে কেবল উত্তাপই বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইজন্য বক্ষস্থিত উজ্জ্বল মুক্তামালার মুক্তাগুলি ফাটিয়া পড়িতেছে, তিনি (শ্রীরাধা) কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া ঠাণ্ডা মাটিতে নিশ্চলভাবে দেহ রাখিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়া আছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি যদি বল আমি অন্য স্ত্রীলোককে দেখি না, তাহার উত্তরে বলি তুমি ব্রজগোপীদের

ভয় নিবারণের মহাযজ্ঞে দীক্ষিত, আমি বালিকা তোমারই শরণাপন্ন, হে সনাতন, তবে কেন আমার এইরূপ বিষমদশা হইল? 'গীতাবলী'তে দেখা যায় যে, দূতী শ্রীকৃষ্ণকে 'ভব কারুণ্যশালী' অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রতি করুণা দেখাইয়া তাঁহার ভালবাসার প্রতিদান দিতে অনুরোধ করিতেছেন। রায় রামানন্দ 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া বলাইয়াছেন যে, আমি তোমাদের সখীর প্রতি কবে অনুরক্তি প্রকাশ করিলাম। গোপসমাজকে জিজ্ঞাসা কর। এইরূপ কোন কপট ঔদাসীন্যের কথা মনে রাখিয়া শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণকে কারুণ্যশালী হইতে মিনতি জানাইয়াছেন। কিন্তু পদাবলীসাহিত্যে কোথাও পূর্বরাগের প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্য দেখা যায় না।

গীতটির অনুবাদ হইয়াছে—

ওহে দেব বংশীধারি একবার কৃপা করি
হও তুমি করুণানিধান।
তোমার নয়ান শরে আহত হয়ে অন্তরে
কৃশাঙ্গিণী ছাড়ে বুঝি প্রাণ॥
হৃদয়েতে করে বল সন্তাপ অগ্নি সকল
তাহে স্ফুটে মুক্তা সমুদায়।
শীতল ভূতলে সেহ হইয়া নিশ্চল দেহ
অবসন্ন দেখি নিরুপায়॥
অকস্মাৎ রোগ সেই কারণ জানে না কেই
মন্ত্রৌষধি যে করে সমর্পণ।
সর্বদা করে রোদন লোহিত তাহে লোচন
করে শোক কুটম্বের গণ॥
বিশাল বিষম দশা করে তাঁরে দুরদশা
তার জ্বালা সহিতে না পারে।
ওহে ব্রজজনাভয় দানবৃত্তি মহাশয়
তুমি সুখে হারাইব তাঁরে॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ৪৫৩; কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ১৫০)

শ্রীরূপের গীতে শ্রীরাধা-দুঃখে কুটুম্বদের রোদন করিয়া লোহিতলোচন হওয়ার প্রসঙ্গ প্রথমেই আছে, অনুবাদক কিন্তু তাহার অন্যথা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, কৃশাঙ্গিণী শ্রীরাধা 'ছাড়ে বুঝি প্রাণ' বলায় অনুবাদক যে কিছুটা স্বাধীনতা লইয়াছেন তাহা লক্ষ্য

করা যায়। শ্রীরূপ গীতে লিখিয়াছেন, শ্রীরাধার অন্তঃকরণে সম্প্রতি কেবল সন্তাপই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে বক্ষস্থ উজ্জল মৌক্তিকমালাও স্ফুটিত হইতেছে। অনুবাদক এই ভাবটি যথাযথ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। সর্বোপরি শেষ স্তবকে অনুবাদক স্বাধীনভাবেই শ্রীরাধার মরণাপন্ন অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্বরাগের পর দেখা যায়, 'গীতাবলী' হইতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্যের তিনটি গীত অনূদিত হইয়াছে। ১৬-সংখ্যক গীতে দেখি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট যে দূতী পাঠাইয়াছেন, তাহার কাছে শ্রীরাধা বাম্যভাব অবলম্বন করিয়া নিজের বিষয় জানাইয়াছেন। শ্রীরাধা প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে, ভয়হেতু তাঁহার রোমাঞ্চ হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসাই তাঁহাকে রোমাঞ্চিত করিয়াছে। শ্রীরূপ 'পুলকমুপৈতি ভয়ান্মম গাত্রং' ইত্যাদি লিখিয়াছেন, অর্থ—হে সখি, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ভয়ে আমার গা রোমাঞ্চিত হইতেছে, তথাপি সগর্বে তুমি হাসিতেছ কেন? সখি, শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্র নিবারণ কর, অনুচিত কাজে ইহার আগ্রহ দেখিতেছি। তুমি যখন আমাকে এই বনে লইয়া আসিয়াছ, তখন বোধ হইতেছে তুমি আমার বিপক্ষে। আজ আমি বিধাতার সৃষ্ট সকল সুখের নিদানস্বরূপ সনাতনধর্ম পরিহার করিব না।

পদ্যানুবাদক লিখিয়াছেন—

ওহে সখি কৃষ্ণে তুমি করহ বারণ।
অনুচিত কর্মে আশা তাঁর সর্বক্ষণ॥
তনু মোর রোমাঞ্চিত হতেছে ভয়েতে।
তথাপি হাসিছ তুমি অত্যন্ত মদেতে॥
আমার বিপক্ষ তুমি জেনেছি তোমায়।
যেহেতু বনের কোলে আনিলে আমায়॥
সনাতন ধর্ম অতি সুখের কারণ।
ত্যাগ না করিব আজ বিধি নিয়োজন॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ৭৪৬; কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ২৪০)

গীতের ধ্রুবপদটি অনুবাদ-সম্মুখে দিয়া পদটি আরম্ভ করায় অনুবাদক ক্রমভঙ্গদোষে বিশেষ দোষী হন নাই, বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যে এই রীতি প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায়। এই পদটিতে শ্রীরূপের গীতের যথার্থ অনুবাদ তো হইয়াছে, উপরন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ সুন্দর একটি পদের স্বাদ সঞ্চারিত হইয়াছে।

৬-সংখ্যক গীতে শ্রীরূপ 'ন কুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাং' ইত্যাদি লিখিয়াছেন। গীতটির অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ সূর্যপূজায় বহির্গতা শ্রীরাধার বস্ত্রাকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীরাধা তাহাতে

বলিতেছেন—হে চন্দ্রবদন, এই পথের মধ্যে অসহায়া আমাকে দেখিয়া উৎপীড়ন করিও না, সখীগণ আমার পিছন-পিছন আসিতেছে। হে চঞ্চল, আমার কাপড়ের অঞ্চলভাগ পরিত্যাগ কর ; আমি সূর্যদেবের আরাধনা করিব। গোকুলবীর ওগো বিধুমুখ, আমি বিনয় করিতেছি, তুমি পথ রোধ করিয়া আমার বিলম্ব ঘটাইও না। হে সনাতন, হে দেব, এই নির্জনে তোমার চঞ্চল চক্ষু দেখিয়া আমার বড় ভয় হইতেছে।

পদ্যানুবাদক লিখিয়াছেন—

করোনা অন্যায় তুমি এপথে এক্ষণ।
অনাশ্রয়া সখী আমি কর অবেক্ষণ ॥
ত্যাগ কর ওহে কৃষ্ণ পটাঞ্চলভাগ।
করিব সংপ্রতি আমি প্রভাকর যাগ ॥
বিলম্ব করো না ওহে গোকুলের পতি।
চন্দ্রানন করিতেছি বিবিধ মিনতি ॥
নির্জনেতে ভীতা হই চঞ্চল নয়ন।
হেরিয়া তোমারে আমি দেব সনাতন ॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪)

শ্রীরূপের 'ন কুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাং'-এর অনুবাদ প্রথম চরণে ঠিকমতো হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় চরণেই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। শ্রীরূপের দ্বিতীয় চরণটি 'মামবলোক্য সতীমশরণ্যাং' ইহা প্রথম চরণের সহিত অন্বিত, অর্থ—'আমাকে অসহায়া সতী দেখিয়া', অনুবাদক চরণটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দিয়াছেন। শ্রীরূপের গীতে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা অনুবাদে ফুটিয়া উঠে নাই। 'রহসি বিভেমি বিলোলদৃগন্তং'—এই নির্জন স্থানে তোমার বিলোল কটাক্ষ দেখিয়া আমি ভীত হইতেছি—এই উক্তির মধ্যে শুধু ভয় নহে, আকাঙ্ক্ষাও কিছু প্রকাশ পায় নাই কি? মুখে ভয় প্রকাশ করিলেও শ্রীরাধা তাঁহার বাক্যের দ্বারা মাধবকে আরও উৎসাহিত করিতেছেন না কি?

১৮-সংখ্যক গীতে শ্রীকৃষ্ণ যমুনা হইতে প্রত্যাবর্তনরতা শ্রীরাধার শাড়ির আঁচল ধরিয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন।[১] শ্রীরূপ লিখিয়াছেন —'শুদ্ধসতীব্রতবিত্তা অহমতিনির্মলচিত্তা' ইত্যাদি, অর্থাৎ—শ্রীরাধা বলিতেছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, আমি শুদ্ধ-সতীব্রতে বিখ্যাত হইয়াছি, কারণ আমার মনের মধ্যে কিছুমাত্র

১। এই পদটি ৩-সংখ্যক পদের মতন শ্রীরাধারই কপট বাম্যময় উক্তি, কিন্তু টীকাকার অনর্থক বলিতেছেন যে, 'রাধয়োপদিষ্টেন কৃষ্ণেন গৃহীত শাটিকাঞ্চলা শ্রীবিশাখা তমাহ।' এখানে বিশাখাকে টানিয়া আনিবার কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

মালিন্য নাই। তুমি এখন আমার প্রতি পরিহাস করিতেছ কেন? স্মার্ত পণ্ডিতেরা এইরূপ ব্যবহারের নিন্দা করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহা অকর্তব্য। ওগো মাধব, আমার আঁচল ছাড়িয়া দাও, আমি শীঘ্র বাড়ী যাইব। তুমি যমুনাতীরে লুকাইয়াছ ইহা যদি আগে জানিতাম, তাহা হইলে এত দূরে এখানে আসিতাম না। তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি, তুমি অন্যায় আচরণ পরিত্যাগ কর। যাহাতে ধার্মিক লোক তোমাকে পছন্দ করেন এমন কাজ কর।

গীতটির অনুবাদ—

ওহে হরি ত্যাগ কর আমার বসন।
শীঘ্র করি যাব আমি নিজ নিকেতন॥
সতীব্রতে ব্রতী আমি সুনির্মলমনা।
আমার সহিত হেন কর্ম করিও না॥
এই কী সুযুক্তি হয় শাস্ত্রের অন্তরে।
সুজনে এমন কর্ম কখনো না করে॥
যদি জানিতাম আমি গোপন শরীরে।
আসন করিয়া তুমি আছ এই তীরে॥
তাহা হইলে এতদূর পথ যমুনায়।
কেনবা আসিব আমি একল সন্ধ্যায়॥
তব চরণেতে আমি করি পরণাম।
শঠতা চরিত্র তুমি ত্যজ ওহে শ্যাম॥
সৎপথে পদার্পণ করি সনাতন।
ধার্মিক চরিত্র তুমি করহ পালন॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ২৫১)

এই পদেও গীতের ধ্রুবপদটি সুরুতে সংযোজিত হইয়াছে। শ্রীরূপ দ্বিতীয় চরণে যে লিখিয়াছেন 'প্রথয়সি সুজনবিমুক্তং নর্মেদং কমিযুক্তং', ইহার অর্থ—সুজনের পরিত্যক্ত অসমীচীন এমন পরিহাস করিতেছ কেন? অনুবাদক এই অংশটির অনুবাদ করিতে বোধ করি গলদঘর্ম হইয়াছেন, ইহার প্রমাণ রহিয়াছে অনুবাদের মধ্যে—

এই কী সুযুক্তি হয় শাস্ত্রের অন্তরে।
সুজনে এমন কর্ম কখনো না করে॥

ইহা অনুবাদ তো নহে, শিশুবোধ্য সুভাষিত বাক্য-রচনার হাস্যকর প্রয়াস মাত্র। ইহাতে বৈষ্ণবের মাধুর্যের আস্বাদন বিঘ্নিতই হইয়াছে বলা যায়। শেষাংশেও 'যেন তেন প্রকারেণ' অনুবাদ করা হইয়াছে, তাই মূলে যেখানে অর্থ 'যাহাতে ধার্মিক জন তোমার প্রতি সমুচিত অভিরুচি প্রকাশ করেন এমন আর্যপথ পালন কর', সেখানে অনুবাদক 'সনাতন' কথাটিকে পথের বিশেষণরূপে ব্যবহার না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্থাপন করিয়া লিখিলেন 'ধার্মিক চরিত্র তুমি করহ পালন'। ধার্মিকের অভিমত পথে চলা নহে, অনুবাদক বিশাখাকে দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধার্মিক হইতে বলাইলেন।

'গীতাবলী'র ৩৪-সংখ্যক গীতের 'কিময়ং রচয়তি নয়নতরঙ্গং' ইত্যাদি চরণাবলীতে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, শ্রীরাধা সম্মুখবর্তী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কপট বিরক্তি প্রকাশ করিয়া সখীকে বলিতেছেন—সখি! শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি বৃথা নেত্র-তরঙ্গ বিস্তার করিতেছেন, (ইহাতে কোন লাভ নাই; কেননা) দেখ, কুমুদিনী কখনই সূর্যকে ভজনা করে না। হে সখি, এই মদনাতুর মাধবকে নিবারণ কর, ইনি যেন আমার অঙ্গ স্পর্শ না করেন। শ্রীরাধা আরও বলিয়াছেন—আমার কম্পমান হস্ত হইতে লবঙ্গপুষ্প পতিত হইতেছে, তথাপি তুমি পরিহাস ত্যাগ করিতেছ না। আমি কোন প্রকারেই আমার হৃদয়সংলগ্ন অভঙ্গ সনাতন ধর্মকে ত্যাগ করিব না।

শ্রীরূপের এই গীতটির অনুবাদে অজ্ঞাতনামা অনুবাদক লিখিয়াছেন—

কেন ইনি করিছেন নয়ন-ইঙ্গিত।
কুমুদিনী নাহি মিলে সূর্যের সহিত॥
নিবারণ কর কৃষ্ণ উঠিছে অনঙ্গ।
নাহি স্পর্শ করে যেন সখি মম অঙ্গ॥
কম্পি হস্ত হতে মোর পড়িল গহনা।
তবু তুমি নিজ রঙ্গ ছাড় না অঙ্গনা॥
সনাতন ধর্ম সদা রহুক অভঙ্গ।
ছাড়িতে নারিব হৃদে করিয়াছি সঙ্গ॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ২৫২; কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৯২)

উপরি-ধৃত অনুবাদে শ্রীরূপের গীতের ধ্বনি-ঝঙ্কার নাই, মধুমর্ম অস্ফুটব্যঞ্জনাও (Sublimity) নষ্ট হইয়াছে। শ্রীরূপের গীতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রেমলিপ্ত হওয়ার অসম্ভাব্যতা একটিমাত্র গূঢ়ার্থব্যঞ্জক কথায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, বলিয়াছেন কুমুদিনী কখনই সূর্যের ভজনা করে না। 'ভজনা' কথাটি এক্ষেত্রে

সাহিত্যলিপ্সুর কাব্যরস জাগ্রত করিয়াছে, অনুবাদকের 'মিলে' কথাটির দ্বারা যত-কিছু সূক্ষ্মতা সব যেন চলিয়া গিয়াছে। অনুবাদক একটি ক্ষেত্রে পর্বতপ্রমাণ ভুল করিয়াছেন; শ্রীরূপের গীতে যেখানে শ্রীরাধার কম্পমান হস্ত হইতে লবঙ্গপুষ্প খসিয়া পড়ার কথা আছে, অনুবাদক সেখানে গহনা পড়িয়া যাওয়ার অবতারণা করিয়া স্থূলতাকেই প্রশ্রয় দিয়াছেন। শ্রীরূপের রাধা যখন বলেন 'কম্পিকরান্মম পততি লবঙ্গং', তখন কি শুধু ভাবেতেই তাঁহার তনুলতা কম্পিত হইল ও লবঙ্গপুষ্প ভূমিতে পড়িল? আনন্দের প্রভাব ইহাতে কতটা, তাহা মহাকবি প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন।

২৩-সংখ্যক গীতে উত্তরগোষ্ঠের প্রসঙ্গ আছে। গীত-রচয়িতা শ্রীরূপ লিখিয়াছেন —সখীরা শ্রীরাধাকে বলিতেছে, হে সুন্দরি, দেখ, বনমালী আগমন করিতেছেন। তিনি তরুণীগণের লোচন-তাপ-নাশন হাস্য-সুধাঙ্কুরধারী, মন্দপবনচঞ্চল শিখিপুচ্ছে উজ্জ্বল চূড়াবিশিষ্ট ও সুন্দর ক্রীড়াশীল। দিবাবসান হইলে তিনি নব নব বিলাস-বিভ্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার ফুল্ল-পঙ্কজ-মাল্য ধেনুখুরোদ্ধত ধূলি দ্বারা সমাবৃত হইয়াছে; তিনি অচির-বিকশিত নীলোৎপলপুঞ্জের ন্যায় কান্তি দ্বারা শোভা পাইতেছেন। তিনি মধুর মুরলীরব দ্বারা তোমার প্রীতি উৎপাদন করিয়া তোমার দিকে বারবার বঙ্কিম দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তিনি সুন্দর সনাতন-তনু ও চিত্তানুরঞ্জনকারী সুহৃদ্‌দিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন।

গীতটি ভাবান্তরে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—

দিবস করে গমন সুন্দরি হের এখন
বনমালী আসিছেন ফিরে।
নূতন নূতন কত অঙ্গভঙ্গী নানামত
কমল চরণ ফেলি ধীরে॥
মন্দ মন্দ গতি বায় ময়ূরপুচ্ছের তায়
চূড়া দোলে মস্তক উপরে।
নারীগণের নয়ন তাপ করে নিবারণ
হেন হাস্য আস্য-সুধাকরে॥
ধেনুখুর সংঘর্ষণে উঠিছে ধূলি গগনে
তাহে ব্যাপ্ত কমলের মালা।
শোভা নব-ইন্দীবর কান্তিময় কলেবর
মনোহর যেন রসশালা॥

মধুর মুরলী ধ্বনি করিছেন গুণমণি
তব রতি করিতে প্রবল।
শোভাময় সনাতন সঙ্গে সব সখাগণ
করিছেন রঙ্গ কৌতূহল॥

(কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ১০৯)

যিনি পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন, তিনি গীতের ধ্রুবপদটি প্রথমে দিয়া পদটি যে সুরু করিয়াছেন তাহাতে কিছু ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু ধ্রুবপদের অর্থটি তিনি ঠিক নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। গীতের অংশবিশেষের প্রকৃত অর্থ যেখানে 'দিবাবসান হইলে তিনি নব নব বিলাস-বিভ্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন', সেখানে অনুবাদক লিখিতেছেন 'নূতন নূতন নানামত কত অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে কমল চরণ ধীরে ধীরে ফেলিয়া বনমালী ফিরিয়া আসিতেছেন।' এতদ্ব্যতীত শ্রীরূপ গীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) মধুর মুরলীরব দ্বারা শ্রীরাধার প্রীতি উৎপাদন করিয়া শ্রীরাধার দিকে বারবার বঙ্কিম দৃষ্টিপাত করিতেছেন, অনুবাদক বঙ্কিম দৃষ্টিপাতের কথাটি বর্জন করিয়া গীতের অর্থগৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

'স্তবমালা'-ধৃত কেশবাষ্টকের মধ্যেও শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণভূমি হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তনের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ৭-সংখ্যক শ্লোকে কবি বলিতেছেন, যিনি বিলাসমুরলীর মধুরধ্বনিতে গৃহস্থিত মাতৃতুল্য ব্রজাঙ্গনাদের উল্লসিতচিত্ত ও পুলকিত-কলেবর করিতেছেন, যিনি মা যশোদার অন্তরে অতিশয় আনন্দ বর্ধন করিতে করিতে বন হইতে গৃহে আসিতেছেন, সেই কেশবকে তিনি (কবি) ভজনা করেন। ৮-সংখ্যক শ্লোকে শ্রীরূপ বলিয়াছেন, দর্শনের জন্য অট্টালিকায় আরূঢ়া স্মিতাননা ব্রজযুবতীদের কটাক্ষমালায় যিনি সুশোভিত হইতেছেন, যিনি পুষ্পস্তবকে ভ্রমরগতির ন্যায় ব্রজাঙ্গনাদের স্তনমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বন হইতে ঘরে আসিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে তিনি (কবি) ভজনা করেন।

কেশবাষ্টকের এই দুইটি শ্লোকের সহিত 'গীতাবলী'র ২৮-সংখ্যক গীতটিকে মিলাইয়া লইলে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীরূপ সখ্য ও বাৎসল্যরসবহুল গোষ্ঠলীলায় ক্ষেত্রে মধুর রসের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীরূপের এই মৌলিকতার প্রভাব পরবর্তী কালের পদাবলীসাহিত্যে অতি অল্পই দেখা যায়। জ্ঞানদাস গোষ্ঠলীলার মধ্যে সরল বালক সখাদের মুখে—'হিয়ায় কণ্টক দাগ, বয়ানে নন্দন রাগ' (তরু ১৩১৬) ইত্যাদি পদে শ্রীকৃষ্ণের দেহে সম্ভোগের চিহ্ন সুকৌশলে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকে কিছু বাড়াবাড়ি বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

পদকার শেখর লিখিয়াছেন—

অরুণিত আনন লোরে ভরু লোচন
পিয়া পথ হেরত রাই।
শিশু পশু সঙ্গতি করি হরি আওত
গোখুর-ধূলি উছলাই ॥

(কীর্তনগীতরত্নাবলী, ৭।৫৯২)

উপরি-ধৃত পদাংশে শ্রীরূপের অনুসরণক্রমে শ্রীরাধার গোচারণভূমি হইতে গৃহ-প্রত্যাগমনশীল শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার বিষয়ই উপস্থাপিত হয় নাই, ২৩-সংখ্যক গীতের 'তরুণী-লোচন তাপ-বিমোচন' ইত্যাদি কথার যেন অনুরণন তোলা হইয়াছে 'অরুণিত আনন লোরে ভরু লোচন'-এর দ্বারা।

শেখর অন্য একটি পদে লিখিয়াছেন—

দূরেতে আওত নাগর রায়।
যুবতী উমতি উনত চায় ॥
বিরস বদন সরস ভেল।
হিয়ার আগুনি তখনি গেল ॥
হসিত বেত বচন মিঠ।
সজল ছুটল তরল দিঠ ॥
মুরলী খুরলী শুনিতে পাই।
অতুল আনন্দে আকুল রাই ॥
দেখিবারে সব সঙ্গিনী আই।
উঠল অট্টালি মিললি রাই ॥
রতন আসনে বসিলা সবে।
শেখর সবারে সেবয়ে তবে ॥ (তরু ২৬৮৩)

পদে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধার 'হিয়ার আগুনি তখনি গেল', আরও মুরলীর শব্দ শুনিতে পাইয়া শ্রীরাধা অতুল আনন্দে আকুল হইলেন, সর্বশেষে সখীগণ-সহ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্যই রত্নাসনে উপবেশন করিলেন। পদের প্রথম দুইটি বিষয়ে 'গীতাবলী'র ২৩-সংখ্যক গীতের প্রভাব রহিয়াছে। যখন 'তরুণী-লোচনে'র 'তাপ-বিমোচন হাস-সুধাঙ্কুরধারী' বনমালী, তখন তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধার বিরস বদন অবশ্যই সরস হইতে পারে। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীরব

শ্রীরাধার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে, বোধ করি ইহা অনুসরণ করিয়াই পদকর্তা শেখর লিখিয়াছেন, 'মুরলী থুরলী শুনিতে পাই, অতুল আনন্দে আকুল রাই।' পদের তৃতীয় বিষয়টি শ্রীরূপ-রচিত কেশবাষ্টকের ৮-সংখ্যক শ্লোকের অনুসারী, উভয়ত্রই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য শ্রীরাধা সখীগণ-সহ অট্টালিকার উপর উঠিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের পদে রহিয়াছে—

বন সঞে গিরিবর ধর আওয়ে।
জলদ হেরি জনু হরষিত চাতকী
ব্রজরমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে॥
(কীর্তনগীতরত্নাবলী, পদ ৯।৫৯৪)

এই অংশটি কেশবাষ্টকের ৭-সংখ্যক শ্লোকের প্রভাবে রচিত মনে হয়। অভিসার বিষয়ে 'গীতাবলী'র তিনটি গীত অনূদিত হইয়াছে। ১৯-সংখ্যক গীতে 'কিং বিতনোষি মুধাঙ্গবিভূষণকপটেনাত্র বিঘাতং' ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, অভিসারার্থিনী শ্রীরাধা বেশধারিণী সখীকে বলিতেছেন—সখি, অঙ্গবিভূষণচ্ছলে তুমি আমার অভিসারের সময় বৃথা নষ্ট করিতেছ কেন? আমি কিছুমাত্র কালক্ষেপ এখন সহ্য করিতে পারিতেছি না। ঐ শোন, কন্দর্পরাজের আজ্ঞাকারী গোকুলমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি বনগমনের জন্য উদ্গর্জিত হইতেছে। আবার ঐ দেখ, গগনমণ্ডলে উদিত চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের চরণাঙ্গুষ্ঠ-নখের কান্তি বহন করিতেছে; এখন আর গুরুজনের ভয় দেখানোও বৃথা, কেননা জোরে দৌড়াইয়া যাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। কেবল একাকিনী আমি নহি, ঐ দেখ গোপবধূগণ বনবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যমুনা-তীরে গমন করিতেছে।

শ্রীরূপের এই গীতের অনুবাদ হইয়াছে—

গোকুলমঙ্গলকারী সরস সুরূপধারী
যুবতীরে আকর্ষয়ে জোরে।
এমন মুরলী ধ্বনি উঠিছে যেন আপনি
বনে এস বলি ডাকে মোরে॥
ওহে সখি আভরণ করিয়া অঙ্গে অর্পণ
ব্যাঘাত কর না তুমি আর।
কপট করিয়া হেন বিলম্ব করিছ কেন
নব কাল না সহে আমার॥

গুরুজন ভয় বৃথা কয়ো না মোরে সে কথা
যাব শীঘ্র কৃষ্ণ সেবিবারে।
মাধব পদ নখর সেই মত নিশাকর
হইতেছে উদয় অম্বরে॥
এই দেখ সনাতন বনবেশ সুচিকণ
চন্দনেতে সুন্দর শরীর।
যত গোপী ব্রজাঙ্গনা করিছে উপসর্পণা
তাহে শোভে যমুনার তীর॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ৭৪৮; কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ২৪০)

পদটির মধ্যে গীতের ধ্রুবপদ প্রথমেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীরূপের গীতে যেখানে শ্রীরাধা বলিতেছেন—তিনি কিছুমাত্র সময়াতিপাত সহ্য করিতে পারিতেছেন না, সেখানে অনুবাদে লেখা হইয়াছে 'নবকালই' শ্রীরাধার সহ্য হইতেছে না। বলাই বাহুল্য, সময়াতিপাত ও নবকাল দুইটি এক বস্তু নহে। গীতের 'স্মরভূপতিশাসনসঙ্গী' কথাটিরও যথার্থ অনুবাদ হয় নাই, অনুবাদক মন-গড়া একটি কথা লিখিয়াছেন 'সরস সুরূপধারী।' অবশ্য পদটির শেষাংশে পদকার অনুবাদ-নিরপেক্ষভাবে যে লিখিয়াছেন সনাতনের (শ্রীকৃষ্ণের) 'চন্দনেতে সুন্দর শরীর', তাহাতে বৈষ্ণব ভাবপরিমণ্ডল সুরচিতই হইয়াছে বলিতে হয়।

১০-সংখ্যক গীতে অভিসারপরা শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরূপ যে 'হন্ত ন কিমু মন্থরয়সি সন্ততমভিজল্পং' ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ—দূতী শ্রীরাধাকে বলিতেছে, হে রাধে, হায়, তুমি অবিশ্রান্ত আলাপ একটু বন্ধ কর না কেন? তোমার দশন-দ্যুতি প্রভূত অন্ধকার অপসারিত করিতেছে। তুমি পথে অভিসার সম্বন্ধীয় প্রবল আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া সুকোমল পদ-পঙ্কজ ধীরভাবে সঞ্চালনপূর্বক অগ্রসর হও। তোমার মেঘবর্ণ অতুল কুন্তলরাজির প্রান্তভাগ (নখোপরি) বিস্তারিত কর। তাহাতে অন্ধকার জীবিত থাকুক। সনাতনানুরক্ত-চিত্তা তুমি আজ নিঃশঙ্কভাবে অভিসার করিয়া মনোহর কুঞ্জগৃহের ক্রোড়কে অলঙ্কৃত কর।

শ্রীরূপের গীতটির নিম্নোক্তরূপ অনুবাদ হইয়াছে—

সম্ভ্রম তেজিয়ে রাধা কর অভিসার।
চালাও চরণ পথে ধীরে পুনর্বার॥

নিরন্তর বাক্য তবে মুখেতে বিকাশ।
তাহে দন্ত দীপ্তি করে ঘন অন্ধ নাশ॥
কেশজালে খুলে দেও হইয়া সরস।
নখকান্তি ঢাকি তাহে বাঁচুক তামস॥
গতশঙ্কা হয়ে চল কুঞ্জের ক্রোড়েতে।
তবে আজি পার সেই সনাতনে পেতে॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ৭৪৪ ; কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ২৩৯)

এই অনুবাদটি অনেকাংশেই শ্রীরূপের গীতের যথার্থ অনুসরণক্রমে রচিত। কেবল একটি বিষয়ে অনুবাদকের অসামর্থ্য লক্ষ্য করা যায়; শ্রীরূপের গীতে সখী যেখানে শ্রীরাধাকে বলিতেছে—তুমি অবিশ্রান্ত আলাপ একটু বন্ধ কর না কেন, সেখানে অনুবাদক নিষেধার্থক কিছু লিখিতে পারেন নাই, কেবলমাত্র বিবৃতি দিয়াছেন—'নিরন্তর বাক্য তবে মুখেতে বিকাশ' ইত্যাদি।

গীতের মধ্যে শ্রীরূপ যে লিখিয়াছেন, দূতী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—নিরন্তর বাক্য-হেতু তোমার দন্তদীপ্তি ঘন অন্ধকার নাশ করিতেছে, ইহারই প্রভাবে গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

কি করব মৃগমদ লেপন তোর।
কি ফল পহিরবি নীল নিচোল॥
শরদ চান্দমুখি এ তুয়া হাস।
তিমিরক তিমির তেজি পরকাশ॥ (কীর্তনানন্দ, ৪।৩১৫)

এখানে গোবিন্দদাস বলিতেছেন, শরৎচন্দ্রাননা শ্রীরাধার হাস্যে তিমির বিঘটিত হইতেছে; শ্রীরূপ বলিয়াছেন হাস্য নহে, শ্রীরাধার নিরন্তর কথাতেই দন্তদীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে, ফলে তিমির হইতেছে অপসারিত। দুই ক্ষেত্রেই শ্রীরাধার দন্তদীপ্তিতে তিমিরাভিসারে বিঘ্ন ঘটার কথা দূতী কর্তৃক নিবেদিত হইয়াছে।

১০-সংখ্যক গীতে তিমিরাভিসার সম্বন্ধে শ্রীরাধাকে সখী যেমন পরামর্শ দিয়াছে, ২৫-সংখ্যক গীতে তেমনি উপদেশ দান করিয়াছে জ্যোৎস্নাভিসার সম্পর্কে। 'স্তুং কুচবল্লিত মৌক্তিকমালা' ইত্যাদি কথায় শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছে—হে রাধে, গতিবশতঃ তোমার মুক্তামালা স্তনমণ্ডলের উপর দুলিতেছে, তোমার ঈষৎ হাস্য চন্দ্রকিরণকে ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে। হে শুভ্রবেশধারিণি, সুন্দরি, হরির নিকট তুমি অভিসার কর। এই পূর্ণিমা রজনী গুরুরূপে তোমাকে উপদেশ দিতেছে।

পরিধানে মহিষদধিবর্ণ শুক্ল বসন, দেহে অনুলিপ্ত শ্বেতচন্দন, এবং শুক্ল কুমুদের কর্ণভূষণ তোমাকে সনাতন সঙ্গ বিলাসে যোগ্য করিয়াছে।

শ্রীরূপের এই গীতের অনুবাদ—

হরি অভিসার আশে সুবেশা সুন্দরী।
জ্যোৎস্নাময় সুনির্মল অপূর্ব শর্বরী॥
কুচে যুক্ত হইয়াছে গজমুক্তাহার।
হাস্যদ্বারা ঘন অংশু মুখ চন্দ্রিমার॥
করেছেন দেহে ঘন চন্দন লেপন।
কর্ণেতে কুমুদপুষ্প হয়েছে ভূষণ॥
মহিষের দধিদীপ্তি জিনিয়া উজ্জ্বল।
পরিলা অপূর্ব বস্ত্র অতি সুকোমল॥
ভূষায় ভূষিত হয়ে মদনোন্মাদিনী।
চলিলেন সনাতন সঙ্গ বিলাসিনী॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ৭৪২; কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ২৬৯)

অনুবাদটি মোটেই শ্রুতিসুখকর হয় নাই, যাহা হউক মিত্রাক্ষর-বহুল একরকম কবিতা হইয়াছে মাত্র। প্রথমতঃ, প্রথম দুইটি চরণে অনুবাদক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিয়াছেন; ইহাতে অভিসারের পাত্রী ও পটভূমি স্পষ্ট বর্ণিত হইলেও 'সুবেশা সুন্দরী' কথায় শ্রীরাধার ব্যঞ্জনা ঠিক ফুটে নাই, যেন মঙ্গলকাব্যিক ধুয়া আসিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরূপ যেখানে শ্রীরাধার ঈষৎ হাস্যের অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে সোজাসুজি হাস্য লেখায় অনুবাদক গীতের মাধুর্য অনেকখানি মন্দীভূত করিয়া দিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, শ্রীরূপের গীতে সখী শ্রীরাধাকে বলিয়াছে যে, পূর্ণিমা রজনীই তাঁহার (শ্রীরাধার) গুরু, এই গুরু উপদেশ দিতেছে যে, সুন্দরী শ্রীরাধা যেন শ্রীহরি অভিসারে যান। অনুবাদে ইহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। চতুর্থতঃ, শ্রীরূপ পর্যায়ক্রমে অভিসারিণী শ্রীরাধার শুক্লবসন, শ্বেতচন্দন ও কুমুদ কর্ণাবতংসের উল্লেখ করিয়াছেন, অনুবাদক এই বিষয়ে ক্রমভঙ্গ করায় পদের মধ্যে রস-পরিণতি ঘটাইতে পারেন নাই।

শ্রীরূপের গীতটিকে মানস-পটে রাখিয়াই গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

কুন্দ কুসুম ভরি কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিমহার॥

চন্দনে চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরি পূর॥
চাঁদনী রজনী উজোরলি গোরী।
হরি অভিসার রভস রসে ভোরি॥
ধবলী বিভূষণ অম্বর বলই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গপুতলী কিএ রস মাহাশূর॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল কনটক কিক রএ পার॥
সুরত শিঙ্গারকি রিতি সম ভাষ।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

(পদামৃতসমুদ্র, পৃঃ ১৩৭—১ম সংস্করণ)

পদটির মধ্যে আমরা দেখিতেছি, শ্রীরূপের মতই গোবিন্দদাস কুন্দ কুসুমের কথা আনিয়াছেন, তবে কুন্দকে তিনি স্থাপন করিয়াছেন শ্রীরাধার কবরীতে, তাহার দ্বারা শ্রীরূপের ন্যায় রাধার কর্ণভূষণ তৈয়ারি করান নাই। শ্রীরূপের আদর্শেই গোবিন্দদাস শ্রীরাধার কর্ণে মৌক্তিকমালা বা 'মোতিমহার' দুলিতে দেখিয়াছেন। চন্দন-চর্চার প্রসঙ্গও শ্রীরূপানুগ। শ্রীরূপ গীতে লিখিয়াছেন, অভিসারিণী শ্রীরাধার ঈষৎ হাস্য চন্দ্রকিরণকে ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে, ইহাই গোবিন্দদাস একটু অন্যভাবে বলিয়াছেন —'চাঁদনী রজনী উজোরলি গোরী'। এতদ্ব্যতীত, শ্রীরাধার শ্বেতবস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-যুক্তার বিষয়ে শ্রীরূপ ও গোবিন্দদাস দুইজনের রচনাতেই কিছু মিল রহিয়াছে।

গোবিন্দদাসের অন্য একটি পদ—

রাকা নিশাকর কিরণ নিহারি।
যতনে পরয়ে ধনি ধবলিত সারি॥
চন্দ চন্দন লেপিত সব অঙ্গ।
সিত কুসুমাবলী হাস নব রঙ্গ॥
অব নবরঙ্গিণী করত অভিসার।
কুচযুগে সোহই মুকুতার হার॥

(গোবিন্দদাসের পদাবলী—ডঃ মজুমদার সম্পাদিত, পদ ৩৭৯)

এখানেও শ্রীরূপের গীতানুসরণে জ্যোৎস্নাভিসারিণী শ্রীরাধাকে আমরা 'ধবলিম সারি' অর্থাৎ শ্বেতবস্ত্র ও কুসুমাভরণ পরিতে এবং সর্বাঙ্গে 'চন্দ চন্দন' অর্থাৎ চন্দ্রবৎ শ্বেত চন্দন অনুলেপন করিতে লক্ষ্য করি। সর্বোপরি গোবিন্দদাসের এই পদে যখন 'কুচযুগে সোহই মুকুতার হার' আসিয়া পড়ে, তখন মনে হয় শ্রীরূপের বর্ণনা—'ত্বং কুচবলিত-মৌক্তিকমালা'।

শ্রীরূপের শরৎকালীয় রাসের দুইটি গীত অনূদিত হইয়াছে। ১৭-সংখ্যক গীতে 'কোমলশশিকররম্যবনান্তর নির্মিত গীত বিলাস' ইত্যাদি চরণ-সরণীতে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, যমুনা-তট-রঙ্গভূমির নটরাজ হে সুন্দর নন্দকুমার, তোমার জয় হউক। তুমি শরৎকালে অপ্রাকৃত-রস-পূর্ণ মঙ্গলজনক রাস-বিহার প্রকাশ করিয়াছ। তুমি কোমল চন্দ্রকিরণ দ্বারা সুরম্য বনস্থলীতে গীতবিলাসের অনুষ্ঠান করিয়াছ এবং সত্বর সমাগত গোপযুবতীদের ভার পরীক্ষার জন্য পরিহাস করিয়াছ। গোপীচুম্বিত রাগালাপকারী তুমি প্রিয়াদের মান দর্শনে অন্তর্হিত হইয়া গুণ-বরেণ্যা শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার প্রেমের অধীন হইয়াছ। (তৎপরে) গোপীগণের বচনামৃতপানে মুগ্ধ হইয়া (তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া) তাঁহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছ। তুমি সুররমণীদের চিত্তবিক্ষোভনকারী ক্রীড়ায় (ব্যাপৃত হইয়া) চঞ্চলহার হইয়াছ। তোমার জলকেলির দ্বারা আনন্দিত গোপাঙ্গনারূপ পরিজনে যমুনার তীরভূমি সুশোভিত হইয়াছে। হে নির্মল-নীল কলেবর শ্রীকৃষ্ণ, তুমি চিদানন্দমূর্তি ও পূর্ণসনাতন।

এই গীতের অনুবাদ করা হইয়াছে—

জয় জয় রম্যস্থান যমুনার তীর।
জয় জয় রসময় সুন্দর শরীর॥
মহানট গুরু তুমি শ্রীনন্দকুমার।
রসামৃত রাস তব অপূর্ব বিহার॥
শরদের নিশি শশী উজ্জ্বল প্রকাশ।
রমণীয় বন তাহে সঙ্গীত বিলাস॥
সভে মেলি তথা আসি হরিষ অন্তরে।
গোপীগণ সঙ্গীতেতে পরিহাস করে॥
কখন তাহারা ঘেরি করয়ে চুম্বন।
তাহে শোভাময় হয় বদন নয়ন॥

সর্বগুণময়ী রাধা সম্পত্তির সার।
অধীনা হইয়া সঙ্গে রহেন তোমার ॥
তাঁর বাক্য সুধাপান মত্ত সখীগণ।
বলয় আকার ঘেরে করেন বেষ্টন ॥
দেখিয়া অপূর্ব খেলা অতি মনোহর।
সুরনারীগণ সব ক্ষোভিত অন্তর ॥
আনন্দ জলেতে উদ্‌বুদ্ধ যত নিজ পরিজন।
যমুনার নীরে সব করেন গাহন ॥
সুনির্মিত নীল আভা দেহ সুশোভন।
চিদানন্দময় ঘন পূর্ণ সনাতন ॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ৮১৬)

অনুবাদটির মধ্যে কিছু আড়ষ্টভাব নাই বলিয়া ইহা একটি পদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা পাইয়াছে। দুইটি বিষয়ে আমরা মূলের সহিত ইহার অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ, গীতে শ্রীকৃষ্ণপক্ষে গোপযুবতীদের পরিহাস করার প্রসঙ্গ আছে, পদে কিন্তু অনুবাদক 'গোপীগণ সঙ্গীতেতে পরিহাস করে' লিখিয়াছেন। অনুবাদক ভালো করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত পড়েন নাই কি? শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদিগকে পাতিব্রত্যধর্ম উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই পরিহাস। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুসরণক্রমেই গীতে লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মান বা আত্মশ্লাঘার ভাব দেখিয়া অন্তর্হিত হইয়া শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীরাধার গৌরব বৃদ্ধি পাইল। পদে কিন্তু তাহার উল্লেখ নাই।

১৩-সংখ্যক গীতে রহিয়াছে, 'মণ্ডিত-হল্লীশকমণ্ডলাং' ইত্যাদি। ইহার অর্থ—সখীরা শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন—হে প্রিয়সখি, দেখ, রাসমণ্ডলস্থিতা চঞ্চলকুণ্ডলা শ্রীরাধাকে নৃত্য করাইতে করাইতে নিখিলকলাসম্পদে পরিচিত মুরজয়ী (শ্রীকৃষ্ণ) নৃত্য করিতেছেন। (শ্রীকৃষ্ণের) করকিশলয় সুচ্ছন্দে সঞ্চালিত হওয়ায় রত্ন-বলয় বারংবার আন্দোলিত হইতেছে। জিতেন্দ্রিয় তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নৃত্যকালীন অঙ্গভঙ্গদর্শনে শশাঙ্ক কামাকুল এবং সনাতন ও শঙ্কর স্তব্ধীভূত।

শ্রীরূপের এই গীতটির অনুবাদ হইয়াছে নিম্নোক্তরূপ—

সুশোভিত হইয়া শ্রীরাসমণ্ডল।
নাচাইছেন রাধিকায় দুলিছে কুণ্ডল ॥

নিখিল কলার যেই সম্পদভবন।
দেখ সখি নাচে সেই মদনমোহন॥
মুহুর্মুহু তুলিতেছে বালা রত্নময়।
সঙ্গেতে চালন করে কর কিশলয়॥
গতি ভঙ্গিমাতে অবশেন্দু কৃষ্ণচন্দ্র।
হেরে স্থির সনাতন যার ভালে চন্দ্র॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ৮৪৭)

অনুবাদ অনেকখানি আক্ষরিক হইয়াছে। এই অনুবাদ নিঃসন্দেহে লোকসমাজে শ্রীরূপের গীতের পঠন-কীর্তনাদি সূচিত করিতেছে ।

শ্রীরূপ গীতে যে নর্তক রাসের কথা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বকীয় পরিকল্পনা নহে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে গোপযুবতীদের শ্রীকৃষ্ণসহ নৃত্য করার কথা আছে। তবে ঐ গোপযুবতীদের মধ্যে শ্রীরাধাকে স্থাপন করিয়াই শ্রীরূপ ক্ষান্ত হন নাই, শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধাকে হাতে ধরিয়া নাচাইতেছেন সে-কথাও বলিয়াছেন। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ সকলেই শরৎকালীন মহারাস বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীরূপকে অল্প-বিস্তর অনুসরণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারি।
জলদ পুঞ্জে জনু তড়িত-লতাবলি
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি॥
নটন হিলোল দোল মণি কুণ্ডল
শ্রম জল ঢল ঢল বদনই চন্দ॥ (তরু ১২৩৬)

উদ্ধৃতাংশটিতে শ্রীরূপানুসরণে শ্যাম-সহ ব্রজনারী শ্রীরাধার নৃত্য করা এবং কুণ্ডল আন্দোলিত হইবার কথা আসিয়াছে। নৃত্যপ্রসঙ্গে আরও বহুবিধ বিষয় আসিতে পারিত ; কিন্তু উপরি-উল্লিখিত বিষয় দুইটিই যখন আসিয়াছে, তখন ইহার পিছনে শ্রীরূপের প্রভাবই লক্ষণীয়।

শ্রীরূপের গীতাবলী হইতে বসন্তবর্ণনা ও হোরিলীলা বিষয়ক দুইটি গীত অনূদিত হইয়াছে। ৩২-সংখ্যক গীতে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন— হে রাধিকে, ঋতুরাজ বসন্ত কর্তৃক অর্পিত এই বৃন্দাবনের মাধুর্য অবলোকন কর। মলয়পবনরূপ গুরুর কাছে নৃত্য শিক্ষা করিয়া লতাগুলি উজ্জ্বল হাস্য বিস্তারপূর্বক

নৃত্য করিতেছে। কোকিলকুলের উচ্চধ্বনি যেন মৃদঙ্গবাদ্য, অঙ্কুরিতাঙ্গ তরুকুলও (যেন) দেখিতেছে। অদ্ভুতচরিত্র অলিকুল সনাতনলীলা আমার বংশীর মতো গান করিতেছে।

গীতটি ভাবান্তরিত হইয়াছে—

বসন্তে উঠিছে সদা আনন্দ তরঙ্গ।
দেখ রাধে বৃন্দাবনে কিবা আজ রঙ্গ॥
গুরুকরে সমীরণে শিখে বিলুণ্ঠন।
হাস্যসহ নাচিতেছে যত লতাগণ॥
কোকিলেতে বাজাইছে বাজনা মৃদঙ্গ।
দেখিতেছে তরুগণ হয়ে পুলকাঙ্গ॥
গাইতেছে ভ্রমরেতে হয় ঘাটশীলা।
বিনা মুরলীর তানে সনাতনলীলা॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ১৩৬৩)

শেষ চরণটি ভিন্ন পদটির সর্বত্রই আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণব পদের সাবলীলতা কণামাত্রও আসে নাই। শেষ চরণটিতে অনুবাদক কোনক্রমে খোঁড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন; ইহা অনুবাদ নহে, স্বয়ংসম্পূর্ণ পদের স্বাভাবিক কোন চরণও নহে।

পদাবলীসাহিত্যে শ্রীরূপের এই গীতের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য; কারণ শ্রীরূপের পূর্বেই কবি বিদ্যাপতি 'আয়ল ঋতুপতি রাজবসন্ত' প্রভৃতি পদ লিখিয়াছেন। পরবর্তী কালে বসন্তবর্ণনামূলক যে সমস্ত পদ অনন্তদাস, গোবিন্দদাস, যদুনন্দন প্রভৃতি মহাজন লিখিয়াছেন, সেইগুলিতে বিদ্যাপতির, না শ্রীরূপের কাহার প্রভাব পড়িয়াছে বলা কঠিন।

৪০-সংখ্যক গীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের হোরিলীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরূপ 'বিহরতি সহ রাধিকয়া রঙ্গী' প্রভৃতির মধ্যে লিখিয়াছেন যে, মধুঋতুসমাগমে বৃন্দাবন-পুলিনে হর্ষোৎফুল্ল শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতেছেন। শ্রীরাধা অঘরিপুর (শ্রীকৃষ্ণের) উপরে যন্ত্র (পিচকারি) দ্বারা কুঙ্কুমবারি বর্ষণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও মৃগমদবারির দ্বারা প্রেয়সীকে সেবন করিতেছেন। তরুণযুগল নব ও অতিশয় অরুণ সুগন্ধচূর্ণ নিক্ষেপ করিতেছেন এবং অতনুবিলাস প্রকাশ করিয়া 'জিতিয়াছি' 'জিতিয়াছি' বলিয়া বারংবার ঘোষণা করিতেছেন। 'বনমালী জয়ী'—এই বলিয়া সুবল ঘন ঘন করতালি

দিতেছেন। ললিতা বলিতেছেন—দেখ, আমার সখী সনাতনবল্লভকে (শ্রীকৃষ্ণকে) জয় করিল।

শ্রীরূপের গীতের অনুসরণে অনুবাদক লিখিয়াছেন—

বিহার করেন সঙ্গে রাধিকারে লয়ে।
বসন্তে মধুর বৃন্দাবনে হর্ষ হয়ে॥
পিচকারি মারে রাধা কুঙ্কুমপঙ্কেতে।
কৃষ্ণ দেন মৃগমদ রাধার অঙ্গেতে॥
পরস্পর রাধাকুণ্ডে হইয়া যুগল।
ক্ষেপণ করেন সুখে সুগন্ধি সকল॥
তাহাতে বিলাস হয় অতি সুশোভন।
জিতেছি জিতেছি সদা করেন জল্পন॥
সুবল করেন শব্দ দিয়ে করতালি।
জিতেছেন জিতেছেন পুন বনমালী॥
বলিছেন ললিতা বল্লভ সনাতন।
হারিলেন এইবার হের সখীগণ॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ১৩৬১)

অনুবাদে গীতোক্ত বর্ণনা যথাযথ উপস্থাপিত হইয়াছে। কেবল শ্রীরূপ যে লিখিয়াছেন, ললিতা বলিতেছেন—আমার সখী সনাতনবল্লভকে জয় করিল, সেই কথাটি পদের শেষ চরণে ঠিক লেখা হয় নাই, সখীগণকে সম্বোধন করিয়াই ললিতা সনাতনবল্লভের হারার কথা পদের মধ্যে বলিয়াছেন।

শ্রীরূপের হোরি-বিষয়ক এই গীতের প্রভাব পদাবলীসাহিত্যে অমিত পরিমাণেই পড়িয়াছে।

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

খেলত ফাগু বৃন্দাবন চান্দ।
ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছান্দ॥
সুন্দরীগণ করি মণ্ডলী মাঝ।
রঙ্গিণী প্রেম তরঙ্গিণী মাঝ॥
আগে ফাগু দেয়ল সুন্দরী নয়নে।
অবসরে মাধব চুম্বয়ে বয়নে॥

চকিত চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে।
ধাই ধরল গিরিধারীক বসনে ॥
তরল নয়ানী তুরিতে এক যাই।
কর সঞে কাড়ি মুরলী লেই ধাই ॥
ঘন করতালি ভালিরে ভালি বোল।
হো হো হোরি তুমুল উতরোল ॥

(গোবিন্দদাসের পদাবলী : ডঃ মজুমদার সঙ্কলিত, পদসংখ্যা ৫৪৫)

গোবিন্দদাসের এই পদে শ্রীরূপের আদর্শে ঋতুপতির সমাগম তো ঘটিয়াছেই, আরও সুন্দরী নয়নে ফাগু দিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ জিতিয়াছেন, পরে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী কাড়িয়া লইয়া জয়লাভ করিয়াছেন শ্রীরাধা। শ্রীরূপের গীতের মতো গোবিন্দদাসের এই পদেও ঘন করতালি দেওয়ার কথা রহিয়াছে।

উদ্ধবদাসের পদে অনেক স্থলেই শ্রীরূপের গীতের যেন পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। পদকার উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন—

খেলত রাধা শ্যাম রঙ্গ ভরি
বৃন্দা বিপিন সমাজ।
চুয়া চন্দন বন্দন কুঙ্কুম
রঙ্গ মুটকি ভরি সাজ ॥
বৈঠল শ্যাম সঙ্গে মধুমঙ্গল
সুবল সখাদিক সাথে।
রাধা ললিতা বিশাখা আদি সহচরি
পিচকারি করি নিজ হাতে ॥
কানুক পিচকারি যবহি বরিখত
একহি শত শত ধারে।
সহচরি মেলি রাই যব ডারত
কত কত শত এক বারে ॥
বহুবিধ রঙ্গ অঙ্গ সব ভীগত
আঁচরে মোছত মুখ।
জিতলুঁ জিতলুঁ ভাষি হাসি দেই করতালি
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ত সুখ ॥

(তরু ৩।২০।১৪৪৪)

উপরি-ধৃত পদে শ্রীরূপের অনুসরণে উদ্ধবদাস বৃন্দা-বিপিনের উল্লেখই কেবলমাত্র করেন নাই, সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের হোরিলীলা প্রসঙ্গে সুবল, ললিতাদির উপস্থিতি বর্ণনা এবং জয় ঘোষণা ও করতালি দেওয়ার কথাও বলিয়াছেন। পদটি পড়িতে পড়িতে অনেকক্ষেত্রেই শ্রীরূপের গীতের অনুবাদ পড়িতেছি বলিয়া ভ্রম হয় ; সুতরাং পদটিতে শ্রীরূপের প্রভাব যে কতখানি পড়িয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীরূপের গীতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পদকর্তা মোহনও হোরিলীলা প্রসঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কথা পাড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়।
চৌদিকে ব্রজবধূ পথ নাহি পায়॥
আবীরে অরুণ আঁখি মেলিতে না পারে।
হারিনু হারিনু শ্যাম বোলে বারে বারে॥
করসঞে মুরলী ভূমেতে পড়ি খসি।
করতালি দেই সব সখীগণ হাসি॥

(তরু ১৪৪৬)

শ্রীরূপের অনুসরণে কেবল শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়ের কথাই নহে, সখীদের করতালি দেওয়ার দৃষ্টান্তও পদে বর্ণিত হইয়াছে।

৪২-সংখ্যক গীতে 'রাধে নিজকুণ্ডপয়সি তুঙ্গীকুরু রঙ্গং' ইত্যাদির মধ্যে জলকেলির জন্য সখী শ্রীরাধাকে অনুরোধ করিয়াছে। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, সখী বলিতেছে—হে রাধে, তোমার নিজকুণ্ডের জলে ক্রীড়া বর্ধিত কর। পিঞ্ছমুকুটধারী (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, আরও জল নিক্ষেপ কর। দেখ ইহার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রস্ফুট কুসুমে রচিত উন্নত চূড়া নিবিড় নীল কুন্তলাবলীর মধ্যে ভয়ে লুকাইয়াছে। ইহার তিলকাদি গৈরিক রচিত চিত্রসকল জলে লীন হইয়া গিয়াছে। গলার মালতীমালা স্খলিত হইতেছে, ইহা ম্লান হইয়াছে বলিয়া ভৃঙ্গ ইহাকে ত্যাগ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অত্যুজ্জ্বল মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভও তোমার গণ্ডদেশের শরণাপন্ন হইয়াছে।

গীতটির অনুবাদ—

রাধে কুণ্ড কর রঙ্গ বিবর্ধন।
হেরে যাবে তবে সেই মদনমোহন॥
প্রস্ফুটিত পুষ্পে রচা চূড়া মনোহর।
দেখ তবে গূঢ় হেন কুন্তল ভিতর॥

গিরি আদি রঙে লেখা তিলক যতেক।
জলধৌত হইয়াছে নাহি তার রেখ॥
শিথিল হঁয়েছে মালা তাহে ভৃঙ্গহীন।
মুখচন্দ্র হইয়াছে কিঞ্চিৎ মলিন॥
সনাতন রত্নমণি কিরণ প্রচণ্ড।
প্রতিবিম্বভারে তব ভজিয়াছে ভণ্ড॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ৯৭৯)

পদটির অনুধ্যান করিতে গেলে প্রথমেই অসুবিধা ঘটে দ্বিতীয় চরণটি লইয়া। শ্রীরূপ গীতে শ্রীকৃষ্ণের পরাজয় ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়াছেন, কিন্তু অনুবাদক বলিতেছেন—'হে বাবে তবে সেই মদনমোহন।' ৮ম চরণটি অনুবাদক স্বাধীনভাবেই রচনা করিয়াছেন আরও ১০ম চরণের শেষে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে 'ভণ্ড' কথাটির প্রয়োগও অনুবাদকের স্বকীয় এইরূপ কয়েকটি বিষয়ে কিছু বৈসাদৃশ্য থাকিলেও, অনুবাদ যথাযথই হইয়াছে ; আমরা অনুবাদের মধ্য দিয়া সুন্দর একটি পদ আস্বাদন করিতে পারিয়াছি।

গোবিন্দদাস এমন জলকেলি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

সব সখীগণ মেলি করল পয়ান।
কৌতুকে কেলিকুণ্ডে অবগান॥
জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি।
দুহুঁ জন সমর করত জলকেলি॥
বিথারল কুন্তল জর জর অঙ্গ।
গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ॥
সখীগণ বেঢ়ল শ্যামরু চন্দ।
গোবিন্দদাস হেরি রহু ধন্দ॥

(গোবিন্দদাসের পদাবলী : ডঃ মজুমদার সঙ্কলিত)

গোবিন্দদাস পদটির মধ্যে জলক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণের যে 'রণে ভঙ্গ' দেওয়ার কথা বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরূপের ৪২-সংখ্যক গীতের প্রভাব রহিয়াছে।

শ্রীরূপকে অনুসরণ করিয়া রাধামোহন ঠাকুরও শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলকেলি বিষয়ে সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পদটি এই—

রাধা সখি সঞে ও বর নাহ।
কৌতুকে কেলি-কুণ্ড অবগাহ॥

অপরূপ সুরচন করু জলকেলি।
সখিগণ সঙ্গে নাগরি একু মেলি॥
দ্বৈরথ ... ... যৈছন বীর।
তৈছন জলসেক দুহুঁক শরীর॥
রাধামোহন পহু কুঞ্জন চাহ।
অবসরে রাই করু জল অতিবাহ॥

(তরু ৪।১৭৬।২৬৪৯)

শ্রীরূপ-রচিত 'গীতাবলী'র ২৫ হইতে ২৯ এবং ৩১ হইতে ৩৩ সংখ্যক গীতের মধ্যে যথাক্রমে অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা—এই অষ্টবিধ নায়িকার বর্ণনা আছে। এই গীতগুলির প্রভাবে কেবল অনূদিত পদই রচিত হয় নাই, বহু পদকর্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ পদাবলী রচনা করিয়াছেন। 'শ্রীশ্রীনায়িকা-রত্নমালা' গ্রন্থে শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর 'যথা শ্রীগীতাবল্যাং' বলিয়া গীতাবলীর নায়িকা-লক্ষণ ও গীত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তৎপরে অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে নিজেরা পদ লিখিয়াছেন। ইহাতে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, শ্রীরূপের গীতাবলীর প্রভাবেই শশিশেখর-চন্দ্রশেখর ভ্রাতৃদ্বয় পদ রচনা করিয়াছেন।

'গীতাবলী'র অভিসার-বিষয়ক ২৫-সংখ্যক গীত পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষেত্রে বাসকসজ্জিকা হইতেই আলোচনা বিধেয়।

২৬-সংখ্যক বাসকসজ্জিকা বিষয়ক গীতে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন 'কুসুমাবলিভিরুপস্কুরু তল্পং' ইত্যাদি। ইহার অর্থ—সখীকে শ্রীরাধা বলিতেছেন—হে সখি, পুষ্পরাজির দ্বারা শয্যাটি সাজাও, মণিমালার ন্যায় পুষ্পমাল্য তাহাতে স্থাপন কর। প্রিয় সখি, শীঘ্র কুঞ্জে গমন করিয়া বিলাসযোগ্য পরিচ্ছদগুলি তুমি রচনা কর। মণিময় সম্পুটে তুমি তাম্বুল রাখ, শয্যার উপান্ত পীতবস্ত্রে ভূষিত কর। অপ্রতিহতগতি সনাতনসন্ধ মাধব এখনি কুঞ্জে আসিতেছেন জানিও।

গীতটির নিম্নোক্তরূপ অনুবাদ হইয়াছে—

কর সখি ক্রীড়া সাজ সব আয়োজন।
এই যে নিকুঞ্জ ধাম কর সুশোভন॥
গাঁথি মুক্তাহার সম পুষ্পেতে রচিয়া।
সাজাও পুষ্পেতে শয্যা সুন্দর করিয়া॥

রাখ সখি মণিময় বাটাতে তাম্বুল।
শয়ন অঞ্চল আছে সে পীত দুকূল॥
নিত্য অভিসন্ধি প্রতিবন্ধ নাহি তায়।
আসিবেক সনাতন অবশ্য হেথায়॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ১৪৫৪)

এই অনুবাদে মূল হইতে কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, ধ্রুবপদ পূর্বেই আসে নাই, কিছু অর্থান্তরিতও হইয়াছে। শ্রীরূপের গীতে শ্রীরাধা সখীকে শীঘ্র কুঞ্জে গিয়া বিলাসযোগ্য পরিচ্ছদসমূহ রচনা করিতে বলিয়াছেন, অনুবাদে কিন্তু কুঞ্জে শীঘ্র গমন করার কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বে পুষ্পমাল্য এবং পরে পুষ্পের বর্ণনা দিয়া অনুবাদক গীতোক্ত ক্রমটিই কেবল ভঙ্গ করেন নাই, পুষ্পমাল্য পৃথকভাবে যে শয্যায় স্থাপন করিতে হইবে তাহা বুঝাইতে অসমর্থ হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ, অনুবাদের মধ্যে শয্যা-প্রান্তের পীত দুকূলের বিষয়টি অনুবাদক ঠিক ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। চতুর্থতঃ, শ্রীরূপ যেখানে শ্রীরাধার উক্তিতে বলিয়াছেন সনাতনসন্ধ (শ্রীকৃষ্ণ) এখনি বা শীঘ্র আসিবেন, সেখানে অনুবাদক 'অবশ্য' লিখিয়া যোগ্য ভাবটি হারাইয়াছেন।

বাসকসজ্জিকার পরিকল্পনা শ্রীরূপের নিজস্ব নহে সত্য, কিন্তু ২৬-সংখ্যক গীতে শ্রীরূপ বাসকসজ্জিকা শ্রীরাধার যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মৌলিক। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' শ্রীকৃষ্ণের নিকট বাসকসজ্জিকা শ্রীরাধার কথা বলিতে গিয়া সখী বলিয়াছে যে, 'সীদতি রাধা বাসগৃহে' অর্থাৎ শ্রীরাধা লতাকুঞ্জে বিষাদে অবস্থান করিতেছেন। তিনি (শ্রীরাধা) দিকে দিকে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছেন। জয়দেবের বর্ণনায় রহিয়াছে—বাসকসজ্জিকা শ্রীরাধা বিরহোত্তাপ মন্দীভূত করিবার জন্য মৃণাল ও নবপল্লবের বলয় ধারণ করিয়াছেন, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বেশভূষাও করেন। হরি কেন শীঘ্র অভিসারে আসিতেছেন না, সখীকে বারবার এই কথা শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীরূপের বাসকসজ্জিকার বর্ণনায় দেখিতেছি ঠিক এই চিত্রটি নাই। জয়দেবের বর্ণনার প্রতিকূলে শ্রীরূপের বর্ণিত শ্রীরাধা বিষাদগ্রস্তা নহেন, সেইজন্য তিনি বিরহোত্তাপ মন্দীভূত করিবার কোনরূপ উপায় অনুসন্ধান করেন না; বরং শ্রীকৃষ্ণাগমন বিষয়ে স্থির বিশ্বাস লইয়া সখীকে কুঞ্জে বাসর রচনা করিতে বলেন। জয়দেবের বাসকসজ্জিকা শ্রীরাধা যেখানে সখীকে শ্রীকৃষ্ণের শীঘ্র না আসার কারণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন, সেখানে শ্রীরূপের শ্রীরাধা স্পষ্টই বলেন—'মাধবমাশু সনাতনসন্ধং বিদ্ধি', অর্থাৎ সনাতনসন্ধ মাধব শীঘ্রই আসিবেন জানিবে।

শ্রীরূপের পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতিও তাঁহার পদে (মিত্র-মজুমদার সঙ্কলিত, পদ ৩৫৩)

অপরূপ সুরচন করু জলকেলি।
সখিগণ সঙ্গে নাগরি একু মেলি॥
দ্বৈরথ ... ... যৈছন বীর।
তৈছন জলসেক দুহুঁক শরীর॥
রাধামোহন পহু কুঞ্জন চাহ।
অবসরে রাই করু জল অতিবাহ॥

(তরু ৪।১৭৬।২৬৪৯)

শ্রীরূপ-রচিত 'গীতাবলী'র ২৫ হইতে ২৯ এবং ৩১ হইতে ৩৩ সংখ্যক গীতের মধ্যে যথাক্রমে অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা—এই অষ্টবিধ নায়িকার বর্ণনা আছে। এই গীতগুলির প্রভাবে কেবল অনূদিত পদই রচিত হয় নাই, বহু পদকর্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ পদাবলী রচনা করিয়াছেন। 'শ্রীশ্রীনায়িকা-রত্নমালা' গ্রন্থে শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর 'যথা শ্রীগীতাবল্যাং' বলিয়া গীতাবলীর নায়িকা-লক্ষণ ও গীত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তৎপরে অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে নিজেরা পদ লিখিয়াছেন। ইহাতে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, শ্রীরূপের গীতাবলীর প্রভাবেই শশিশেখর-চন্দ্রশেখর ভ্রাতৃদ্বয় পদ রচনা করিয়াছেন।

'গীতাবলী'র অভিসার-বিষয়ক ২৫-সংখ্যক গীত পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষেত্রে বাসকসজ্জিকা হইতেই আলোচনা বিধেয়।

২৬-সংখ্যক বাসকসজ্জিকা বিষয়ক গীতে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন 'কুসুমাবলিভিরুপস্কুরু তল্পং' ইত্যাদি। ইহার অর্থ—সখীকে শ্রীরাধা বলিতেছেন—হে সখি, পুষ্পরাজির দ্বারা শয্যাটি সাজাও, মণিমালার ন্যায় পুষ্পমাল্য তাহাতে স্থাপন কর। প্রিয় সখি, শীঘ্র কুঞ্জে গমন করিয়া বিলাসযোগ্য পরিচ্ছদগুলি তুমি রচনা কর। মণিময় সম্পুটে তুমি তাম্বুল রাখ, শয্যার উপান্ত পীতবস্ত্রে ভূষিত কর। অপ্রতিহতগতি সনাতনসন্ধ মাধব এখনি কুঞ্জে আসিতেছেন জানিও।

গীতটির নিম্নোক্তরূপ অনুবাদ হইয়াছে—

কর সখি ক্রীড়া সাজ সব আয়োজন।
এই যে নিকুঞ্জ ধাম কর সুশোভন॥
গাঁথি মুক্তাহার সম পুষ্পেতে রচিয়া।
সাজাও পুষ্পেতে শয্যা সুন্দর করিয়া॥

রাখ সখি মণিময় বাটাতে তাম্বুল।
শয়ন অঞ্চল আছে সে পীত দুকূল॥
নিত্য অভিসন্ধি প্রতিবন্ধ নাহি তায়।
আসিবেক সনাতন অবশ্য হেথায়॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ১৪৫৪)

এই অনুবাদে মূল হইতে কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, ধ্রুবপদ পূর্বেই আসে নাই, কিছু অর্থান্তরিতও হইয়াছে। শ্রীরূপের গীতে শ্রীরাধা সখীকে শীঘ্র কুঞ্জে গিয়া বিলাসযোগ্য পরিচ্ছদসমূহ রচনা করিতে বলিয়াছেন, অনুবাদে কিন্তু কুঞ্জে শীঘ্র গমন করার কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বে পুষ্পমাল্য এবং পরে পুষ্পের বর্ণনা দিয়া অনুবাদক গীতোক্ত ক্রমটিই কেবল ভঙ্গ করেন নাই, পুষ্পমাল্য পৃথকভাবে যে শয্যায় স্থাপন করিতে হইবে তাহা বুঝাইতে অসমর্থ হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ, অনুবাদের মধ্যে শয্যা-প্রান্তের পীত দুকূলের বিষয়টি অনুবাদক ঠিক ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। চতুর্থতঃ, শ্রীরূপ যেখানে শ্রীরাধার উক্তিতে বলিয়াছেন সনাতনসন্ধ (শ্রীকৃষ্ণ) এখনি বা শীঘ্র আসিবেন, সেখানে অনুবাদক 'অবশ্য' লিখিয়া যোগ্য ভাবটি হারাইয়াছেন।

বাসকসজ্জিকার পরিকল্পনা শ্রীরূপের নিজস্ব নহে সত্য, কিন্তু ২৬-সংখ্যক গীতে শ্রীরূপ বাসকসজ্জিকা শ্রীরাধার যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মৌলিক। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' শ্রীকৃষ্ণের নিকট বাসকসজ্জিকা শ্রীরাধার কথা বলিতে গিয়া সখী বলিয়াছে যে, 'সীদতি রাধা বাসগৃহে' অর্থাৎ শ্রীরাধা লতাকুঞ্জে বিষাদে অবস্থান করিতেছেন। তিনি (শ্রীরাধা) দিকে দিকে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছেন। জয়দেবের বর্ণনায় রহিয়াছে—বাসকসজ্জিকা শ্রীরাধা বিরহোত্তাপ মন্দীভূত করিবার জন্য মৃণাল ও নবপল্লবের বলয় ধারণ করিয়াছেন, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বেশভূষাও করেন। হরি কেন শীঘ্র অভিসারে আসিতেছেন না, সখীকে বারবার এই কথা শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীরূপের বাসকসজ্জিকার বর্ণনায় দেখিতেছি ঠিক এই চিত্রটি নাই। জয়দেবের বর্ণনার প্রতিকূলে শ্রীরূপের বর্ণিত শ্রীরাধা বিষাদগ্রস্তা নহেন, সেইজন্য তিনি বিরহোত্তাপ মন্দীভূত করিবার কোনরূপ উপায় অনুসন্ধান করেন না; বরং শ্রীকৃষ্ণাগমন বিষয়ে স্থির বিশ্বাস লইয়া সখীকে কুঞ্জে বাসর রচনা করিতে বলেন। জয়দেবের বাসকসজ্জিকা শ্রীরাধা যেখানে সখীকে শ্রীকৃষ্ণের শীঘ্র না আসার কারণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন, সেখানে শ্রীরূপের শ্রীরাধা স্পষ্টই বলেন—'মাধবমাশু সনাতনসন্ধং বিদ্ধি', অর্থাৎ সনাতনসন্ধ মাধব শীঘ্রই আসিবেন জানিবে।

শ্রীরূপের পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতিও তাঁহার পদে (মিত্র-মজুমদার সঙ্কলিত, পদ ৩৫৩)

বাসকসজ্জিকার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে জয়দেবের পন্থানুসরণই লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

কুসুমে রচিব সেজা দীপ রহল তেজা
পরিমল অগর চন্দনে।
জয়ে জয়ে তুঅ মেরা নিফল বহলি বেরা
তবে তবে পীড়লি মদনে॥
মাধব তোরি রাহী বাসক সজা।
চরণ শবদ চৌদিশ আপত্র কানে
পিয়া লোভে পরিণতি লজা॥

অর্থাৎ—কুসুমে রচিত শয্যা এবং প্রদীপ্ত দীপ রহিল, অগুরুচন্দনের পরিমলও (রহিল)। যখন যখন তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) মিলনের বেলা নিষ্ফল রহিয়া গেল, তখনই তখনই মদন (শ্রীরাধাকে) পীড়া দিল। হে মাধব, তোমার রাধা বাসকসজ্জা করিয়াছে, চরণশব্দ (শুনিবার) জন্য চারিদিকে কান পাতিয়াছে, প্রিয়ের লোভে লজ্জাই পরিণতি হইল। জয়দেবের শ্রীরাধার মতো বিদ্যাপতির শ্রীরাধাও বাসক-সজ্জায় শেষ পর্যন্ত দুঃখলিপ্তা। শ্রীরূপই এই বিষয়ে স্বতন্ত্র পথ ধরিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বহু পদকার বাসকসজ্জিকার বর্ণনা দিয়াছেন। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

বাসিত বারি কর্পূরিত তাম্বুল
কুসুমিত মদন শয়ান।
উজর দীপ সমীপহি জারহ
বিরচহ চারু বিতান॥
সখিহে কহই না জাএ আনন্দ।
ঋতুপতি রাতি অবহু নব নাগর
মিলবহু শ্যামর চন্দ॥

(পদামৃতসমুদ্র : পৃঃ ১৫০, পদ ৪)

বলাই বাহুল্য যে, পদটির মধ্যে শ্রীরূপের আদর্শে তাম্বুল ও কুসুমিত শয্যা রচনার কথা আছে। সর্বোপরি, এই পদে শ্রীরূপের মতোই লেখা হইয়াছে 'অবহু নব নাগর মিলবহু শ্যামর চন্দ', অর্থাৎ নব-নাগর শ্যামচন্দ্রকে এখনি মিলিবে।

গোবিন্দদাসের অন্য পদেও অনুরূপ কথাই রহিয়াছে—

উজোর রাতি শেজ নব কিশলয়
বাসিত তাম্বুল বারি।
এই উপচারে আজু হরি ভেটব
ঐছন মরম হামারি॥
(গোবিন্দদাসের পদাবলী: ডঃ মজুমদার সঙ্কলিত, পদ ৪১৮)

'শ্রীশ্রীনায়িকা-রত্নমালা'য় চন্দ্রশেখর শ্রীরূপের আদর্শে আশান্বিতা বাসকসজ্জিকার কথা চিন্তা করিতে গিয়া তাহাকে কিছুদূর অগ্রবর্তী করিয়া দিয়াই লিখিয়াছেন—

সঙ্কেত কুঞ্জে আয়ব যব মোহন
হসি হম যায়ব দূরে।
বিদগধ নাহ বসনে ধরি আনব
পিরিতি-বিনয়-বেবহারে॥
সখিহে কথিত সময় উপনীত।
কী বুঝি মাধব পথে চলি আয়ত
অতএ সে হরষিত চীত॥ (পদ ১৩)

উপরি-ধৃত পদে দেখা যাইতেছে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আগমন বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া চলিতেছেন, সেইজন্যই তাঁহার ইচ্ছা, মোহন শ্রীকৃষ্ণ যখন সঙ্কেতকুঞ্জে আসিবেন তখন তিনি (শ্রীরাধা নিজে) হাসিয়া দূরে সরিয়া যাইবেন, তৎপরে বিদগ্ধনাথকে বসনে ধরিয়া প্রীতি ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহারে ধরিয়া আনিবেন। শ্রীরাধা সখীকে ডাকিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন, উক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখানে আমরা দুইটি বিষয়ে শ্রীরূপের প্রভাব লক্ষ্য করিতেছি। প্রথমতঃ, শ্রীরূপের বর্ণনার ন্যায় চন্দ্রশেখরের বর্ণিত শ্রীরাধাও আশান্বিতা। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরূপের শ্রীরাধা যেমন জানেন, মাধব শীঘ্রই আসিবেন, তেমনি চন্দ্রশেখরের শ্রীরাধা বলিতেছেন, 'কী বুঝি মাধব পথে চলি আয়ত।'

পদকর্তা মনোহর জাগ্রতিকা বাসকসজ্জিকার বিষয়ে লিখিয়াছেন—

নবীন কিশলয় ফুটল ফুলচয়
পাতি বিবিধ বিধান।
যৈছে খির-সর তৈছে শেজ কর
কুসুম কুল উপধান॥

সখিহে, স্বরূপে কহলমু তোয়।
ঐছে সাজহ বাস গৃহ জনু
নিরখি হরি সুখী হোয়॥
চারু চম্পক- কুসুম-হারক
গন্ধ, মালতীমাল।
খপুর কর্পূর পাণ সুমধুর
পুরিঞা কাঞ্চন-থাল॥
করহ সব তুহুঁ জাগি রহলহুঁ
পিয়াক পন্থ নিহার।
কহে মনোহর কুঞ্জ-কাননে
মিলব নন্দকুমার॥

(শ্রীশ্রীনায়িকা-রত্নমালা, পদ ১১)

শ্রীরূপের গীতের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন-আকাঙ্ক্ষায় এখানেও শ্রীরাধা সখীকে হরির যাহাতে সুখ হয়, সেইরূপ কুসুম-শয্যা রচনা করিতে বলিয়াছেন। কুসুমের হার, পান প্রভৃতির উল্লেখও শ্রীরূপানুসারী। সর্বশেষে 'মিলব নন্দকুমার' এই কথা যে মনোহর দাস বলিতে পারিয়াছেন, তাহার পিছনে রহিয়াছে শ্রীরূপের লেখা—'মাধবমাশু সনাতনসঙ্গং।'

২৭-সংখ্যক গীতে 'কিমু চন্দ্রবলীরনয়গভীরা' প্রভৃতি লিখিয়া শ্রীরূপ উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধার বর্ণনা দিয়াছেন। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, শ্রীরাধা বলিতেছেন—বোধ করি অতি প্রগল্‌ভা অধীরা চন্দ্রাবলী রতিবীরকে (শ্রীকৃষ্ণকে) রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রাত্রি বহুক্ষণ যাবৎ ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন, তথাপি বনমালী (আমার সঙ্গে) মিলিত হইলেন না। আমার কোন্ পাপের বিপাকদশা উপস্থিত হইয়াছে জানি না, (যাহার জন্য) এই বরাকীকে ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) বিস্মরণ। কিংবা সনাতনতনু (শ্রীকৃষ্ণ) অসুরদের সহিত অভীষ্ট (অথচ) বৃহৎ এক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন।

এই গীতের অনুবাদ হইয়াছে—

অমা রাত্র একে তাহে অর্ধগত হয়।
তথাচ কৃষ্ণের কেন না হলো উদয়॥
অন্যায় পণ্ডিতাধীরা সেই চন্দ্রাবলী।
রোধ করিয়াছে নাথে বুঝি বাক্যে ছলি॥

কিম্বা মোর মন্দ কর্ম অপাক এক্ষণ।
ক্ষুদ্র বলে ভুলেছেন মোরে অকারণ॥
কিম্বা করেছেন গুরুতর সনাতন।
অসুরগণের সহ যুদ্ধ আরম্ভন॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ১৪৮০)

গীতের ধ্রুবপদটি অনুবাদে কেবল প্রথমেই যায় নাই, কিছু বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গীতে যেখানে আছে রাত্রি বহুক্ষণ যাবৎ ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন, সেখানে অনুবাদক লিখিয়াছেন 'অমা রাত্র একে তাহে অর্ধগত হয়।' চন্দ্রাবলীর কথাতেও সে যে 'বাক্যে ছলি' শ্রীকৃষ্ণকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই কথা অনুবাদকই বলিয়াছেন। এইগুলি অনুবাদের উৎকর্ষের দিক। অন্যদিকে গীতের 'বরাকী' শব্দের পরিবর্তে 'ক্ষুদ্র' কথাটি ব্যবহার করিয়া অনুবাদক পদ-রস-মাধুর্য একটু হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন।

উৎকণ্ঠিতার পরিকল্পনা শ্রীরূপের নিজস্ব নহে, কিন্তু গীতের মধ্যে এইরূপ বর্ণনা শ্রীরূপের স্বকপোল-কল্পিত। কবি জয়দেব গীতগোবিন্দে উৎকণ্ঠিতার বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু শ্রীরূপের বর্ণনার সহিত তাহার আমূল পার্থক্য। জয়দেব যেখানে উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধাকে দিয়া বলাইয়াছেন, 'আমার অমল রূপযৌবন বিফল হইল', 'সখীগণ আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে', 'আমার কুসুম কোমল দেহকে বক্ষস্থিত ফুলহার মদনশরের ন্যায় বিদ্ধ করিতেছে' ইত্যাদি সেখানে শ্রীরাধা সম্পূর্ণ আত্মচিন্তামগ্না। শ্রীরূপের উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা কিন্তু এমন নহেন, তিনি যত কিছু চিন্তা করিয়াছেন সকলের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-তন্ময়তাই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ছাড়া, জয়দেবের শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের না আসার বিষয় চিন্তা করিতে গিয়াই ভাবিয়াছেন, না জানি কোন পুণ্যবতী শ্রীহরির মিলনসুখ অনুভব করিতেছে। শ্রীরূপের শ্রীরাধা ঠিক এই ভঙ্গীতে ভাবেন নাই।

বিদ্যাপতির 'হরি বিসরল বাহর গেহ' পদে জয়দেবের শ্রীরাধার মতো উৎকণ্ঠিতা বর্ণনা নাই সত্য, কিন্তু শ্রীরূপের ন্যায় চিন্তারও অসদ্‌ভাব লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাপতির উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জবাসরে না আসিবার কারণ বলিতে গিয়া জানাইয়াছেন 'বসুহ মিলন সুন্দর দেহ'—পৃথিবীতে সুন্দর দেহ মিলিয়াছে। শ্রীরাধার চিন্তা, শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় সেই দেহলোলুপতায় তাঁহাকে (শ্রীরাধাকে) বিস্মৃত হইয়াছেন। শ্রীরূপের শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এমন অবনত চিন্তা করিয়া থাকিতে দেখি না, শ্রীরাধা সেক্ষেত্রে মনে করেন, হয় চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণকে আবদ্ধ করিয়াছে, না হয় শ্রীরাধার

কপালদোষেই শ্রীকৃষ্ণকে পাইতেছেন না, নতুবা শ্রীকৃষ্ণ অসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীরাধার এবম্বিধ চিন্তায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উন্নত ধারণাই প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির উৎকণ্ঠিতা নায়িকা শ্রীরাধা শেষ পর্যন্ত সকাতরে সখীর দৌত্য প্রার্থনা করিয়াছেন, শ্রীরূপের শ্রীরাধার ক্ষেত্রে দৌত্যের কথা উঠে নাই।

চন্দ্রশেখরের পদে শ্রীরূপের উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধার প্রভাব অমিত পরিমাণেই পড়িয়াছে। চন্দ্রশেখর একটি পদে লিখিয়াছেন—

সদন তেজিয়া আমি বিপিনে আইলু গো
যার সঙ্গ-সুখের লাগিয়া।
তাহার বিলম্বে প্রাণ না জানি কি করে গো
কত রব রজনী জাগিয়া॥
সখি হে বিহি মোরে দুরমতি দেল।
খলের বচনে মোর এতদূর হৈল গো
পথ নিরখিতে প্রাণ গেল॥
আসিবার কাল তার অতীত হইল গো
গগনে উদয় ভেল শশী।
তাহার চরিতে রীতে বড় ভয় লাগে গো
পাছে মোর হয় লোক-হাসি॥
আসিতে আসিতে কোন অসুর সহিত গো
পথে কিবা হৈল দরশন।
চন্দ্রশেখরে কহে কোমল-শরীরে গো
কেমনে করিবে মহা-রণ॥

(শ্রীশ্রীনায়িকা-রত্নমালা, পদ ১৮)

পদের 'কত রব রজনী জাগিয়া' শ্রীরূপের 'রাত্রি বহুক্ষণ যাবৎ ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন' কথাটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অনুবাদের 'অমা রাত্র একে তাহে অর্ধগত হয়' আরও বেশী করিয়া মনে করাইয়া দেয়। শ্রীরূপের গীতের স্পষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে যেখানে পদের মধ্যে শ্রীরাধা ভাবিতেছেন পথে হয়তো অসুরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দেখা হইয়াছে, রণ হইবে।

চন্দ্রশেখরের অন্য একটি পদে রহিয়াছে—

কিয়ে কংসচর বরজে আইল
কি বুঝি তাহার সনে।
সমর আরম্ভ করিল মাধব
নহে না আইলা কেনে॥
কিয়ে কোন নারী দিঠি ভঙ্গী করি
ভুলাঞা লইয়া গেল।
নহিলে বা কেনে সঙ্কেত ভবনে
মুর-হর না আইল॥

(শ্রীশ্রীনায়িকা-রত্নমালা, পদ ১৯)

উপরি-ধৃত পদাংশে প্রথমে যে কংসচরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সমরের আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা শ্রীরূপের গীতের 'কিমুত সনাতনতনু রণঘিষ্টং, রণমারভত সুরারিভিরিষ্টং' অর্থাৎ সনাতনতনু (শ্রীকৃষ্ণ) কোন অসুরের সহিত অভীষ্ট বৃহৎ এক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন, এই বিষয়টিই স্মরণ করাইয়া দেয়। তারপর 'কিয়ে কোন নারী দিঠি ভঙ্গী করি ভুলাঞা লইয়া গেল'—পদের এই অংশটি শ্রীরূপের গীতের চন্দ্রাবলী-ভূমিকার প্রভাবেই পরিকল্পিত হইয়াছে।

'গীতাবলী'র ২৮-সংখ্যক গীতে বিপ্রলব্ধা শ্রীরাধার প্রসঙ্গে 'কোমলকুসুমাবলিকৃত-চয়নং' ইত্যাদি রহিয়াছে। ইহাতে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, সখীকে শ্রীরাধা বলিতেছেন—হে সখি, কোমল পুষ্পাবলী-রচিত লীলাশয্যা দূরে নিক্ষেপ কর। আজ শ্রীহরিকে (যোগ্য) সময়ে লাভ করিতে পারিলাম না, হায়, আর কোন্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিব, যে আমাকে শ্রীহরিদর্শন করাইয়া দিবে? মনোহর গন্ধ দ্রব্যাদি যমুনাতটে ক্ষেপণ কর। রাত্রির শেষ যাম সমাগত, সনাতনের সঙ্গকামনা ত্যাগ কর।

শ্রীরূপের এই গীতের অনুবাদ হইয়াছে—

নাহি হরি মিলিলেন রাত্রে আজুকার।
বল সখি শরণ লইব আর কার॥
তোল ওহে সুকোমল পুষ্পের বিছানা।
রতিক্রীড়া লাগি যাহা হয়েছে রচনা॥
মনোহর গন্ধধর বিলাস কর্পূরে।
ক্ষেপণ করহ যমুনার জল পূরে॥

আর নাহি রাত্র আছে গত ত্রিপ্রহর।
ত্যজ সনাতন-সঙ্গ কল্পনা দুস্তর॥
(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ১৪৯৯)

অনুবাদের মধ্যে ধ্রুবপদটি পুরোভাগে বসিয়াছে। পুষ্পশয্যাকে বিশেষিত করিতে ৪র্থ চরণে যে লেখা হইয়াছে 'রতিক্রীড়া লাগি যাহা হয়েছে রচনা', ইহা সম্পূর্ণ গদ্যধর্মী। এতদ্ব্যতীত অনুবাদটি সুন্দর ও সঙ্গত হইয়াছে।

শ্রীধর দাস-সঙ্কলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' বিপ্রলব্ধা বিষয়ে পাঁচটি শ্লোক রহিয়াছে, কিন্তু কোথাও শ্রীরাধাদির নাম নাই। রুদ্রটের শ্লোকটিতে কোন বিপ্রলব্ধা নায়িকা সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে, প্রিয়তম লীলানিপুণা কোন পরস্ত্রী দ্বারা বিজিত হইয়াছে, তাহাদের রাত্রি না জানি কত আনন্দেই কাটিতেছে। শেফালী ঝরিয়া লাভ কী, চন্দ্র নভোমধ্যে অবস্থান করা সত্ত্বেও প্রিয়তমের আসিতে বিলম্ব হইতেছে। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, রুদ্রটের এই বর্ণনার সহিত শ্রীরূপের গীতের কিছুমাত্র মিল নাই।

কবি জয়দেব গীতগোবিন্দে বিপ্রলব্ধার বর্ণনায় রুদ্রটের পন্থানুসরণ করিয়াছেন। তাই আমরা দেখি, জয়দেবের বিপ্রলব্ধা শ্রীরাধা ভাবিতেছেন—রতিরণের উপযুক্ত বেশবাসে সজ্জিতা আমা হইতে অধিক গুণবতী কোন নারী মধুরিপুর (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত বিলাসে মাতিয়াছে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীরাধা সেই নারীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বলাই বাহুল্য, শ্রীরূপের বিপ্রলব্ধা শ্রীরাধা জয়দেবের এই নায়িকার মতো প্রিয়তমের অন্যনারীবিলাস একাগ্রচিত্তে চিন্তা করেন নাই।

বিদ্যাপতির বিপ্রলব্ধা-বর্ণনার সহিতও শ্রীরূপের বর্ণনার পার্থক্য রহিয়াছে। বিদ্যাপতির 'রিপু পঁচসর জনি অবসর' পদে শ্রীরাধা ভাবিয়াছেন—মদন শরাসন হইয়া সাজিল বটে, কিন্তু মনোরথ তো পূর্ণ হইল না। রাত্রিতে হরিকে ত্যাগ করিয়া দূতীও ফিরিল না। যাহা হউক, রাত্রির অন্ধকারে অভিসারে আসিয়াছি, এখন প্রভাত না হইয়া যায়। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, বিদ্যাপতি যেখানে মদনের কথা বলিয়াছেন, শ্রীরূপ সেখানে তাহার উল্লেখও করেন নাই। বিদ্যাপতির পদে দূতী শ্রীরাধার নিকট হইতে দূরে, কিন্তু শ্রীরূপের গীতে দূতী শ্রীরাধার পার্শ্বে রহিয়াছে বলিয়াই তাহাকে সম্বোধন করিয়া কী করিতে হইবে শ্রীরাধা বলিতেছেন। শ্রীরূপের গীতে বিদ্যাপতির পদের ন্যায় প্রভাত হইয়া যাইবার ভয় শ্রীরাধার মধ্যে আসে নাই। সুতরাং আমরা লক্ষ্য করিতেছি, শ্রীরূপের বিপ্রলব্ধা-বর্ণনা সম্পূর্ণ মৌলিক।

এই মৌলিক বর্ণনার প্রভাব পরবর্ত্তী কালের পদাবলীসাহিত্যে দৃষ্ট হয়। উদাহরণ হিসাবে বলরামদাসের একটি পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

ত্যজ সখি কানু আগমন আশ রে।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ রে॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহি ডারহ যমুনা পার॥
কিশলয় শেজ মণি মোতিক মাল।
জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥
অব কি করব সখি কহ না উপায়।
কানু বিনু জিউ কাহে নাহি বাহিরায়॥

(পদামৃতমাধুরী—৩য়, পৃঃ ১৫৭)

পদটির মধ্যে অনেক স্থানেই শ্রীরূপের গীতের যেন অনুবাদ করা হইয়াছে। পদের 'কানু আগমন আশ' ছাড়ার কথা শ্রীরূপের 'মুঞ্চসনাতন সঙ্গতি কামং'-এর অনুসরণে রচিত। তাহা ছাড়া, শ্রীরূপের 'লব্ধমবেহি নিশান্তিমযামং'-এর প্রভাবে 'যামিনী শেষ ভেল', 'বিধৃত মনোহর গন্ধবিলাসং, ক্ষিপ যামুনতটভূমি পটবাসং'-এর প্রভাবে 'তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার দূরহি ডারহ যমুনা পার', শ্রীরূপের 'কোমলকুসুমাবলিকৃতচয়নং অপসারয় রতিলীলাশয়নং'-এর অনুসরণে 'কিশলয় শেজ মণি' ইত্যাদি লেখা হইয়াছে।

২৯-সংখ্যক গীতে শ্রীরূপ খণ্ডিতার বর্ণনা দিয়াছেন। 'হৃদয়ান্তর মধিশয়িতং রময় জনং নিজদয়িতং' ইত্যাদি চরণে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হৃদয়মধ্যে বিরাজিত নিজ প্রিয়তমার সন্তোষ বিধান কর, এখন অপরাধিনী রাধিকায় তোমার কি প্রয়োজন আছে? হে মাধব, প্রবঞ্চনা-চাতুর্য পরিত্যাগ কর, কারণ কোন্ রমণী তোমার বিলাস-চাতুর্য না জানে। তোমার নয়ন ঘূর্ণিত হইতেছে, যাও ঘটিকা-পরিমিত কাল নিদ্রার সেবা কর। প্রচুর অনুলেপনে নখক্ষতচিহ্নগুলি অদৃশ্য হউক। যৌবনবতী মুখরা সখীরা এখানে তোমাকে উপহাস করিতেছে। হে সনাতন, দেব, তোমাকে প্রণাম, আমার গৃহের বারান্দায় আর বিলম্ব করিও না।

গীতটি ভাষান্তরে রূপ পাইয়াছে—

ত্যাগ কর কৃষ্ণ তুমি কপট তরঙ্গ।
কে না জানে হে তোমার এ সকল রঙ্গ॥

আপন হৃদয়ে তুমি করায়ে শয়ন।
রমণ করসে লয়ে নিজ প্রিয়জন ॥
অপরাধী এ রাধিকা হয়েছে এক্ষণ।
এহেতু আমাতে তব নাই প্রয়োজন ॥
ঢুলু ঢুলু করিতেছে তোমার নয়ন।
ক্ষণেক যাইয়া তুমি করগে শয়ন ॥
করগে অঙ্গেতে অনুলেপন চন্দন।
নখাদির চিহ্ন তবে হবে আবরণ ॥
মুখরা সখীর শ্রেণী রয়েছে আমার।
হাসিব দেখিয়া তব আকার প্রকার ॥
করি দেব সনাতন বিবিধ বন্দন।
করো না বিলম্ব আর প্রাঙ্গণে এক্ষণ ॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ১৫২৬)

ভাষান্তরিত রূপে আমরা দেখিতেছি, গীতের ধ্রুবপদটি পূর্বে বসিয়াছে এবং 'কোন রমণী না জানে'র ক্ষেত্রে 'কে না জানে' লেখা হইয়াছে। গীতে শ্রীরাধা যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে বিরাজিত প্রিয়তমার সন্তোষ বিধান করিতে বলিয়াছেন, পদটির ভিতরে সেখানে নিজ প্রিয়জনকে হৃদয়মধ্যে শয়ন করাইয়া রমণ করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গীতের অর্থটি সুব্যক্ত হয় নাই, কিছু স্থূলতাও আসিয়াছে। গীতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে ঘটিকামাত্র কাল নিদ্রার সেবা করিতে বলিয়াছেন, অপর পক্ষে অনূদিত পদে বলা হইয়াছে 'ক্ষণেক'। সখীদের প্রসঙ্গে পদটির মধ্যে যৌবনবতী কথাটির ব্যঞ্জনাও নাই এবং সখীরা হাসিতেছে না, হাসিবে। এইরূপ ক্ষুদ্র খণ্ড বহু ত্রুটি সত্ত্বেও অনূদিত পদটি বৈষ্ণব পদের রূপ হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

শ্রীরূপের পূর্বে কোন কোন কবি খণ্ডিতার বর্ণনা দিয়াছেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' খণ্ডিতা বিষয়ে যে পাঁচটি শ্লোক সংকলিত হইয়াছে, সেইগুলির একটির সহিত শ্রীরূপের বর্ণনার কিছু মিল রহিয়াছে। খণ্ডিতা সম্পর্কিত ২-সংখ্যক শ্লোকে কোন অজ্ঞাতনামা কবি লিখিয়াছেন, খণ্ডিতা নায়িকা নায়ককে বলিতেছে 'সৈব স্থিতা মনসি কৃত্রিম-ভাবরম্যা' অর্থাৎ কৃত্রিম-ভাব-সুশোভিতা সেই (প্রতিনায়িকা) (তোমার) মনের মধ্যে রহিয়াছে। এই বিষয়টিরই অনুসরণক্রমে বোধ করি শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—তোমার হৃদয়মধ্যে বিরাজিত নিজ প্রিয়তমার

সন্তোষ বিধান কর। 'হৃদয়মধ্যে বিরাজিত' কথাটি ছাড়া শ্রীরূপ শ্লোক হইতে অন্য কিছু গ্রহণ করেন নাই।

জয়দেব ও বিদ্যাপতির খণ্ডিতা-বর্ণনার সহিতও শ্রীরূপের বর্ণনার পার্থক্য রহিয়াছে। কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে শ্রীরাধা রাত্রি-জাগরণ-ক্লিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের ক্রম-নিমীলীয়মান নয়নের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে ঘটিকামাত্র কাল নিদ্রার সেবা করিতে বলেন নাই, জানাইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের নয়নের আরক্তিম ভাব তাঁহার অন্য নায়িকানুরাগ ব্যক্ত করিতেছে। জয়দেবের শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কপটবাক্য বলিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু কপটবাক্য যে সকলেই ধরিয়া ফেলে তাহা জানান নাই। আরও, জয়দেবের কাব্যে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের গাত্রে দংশন-নখ-ক্ষতাদির চিহ্ন দেখিয়াছেন, কিন্তু শ্রীরূপের বর্ণিত শ্রীরাধার ন্যায় চন্দনাদি লেপনে প্রতিকারের কথা বলেন নাই।

বিদ্যাপতি তাঁহার খণ্ডিতা বিষয়ক 'নয়ন চামর তুঅ অধর চোরাওল' পদে শ্রীরাধাকে দিয়া বলাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের 'নয়নে চোরাওল রাগে' অর্থাৎ নয়ন রক্তিম হইল, কিন্তু প্রতিকার কী? শ্রীরাধা কিছুই বলেন নাই। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের 'তিলা এক কৈতব লাগে' অর্থাৎ কপটতা ধরিতে তিলমাত্র সময় লাগে—শ্রীরাধা বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীরূপের শ্রীরাধার মতো কাহাদের কাছে তাহার উল্লেখ করেন নাই। বিদ্যাপতির পদে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—যাহার সহিত রাত্রি যাপন করিলে তাহার কাছে ফিরিয়া যাও, এক্ষেত্রে শ্রীরূপের গীতের ন্যায় 'তাহার সন্তোষ বিধান কর' না বলায় তেমন সূক্ষ্মতা নাই। সর্বোপরি বিদ্যাপতির খণ্ডিতা শ্রীরাধা প্রতি-নায়িকার সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়াছেন, শ্রীরূপের শ্রীরাধার ক্ষেত্রে তাহার সন্ধান মিলে না।

অতঃপর আমাদের দেখা প্রয়োজন যে, শ্রীরূপের এই খণ্ডিতার প্রভাব পদাবলী-সাহিত্যে কতখানি পড়িয়াছে।

পদকর্তা রাধামোহন লিখিয়াছেন—

(মাধব) কাহে কান্দায়সি হামে।
চলি যাহ সো ধনি ঠামে॥
তোহারি হৃদয়ে অধিদেবী।
তাক চরণ যাহ সেবি॥ (তরু ৩৭৪)

শ্রীরূপের গীতে যেমন রহিয়াছে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—তোমার হৃদয়মধ্যে বিরাজিত নিজ প্রিয়তমার সন্তোষ বিধান কর, সেইরূপে উপরি-ধৃত পদাংশেও রাধামোহন লিখিয়াছেন, 'তোহারি হৃদয়ে অধিদেবী, তাক চরণ যাহ সেবি।'

শশিশেখরের পদে রহিয়াছে—

তরুণারুণ নয়নাম্বুজ
ঢুলু ঢুলু ঢুলু অলসে।
দেখিও দেখিও পড়িবে পড়িবে
শুতি রহ যাই দিবসে ॥

(অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পদ ২৫৫)

এই পদে শ্রীরূপের গীতের প্রতিধ্বনি করিয়া অরুণ নয়নের কথাই বলা হয় নাই, শ্রীরাধাকে দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শুইতে যাওয়ার উপদেশও দেওয়ানো হইয়াছে।

অষ্টপ্রকার নায়িকার মধ্যে অন্য তিনপ্রকার নায়িকার বিষয়ে যে গীতাবলী আছে, সেইগুলির কোনরূপ অনুবাদ আমরা পাইতেছি না। তবে কলহান্তরিতা ও স্বাধীনভর্তৃকা সম্পর্কিত গীতের কিছু অনুসরণ আমরা গোবিন্দদাসের একাধিক পদে লক্ষ্য করি।

কলহান্তরিতার গীতে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্।
যদভজমিহ নহি গোকুলবীরম্ ॥
নাকর্ণয়মপি সুহৃদুপদেশম্।
মাধব চাটুপটলমপিলেশম্ ॥
নালোকয় মর্পিত মুরু—হারম্।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্ ॥
হন্ত সনাতন-গুণমভিযান্তম্।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তম্ ॥

অর্থাৎ—সখি, এখানে (কুঞ্জে আগত) গোকুলবীরকে আমি ভজনা করিলাম না; (সেইজন্য) আমার আকুল হৃদয় মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে। সুহৃদ্‌গণের উপদেশ (কিংবা) মাধবের স্তোকবাক্যের কণামাত্রও আমি শুনি নাই। (শ্রীকৃষ্ণের অর্পিত) মনোহর হারের প্রতি, আরও বারংবার আমার পদে পতিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমি ফিরিয়াও চাহি নাই। হায়, কেন আমি সনাতনগুণান্বিত সমাগত প্রিয়তমকে বক্ষে ধারণ করিলাম না!

গোবিন্দদাস তাঁহার একটি পদে লিখিয়াছেন—

যো মঝু চরণ- পরশ-রস-লালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল।
তাকর দরশন বিনে তনু জরজর
পরশ পরশ-সম ভেল ॥
সহচরি মেলি লাখ সমুঝাওলি
সো নাহি শুনলোঁ হাম।

(তরু ৪৩৪, সমুদ্র ১৮৬, সং ৪১৬)

শ্রীরূপের গীতের আদর্শে এখানে গোবিন্দদাসের শ্রীরাধাও কলহান্তরিতা হইয়া ভাবিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চরণ ধরিয়া সাধিয়াছিলেন, সহচরীরা (সুহৃদ্‌গণের সমতুল্য) কত বুঝাইয়াছেন, কিন্তু সেই সমস্ত তিনি না শুনিয়া খুবই ভুল করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের অন্য একটি পদে রহিয়াছে—

চরণে লাগি হরি হার পিন্ধায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাথ।
সো নাহি পহিরলুঁ দূরহি ডারলুঁ
মানিনি অবনত মাথ ॥

(তরু ৪৩৬, সং ৪১৮, সমুদ্র ১৮৪, সিদ্ধান্ত ১৪২)

এখানে হারের প্রসঙ্গটি কি শ্রীরূপের গীতের প্রভাবেই আসে নাই ?

স্বাধীনভর্তৃকা সম্পর্কিত গীতের অনুসরণ আরও ব্যাপক।

শ্রীরূপের গীত—

পত্রাবলিমিহ মম হৃদি গৌরে।
মৃগমদ-বিন্দুভিরর্পয় শৌরে ॥
শ্যামল সুন্দর বিবিধ-বিশেষং।
বিরচয় বপুষি মমোজ্জ্বল-বেশং ॥ ধ্রু ॥
পিঞ্ছ-মুকুট মম পিঞ্ছ-নিকাশং।
বরমবতংসয় কুন্তল-পাশং ॥
অত্র সনাতন শিল্প-লবঙ্গং।
শ্রুতি-যুগলে মম লম্ভয় সঙ্গং ॥

বাংলায় ভাষান্তরিত করিলে দাঁড়ায়—হে শৌরে, আমার গৌরবর্ণ হৃদয়ে মৃগমদবিন্দু দিয়া পত্রাবলী আঁকিয়া দাও। শ্যামল সুন্দর, আমার দেহে বহুপ্রকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উজ্জ্বল সব বেশ রচনা কর। হে ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত মুকুটধারী, ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় আমার দীর্ঘ কেশদাম সুন্দর কুসুমাবলীতে সাজাও। সনাতন (শ্রীকৃষ্ণ), আমার কর্ণযুগল লবঙ্গপুষ্পে অলঙ্কৃত করিয়া তোমার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় জানাও।

অনুরূপ ভাব লইয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

আকুল কুটিল অলককুল সমরী।
সীঁথি বনাই বান্ধহ পুন কবরী॥
তহিঁ সমরেহ সিন্দুরক বিন্দু।
কুঙ্কুমে মাজি সাজহ মুখ-ইন্দু॥
এ হরি রতি-রস অবশ রসাল।
বিঘটিত বেশ বনাহ পুনবার॥
কাজরে উজোরহ চলাচল-ভ্রমরী।
শ্রুতি-অবতংসহ কিশলয় চমরী॥
পীন-পয়োধরে থির কর আপি।
মৃগমদে রঞ্জহ নখ-পদ ছাপি॥
বিগলিত কম্বু-বলয়গণ মোর।
সীধে পীন্ধায়হ নূপুর জোর॥
মেটল যাবক পদে পুন লেখ।
গোবিন্দদাস দেখউ পরতেক॥

(ক্ষণদা ২০।১১, স ৪৫৭, তরু ২৭৩৪, কী ১৯৫)

এখানেও উপরি-উক্ত গীতের ন্যায় সেই কবরীবন্ধন, শ্রুতিযুগলকে সাজাইয়া তোলা, পীনপয়োধর (গীতের বক্ষোদেশ) মৃগমদে রঞ্জিত করা সমস্তই রহিয়াছে। আরও যাহা আছে তাহা শ্রীরূপের গীতের সূত্রেই বিস্তৃত চিন্তার ফলস্বরূপ।

মান-বিষয়ক তিনটি গীত অনূদিত হইয়াছে। ৩০-সংখ্যক গীতে 'যাং সেবিতবানসি জাগরী' ইত্যাদি চরণে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—রজনী জাগিয়া যাহার সেবা করিয়াছ, সেই নাগরী তোমাকে জয় করিয়া লইয়াছে। হরি, তোমার মিথ্যা চাটুবাক্য আমার সখীবর্গ বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। হে গোকুলপতি, (অনর্থক) শপথ করিও না। বহুদিন হইতেই তোমার চরিত্র কে না

জানে ? যে সনাতন সদ্‌ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে, আমি তাহার সঙ্গে কোন প্রীতির সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না।

শ্রীরূপের এই গীতটির অনুবাদ হইয়াছে—

যাহার করেছ সেবা জাগিয়া রজনী।
জিনেছে তোমারে সেই প্রবলা রমণী॥
প্রকাশ পেয়েছে তব সব চতুরালি।
ঘটিবেনা সখী মাঝে শুন বনমালী॥
করোনা শপথ ওহে গোকুলের পতি।
কেনা জানে তোমার যে চরিত এমতি॥
হইলাম প্রণয়েতে মুক্ত সনাতন।
আর না হইবে তব সঙ্গেতে মিলন॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ১৫২৭)

উপরের অনুবাদটিতে তিনটি বিষয়ে মূলের সহিত পার্থক্য ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, সখীরা শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যা চাটুবাক্য বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, অনুবাদক সেই অর্থ বুঝাইতে না পারিয়া লিখিয়াছেন 'চতুরালি ঘটিবেনা সখী মাঝে'। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরূপের মতই অনুবাদক লিখিয়াছেন 'কেনা জানে তোমার যে চরিত এমতি', কিন্তু এই সঙ্গে শ্রীরূপের 'বহুদিন যাবৎ' কথাটির ভাব অনুবাদক সংযুক্ত করিতে পারেন নাই। তৃতীয়তঃ, শ্রীরূপ গীতের শেষাংশে লিখিয়াছেন, যে সনাতন সদ্‌ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে আমি (শ্রীরাধা) তাহার সঙ্গে কোন প্রীতির সম্বন্ধ রাখিতে চাহি না, অনুবাদে এই ভাবটি একেবারেই ফুটানো হয় নাই।

শ্রীরূপের এই গীতটির এমন কোন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নাই যে, ইহার প্রভাব কোথায় কতখানি পড়িয়াছে তাহা নির্ধারণ করা যাইবে।

২২-সংখ্যক গীতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীরাধাকে সখী অনুরোধ করিয়াছে। 'যামুনজলকণিকাভিরূপেতে' প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—হে রাধিকে, যমুনার জলকণা-সিক্ত উজ্জ্বল কুসুমশোভিত কুঞ্জে সঙ্কেত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে সখি, তোমার সহিত বিহারকামী গোপরাজ-কুমারকে ভজনা কর। অন্য তরুণীকে পরিহার করিয়া তিনি তোমার উপরেই সমস্ত সৌহার্দ্য ন্যস্ত করিয়াছেন, নবগুঞ্জাফলের মালা এবং মাল্যবিহারী মধুপকে স্বীকার করিয়াছেন। নির্মল নর্মপরিহাসে পটু সনাতনশীল গোপকে ভজনা কর।

এই গীতের অনুবাদ—

যমুনার জলকণা যুক্ত কুঞ্জান্তরে।
উজ্জ্বল করিয়া তাহে বৈসে একান্তরে॥
তোমাতে অর্পিয়ে প্রেম অন্তরঙ্গভার।
করেছেন ত্যাগ পররমণী এবার॥
ভজ সখি গোপরাজ সে নন্দকুমার।
বিহারাভিলাষ যাঁর সঙ্গেতে তোমার॥
নবগুঞ্জফলে রচা মালা মনোহর।
বিহার করিছে তাতে বসিয়া ভ্রমর॥
শুদ্ধ পরিহাস তাঁর প্রকাশ স্বভাব।
যুক্ত তাহে সনাতন লীলার প্রভাব॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ১৬৯৪)

শ্রীরূপ উজ্জ্বল কুসুমশোভিত কুঞ্জের কথা বলিয়াছেন, অনুবাদে কুসুমাদির উল্লেখ নাই, শ্রীকৃষ্ণই কুঞ্জান্তরকে উজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছেন। আর বসিয়াছেনই বা কেন? শ্রীরূপ লিখিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ প্রতীক্ষা করিতেছেন, অনুবাদে তাহা নাই। অনুবাদের মধ্যে গীতের ক্রমভঙ্গও হইয়াছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ চরণের বিষয় অনূদিত পদে তৃতীয় ও চতুর্থে আসিয়া গিয়াছে। শেষাংশটিও কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে।

শ্রীরূপের এই গীতের প্রভাব পদাবলীসাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

সুন্দরি আর কত সাধসি মান।
তোহারি অবধি করি নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি,
কানু ভেল বহুত নিদান॥

(পদামৃতমাধুরী: ৩য়—পৃঃ ৩৭৯)

শ্রীরূপের গীতের ন্যায় এখানেও মানিনী শ্রীরাধাকে সখী বলিতেছে। তাহা ছাড়া, পদের 'তোহারি অবধি করি' কথাটির অর্থ একমাত্র তোমাকে চিন্তা করিয়া, এখানে প্রতিধ্বনি শুনিতেছি শ্রীরূপের সেই কথাটির—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার উপরেই সমস্ত সৌহার্দ্য ন্যস্ত করিয়াছেন।

ঘনশ্যামের পদে রহিয়াছে—

ঘোর তিমির অতি ঘন কাজর জিতি
নিবসই বিপিনে একান্ত। (তরু ৪৯১)

সখী শ্রীরাধাকে জানাইতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কজ্জলাতিরিক্ত অন্ধকারে নির্জন বিপিনে অবস্থান করিতেছেন। পদের এই বিষয়টি শ্রীরূপের গীতের দ্বারা প্রভাবিত; কারণ, শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে তোমার জন্য অবস্থান করিতেছেন। পদটিতে মূলের যতখানি প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা অপেক্ষা বেশী প্রভাব পড়িয়াছে অনুবাদের; কেননা অনুবাদের 'একান্তরে' শব্দটিই কিছু পরিবর্তিত হইয়া পদে 'একান্ত' হইয়াছে।

১২-সংখ্যক গীতে 'তব চঞ্চলমতিরয়মঘহন্তা' ইত্যাদি রহিয়াছে। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, মানিনী শ্রীরাধা সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে পরাঙ্মুখী হইয়া সখীকে বলিতেছেন—তোমার এই অঘাসুরবিনাশী (শ্রীকৃষ্ণ) চঞ্চলস্বভাব, আমার উত্তম ধৈর্যগুণের দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইয়াছে। হে দূতী, তুমি চাটুকার মধুসূদনকে বিদূরিত কর! আমি তাহার সহিত আর বাক্য প্রয়োগ করিব না। তোমার এই বনমালী শঠচরিত্র; আমি কোমলহৃদয়া ও কুলরীতিপরায়ণা। তোমার এই হরি উচ্ছৃঙ্খল কেলিনিরত; আমি সনাতন-ধর্মাচরণপরায়ণা।

এই গীতটির অনুবাদ—

ত্যাগ কর দূতি তুমি কোমল কথনে।
আর না কহিব কথা সেই কালা সনে॥
তোমার কৃষ্ণের হয় সচঞ্চল মতি।
আমি ত উত্তমা ধীরা হই ধৈর্যবতী॥
বনমালী হন অতিশয় শঠ।
আমি কুলবতী স্নিগ্ধ হৃদয়াকপট॥
কৃষ্ণ বন্য অশাসিত পরিহাস কর্মে।
আমি সে আবদ্ধ সদা সনাতনধর্মে॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ১৫১১)

মূলের সহিত এই অনুবাদের দুইটি বিষয়ে পার্থক্য ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, ধ্রুবপদ প্রথমে গিয়াছে এবং 'চাটুকার মধুসূদনকে বিদূরিত কর' স্থলে 'ত্যাগ কর দূতি তুমি কোমল কথনে' লেখা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরূপের গীতে শ্রীরাধা যেখানে বলিয়াছেন—এই অঘাসুরবিনাশী চঞ্চলস্বভাব, আমার উত্তম ধৈর্যগুণের দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইয়াছে,

তাহার অনুবাদে পদকার 'অঘাসুরবিনাশী' স্থলে 'শ্রীকৃষ্ণ' লিখিয়াছেন এবং দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি বাদ দিয়াছেন।

শ্রীরূপের আলোচ্য গীতের কিছু প্রভাব পড়িয়াছে চম্পতির একটি পদে। চম্পতি লিখিয়াছেন—

সোবর শঠগণ গুরুবর গুরুতর
আছুগুণ খলনিধি সার।
হাম অবলা জাতি তাহে দুখিত মতি
কৈছনে না পাইএ পার॥ (তরু ৫৩২)

উদ্ধৃত অংশে সখীকে সম্বোধন করিয়া মানিনী শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের বৈপরীত্য দেখাইতেছেন, এখানে শ্রীরূপের ১২-সংখ্যক গীতের অনুরূপ ব্যাপারই ঘটিয়াছে।

'গীতাবলী' সম্বন্ধে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইহাতে বিরহ-বিষয়ক গীত বিশেষ নাই, কেবলমাত্র ৩২-সংখ্যক গীতে বিরহিণী শ্রীরাধার ব্যাধিদশা বর্ণিত হইয়াছে। এই পদটিও আবার অনূদিত হয় নাই। ইহাতে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, বিরহের পদাবলী শ্রীরূপের বিশেষ প্রিয় ছিল না এবং তাঁহার বিরহ-বিষয়ক গীত পদাবলী-সাহিত্যকেও বেশী পরিমাণে প্রভাবিত করে নাই।

'গীতাবলী'র ১৫-সংখ্যক গীতে ভাবোল্লাস বর্ণিত হইয়াছে। 'রাজপুরাদ্গোকুলমুপ-যাতং' ইত্যাদি চরণের মাধ্যমে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) যেন রাজধানী মথুরা হইতে গোকুলে আগমন করিয়াছেন এবং সেই আনন্দে নন্দরাজ ও যশোদা অত্যন্ত প্রমোদিত হইয়াছেন। হে সখি, কুন্দকুসুমের অবতংসধারী মুকুন্দকে আজ আবার আমি দর্শন করিয়াছি। পরমোৎসবে গোপগণ ঘুরিতেছে এবং তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নয়নযুগলের ইঙ্গিতে আমার অতুল পরিতোষ জন্মিতেছে। নবগুঞ্জাবলীর দ্বারা তাঁহার শোভা বর্ধিত, সুহৃদ্গণের প্রতি (তাঁহার) অনুরাগ সনাতন ও প্রবল।

এই গীতের অনুবাদ হইয়াছে—

আজ স্বপ্নে হেরিলাম পুন কৃষ্ণ রসধাম
মস্তকেতে চূড়া সুশোভন।
নব গুঞ্জ বেড়া তায় সন্তোষ দিতে আমায়
ধরে যেন ইঙ্গিত নয়ন॥

সাজিয়া এরূপ মতে মথুরা নগর হতে
করিছেন গোকুলে গমন।
আনন্দে উন্মাদময় জনক জননী হয়
আর যত সব পরিজন॥
পরম উৎসব ময় গোপকুল সমুদয়
উচ্চরব করেন কীর্তন।
প্রবল করিয়া মন মিত্র সেই সনাতন
অনুরাগ করেন বর্ধন॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ১৯৯৩)

অনুবাদে গীতের বিষয়গুলি অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ক্রম কিছুমাত্র রক্ষিত হয় নাই। কীর্তনাদির কথাও অতিরিক্তভাবে আসিয়াছে।

স্বপ্নে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণদর্শনের কথা শ্রীরূপ নূতন বলেন নাই, কবি বিদ্যাপতি তাঁহার পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বিদ্যাপতির বর্ণনার সহিত শ্রীরূপের বর্ণনার প্রচুর পার্থক্য আছে।

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

আওল গোকুলে নন্দকুমার।
আনন্দ কোই কহই জনি পার॥
কি কহব রে সখি রজনিক কাজ।
স্বপনহি হেরলু নাগর-রাজ॥
আজু শুভ নিশি কি পোহায়লু হাম।
প্রাণ-পিয়ায়ে করলু পরণাম॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারী।
ধৈরজ করহ তুহে মিলব মুরারি॥ (তরু ১৭৬৪)

বিদ্যাপতি পদে একবারমাত্র বলিলেন 'আনন্দ কোই কহই জনি পার' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আগমন উপলক্ষে নন্দ-যশোমতী, গোপগোপী কাহারও উল্লেখ করিলেন না। শ্রীরূপ এমন করেন নাই।

আমরা শ্রীরূপের পরিকল্পনার প্রভাব লক্ষ্য করি পুরুষোত্তমদাসের পদে। পদকর্তা পুরুষোত্তমদাস লিখিয়াছেন—

হেরত সপনে সোই ব্রজ বল্লভ
আওল গোকুলপুর।
ধাওল ব্রজজন আনন্দ নিমগন
জয় জয় মঙ্গল পুর ॥
যশোমতি ধাই কোর পর নাওল
চুম্বয়ে ও মুখ চান্দে।
ব্রজ-রমণীগণ করয়ে নিরীক্ষণ
আনন্দ হিয়া নাহি বান্ধে ॥ (তরু ৫২।১৭৬২)

শ্রীরূপের লেখার আদর্শে এই পদে স্বপ্নে ব্রজবল্লভকে কেবল গোকুলে আসিতেই দেখা যাইতেছে না, সমস্ত ব্রজজনসহ যশোমতীও আনন্দে নিমগ্ন হইয়াছেন পরিলক্ষিত হইতেছে।

শ্রীরূপ-রচিত 'গীতাবলী'র ২১-সংখ্যক গীতে শ্রীকৃষ্ণের অনুপম রূপ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন 'সৌরভ সেবিত পুষ্পবিনির্মিত' ইত্যাদি ; অর্থ—সৌরভসম্পন্ন পুষ্প-নির্মিত সুনির্মল বনমালা দ্বারা যাঁহার অঙ্গ পরিশোভিত, যাঁহার কান্তি মন্দহাস্যে সর্বদাই যুক্ত, যিনি মুখপদ্মের নব নব বিভ্রমে সুপণ্ডিত, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। যিনি মরকতমণির তৈয়ারী জবাফুল-সদৃশ সুন্দর, যাঁহার উৎকৃষ্ট স্বর্ণের ন্যায় পীত বসন, যিনি বৃন্দাবনবাসী জনগণের নিকট ইন্দ্রস্বরূপ (তিনি জয়যুক্ত হউন), যিনি অভিনব গুঞ্জা-ফলশ্রেণী দ্বারা মণ্ডিত, যিনি ময়ূরপুচ্ছের শিখর দ্বারা অতিশোভিত, যিনি নিখিল গোপাঙ্গনাগণের মানসরূপ ভ্রমরের পুষ্পিত অশোকতরুস্বরূপ (তিনি জয়যুক্ত হউন), যিনি মধুর মুরলীধ্বনি করিতে অতি-বিচক্ষণ, যিনি ব্রজবাসী নন্দের আনন্দবর্ধক, যাঁহাকে শিব-সনক-সনন্দ-নারদ ও ব্রহ্মাদি দেবগণ বন্দনা করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

এমন শ্রীকৃষ্ণরূপ বিষয়ক গীতটি ভাষান্তরে দাঁড়াইয়াছে—

জয় জয় সুন্দর মরকত কান্তিধর
স্বর্ণ জিনি পীতাম্বরধারী।
বৃন্দাবন শোভাকর জনগণ পুরন্দর
তাহাদের হও মনোহারী ॥
অনুপম সৌরভিত পুষ্পময় সুনির্মিত
বনমালা গলে শোভাকর।
মন্দহাস্য কান্তময় বদন-অম্বুজে রয়
ইঙ্গিতের পণ্ডিত প্রবর ॥

নব গুঞ্জফলে করে সমুজ্জ্বল শোভা ধরে
শিখিপুচ্ছ শিরের উপর।
গোপীগণের মানস ভ্রমরে দিতে সরস
পুষ্পিত অশোক তরুবর॥
মধুর মুরলীধ্বনি করিতে পটু আপনি
শ্রীনন্দের আনন্দবর্ধন।
গিরিশাদি সনাতন নারদ কমলাসন
করেছেন তোমারি বন্দন॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ২০৯৪)

অনুবাদে ধ্রুবপদটি প্রথমে বসিয়াছে। মুখপদ্মের নব নব বিভ্রমকে অনুবাদক 'ইঙ্গিত' কথায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'তাহাদের হও মনোহারী' প্রভৃতি অতিরিক্ত আসিয়াছে। এই সব সামান্য অসামঞ্জস্য ছাড়া অনূদিত পদটির মধ্যে সেরূপ বড় কোন ত্রুটি নাই, ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ সুন্দর একটি পদের রূপ পাইয়াছে।

এই গীতের প্রভাব পদাবলীসাহিত্যে লক্ষণীয়। অজ্ঞাতনামা কোন একজন পদকারের পদে রহিয়াছে—

ইন্দ্রের নন্দন বন তাহে জিনে বৃন্দাবন
সদা কৃষ্ণ তাহে বিলসয়ে।
ইন্দ্রের নাশিলা গর্ব কালি মদ করি খর্ব
বলে কংস সবংশে ঘাতয়ে॥

(তরু ৪।১৮৬।২৬৫৯)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা-প্রসঙ্গে পদকার এই যে ইন্দ্রের অবতারণা করিয়াছেন, ইহা শ্রীরূপের গীতের 'যিনি বৃন্দাবনবাসী জনগণের নিকট ইন্দ্রস্বরূপ' কথাটিই স্মরণ করাইয়া দেয়।

গোবিন্দদাসের একটি পদে রহিয়াছে—

নন্দ সুনন্দন ভুবন আনন্দন।
নাগরী নারী হৃদয় ঘন চন্দন॥

(পদামৃতমাধুরী : ২য়—পৃঃ ৮৭)

এখানে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া গোবিন্দদাস যে নন্দ সুবন্ধনাদির আনন্দবর্ধন-রূপে শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণনা করিলেন, ইহার পিছনে রহিয়াছে শ্রীরূপের গীতের প্রভাব।

'গীতাবলী'র দুইটি গীতে শ্রীরূপ স্বয়ং ভক্তহিসাবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন। ২৪-সংখ্যক গীতে শ্রীকৃষ্ণকৃপার জন্য শ্রীরূপ 'যদ্যপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি' ইত্যাদি লিখিয়াছেন; ইহার অর্থ—হে অচ্যুত, চতুরানন ব্রহ্মাও ধ্যানযোগে তোমার নখকান্তি পর্যন্ত দর্শনে অক্ষম, কিন্তু আমি তোমার দয়ার তরঙ্গ শুনিয়া এইরূপ কামনা করিতেছি যে, হে দেব, আমি তোমার বন্দনা করি, আমার মানসভৃঙ্গকে আপনার বিকশিত পাদপদ্মের মকরন্দপানে নিযুক্ত কর। হে মাধব, যদিও তোমাতে তিলমাত্রও ভক্তি আমার নাই, তথাপি হে পরমেশ্বর, তোমার ঐশ্বর্যমাহাত্ম্যে দুর্ঘট কার্যেরও ঘটনা হওয়া অসম্ভব নহে। আমার মানসভৃঙ্গ মকরন্দপানে লুব্ধ হইয়া তোমার পাদপদ্মে নিশ্চলরূপে বাস করুক, তাহা হইলে মাধুর্যসার অবশ্যই লাভ করিবে। হে সনাতন, তোমার এই পাদপদ্ম অমৃতকেও ঘৃণা করিতেছে।

শ্রীরূপের কথাগুলি বাংলা পয়ারে ধরিতে গিয়া লেখা হইয়াছে—

ওহে হরি আমি করি বন্দনা তোমার।
কৃপা করি অভিলাষ পুরাও আমার॥
তোমার চরণ-পদ্ম সুধার আকর।
মম মন ভৃঙ্গে রাখ তাহার উপর॥
তব নখাগ্রে সেই অপূর্ব কিরণ।
ব্রহ্মা সমাধিতে নাহি পায় দরশন॥
তাহা ইচ্ছা করি আমি দেখিবার তরে।
এ কেবল তব কৃপা তরঙ্গের ভরে॥
তোমাতে আমার যদি ওহে শ্রীমাধব।
তিলমাত্র ভক্তি হেন না হয় সম্ভব॥
তথাপি তোমার যত ঈশ্বরীয় কার্য।
অঘট ঘটনা হয় আছে ইহ ধার্য॥
এই অভিলাষ মোর শুন সনাতন।
অমৃতনিন্দিত হয় তোমার চরণ॥
এ মানস মধুকর হয়ে অচঞ্চল।
অদ্ভুত রসসার ধরিয়া সকল॥

করুক তোমার পদে নিত্য আশ।

পাইয়া মাধুর্যে যদি পুরাইয়ে আশ ॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ২০৯২)

অনুবাদটিতে স্থানে স্থানে ছন্দ-শিথিলতা আসিয়াছে, যেমন 'করুক তোমার পদে নিত্য আশ' ইত্যাদি। ইহা ছাড়া ধ্রুবপদ কিছু পরিবর্তিত রূপে প্রথমে বসিয়াছে মাত্র।

শ্রীরূপের এই গীতে চতুরানন ব্রহ্মার যে প্রসঙ্গ আসিয়াছে, তাহা বিদ্যাপতির 'কত চতুরানন মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা' স্মরণ করাইয়া দেয়।

শ্রীরূপের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রার্থনার পদ নরোত্তম প্রভৃতিকে প্রভাবিত করিয়াছে; তাঁহাদের পদাবলীতে ইতস্ততঃ শ্রীরূপের উক্তির অনুরণন শুনা যায়।

নরোত্তম যে বলিয়াছেন—

শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে শুনিয়াছি এই সবে

হরিপদ অভয় শরণ।

জনম লইয়া সুখে কৃষ্ণ না বলিলাম মুখে

না করিলাম সেরূপ ভাবন ॥

ইহার মধ্যে শ্রীরূপের 'যদিও তোমাতে তিলমাত্র ভক্তি আমার নাই' ইত্যাদির প্রভাব রহিয়াছে।

গোবিন্দদাস গৌরচন্দ্রিকার পদে যে 'ভকত ভ্রমরগণ ভোর' লিখিয়াছেন, সেখানে ভক্তকে ভ্রমররূপে চিন্তা করিতে গিয়া তিনি বোধ করি শ্রীরূপের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। শ্রীরূপের পূর্বে দণ্ডী কাব্যরসপিপাসুকে ভ্রমররূপে চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই ভক্তকে ভ্রমর বলেন নাই।

শ্রীরাধার কৃপা প্রার্থনা-বিষয়ক ১৪-সংখ্যক গীতে শ্রীরূপ 'দামোদররতিবর্ধনবেশে' ইত্যাদি লিখিয়াছেন। চরণগুলির অর্থ এইরূপ—দামোদরের রতিবর্ধনবেশধারিণী শ্রীকৃষ্ণের গৃহারামস্বরূপা হে বৃন্দাবনেশ্বরী, মাধবদয়িতা গোকুলগোপীকুলভূষিতা, তোমার জয় হউক। তুমি বৃষভানুরাজরূপ সমুদ্রের নবোদিত চন্দ্রলেখাস্বরূপা, তুমি ললিতার প্রিয়সখী এবং সৌহার্দ্যগুণে বিশাখাকেও বশীভূত করিয়াছ, কারুণ্যরসে তুমি সর্বদা পরিপূর্ণা, সনক-সনাতনও তোমার গুণ বর্ণনা করেন, (তুমি) এখন আমাকে করুণা কর।

ইহার অনুবাদ হইয়াছে—

জয়যুক্ত হও রাধে শ্রীকৃষ্ণরমণী।

ব্রজাঙ্গনা যুবতীগণের মান্যা ধনী ॥

কৃষ্ণরতি বিবর্ধন কর বেশ ধরি।
হরি উপবন রয় বৃন্দাবনেশ্বরি ॥
বৃষভানু সাগরের নবচন্দ্ররেখা।
সখীগণে মনোহর রমণ বিশাখা ॥
কৃপা আভরণা মোরে করহ করুণা।
সনক সনাতন করে চরিত বর্ণনা ॥

(ক. বি. পুঁথি ৬২০৪, পদ ২০৯০)

স্বল্পায়ত এই অনূদিত পদের মধ্যে মূলের প্রত্যেকটি কথাই সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, কেবল ললিতার উল্লেখ নাই। শ্রীরূপের গীতের প্রভাবেই আমরা এইরূপ একটি রসসমৃদ্ধ অনিন্দ্য পদ পাইয়াছি।

তাহা ছাড়া, নরোত্তম দাস লিখিয়াছেন—

প্রাণেশ্বরি এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি অঞ্জলি মস্তকে করি
এই জন নিবেদন করে ॥
প্রিয় সহচরী সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
তুয়া প্রিয় ললিতা-আদেশে।
তুয়া প্রিয় নিজ সেবা দয়া করি মোরে দিবা
করি যেন মনের হরিষে ॥
প্রিয় গিরিধর সঙ্গে অনঙ্গ খেলন রঙ্গে
ভঙ্গ বেশ করাইতে সাজে।
রাখ এই সেবা কাজে নিজ পদ পঙ্কজে
প্রিয় সহচরীগণ মাঝে ॥ (তরু ৪।৮৩।৩০৬৭)

শ্রীরাধার উদ্দেশে এই প্রার্থনার পদে যে, সখীগণের বিশেষ করিয়া ললিতার উল্লেখ করা হইয়াছে, আরও 'এইবার করুণা কর মোরে' ভঙ্গীতে মনের আকুল আবেগ ব্যক্ত করা হইয়াছে, ইহার পশ্চাতে শ্রীরূপের গীতের 'তুমি ললিতার প্রিয়সখী' এবং 'এখন আমাকে করুণা কর' কথাগুলির প্রভাব পড়িয়াছে।

বৈষ্ণবদাসের 'মদীশ্বরি তুমি মোরে করিবে করুণা' ইত্যাদি পদের (তরু ৪।৯৪। ৩০৭৮) শ্রীরূপের এই গীতের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

'গীতাবলী'র যে গীতগুলি অনূদিত হয় নাই, আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় দেখা যায় সেইগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যান্বিত নহে। বোধ করি এই গীতগুলি কেবল অনুবাদককেই প্রভাবিত করিতে অসমর্থ হয় নাই, পরবর্তী কালের পদকারদেরও দিগ্‌দর্শী হইতে অক্ষম হইয়াছে। কতকগুলি গীত পূর্বালোচিত গীতগুলিরই রূপান্তর মাত্র, যেমন নন্দোৎসব বিষয়ক ২-সংখ্যক গীত ১-সংখ্যক গীতের, রূপানুরাগ বিষয়ক ৩, ২০ ও ৩৫-সংখ্যক গীত ২১-সংখ্যক গীতের, হোরি ও দোলোৎসব বিষয়ক ৪, ৫ ও ৩৮-সংখ্যক গীত ৪০-সংখ্যক গীতের, জলকেলি বিষয়ক ৪১-সংখ্যক গীত পূর্বালোচিত ৪২-সংখ্যক গীতের এবং মানিনীর প্রতি সখীর উক্তি সম্বন্ধীয় ৩৬ ও ৩৭-সংখ্যক গীত ২২-সংখ্যক গীতের সমগোত্রীয়। এইগুলির স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার প্রয়োজন নাই। তাহা ছাড়া, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা সম্বন্ধীয় যথাক্রমে ৩১, ৩২ ও ৩৩-সংখ্যক গীতের কোন অনুবাদ না থাকায় সেইগুলির প্রভাবের রাহিত্যই সূচিত হইতেছে, সুতরাং এই প্রসঙ্গে সেইগুলিরও আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখি না।

॥ বিদগ্ধমাধবের প্রভাব ॥

শ্রীরাধার বিলাস ও বিচ্ছেদ চিহ্নিত চতুঃষষ্ঠীকলাযুক্ত 'বিদগ্ধমাধব' নাটক শ্রীরূপ গোস্বামীর কবিকৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের শেষে বিদ্বদ্বর শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

নন্দসিন্ধুরবাণেন্দু-সংখ্যে সংবৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্ ॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ৪৪৮)

অর্থাৎ—নন্দসিন্ধুর বাণেন্দু- সংখ্যক সম্বৎসর (নন্দ ৯, সিন্ধু ৮, বাণ ৫, ইন্দু ১—অঙ্কের বামাগতি, সুতরাং ১৫৮৯ সম্বৎসর, ১৪৫৪ শক বা ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ) গত হইলে গোকুলে 'বিদগ্ধমাধব' নামক নাটক প্রণীত হয়।

নাটকের এই সমাপ্তি-কাল লক্ষ্য করিলে আমরা দেখি, শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালে ইহা সমাপ্ত হইয়াছে। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিতেছেন—

প্রভু কহে 'কহ রূপ নাটকের শ্লোক।
যেই শ্লোক শুনি লোকের যায় দুঃখ শোক ॥'

বার বার প্রভু তাঁরে আজ্ঞা যদি দিল।
তবে সেই শ্লোক রূপ কহিতে লাগিল ॥

(চৈ. চ. অন্ত্য, পৃঃ ১৬)

কোন্ কোন্ শ্লোক শ্রীচৈতন্যের আস্বাদনের জন্য শ্রীরূপ বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা দেখি, 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের যথাক্রমে প্রথমাঙ্কের ১৩, ১, ২, ১০, ৮, ৬-সংখ্যক শ্লোক, দ্বিতীয়াঙ্কের ৮, ৭, ৩৩, ১৪, ৪৬, ১৮-সংখ্যক শ্লোক, পঞ্চমাঙ্কের ৩য় শ্লোক, পুনর্বার দ্বিতীয়াঙ্কের ৪১, ৪৫, ৩৭-সংখ্যক শ্লোক, তৃতীয়াঙ্কের ৮ম, পুনরায় প্রথমাঙ্কের ১৯, ২০, ৩১-সংখ্যক শ্লোক, তৃতীয়াঙ্কের ১ম শ্লোক, পঞ্চমাঙ্কের ১৫-সংখ্যক শ্লোক, চতুর্থাঙ্কের ৮ম সংখ্যক শ্লোক, প্রথমাঙ্কের ২৩ ও ২৮, পঞ্চমাঙ্কের ১৮ এবং দ্বিতীয়াঙ্কের ৫০-সংখ্যক শ্লোক শ্রীরূপ আবৃত্তি করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই বর্ণনার সত্যতার বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, গ্রন্থ-সমাপ্তির কালের সহিত গ্রন্থারম্ভকালের বেশ-কিছু ব্যবধান থাকিতে পারে, সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালে শ্রীরূপ যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন তখন 'বিদগ্ধমাধব'-এর পঞ্চমাঙ্ক পর্যন্ত অন্ততঃ রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ হইলে শ্রীচৈতন্যের পক্ষে শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধবের পূর্বনির্দিষ্ট শ্লোকাবলীর আস্বাদন করা সম্ভব হয়। আমাদের অনুমানের পিছনে একটি স্পষ্ট প্রমাণও রহিয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতে স্বরূপ-দামোদর বঙ্গদেশীয় কবিকে বলিয়াছেন—"রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে।" (চৈ. চ. অন্ত্য, ৫।১০৮)। এখানে শ্রীরূপের গ্রন্থ-রচনা শেষ হইয়াছে বলা হয় নাই, বরং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরম্ভের কথাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

শ্রীরূপের 'বিদগ্ধমাধব' পদাবলীসাহিত্যেরও উৎস ও প্রেরণাস্থল। বহু পদকর্তা পদ-রচনার বিষয়ে এই 'বিদগ্ধমাধব'-এর দ্বারা বহুভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। আমরা 'বিদগ্ধমাধব'-এর প্রভাবকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিতে পারি—(১) বিদগ্ধমাধবের শ্লোকাবলীর অনুসরণক্রমে পদকর্তৃগণ সুন্দর সুন্দর পদ প্রণয়ন করিয়াছেন। পদকর্তা যদুনন্দন দাস শ্লোকাবলীর অনুবাদ করিতে গিয়াও স্বয়ংসম্পূর্ণ পদই রচনা করিয়াছেন। (২) বিদগ্ধমাধবে বর্ণিত অনেক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কালের পদকারগণ অসংখ্য পদ রচনা করিয়াছেন। (৩) শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধবে মৌলিকভাবে সৃষ্ট বহু চরিত্র, যেমন পৌর্ণমাসী, মধুমঙ্গল, চন্দ্রাবলী (শ্রীরাধার সহিত স্বতন্ত্র), শৈব্যা প্রভৃতিকে লইয়া পরবর্তী কালের পদাবলী গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রথমতঃ, শ্লোকাবলীর অনুবাদ ও অনুসরণের কথা। 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের প্রথমাঙ্কে যেখানে নান্দীমুখীর কাছে শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণেই শ্রীরাধার রোমাঞ্চাদি ভাবের কথা ভগবতী পৌর্ণমাসী শুনিয়াছেন, সেখানে সব-কিছু শুনিয়া পৌর্ণমাসী তাঁহার মনোভাব জানাইতে বলিয়াছেন—'এমনি হয়'। শ্রীরূপ পৌর্ণমাসীর মুখে বিখ্যাত শ্লোকটি সংযোজিত করিয়াছেন—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥
(শ্লোক ৩৩, পৃঃ ২৪)

অর্থ—কতখানি অমৃত দিয়া কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় সৃষ্ট হইয়াছে তাহা জানা যায় না; কারণ, ইহা বদনে নৃত্য করিতে থাকিলে অসংখ্য বদন পাইবার জন্য ইচ্ছা হয়, কর্ণকুহরে অঙ্কুরিত (প্রবিষ্ট) হইলে অর্বুদ সংখ্যক কর্ণের জন্য বাসনা জাগায়, চিত্তপ্রাঙ্গণের সঙ্গী হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকে পরাস্ত করে।

এই শ্লোকটির অনুসরণে পদ রচনা করিতে গিয়া যদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন—

মুখে লৈতে[১] কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম[২]
আরতি বাড়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে[৩] হিয়া[৪]
অনেক তুণ্ডের[৫] বাঞ্ছা হয় ॥
কি কহিব[৬] নামের মাধুরী।
কেমনে আনিয়া[৭] দিয়া কে জানি[৮] গড়িল[৯] ইহা[১০]
কৃষ্ণ এই দুআঁখর করি[১১] ॥
আপন মাধুরি গুণে[১২] আনন্দ বাড়ায় কানে
তাতে কালে অঙ্কুর[১৩] জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ[১৪] কান যবে হয় তবে নাম
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে ॥

কৃষ্ণ দুআখর[১৫] দেখি জুড়ায়[১৬] তপত আঁখি

অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।

যদি[১৭] হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণরূপ[১৮] দেখি

নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥

চিত্তে[১৯] কৃষ্ণনাম যবে[২০] প্রবেশ করয়ে তবে[২১]

বিস্তারিত হৈতে[২২] হয় সাধ।

সকল ইন্দ্রিয়গণ করে[২৩] অতি আহ্লাদন

নামে করে প্রেম উনমাদ॥

যে কানে[২৪] পরশে নাম সে তেজয়ে আন কাম[২৫]

সব ভাব করয়ে[২৬] উদয়[২৭]।

সকল মাধুর্য স্থান সব[২৮] রস কৃষ্ণনাম

এ যদুনন্দন দাস কয়[২৯]॥

(রসকদম্ব—নৃত্যলাল শীল সংস্করণ, পৃঃ ১২)

পাঠান্তর :—

বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ পাঠমন্দিরের ১০৭ (১৮)-সংখ্যক অনুবাদ পুঁথি (লিপিকাল ১০৪৩ সাল)—২ অভিরাম, ৩ ধরিতে না পারে, ৭ কেমন অমিঞা, ১১ দুই বর্ণ করি, ১২ নাম সুমাধুরি গুণে, ১৩ কানের অঙ্কুর, ১৮ হএ লাখ, ১৫ দু অক্ষর, ১৮ কৃষ্ণনাম। যে কানে……কয় পর্যন্ত ভণিতা-সম্বলিত স্তবকটি নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথি—

(ক) ২৯৯-সংখ্যক পুঁথি—১ কৈতে, ৩ ধরিতে না পারে, ৫ তাণ্ডব, ৬ কহব, ৭ কেমন অমিয়া, ৮ কে জানে, ৯ গঢ়ল, ১০ তাহা, ১১ কৃষ্ণ এই দুই আখর রি, 'আপন মাধুরি গুণে' হইতে 'করিয়ে আস্বাদনে' পর্যন্ত স্তবকটি নাই, ১৬ জুড়ায়ে, ১৭ যবে, ২১ উদয় করয়ে তবে, ২২ কৈতে, ২৪ যেখানে, ২৭ উদয়ে, ২৮ সর্ব, ২৯ কয়ে।

(খ) ১২১২-সংখ্যক পুঁথি—৬ কহব, ৭ কেমন অমিয়া, ৮ জানে, ৯ গঢ়ল, ১০ তাহা, ১৩ তাথে কর্ণের আনন্দ, ১৮ নাম, ১৯ চিতে, ২০ যার, ২১ তার, ২৩ করি, ২৫ তেজএ আপন কাম, ২৬ করায়, ২৮ সর্ব।

পদকর্তা যদুনন্দন দাসের অনূদিত পদটি মূলের সহিত মিলাইয়া লইলে দেখা যায়, পদকর্তা শ্লোকের অর্থটি সুস্পষ্ট করিবার জন্য অনেকক্ষেত্রে কিছু বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছেন। যেমন, কৃষ্ণনাম মুখে লইতে অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা কেন হয় তাহা বলিতে

যদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন 'নাম সুমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয়া', অসংখ্য কর্ণ হইলে কী হইবে তাহার উত্তরেই জানাইয়াছেন 'যবে হয় তবে নাম মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে'। এইগুলি পদকর্তা কর্তৃক শ্লোকোক্ত ভাবের সম্প্রসারণ ভিন্ন কিছু নহে। পদকর্তা স্বাধীনভাবেও কয়েকটি স্তবক রচনা করিয়াছেন ; যেমন, আঁখির প্রসঙ্গ শ্রীরূপ লেখেন নাই, কিন্তু পদকর্তা লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম ও তনু যে ভিন্ন নহে, এমন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যদুনন্দনের পদে ব্যক্ত হইয়াছে। শেষ স্তবকটিও পদকর্তা যদুনন্দনের অতিরিক্ত সংযোজনা, ইহার দ্বারা পদকর্তা নাম শ্রবণে শ্রীরাধার পূর্বরাগ সঞ্চারের বিষয়টি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীরূপের শ্লোকের ভাবটি অনুসরণ করিয়াই চৈতন্যোত্তরকালের দ্বিজ চণ্ডীদাস (চণ্ডীদাসের পদাবলী—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার) লিখিয়াছেন—

সই কেবা শুনাইলে শ্যামনাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥ (তরু ১৪১)

উপরি-ধৃত পদে শ্রীরূপের বর্ণনার আদর্শে নাম শ্রবণেই শ্রীরাধার পূর্বরাগের সঞ্চার হয় নাই, শ্রীরাধা চিন্তাও করিয়াছেন শ্যামনামে কতখানি মধু আছে। শ্রীরূপের বর্ণনার মতো চণ্ডীদাসও লিখিয়াছেন, শ্রীরাধা মনে করিতেছেন শ্যামনাম তাঁহার কর্ণের মধ্যে সুপ্রবেশ করিয়াছে এবং বদনও তাহা ছাড়িতে না পারিয়া অনবরত জপ করিয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত বর্ণনা পদটির উপর শ্রীরূপের প্রভাবের পরিচায়ক।

'বিদগ্ধমাধব'-এর প্রথমাঙ্কের ৬৯-সংখ্যক শ্লোকে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

নাদঃ কদম্ববিটপান্তরতো বিসর্পন্
কো নাম কর্ণপদবীমবিশন্ন জানে।
হা হা কুলীনগৃহিণীগণগর্হণীয়াং
যেনাদ্য কামপি দশাং সখি লম্ভিতাস্মি॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ৫৪)

অর্থ—শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন—সখি, কদম্বকাননের অন্তরাল হইতে কি একটি নাদ আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে ; হায়, হায়, আমি তাহাতেই কুলীন-গৃহিণীদের নিন্দনীয় কি এক দশায় পড়িয়াছি।

যদুনন্দন ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন—

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিঞা পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া পেলি সুমাধুর্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে ॥
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোহে।
হাহা কুলরমণীর গ্রহণ করিতে ধীর
যাতে কোন দশা কৈল মোহে ॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ২৪)

এই পর্যন্ত পদকর্তা শ্রীরূপ-রচিত শ্লোকের নিছক অনুবাদই করিয়াছেন। কিন্তু পরেই শ্রীরূপ যেখানে লিখিয়াছেন—

ললিতা। হলা এসো মুরলীরও।
রাধিকা। (সব্যথং সংস্কৃতেন)
অজড়ঃ কম্পসম্পাদী শাস্ত্রাদন্যো নিকৃন্তনঃ।
তাপনোঽনুষ্ণতাধারী কো বায়ং মুরলীরবঃ ॥
(ইত্যুদ্বেগং নাটয়ন্তী)
হলা নাহং মুরলীণাঅস্স অণহিণ্ণা তা অলং বিপ্পলম্ভেণ।
ফুড়ং এসো কেণ বি মহাণাঅরেণ কো বি মোহণমন্তো পঢীঅদি ॥ (বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ৫৫)

অর্থাৎ—

ললিতা। সখি, এ মুরলীর রব।
রাধিকা। (ব্যথিতভাবে সংস্কৃতে) ইহা হিম নহে, তথাপি কম্পিত করিতেছে ; শাস্ত্র নহে, তবু মর্মচ্ছেদন করিতেছে ; তাপ না হইলেও জ্বালা উৎপাদন-কারী। ইহা কেমন বা মুরলীর রব ? (উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া) সখি, আমি মুরলীর রব অনেক শুনিয়াছি, সুতরাং ছলনার প্রয়োজন নাই। নিশ্চিত কোন মহানাগর কোন মোহনমন্ত্র পাঠ করিতেছে।

যদুনন্দন দাস অনুবাদচ্ছলে লিখিয়াছেন—

শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিঞা কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে
রহ তুমি চিত্তে বান্ধি থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে মিশাল করিঞা।
হিম নহে তবু তনু কাঁপাইছে হিমে জনু
প্রতি তনু শীতল করিঞা॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাতারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায়ে আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর॥
এতেক কহিতে ধনী উদ্বেগ বাড়িল জানি
নারে চিত্ত প্রবোধ করিতে।
কহে শুন আরে সখি তুমি মিথ্যা বুইলে দেখি
মুরলীর নহে হেন রীতে॥
কোন সুনাগর এই মোহমন্ত্র পড়ে যেই
হরিতে তোমার ধৈর্য মত।
দেখিয়া ঐ সব রীত চমক লাগিল চিত
দাস যদুনন্দনের মত॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ২৪-২৫)

মূলে ললিতা যেখানে 'মুরলীরব' বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, অনূদিত পদটিতে সেখানে ললিতা আরও বলিয়াছেন—তুমি সেই কথা শুনিয়া কেন বিমুগ্ধ হইলে? তুমি চিত্তে ধৈর্য ধরিয়া থাক। শ্রীরাধাও শ্লোকোক্ত কথাগুলিই শুধু বলেন নাই, বিষামৃতে মিশ্রিত করিয়াই যে কেহ বাঁশী বাজাইতেছে, তাহাও জানাইয়াছেন। বিষামৃতে একত্র মিলন কথাটি কবিরাজ গোস্বামী তাহার পূর্বে ব্যবহার করিয়াছেন। 'বিদগ্ধমাধব'-এর (২।৩১) 'পীড়াভি র্নবকালকূট' ইত্যাদি শ্লোকের বিষামৃতের মিলনের ইঙ্গিত আছে।

যাহা হউক, বংশীধ্বনির ফল তাঁহার উপর কেমন হইল, সে-কথা বলিতে গিয়াও শ্রীরাধা শ্লোকোক্ত কথাগুলি সম্প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'প্রতি তনু শীতল করিঞা'ই বংশীরব তনু কাঁপাইতেছে, কাতারির মতোই যেন মনে আঘাত করিতেছে, তাপ না হইয়াও উষ্ণ বলিয়া মতিকে (বুদ্ধিকে) দগ্ধ করিতেছে এবং সেইজন্যই 'বিচারিতে না পাইয়ে ওর'। শ্লোকে এই কথাগুলি নাই। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, যদুনন্দন দাস অনুবাদের ফাঁকে ফাঁকে স্বাধীনভাবে শব্দাবলী বিন্যস্ত করিয়া রচনাটির মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ পদের মর্যাদা আনিয়াছেন। পদটি 'পদকল্পতরু'তে ১৪২-সংখ্যক পদরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

উদ্ধবদাস শ্রীরূপের অনুসরণে লিখিয়াছেন—

কদম্বের বনে থাকে কোন জনে
কেমন শবদ আসি।
একি আচম্বিতে শ্রবণের পথে
মরমে রহল পশি॥
সান্ধায়া মরমে ঘুচায়া ধরমে
করিলে পাগলি পারা।
চিত স্থির নহে সোয়াস্থ্য না রহে
নয়ানে বহয়ে ধারা॥
কি জানি কেমন সেই কোন জন
এমন শবদ করে।
না দেখি তাহারে হৃদয় বিদরে
রহিতে না পারি ঘরে॥

(পদামৃতমাধুরী, পৃঃ ৭৩)

এখানেও কদম্বের বন হইতে আচম্বিতে এক শব্দ আসিয়া শ্রীরাধার ধর্ম (বোধ করি কুলবধূর ধর্মই) ঘুচাইয়া দেয়; শব্দ শুনিয়া অথচ শব্দকারীকে না দেখিতে পাইয়া শ্রীরাধার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শ্রীরূপের বর্ণনাই যেন কিছু অস্ফুট আকারে আসিয়াছে।

'বিদগ্ধমাধব'-এর প্রথমাঙ্কের ৭২-সংখ্যক শ্লোকে পূর্বরাগিণী শ্রীরাধার অনুভাবগুলি (বহির্বিকার) লক্ষ্য করিয়া ললিতা প্রশ্ন করিয়াছেন। শ্রীরূপ ললিতার সংলাপে লিখিয়াছেন—

ক্ষৌণীং পঙ্কিলয়ন্তি পঙ্কজরুচোরক্ষ্ণোঃ পয়োবিন্দবঃ
শ্বাসাস্তাণ্ডবয়ন্তি পাণ্ডুবদনে দূরাদুরোজাংশুকং।

মূর্তিং দন্তুরয়ন্তি সত্তমমী রোমাঞ্চপুঞ্জাশ্চ তে
মন্যে মাধবমাধুরী শ্রবণয়োরভ্যাসমভ্যায়যৌ ॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ৫৬)

অর্থাৎ—পাণ্ডুবদনে (রাধে), কমলতুল্য তোমার আঁখিযুগল হইতে বারিবিন্দুগুলি (ঝরিয়া) ভূমিকে পঙ্কিল করিতেছে, শ্বাস দূর হইতে স্তনাবরণকে আন্দোলিত করিতেছে, রোমাঞ্চপুঞ্জ তোমার দেহকে করিতেছে কণ্টকিত; মনে হইতেছে মাধবের মাধুর্যের কথা শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়াছে।

পদকর্তা যদুনন্দন দাস শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—

জিনি পদ্মগণ এ তুয়া নয়ন
মাধুরী মোহন জাতি।
তাহাতে নির্ঝর ঝরে বসুন্ধর
কর্দম কওল অতি ॥
সখি হে বুঝিলুঁ এ তুয়া রীত।
মাধব মাধুরী শ্রুতিযুগ ভরি
তওল কওল চিত ॥
ঘন শ্বাস ভরে কুচ কুম্ভ পরে
সঘনে নাচয়ে বাস।
প্রভাত কমল জিনিয়া বিমল
বদন পাণ্ডুর ভাস।
পুলক ভরিল সব কলেবর
তাহাতে দ্বিগুণ দেহ।
এ যদুনন্দন কহয়ে ঐছন
চরিত নবীন নেহ ॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ২৫)

যদুনন্দন শ্লোকের 'পঙ্কজরুচোরক্ষোঃ' স্থলে ব্যতিরেক-অলঙ্কার প্রয়োগে আরও বাড়াইয়া লিখিয়াছেন যে, শ্রীরাধার চক্ষু দুইটি সৌন্দর্যে পদ্মকেও হারাইয়া দিয়াছে; 'পয়োবিন্দবঃ' স্থলে লিখিয়াছেন 'তাহাতে নির্ঝর'; শ্লোকের অনুসারে মাধব-মাধুরী না হয় শ্রীরাধার শ্রুতিযুগকে ভরিয়া ফেলিল, কিন্তু চিত্তকেও যে উত্তপ্ত করিয়া তুলিল, ইহা পদকর্তার সুন্দর অথচ অতিরিক্ত সংযোজনা। শ্লোকে ললিতা যেখানে শ্রীরাধাকে 'পাণ্ডুবদনে'

বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন মাত্র, সেখানে পদকর্তা পাণ্ডুবদনের সুন্দর বর্ণনা দিয়া লিখিয়াছেন যে, শ্রীরাধার শুভ্রবর্ণ বদনখানি প্রভাতের পদ্মকেও অতিক্রম করিয়াছে। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, পুলকে শ্রীরাধার দেহ কণ্টকিত হইতেছে; পদকর্তা যদুনন্দন বলিয়াছেন যে, আনন্দে দেহ দ্বিগুণ (স্ফীত) হইয়াছে। সর্বশেষে ভণিতায় যদুনন্দন স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন, সমস্তই শ্রীরাধার নূতন ভালবাসা অর্থাৎ পূর্বরাগের লক্ষণ। এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা হইতে প্রতীত হয় যে, যদুনন্দনের উপরি-ধৃত পদটি সামান্ত অনুবাদ নহে, স্বতন্ত্র পদের কিছু লক্ষণেও আক্রান্ত।

বড়ু চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত একটি পদে[১] শ্রীরূপ-কৃত শ্লোকটির কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পদটি এই—

এ সখি সুন্দরি কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি অঙ্গ অবশ তুয়া হোয়॥
অধর কাঁপয়ে তোর ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি॥
* * *
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে বুঝিলু নিচয়।
শ্রবণে পশিল বাঁশী অতএ সে হয়॥ (গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ২৪৬)

এখানেও শ্রীরূপের শ্লোকের মতোই সখী (ললিতা নামটি নাই) শ্রীরাধাকে তাঁহার অনুভব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে; তাহা ছাড়া, শ্রীরাধার পদ্মনয়ন-নিঃসৃত অশ্রুরাশির কথা বলা না হইলেও, চক্ষু ছলছল করিবার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। পদটিতে কণ্টকিত দেহেরও উল্লেখ আছে। সর্বশেষে শ্লোকের ভঙ্গীতেই অনুমান করা হইয়াছে যে, শ্রীরাধার শ্রবণে বাঁশী (শ্লোকে মাধুরী) প্রবেশলাভ করিয়াছে। সেজন্যই এইরূপ অবস্থা।

প্রথমাঙ্কের ১৩-সংখ্যক শ্লোকে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

এষ স্থৈর্যভুজঙ্গসজ্ঘদমনাসঙ্গে বিহঙ্গেশ্বরো
ব্রীড়া-ব্যাধিধুরা-বিধুননবিধৌ তম্বঙ্গি ধন্বন্তরিঃ।
সাধ্বীগর্বভরাম্বুরাশিচুলুকারম্ভে তু কুম্ভোদ্ভবঃ
কালিন্দীতটমণ্ডলীষু মুরলীতুণ্ডাধ্বনির্ধাবতি॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ৫৭)

১। ডঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' গ্রন্থে পদটিকে প্রাক্‌চৈতন্যপর্বের চণ্ডীদাসের বলেন নাই, 'সন্দিগ্ধ পদ' পর্যায়ে ধরিয়াছেন, পৃঃ ১৮৪।

অর্থ—ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, ওগো কৃশাঙ্গি, কালিন্দীতীরে বংশীবদনের মুখ হইতে এই ধ্বনি বাহির হইতেছে। ধ্বনি যেন গরুড়ের মতন ধৈর্যকে গ্রাস করিতেছে; শুধু তাহাই নহে, লজ্জারূপ ব্যাধিকেও যেন ধন্বন্তরী হইয়া বিনাশ করিতেছে, অর্থাৎ লজ্জাও নষ্ট করিতেছে। আর সতীধর্মরূপ সমুদ্রকে অগস্ত্যের মতন শোষণ করিতেছে।

যদুনন্দন শ্লোকটির অনুসরণে লিখিয়াছেন—

যুবতী ধরম ধৈর্য ভুজঙ্গম
দমন কারণ কাজে।
এই ধ্বনি ছলে সদা ফিরি ঝুলে
গরুড় জগৎ মাঝে॥
সই এ তোহে কহিল সার।
কুল যুবতীর ধরম করম
ভরম না রহে আর॥
মাজা ক্ষীণ নারী ব্যাধি লজ্জাবলী
তাহার নাশের আশে।
ধ্বনি ধন্বন্তরী সর্বক্ষণ ফিরি
শ্রুতিপথে হৃদি পৈশে॥
সতী যুবতীর সাধ্বী গর্ব ভর
সে যে সরোবর অতি।
এ ধ্বনি বন্ধন কুম্ভের নন্দন
গণ্ডূষে পিয়য়ে মতি॥
এই ত কারণ মুরলী বদন
পন্থেত হইতে ধায়।
আইসে কালিন্দী কিনার হইতে
দেখ পরতেক তায়॥
শুনিয়া ললিতা বাণী সুললিতা
ধরিতে না পারে অঙ্গ।
এ যদুনন্দন দাস পুন ভণ
ভালে বলে এই রঙ্গ॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ২৬)

মূল শ্লোক অপেক্ষা ভাবানুবাদ এখানে বেশী দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বনি ধন্বন্তরীর মানে বুঝিতে পাঠকের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়, কেননা মুরলীর ধ্বনিই যে ধন্বন্তরী হইয়া নারীদের লজ্জারূপ ব্যাধিকে বিনষ্ট করিতেছে তাহা বুঝা কঠিন। কুম্ভোদ্ভবকে কুম্ভের নন্দন বলিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হয় না। সতীদের গর্বের সমুদ্রকে সরোবরে পরিণত করারও কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

'বিদগ্ধমাধব' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক খুব ব্যাপকভাবে পদাবলীসাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে; কেননা, পদাবলী-সঙ্কলনে ও অন্যান্য গ্রন্থে প্রায় ষোলটি পদ ভাবানুবাদিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াঙ্কের পাঁচ-সংখ্যক শ্লোকে বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন—

চিন্তাসন্ততিরদ্য কৃন্ততি সখি স্বান্তস্য কিন্তে ধৃতিং
কিংবা সিঞ্চতি তাম্রমম্বরমতিস্বেদাম্ভসাং ডম্বরঃ।
কম্পশ্চম্পকগৌরি লুম্পতি বপুঃ স্থৈর্যং কথং বা বলাৎ
তথ্যং ব্রূহি ন মঙ্গলা পরিজনে সঙ্গোপনাঙ্গীকৃতিঃ॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ৬২)

অর্থাৎ—সখি, চিন্তা কি আজ তোমার অন্তরের ধৈর্যের বন্ধনকে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে, কিংবা ঘামে তোমার লাল শাড়িকে ভিজাইয়া দিতেছে? হে চম্পকগৌরি, ধৈর্যহারা তুমি কাঁপিতেছই বা কেন? প্রকৃত ঘটনা বল, পরিজনের কাছে গোপন করিলে মঙ্গল হয় না।

এই শ্লোকটি অনুসরণ করিয়া যদুনন্দন দাস ও ঘনশ্যাম পদ রচনা করিয়াছেন। যদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন—

উপজিল চিন্তা অতি   তোমার অন্তর মতি
ধৃতিচ্ছেদ কর কেনে নিতি।
কেনে বা অরুণ চির   সিঞ্চিয়া পড়য়ে নীর
ঘর্মে ভেল শরীর পূরিতি॥
সখি হে সত্য কহ আমা সবাকার।
নিজ পরিজন গণে   করিছ যে সঙ্গোপনে
শুন সখি সব অমঙ্গলে॥
চম্পক বরণ দেহ   তিলেক না পায় থেহ
অতিকম্পে করয়ে গরাস।
দেখি তুয়া এই রীতে   সব সখীগণ চিতে
অতিশয় লাগয়ে তরাস॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ২৯-৩০)

যদুনন্দনের এই পদে শ্লোকের কথাগুলি প্রায় অনূদিত হইয়াছে; বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই যে, শ্লোকের শেষ কথাগুলি ধ্রুবপদরূপে মাঝে বসিয়াছে এবং 'দেখি তুয়া এই রীতে' ইত্যাদি অতিরিক্ত সংযোজিত হইয়াছে।

ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

নয়ন কাজর লোরে মিটায়লি
ঘামে বসন তিতি গেলা।
চিন্তসি হৃদয়ে বুঝই নাহি পারই
কৈছে মনোরথ ভেলা॥
সুন্দরি না বুঝিএ তোহারি চরিতে।
পরিজন বাচি হোত কিয়ে মঙ্গল
সো সমুঝবি নিজ চিতে॥
চম্পক বরণ অঙ্গ ঘন কাঁপই
তাহি অবস ভেল দেহা।
হেরইতে তোহারি বিপদ প্রিয়সখিগণ
জীবনে না বান্ধই থেহা॥
শুনইতে কোপে কমলমুখি বোলত
শুনই নিঠুর তোহে জান।
বোলই প্রিয়সখি কাহে মোহে রোখসি
ঘনশ্যাম ইথে পরমাণে॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৬০)

একই শ্লোককে অবলম্বন করিয়া পদ লিখিলেও, ঘনশ্যামের কবি-প্রতিভার কাছে এখানে যদুনন্দনের পদ নিতান্ত নিষ্প্রভ প্রতীয়মান হয়। কি ভাষার ঝঙ্কারে, কি ভাবের দ্যোতনায় ও বিশ্লেষণে ঘনশ্যাম যদুনন্দন অপেক্ষা অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। চিন্তায় শ্রীরাধার ধৈর্যের বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া ঘনশ্যাম আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদের ন্যায় বলিতেছেন—তোমার মনে এমন কি ভাব উঠিল যাহাতে এত বেশী চিন্তান্বিত হইয়াছ? শ্লোকে রহিয়াছে ঘর্মজলে শ্রীরাধার রক্তবসন সিক্ত হইতেছে, ঘনশ্যাম বসনের রক্তবর্ণের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না দিয়া বলিতেছেন—একদিকে তোমার দেহ হইতে ঘাম ঝরিয়া বসন ভিজিতেছে, আবার অন্যদিকে চক্ষু হইতে অশ্রুধারা পতিত হইয়া কজ্জলের রেখাকে মুছিয়া দিতেছে। ঘনশ্যাম তাঁহার পিতামহ গোবিন্দদাসের ন্যায় বঞ্চিত করা

অর্থে 'বাঁচি' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বলিতেছেন, নিজ পরিজনদিগকে বঞ্চিত করিলে তোমার কি যে ভালো হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। চাঁপার মতো তোমার গায়ের রঙ এবং চাঁপাফুলের মতো তুমি সুকুমারী, কিন্তু ভাবের প্রাবল্যে তুমি এত বেশী ঘন ঘন কাঁপিতেছ যে, মনে হয় তাহার প্রতিক্রিয়ায় তোমার দেহ অবশ হইয়া গিয়াছে। তোমার এই বিপদ্ দেখিয়া তোমার প্রিয়সখীদের ধৈর্য ধরা অসম্ভব হয়। এতক্ষণ পর্যন্ত ঘনশ্যাম শ্রীরূপের শ্লোকের কিছুটা অনুসরণ করিয়াছেন। তাহার পর তিনি সংযোজন করিয়াছেন যে, সখীর কথা শুনিয়া কমলমুখী শ্রীরাধা তাঁহাকে রাগ করিয়া বলিলেন—তুমি কি নিষ্ঠুর তাহা শুনিয়াছিলাম, এখন বুঝিতে পারিলাম। শ্রীরাধা ধরা পড়িয়া সখীকে নিষ্ঠুর বলিয়া তিরস্কার করিলেন। সেই তিরস্কার শুনিয়া সখী বলিলেন —আমার উপর শুধু শুধু রাগ করিতেছ কেন? আমি ঠিক কথা বলিতেছি কিনা তাহার সাক্ষ্য ঘনশ্যাম দিবেন। 'ঘনশ্যাম' শব্দটি এখানে একযোগে কবি ও শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

'বিদগ্ধমাধব'-এর দ্বিতীয়াঙ্কের এক স্থানে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

বিতন্বাস্তন্বা মরকতরুচীনাং রুচিরতাং
পটান্নিষ্ক্রান্তোঽভূৎ ধৃতশিখিশিখণ্ডো নবযুবা।
ভ্রুবং তেনাক্ষিপ্তা কিমপি বসতোন্মাদিতমতেঃ
শশী বৃত্তো বহ্নিঃ পরমহহ বহ্নির্মম শশী॥

(বিদগ্ধমাধব—শ্লোক ৯, পৃঃ ৬৩)

অর্থ—শ্রীরাধা সখী বিশাখাকে বলিতেছেন, যাঁহার কান্তি মরকতমণির শোভা বিস্তার করিতেছে, সেই ময়ূরপুচ্ছধারী নবযুবা চিত্রপট হইতে বাহির হইলেন। তাহার পর তিনি আমার প্রতি কটাক্ষশর নিক্ষেপ করায় আমার মতি উন্মাদিত হইল; হায়, হায়, সেই হইতে চন্দ্র আমার নিকট অগ্নিতুল্য এবং অগ্নি চন্দ্রবৎ হইয়া গিয়াছে।

পূর্বরাগিণী শ্রীরাধার এই অবস্থা উন্মাদদশা ভিন্ন কিছু নহে। পদকর্তা ঘনশ্যাম উন্মাদদশা বর্ণনা করিতে শ্রীরূপের শ্লোকটির অনুসরণে লিখিয়াছেন—

উতপত দেহ থেহ নাহি বান্ধই
অনুকূলে প্রতিকূল ভান।
সঘন নিশ্বাস নিমিখ নাহি লোচনে
কি ভেল পাপ পরাণ॥

সজনি শুনইতে মানবি আন।

নিকসল চারু চিত্রপটে হঠ সঞে

এক মূরতি অনুপাম॥

অভিনব শ্যাম জলদ নব কৈশোর

মরকত জিনিয়া সুঠান।

বরিহা মিলিত ললিত নবমালতি

ভালে চূড়া চিকণ বনান॥

মঝু মুখ হেরি ঢালি নয়নাঞ্চল

হানল ভাঙু সন্ধান।

তব ধরি উনমত হৃদয় থির নহ

ভালমন্দ একু না জান॥

অনল দহন ঘন চাঁদ কিরণ যেন

হিমকর অনল সমান।

হেন বিপরীত রূপ হেরি ঐছন

ঘনশ্যাম দাস পরমাণ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৬৫)

শ্রীরাধার নিকটে অনলের ঘন যে দহন তাহা শীতল বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ যেখানে উত্তাপের অস্তিত্ব সেখানে শৈত্য অনুভূত হয়; অন্যদিকে চন্দ্র শীতল হইলেও অগ্নিতুল্য দাহকর বলিয়াই প্রতীয়মান।

দ্বিতীয়াঙ্কের ১২-সংখ্যক শ্লোকে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

দরোন্মীলন্নীলোৎপলদলরুচস্তস্য নিবিড়া—

দ্বিরূঢ়ানাং সদ্যঃ কর-সরসিজ-স্পর্শ-কুতুকাৎ।

বহন্তী ক্ষোভাণাং নিবহমিহ নাজ্ঞাসিষমিদং

ক বাহং কা বাহং চকর কিমহং বা সখি তদা॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ৬৬)

অর্থাৎ—শ্রীরাধা বলিতেছেন, সখি, আধ-ফোটা নীল পদ্মের ন্যায় যাঁহার দেহ-সৌন্দর্য, তাঁহার করপদ্মের স্পর্শে অতিশয় আনন্দের উদ্রেক হইতেছে। সেইজন্য ক্ষোভের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া আমি কে, কোথায় আছি, কি করিতেছি, তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না।

এই শ্লোকটির পরিপ্রেক্ষিতে যদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন—

নীল উতপল অল্প বিকশিল
তার দল তনু কাঁতি।
চন্দন লেপন প্রতি কলেবর
ঘুসৃণ চর্চিত অতি॥
সইগো কি আর বলিস মোরে।
জাতি কুলশীল সকলি মজিল
নিশ্চয় কহিল তোরে॥
কদম্বের তলে সেই সে চঞ্চলে
মিলন সে পুনঃ মোরে।
নহি নহি নহি আমি যত কহি
সে আসি করয়ে কোলে॥
সেই যে তনুনীল নাগর সুশীল
হঠাৎ আসিঞা মোর।
ভুজলতা দল ত্বরিতে ধরল
হাস মুখে চিত চোর॥
সে করকমল পরশে নিবিড়
কৌতুক বাঢ়ল চিত।
বিরূঢ় তখনি ক্ষোভ বহু জানি
বহয়ে না বুঝি রীত॥
জ্ঞান গোচর যত কিছু মোর
সকল রহিল দূরে।
কেবা আমি হই কিবা করি এই
আছি কোথা নাহি স্ফুরে॥
এতেক কহিতে পুনঃ ধনীচিতে
বৈকল্য বাঢ়ল অতি।
মৌন করি মন বুঝি অনুক্ষণ
করিয়া অবোধ মতি॥

আরে দুষ্ট মন কেনে অনুক্ষণ
সে কানু লাগিয়া ঝুর।
শ্যামল কিশোর রূপ মনোহর
দেখিয়া সলোভ কর॥
সে পর পুরুষ লাগি কর আশ
লাজ নাহি কর চিত।
শুনহ পামর মন নিরন্তর
অন্তর কর বেয়াপিত॥
কৃষ্ণের লাগিয়া ধনী নিজ হিয়া
থির করিবারে নারে।
এ যদুনন্দন ভণ এই মনঃ
শুনিতে প্রাণ কে ধরে॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ৩১-৩২)

উপরি-ধৃত পদে যদুনন্দন প্রথমে শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ করিতে যাইলেও, তৃতীয় ছত্র আসিতেই চন্দনাদির কথায় মৌলিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। ধ্রুবপদটি সুন্দর এবং মৌলিক সৃষ্টি। ধ্রুবপদের পরে দুইটি স্তবকে যদুনন্দন পূর্বোক্ত শ্লোকের অনুসরণ করেন নাই, বরং 'কৃতাং ভক্তিচ্ছেদৈর্ঘুসৃণঘনচর্চামধিবহন্' ইত্যাদি ১১-সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন। তাহার পর ১২-সংখ্যক শ্লোকের অনুসরণে আবার দুইটি স্তবক রচনা করিয়াছেন। 'এতেক কহিতে, পুনঃ ধনী-চিতে' হইতে 'শুনিতে প্রাণ কে ধরে' পর্যন্ত যদুনন্দন স্বাধীনভাবে লিখিয়াছেন, ইহাতে শ্রীরাধার মানস-অবস্থাটি সুন্দরভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আলোচ্য পদটিকে কিছু কিছু অনুবাদ সত্ত্বেও নিছক অনূদিত পদ বলা যায় না; বরং বলা যায়, নানাভাবে উপাদান সংগ্রহ করিয়া পদকর্তা যদুনন্দন সুন্দর ও স্বতন্ত্র একটি পদ রচনা করিয়াছেন।

'বিদগ্ধমাধব' নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের ১৫-সংখ্যক শ্লোকে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

বিক্রীড়ন্তু পটীরপর্বততটীসংসর্গিণো মারুতাঃ
খেলন্তঃ কলয়ন্তু কোমলতরং পুংস্কোকিলাঃ কাকলীং।
সংরম্ভেণ শিলীমুখা ধ্বনিভৃতো বিধ্যন্তু মন্মানসং
হাস্যন্ত্যাঃ সখি মে ব্যথাং পরমমী কুর্বন্তি সাহায়কং॥

(পৃঃ ৬৭)

অর্থাৎ—সখি, মলয়পর্বতের তট-সংশ্লিষ্ট বায়ু ক্রীড়া করিতে থাকুক, পুরুষ কোকিলেরা খেলায় মত্ত হইয়া পঞ্চমস্বরে গান করিতে থাকুক, আর অলিকুল গুনগুন গুঞ্জনে আমার মর্মস্থলে বিদ্ধ করিতে থাকুক—ব্যথা পরিত্যাগের ব্যাপারে ইহারা আমাকে সাহায্য করিলে (ইহার ফলে আমি চেতনা হারাইলে) আমার সকল দুঃখের অবসান হইবে।

যদুনন্দন শ্লোকটি অবলম্বনে লিখিয়াছেন—

মলয়পর্বতবাসী শুনহ অনিল রাশি
মন্দ মন্দ করহ গমনে।
পুরুষ কোকিলবর সুমাধুরী গান কর
আনন্দে খেলহ এইখানে॥
শুনহ বিরহি বধূগণে।
সবে আসি এক ঠাঞি প্রকাশ করহ তাই
দুঃখের সহায় কর মেনে॥
শুনহ ভ্রমরগণ গান কর অনুক্ষণ
ঝঙ্কার করিয়া অতিশয়।
বিদ্ধ কর মোর মনঃ হরে যাতে সুচেতন
চেতনে পাইয়ে দুঃখচয়॥
বিশাখা ললিতা দোঁহে শুনিয়া রাইরে কহে
ঘোর চিন্তা কেনে কর তুমি।
কেনে দুঃখী কর মন যাতে তুয়া চেষ্টাগণ
সে তত্ত্ব জানিল সব আমি॥
তুয়া যে হৃদয় হয় অত্যন্ত দুর্লভ ময়
সুলভ জানহ সেই জনে।'
এই যে বচন গণে প্রতীত করহ মনে
কহে দাস এ যদুনন্দনে॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ৩২-৩৩)

উপরি-ধৃত পদে যদুনন্দন বিরহী-বধূগণের যে প্রসঙ্গ আনিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মৌলিক। তাহা ছাড়া, শ্রীরাধা কিভাবে দুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন তাহা শ্লোকে অস্পষ্ট ছিল, অনুবাদক স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, যদুনন্দন কেবলমাত্র শ্লোকটিতেই দৃষ্টি

নিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, শ্লোকের পরবর্তী ললিতা বিশাখার 'হলা কধং' ইত্যাদি সংলাপটিও সবিস্তারে বুঝাইয়া লিখিয়াছেন।

দ্বিতীয়াঙ্কের ১৬ ও ১৭-সংখ্যক অনুচ্ছেদে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

রাধিকা। (নিশ্বস্য সংস্কৃতেন)

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্যবস্যতি ॥
তা বিণ্ণবেমি ইমস্সিং ওসরে জধা সুদিঢ়ং এক্কং লদাপাসং লহেমি
তধা সিণেহস্‌স ণিক্কিদিং করেধ ॥

উভে। (সব্যথং) হলা এব্বং দারুণং ভণণ্তী মা কুণু সহীণং জীবিদং
লুম্পেহি। ণং পচ্চাসণ্ণা দে অহীট্ঠসিদ্ধিঃ ॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ৬৮)

বঙ্গানুবাদ—

রাধিকা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সংস্কৃতে) সখি, রাধার এই অন্তর-বেদনা অত্যন্ত দুর্নিবার্য। যে ইহার চিকিৎসায় ব্যাপৃত হইবে তাহার প্রচেষ্টা কুৎসায় পর্যবসিত হইবে।
তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, এখন যদি সুদৃঢ় একটি লতাপাশ পাই তবে তোমাদের প্রতি আমার স্নেহের প্রতিদান দেওয়া হয়।

উভয় সখী। (ব্যথার সহিত) সখি, এমন দারুণ কথা বলিয়া আর সখীদের জীবননাশ করিও না। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, শীঘ্রই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

শ্রীরূপের গ্রন্থোক্ত এই অংশটির অনুসরণে যদুনন্দন লিখিয়াছেন—

আমার হৃদয় ব্যথা অতিশয়
দুঃসাধ্য কহিল তোয়।
ইহা উপশম হৈতে পরিণাম
কুচ্ছানিরমিত মোয় ॥
সই কহিয়ে মরম কথা।
উপায় আছয়ে লজ্জা যাতে নহে
ঘুচয়ে মরম ব্যথা ॥

এই অবসরে বৃক্ষের মন্দিরে
দৃঢ় লতাপাশ লঞা।
পিরিতী কারণ তেজিব পরাণ
এই সে লইছে হিয়া॥
এই সব কথা বিশাখা ললিতা
শুনিয়া মানয়ে দুখ।
কহে কেনে হেন কহিছ দারুণ
যাতে বিদরয়ে বুক॥
আমার জীবন থাকিতে এমন
কেমনে হইবা তুমি।
আমার হৃদয় বাঞ্ছিত যে হয়
মিলিবে কহিল আমি॥
তুয়াভীষ্ট সিদ্ধি পত্যাসন্ন বিধি
দেখি মোর মনে হয়।
এ যদুনন্দন দাস তঁহি ভণ
এ বচন আন নয়॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ৩৩)

যদুনন্দন উপরি-ধৃত অনূদিত পদে যথাসাধ্য মূলের অনুসরণ করিয়াছেন, কেবল সখীদের কথায় আন্তরিকতার কিছু আধিক্য ঘটাইবার জন্য মৌলিকভাবে 'আমার জীবন থাকিতে এমন' ইত্যাদি লিখিয়াছেন। অনুবাদে মৌলিক পদের সাবলীল ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়াঙ্কের একটি বিখ্যাত শ্লোকে শ্রীরূপ বলিতেছেন—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং।
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ৬৯-৭০)

অর্থাৎ—সখি, একজনের 'কৃষ্ণ' এই নামাক্ষর শুনিয়াই আমার জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, অন্যজনের বংশীধ্বনি আমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে, চিত্রে দর্শনহেতু এই স্নিগ্ধ ঘনদ্যুতি পুরুষ আমার মনে বিরাজ করিতেছে—ধিক্ কি কষ্ট, তিনজন পুরুষে একসঙ্গে অনুরাগ। ইহা অপেক্ষা মরণও শ্রেয়।

গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীরূপের রচিত শ্লোকটি লইয়া মৌলিক পদই রচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

সজনি, মরণ মানিয়ে বহুভাগি।
কুলবতী তিন পুরুখে ভেল আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি॥
পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর
তৈখনে মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কো ঐছে মুরলি আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥
না জানিয়ে কো ঐছে পটে দরশায়লি
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাহাঁ যাহাঁ ধাইয়ে
তাহাঁ তাহাঁ রোধয়ে মাতি॥
গোবিন্দদাস কহয়ে শুন সুন্দরি
অতয়ে কর বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরলি-রব তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ॥

(তরু ১৩৯)

শ্রীরাধা বলিতেছেন—সখি, আমার মরণই ভালো (মরণকে আমি সৌভাগ্যের ফল বলিয়া মনে করি)। আমি কুলবতী নারী; অথচ আমার তিনজন পুরুষে অনুরক্তি জন্মাইল। এই জীবনে আর কি সুখ। প্রথমে আমি শ্যাম এই দুই অক্ষর শুনিলাম; নাম শুনিয়াই আমার মন চুরি গেল। তারপর কোন একজনের মুরলী-আলাপ শোনামাত্র আমি বিস্মিত হইলাম—আমার কান যেন চুরি করিয়া লইল (অর্থাৎ আমার কানে এখন মুরলীধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাই না)। তারপর আবার তৃতীয় একজনের সঙ্গে প্রেম। কে যেন চিত্রপটে তাহার নবজলধরকে-হার-মানানো

কান্তি দেখাইল। গোবিন্দদাসের পদে এতদূর যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ শ্লোকানুসারী। পরেই শ্রীরাধা বলিতেছেন—তাহা (চিত্রে নবজলধরকান্তিকে) দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি যেখানে যেখানে পলায়ন করি, সে যেন সেইখানেই মত্ত হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়ায়। শ্রীরাধার এই কথাগুলি গোবিন্দদাসের মৌলিক সংযোজনা। পদকর্তা আরও মৌলিকতার পরিচয় দিয়া শ্রীরাধাকে নিজে আশ্বাস দিয়াছেন—শোন, আমার কথা বিশ্বাস কর, যাহার নাম শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছ, তাহারই মুরলী তুমি শুনিয়াছ, আর চিত্রপটে তাহারই ছবি দেখিয়াছ—সুতরাং একজনেই তোমার প্রেম জন্মিয়াছে, তিনজনে নহে।

শ্লোকটি যদুনন্দনের লেখনীতে বাংলাভাষায় রূপ পাইয়াছে—

কৃষ্ণ দু আঁখর অতি মনোহর
পহিলে শুনিল কায়।
তাহে গরাসল মতি যে[১] সকল
ধরম করম আর॥
সইগো[২] কহিল[৩] এ তোহে সার।
এ তিন পুরুষে চিত্তের আরতি
কি কায জীবনে আর॥
আন পুরুষের বংশী মনোহব
শুনিনু[৪] মধুর গান।
তাতে পরমাদ চিত্ত উন্মাদ[৫]
আন না শুনয়ে কান॥
এ চিত্রপটেত নবীন মুরত[৬]
নবঘন জিনি তনু।
ইহার দরশে পরম হরিষে
মগ্ন ভেল মন জনু॥
এ সব শুনিয়া সখীগণ হিয়া
হরষি পায়ল[৭] অতি।
এ যদুনন্দন দাস তঁহি[৮] ভণ
ভালে[৯] চিন্তিত মতি॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ৩৪)

পাঠান্তর :—বরাহনগর পাঠবাড়ী পুঁথি ১০৭ (২)—

১ মাতায়, ২ সখিগো, ৩ কহিলুঁ, ৪ শুনিল, ৫ চিত্তের উন্মাদ, ৬ মুরুত, ৭ হরিষ পাইল, ৮ তহি, ৯ ভালে সে।

যদুনন্দনের এই পদেও শ্লোকের কথাগুলি রহিয়াছে, কিন্তু গোবিন্দদাস অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র ভঙ্গীতেই তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে। শ্লোকের কৃষ্ণ কথাটি গোবিন্দদাসের পদে শ্যামে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল, যদুনন্দনের পদে তাহা মূলরূপেই ফিরিয়া আসিয়াছে। কুলবতী বলিয়াই যে শ্রীরাধা তিনজন পুরুষকে ভালবাসিয়া বিপদে পড়িয়াছেন এই ভাবটি গোবিন্দদাসের পদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, যদুনন্দনের পদে ইহা অনুক্ত। শ্রীরাধার বিপদের কথা শুনিয়া সখীরা কি করিল তাহা বলিতে গিয়া যদুনন্দন পদের শেষে মৌলিকতা দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার মৌলিকতা গোবিন্দদাসের পদের মৌলিকতার ন্যায় সুন্দর ও সর্বজনগ্রাহ্য হয় নাই।

শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধবে শ্রীরাধা তিনজনের প্রতি আসক্ত হওয়ার বিষয়ে যে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নিরসনকল্পে সখী বলিয়াছেন, এই তিনজনই সেই মহানাগর শ্রীকৃষ্ণ (বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ৭০)। বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যেও অনুরূপ ঘটনার রূপায়ণ রহিয়াছে। সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

কেমন শুনিলা কেমন মুরলী।
কি রূপ দেখিয়া পটে সব গেলা ভুলি ॥
কেমনে দেখিলা তারে কিবা অভিলাষ।
শুনিয়া সকল তোর পূরাইব আশ ॥
তিনজন নহে সে বুঝিলুঁ মন দিয়া।
উপায় করিয়া তোরে দিব মিলাইয়া ॥
থির হৈয়া সুবদনি কহ সব বাত।
কহয়ে মাধবী মোর শিরে ধর হাত ॥ (তরু ১৪০)

পূর্বরাগিণী শ্রীরাধার প্রকৃত মনোভাব গোপন করার প্রচেষ্টা দেখিয়া পৌর্ণমাসী যেখানে নান্দীমুখীর সহিত জনান্তিকে কথা বলিয়াছেন, সেখানে তিনি জানাইয়াছেন—

প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্মনো ধিৎসতে
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।
যস্য স্ফূর্তিলবায় হন্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে
মুগ্ধেয়ং কিল পশ্য তস্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি ॥
(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ৭৭-৭৮)

অর্থাৎ—মুনিজন বিষয় হইতে মনকে ক্ষণকালের জন্য প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যাঁহাকে (যে শ্রীকৃষ্ণকে) ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, এই বালিকা তাঁহা হইতেই মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়ে নিয়োগ করিতে চাহে। হায়, যাঁহার আনন্দের একটি কণামাত্র হৃদয়ে লাভ করিবার জন্য যোগীরা উৎকণ্ঠিত থাকে, এই মুগ্ধা বালিকা, দেখ, তাঁহাকেই হৃদয় হইতে দূর করিতে চাহিতেছে।

শ্লোকটিকে ত্রিপদীতে রূপান্তরিত করিতে গিয়া যদুনন্দন লিখিয়াছেন—

নিতে মুনিগণ আপনার মন
বিষয় হইতে আনি।
তিলেক গোবিন্দ পদ অরবিন্দ
স্মরণে বাঞ্ছয়ে জানি॥
হের অদ্ভুত দেখহ বিদিত
রাধিকা কুলের বালা।
সে কৃষ্ণ হইতে চিত ছাড়াইতে
ইচ্ছয়ে বিষয় জ্বালা॥
স্ফূর্তি ডুব লাগি কত কত যোগী
করয়ে কামনা যাঁর।
মুগধি তাঁহার হৃদয় মন্দির
যত্নে চাহে ত্যজিবার॥
যাঁহার চরণ দরশ কারণ
তপস্যা করয়ে রমা।
এ যদুনন্দন কহয়ে সে জন
যাচিতে করয়ে ঘৃণা॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ৩৮)

উপরের পদটিতে শ্লোকের স্ফূর্তি-লব বা স্ফূর্তি-কণার কথা নাই, সেক্ষেত্রে স্ফূর্তি বা আনন্দের মধ্যে ডুবিয়া যাইবার জন্য কত যোগী যাঁহাকে কামনা করে এইরূপ বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহার চরণ দর্শন করিবার জন্য রমা অর্থাৎ লক্ষ্মী স্বয়ং তপস্যা করেন—পদের শেষে এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহাতে পদটির মৌলিকতাই সূচিত হইতেছে।

পূর্বরাগিণী শ্রীরাধা চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীরূপের গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীরাধা স্বগতোক্তি করিয়াছেন—'শিশিরয় দৃশৌ দৃষ্টা দিব্য-

কিশোরমিতীক্ষিতঃ' ইত্যাদি (পৃঃ ৮২), অর্থাৎ এই দিব্য কিশোরকে দর্শন করিয়া দুই আঁখি শীতল কর—পরিজনদের এই কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি চিত্রফলকে অঙ্কিত তোমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দর্শন করিয়াছিলাম। হায়, হায়, তুমি যে নিবিড় জ্বালাকলাপ বিকাশ করিবে সরলমতি আমরা তাহা কিরূপে বুঝিব?

শ্রীরূপের এই পরিকল্পনাটি লইয়া যদুনন্দন দাস কোন পদ রচনা করেন নাই। কিন্তু ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

মাধব কি কহব মরমকো বেদন মোর।
কি পেখলু চারু চিত্রপটে অঙ্কিত
তোহারি মুরতি নব বয়েস কিশোর॥
পরিজন সরস বচনে করি সাদর
নিরখিলু লোচন তিরপিত সাধে।
জনু বড়বানল দহই কলেবর
কো জানে উপজব হেন পরমাদে॥
কাসোঁ কহিব দুঃখকো পাতি আয়ব
তিল এক হৃদয়ে ন বান্ধহি থেহা।
হাম অবলামতি সরল নিরন্তর
জর জর অন্তর জীবন সন্দেহা॥
ছট ফট শয়ন গমন অতি বারণ
কি কহব অনুভব কহই না জান।
আরতি বিরতি কতয়ে মনোরথ
ইথে ঘনশ্যাম পরমাণ॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৫৫)

শ্রীরাধা বলিতেছেন—হে মাধব, তোমাকে আমার অন্তরের বেদনা আর কি বলিব? নববয়স্ক হে কিশোর, চিত্রপটে অঙ্কিত তোমার সুন্দর মূর্তি কি দেখিলাম! পরিজনদের রসিকতা-করিয়া-বলা কথা সাগ্রহে স্বীকার করিয়া লইয়া আমার চক্ষু-দুইটি জুড়াইবার জন্যই তোমার মূর্তির দিকে তাকাইলাম, কিন্তু (মুহূর্তে) বাড়বানল যেন দেহকে পুড়াইয়া দিয়া গেল। কে জানিত এমন বিপদ উপস্থিত হইবে? এতদূর পর্যন্ত মোটামুটি শ্লোকেরই অনুসরণ করা হইয়াছে, তবে শ্লোকে পরিজনদের কথাটি যেখানে তাহাদের উক্তির দ্বারাই উপস্থাপিত হইয়াছে, পদের মধ্যে সেখানে শ্রীরাধা নিজের কথায় পরোক্ষভাবে বলিয়াছেন। পদের শেষাংশে পদকর্তা স্বাধীনভাবে বর্ণনা

করিয়াছেন, শ্রীরাধা বলিতেছেন—হৃদয় একদণ্ডও স্থির হইতে পারিতেছে না। আমি অবলা নারী, অতিশয় সরল, আমার অন্তর জর জর হইল। জীবনে এখন সন্দেহ সমুপস্থিত। শয়নে আমি ছটফট করি, চলিতে ফিরিতেও হস্তীর মতো চলি। আমার অনুভব কাহাকে বলিব? বলিতেও ত জানি না। ঘনশ্যাম নিজের উক্তিতে মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—আর্তি ও আর্তির অবসান—কত রকম মনোভাবই না (শ্রীরাধার) জাগে। পদকর্তা নিজেই ইহার প্রমাণ।

শ্রীরাধাকে দেখার পর পূর্বরাগে লিপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বয়স্য মধুমঙ্গলের কাছে বলিয়াছেন—

ভ্রমদ্‌ভ্রূবল্লীকৈঃ প্রতিদিশমপাঙ্গস্য বলনৈঃ
কুরঙ্গীভ্যো ভঙ্গীভরমুপদিশন্তীমিব দৃশোঃ।
ততস্তাং বিম্বোষ্ঠীং কলয়তি ময়ি ক্রোধবিকটো
মনোজন্মা পৌষ্পং ধনুরনুপমং সজ্যমকরোৎ ॥

মধুমঙ্গলঃ। অবি নাম সংবুত্তং অণ্ণোণ্ণদংসণং।

কৃষ্ণঃ। নহি নহি।

তস্যাঃ সখে! মুখতুষারময়ূখবিম্বে
দূরাম্মমাক্ষিপদবীমধিরূঢ়মাত্রে।
নির্বন্ধতঃ শপথকোটিভিরম্বয়াহং
নীতঃ ক্ষণাদহহ !! সদ্মনি ভোজনায় ॥ (বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ৮৮)

বাংলায়—শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীরাধা ভ্রূ-লতা সঞ্চরণ করিয়া চতুর্দিকে অপাঙ্গচ্ছটায় যেন হরিণীগণকে নয়নভঙ্গী সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময় আমি বিম্বোষ্ঠীকে দেখায় কামদেব ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি নিজ অনুপম পুষ্পধনুর সন্ধান করিলেন।

মধুমঙ্গল। তাহা হইলে পরস্পরের কি সাক্ষাৎ হইয়াছে?

শ্রীকৃষ্ণ। না, না, সখে। দূর হইতে আমি সেই চন্দ্রবদনে নেত্রপাত করিতেই মাতা আসিয়া কোটি কোটি শপথ দান করিয়া আমাকে ভোজন করাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ গৃহে লইয়া গেলেন।

যদুনন্দন শ্রীরূপ-লিখিত পূর্বোক্ত অংশটির ভিত্তিতে লিখিয়াছেন—

রাই ভ্রূভঙ্গিমা ঠাম কামের সমান ভান
নাচয়ে সঘন অনুপাম।
অপূর্ব নয়নভঙ্গী শিখায়ে কুরঙ্গরঙ্গী
আপাঙ্গ কাছলী যেন বাণ ॥

সখি হে হেরইতে ব্রজজন নারী।
সেইকালে ক্রোধে কাম সাজে ধনু অনুপাম
বরিষে কুসুম শর সারি॥
বটু কহে দোঁহে দোঁহা দরশনে দোঁহা হিয়া
দংশন হইল অনুমানি।
কৃষ্ণ কহে নহি নহি শুনহ নিশ্চয় কহি
যে রূপে দেখিল তারে আমি॥
চন্দ্রবিম্ব সুশীতলা মুখচন্দ্র মনোহরা
দূরে হৈতে দেখিতে তাহারে।
মাতা কহে হেনকালে মোরে দিব্য দিঞা বোলে
লঞা গেল অন্ন খাইবারে॥
বটু কহে ব্রজস্থানে আছয়ে সুন্দরীগণে
চাতুর্য বৈদগ্ধী নাহি ওর।
তবে কেনে একা রাধা লাগিয়া পাইছ বাধা
নির্ভরানুরাগে চিত্ত তোর॥
কৃষ্ণ কহে রাধিকার মাধুর্যের নাহি পার
রূপের তুলনা নাহি আনে।
সে সুন্দর মুখঠাম সুমঞ্জুল দুনয়ান
দেখি কাম হরয়ে গেয়ানে॥
যে হৈতে দেখিল তাঁরে চন্দ্র আর ইন্দীবরে
অতি তুচ্ছ করি হয় জ্ঞান।
সে মুখ নয়নযুগে দিতে উপমার যোগে
কুটিলতা লজ্জা পায় মন॥
সে রহে অন্তরে পশি না জানয়ে নিশি দিশি
সমাধি লাগিল আঁখি মোর।
দাস যদুনন্দন চিত্তে করে এই মন
নব লেহ রসে ভেল ভোর॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ৪৩-৪৪)

পূর্বোক্ত অনূদিত পদটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন। প্রথমতঃ, যদিও অনুবাদকার দুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া স্বকীয় অনুবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তথাপি মূলের আরও কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ তিনি করিয়াছেন। মাতার ভোজন করাইবার প্রসঙ্গের পরে 'বটু কহে ব্রজস্থানে' ইত্যাদি হইতে পদটির শেষ পর্যন্ত অন্য কতকগুলি শ্লোকের অনুবাদ। দ্বিতীয়তঃ, অনুবাদের মধ্যে অনুবাদকের স্বকীয় কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। কামের উল্লেখ শ্লোকানুসরণে হঠাৎ এক স্থানে না করিয়া যদুনন্দন প্রথম হইতেই তাহার কিছু বর্ণনা দিয়াছেন। বটু বা মধুমঙ্গলের গ্রন্থোক্ত জিজ্ঞাসাকে যদুনন্দন সম্ভবপর অনুমানে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। এইভাবেই অনূদিত পদটি আদ্যোপান্ত অনুবাদকের মৌলিকতা ও কবিত্বে মণ্ডিত লক্ষ্য করা যায়।

ললিতা বিশাখা শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে শ্রীরাধার পূর্বরাগের কথা নিবেদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে কপটতা করিয়া সেই পূর্বরাগ সাময়িকভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন, সেখানে সখীদ্বয় হতাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সখীদের অন্তর্ধানের পরেই শ্রীকৃষ্ণ দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন। তিনি মধুমঙ্গলের নিকট বলিয়াছেন—

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিংবা পামরকামকার্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন
হা মৌঢ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা॥

(বিদগ্ধমাধব: ২য় অঙ্ক, শ্লোক ৫৯, পৃ: ১০১)

অর্থাৎ—চন্দ্রবদনা (শ্রীরাধা) আমার নিষ্ঠুরতার কথা শুনিয়া হয়ত প্রেমাঙ্কুরকে ছিন্ন করিয়া দুঃখিত চিত্তে কোনরূপে ধৈর্যধারণপূর্বক ব্যথিত হইবে, কিংবা নিষ্ঠুর কামদেবের ধনুশব্দে ভীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। হায়, মূঢ়তাবশতঃ আমি কোমল ফলবতী মানস-লতাকে উন্মূলিত করিলাম।

যদুনন্দন শ্রীরূপ-রচিত পূর্বোক্ত শ্লোকটির পদ্যানুবাদ করিয়াছেন—

শুনিয়া নিষ্ঠুর বচন আমার
সে চাঁদ-বদনী রাধা।
বাঢ়ল প্রেমের অঙ্কুর সুন্দর
ভাঙ্গে পাঞা পাছে বাধা॥

কি কহিব আর তোরে।
কেন পরিহাস বচন নৈরাশ
কহিল হইয়া ভোরে॥
কিম্বা সেই ধনী ধৈর্য ধরে জানি
অন্তরে ধরিয়া ব্যথা।
পাছে সে ব্যথায়ে সে তনু জরয়ে
উপায় কি করি এথা॥
কিম্বা সুদারুণ কামের কামান
বিন্ধয়ে বিষম শরে।
শিরিষের ফুল জিনিয়া কোমল
সে কি সহিবারে পারে॥
তাহে সে মুগধি রূপের অবধি
ফলিনী মনোরথলতা।
ইহা কেন হেন বঞ্চনা বচন
কহি কৈনু উন্মূলিতা॥
অমৃত পুতলী রূপের আগলী
না জানি কি জানি হয়।
এ যদুনন্দন দাস কহি ভণ
দরশে পরাণ রয়॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ৪৮)

এখানেও যদুনন্দন যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ, পদকর্তা শ্লোকের একসাথে অন্বিত বিষয়গুলিকে পৃথক পৃথক করিয়া লইয়া রচনার মধ্যে সহজবোধ্যতা আনিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, পামর কামদেবের ধনুশব্দের উল্লেখের পরিবর্তে পদকর্তা বলিয়াছেন যে, শিরিষের ফুল অপেক্ষাও কোমল শ্রীরাধার অঙ্গ কামের কামানরূপ বিষম শরে বিদ্ধ হয়। ইহাতে ব্যথার দুঃসহতা অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, শিরিষ-ফুলের মতো শ্রীরাধার অঙ্গ কি মদন-বাণ সহ্য করিতে পারে? কিংবা অমৃত পুত্তলিরূপে অগ্রগণ্যা শ্রীরাধার না জানি কি হইবে—এই সমস্ত বলিয়া পদকর্তা যদুনন্দন মৌলিক অথচ অপূর্ব কবিত্বের সাক্ষ্য রাখিয়াছেন। এইসব কারণে রচনাটিকে আমরা শ্রীরূপের রচিত শ্লোকের অনুবাদ না বলিয়া শ্লোকানুসরণে মৌলিক পদ বলিয়াই অভিহিত

করিতে পারি। স্বতন্ত্র একটি পদরূপেই যে উপরের রচনাটি প্রচলিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে ১৮৭-সংখ্যক পদ হিসাবে রচনাটি সংকলিত হইয়াছে।

শ্রীরূপের শ্লোকটির অনুসরণে পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুরও পদ লিখিয়াছেন। তাঁহার পদটি এই—

হামারি নিঠুর পণা শুনই ইন্দুমুখী
ভাঙ্গই প্রেম অঙ্কুর।
দুখিত হৃদয় মাহা ধৈরজ করি পুন
ও রস করে জানি দূর ॥
কিয়ে জানি আপনি মদন-কদন-শরে
তেজই নিরুপম দেহ।
হাহা মনোরথ সব কৈল আনমত
কি করিব অব হাম থেহ ॥
অব মঝু অন্তর জ্বলত তুষানল
সহই না পারই অঙ্গে।
হোই সমীরণ বাঢ়ই পুন পুন
দারুণ মদন-তরঙ্গে ॥ (তরু ৪৭)

রাধামোহনের পদটির মধ্যে শ্রীরূপের শ্লোকানুসরণে শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কথা, ইন্দুমুখী শ্রীরাধার প্রেমাঙ্কুর ভঙ্গ করা, দুঃখিত হৃদয়ে ধৈর্যধারণ এবং সর্বশেষে মদনের শরে তাঁহার (শ্রীরাধার) দেহত্যাগ করিবার বিষয় সমস্তই উল্লিখিত হইয়াছে। রাধামোহনের পদেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মনোরথ নষ্ট হইল বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন।

বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কেই শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানের কথা শুনিয়া শ্রীরাধা খেদ-সহকারে প্রবোধদায়িনী বিশাখাকে বলিয়াছেন—

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমা সখি! তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্ধৈর্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥
(বিদগ্ধমাধব—শ্লোক ৬০, পৃঃ ১০২-১০৩)

অর্থাৎ—সখি, যাঁহার ক্রোড়ে স্থান পাইবার সুখের আশায় গুরুজন হইতে গুরুতর লজ্জাকেও শিথিল করিয়াছি, প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়তমা সখী তোমাদের কত রকমে

কষ্ট দিয়াছি, সাধ্বীদের সেবিত সেই মহান ধর্মকেও আমি গ্রাহ্য করি নাই, তাঁহার দ্বারাই যখন উপেক্ষিত হইয়াও পাপীয়সী আমি প্রাণ ধারণ করিয়া আছি, তখন আমার ধৈর্যকেই ধিক্।

যদুনন্দন শ্লোকটিকে ভাষান্তরিত করিতে লিখিয়াছেন—

যার সঙ্গসুখ আশে কৈনু আমি ধর্ম নাশে
তিয়াগিনু গুরু লজ্জাগণ।
যত সখিগণ তোরা প্রাণ হৈতে অধিক মোরা
দুঃখ দিল যাহার কারণ॥
সখিহে ধিক রহু ধৈরয আমার।
সে কৃষ্ণ উপেক্ষা শুনি তবু রহে পাপ প্রাণী
কিবা চাহে করিবারে আর॥
যাহার লাগিয়া সতী ধর্ম তিয়াগিনু অতি
না গণিনু দুর্জন বচন।
দুকুলে কলঙ্ক হৈল তাহা নাহি মনে কৈল
সে রূপে মগন কৈলু মন॥
যাহার লাগিয়া কত গুরুর গঞ্জনা যত
করিয়া লইনু হিয়া হার।
এতেক কহিতে রাই মূর্ছা পাঞা সেই ঠাঞি
পড়ি রহে জ্ঞান নাহি আর॥
বিশাখা সম্ভ্রমে যাঞা তাঁরে কহে ধরি লঞা
ধৈর্য হও না ভাব অসার।
ইহা শুনি পোড়ে মন দাস যদুনন্দন
মুখে বাক্য না হয় সঞ্চার॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ৪৯)

পদটির মধ্যে শ্রীরাধা কর্তৃক দুর্জন-বচন গণনা না করা, তাঁহার দুকুলে কলঙ্ক হওয়া, শ্রীরাধার পক্ষে গুরুর গঞ্জনাকেও হৃদয়ের (বুকের) হার করিয়া তোলা—সমস্তই যদুনন্দনের মৌলিক সংযোজনা। এই মৌলিক সংযোজনার গুণে পদটির কাব্যিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহা স্বতন্ত্র পদের মর্যাদা অর্জন করিয়াছে।

বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীরাধা যেখানে সখিমুখে তাঁহার প্রেম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানের বিষয় অবগত হইলেন, সেখানে শ্রীরূপ শ্রীরাধার মুখে সংলাপ সংযোজনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

মং পরিহরই মুউংদো তহ বি দুরাসা বিরোহিণী ডহই।
মহ সহি! গহীরণীরা সরণং বহিণী কিদংতসূস॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ১০৫)

অর্থাৎ—সখি, মুকুন্দ আমাকে পরিত্যাগ করিলেও বিরোধিনী দুরাশা আমাকে দগ্ধ করিতেছে। এখন গভীরসলিলা কৃতান্তভগিনী যমুনাই আমার একমাত্র আশ্রয়।

শ্রীরাধার এই কথার উত্তরে ব্যাকুলা বিশাখা বলিয়াছেন—

হলা! পেকৃখ পথাণে মঙ্গলসূঅণাইং সউণাইং, তা এব্বং মা ভণ।

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ১০৫)

বঙ্গার্থ—সখি, দেখ, আমাদের প্রস্থানকালে মঙ্গলসূচক লক্ষণসকল পরিদৃষ্ট হইতেছে, অতএব আর এইরূপ কথা বলিও না।

যদুনন্দন দাস উপরি-উক্ত প্রসঙ্গটি লইয়া ত্রিপদীতে লিখিয়াছেন—

মোরে তিয়াগিল শ্যামল সুন্দর
শুনিল এ তব কানে।
দুরাশা বিবিধি হয়া নিরবধি
তথাপি দগধে মনে॥
সই দঢ়াইনু এই সার।
সে হরি দুর্লভ না হয় সুলভ
মরণ সে প্রতিকার॥
কালিন্দী গভীর জলের ভিতর
প্রবেশ করিব আমি।
তবে সে পিরিতি কহয়ে কি রীতি
নিশ্চয় জানিহ তুমি॥
বিশাখা শুনিঞা দুঃখি ভেল হিয়া
কহে হেন কেনে কহ।
গমন সময়ে মঙ্গল কহয়ে
বুঝিয়া ধৈরয কহ॥

এমতে রাধিকা ব্যাকুল অধিকা
ভাবের তরঙ্গে ভাসে।
অনুরাগে মনঃ ধৈর্য নহে পুনঃ
ভণে যদুনন্দন দাসে ॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ৫১)

আমরা দেখিতেছি, ত্রিপদীর মধ্যে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি যে সখীর মুখে শুনিয়াছেন তাহা স্পষ্টই বলিতেছেন, শ্লোকে এইরূপ নাই। দ্বিতীয়তঃ, অকৃত্রিম প্রেমের পরিচয় রাখিবার জন্যই শ্রীরাধা যে কালিন্দীনীরে প্রবেশ করিবেন, তাহা পদটির মধ্যেই বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, পদটির শেষ স্তবকে পদকর্তা মৌলিক ভাবেই শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের ৬৮-সংখ্যক শ্লোকে সখীদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীরাধা বলিয়াছেন—

যস্যোরস্তঃস্থলমণ্ডলং ধৃতিনদীরোধক্রিয়াপণ্ডিতং
বক্ত্রেন্দুঃ কুলধর্মপঙ্কজবনীসঙ্কোচদীক্ষাব্রতী।
দোর্যূপৌ নিতরামুদঞ্চিতচিরব্রীড়াভিচারাধ্বরৌ
হা কষ্টং! নিখিলঙ্গিলা সখি! দৃশোর্ভঙ্গী ভুজঙ্গী তু সা ॥
(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ১০৮)

অর্থাৎ—যাঁহার বক্ষস্থল ধৈর্যনদীকে রোধ করার কার্যে দক্ষ, মুখচন্দ্র কুলধর্মরূপ পদ্মবনের সঙ্কোচনে দীক্ষিত, বাহুদ্বয় উন্নত ব্রীড়াবলিদান যজ্ঞের জন্য চিরকাল যূপকাষ্ঠের ন্যায় উদ্গত, হে সখি, কী কষ্ট, তাঁহার নয়নভঙ্গীরূপা ভুজঙ্গিনী আমাদের সকলকে গ্রাস করিল। শ্লোকোক্ত এই কথাগুলির মধ্যে অতিরিক্ত সংহতি থাকার জন্য কাব্যধর্ম ঠিক উপলব্ধি করা যায় না।

যদুনন্দন কিছু বিশ্লিষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—

যাঁর পরিসর বুক জাগায়ে সকল সুখ
হরে কুলনারীগণ চিত।
তাঁহার মাধুরী ভাল যত কুলাঙ্গনা জাল
ধৈর্যনদী রোধন পণ্ডিত ॥
সখী হে কহ ইবে কি করিব আমি।
সুন্দর মধুর নাম মাধুর্য মুরলী গান
তাতে ধৈর্য ধরে কেবা প্রাণী ॥

বদন চান্দের ছান্দ মদন দেখিয়া ধান্ধ
অখণ্ড নলিনী নিশিদিনে।
কুলাঙ্গনা ধর্ম যত পঙ্কজ বনের মত
তাহা সঙ্কোচিত করে হিমে॥
কৃষ্ণ বাহু ডুই নহে কন্দর্পের স্রব বহে
সতী লজ্জা হরি করে জাগে।
নয়ান ভঙ্গিম ঠাম শীতল ভুজঙ্গ ভান
দেখি ধর্ম ভেকগণ ভাগে॥
তাঁহা প্রতি অঙ্গ তার মদন বাণের জাল
অলখিতে কুলবতী চিত।
বিন্ধিয়া বিকল করে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে
কহে যত্নন্দন এ রীত॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ৫২-৫৩)

কেবলমাত্র বিশ্লিষ্টভাবে লেখাই নহে, যত্নন্দন দাস বহু নূতন কথার অবতারণাও করিয়াছেন। প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মধুর নাম ও মাধুর্যপূর্ণ মুরলীর গান ত্রিপদীতেই প্রথম উল্লিখিত। দ্বিতীয়তঃ, নলিনীর প্রসঙ্গ পঙ্কজবনের বৈপরীত্য দেখাইতেই পদকর্তা মৌলিকভাবে লিখিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের দুই বাহুর প্রসঙ্গটি শ্লোক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্থতঃ, ধর্মভেকের অবতারণা যত্নন্দনের নিজস্ব। পঞ্চমতঃ, শেষ স্তবকটি সমস্ত পূর্ববর্তী বর্ণনার উপসংহার হিসাবেই পদকর্তা নিজে সংযোজনা করিয়াছেন। এতগুলি পার্থক্যের বিষয় অনুধাবন করিয়া উপরি-ধৃত পদটিকে নিতান্তই অনুবাদ বলিতে কেমন সঙ্কোচ হয় না কি?

দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্বরাগিণী শ্রীরাধা বলিয়াছেন—

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা নহি কিমপি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং।
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবীম্॥ (বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ১০৯)

শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ—আমরা নিজেদের বাল্যস্বভাববশতঃ গৃহমধ্যেই খেলা করিয়া থাকি, ভালো বা মন্দের কিছুই বুঝি না। আমাদের কোন আশ্রয়হীন দশায় লইয়া যাওয়া কি (তোমার) উচিত? (লইয়া যাওয়ার পর) এইরূপ উদাসীন হইয়া থাকাও কি তোমার (পক্ষে) যুক্তিযুক্ত?

শ্লোকের কথাগুলি লইয়া সাজাইয়া গুছাইয়া পদকর্তা যদুনন্দন নিম্নোক্ত পদটি রচনা করিয়াছেন—

গৃহের ভিতরে হরিষ অন্তরে
খেলিয়ে বিবিধ খেলা।
সহজে আপন বয়স যেমন
নবীন কুলের বালা॥
হরি হরি হেন না বুঝিবে তোরে।
গৃহ ছাড়াইয়া কুপথে ফেলিয়া
উদাসীন কৈলা মোরে॥
ভালমন্দ আমি কিছু নাহি জানি
হেন দশা কৈলে কেনে।
অতি অবিচার দেখিয়া ব্যাভার
চমক লাগয়ে মনে॥
উদাসীন কৈলে পুনঃ তেয়াগিলে
তুমি নিদারুণ রাজ।
তোরে নাহি দুঃখ মোর ফাটে বুক
জীবন লাগয়ে লাজ॥
শয়ন ভোজনে তনু বেশ গণে
তিলেক না লয়ে চিত।
এ যদুনন্দন দাস তঁহি ভণ
নবীন লেহক রীত॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ৫৩)

এখানে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, শ্লোকোক্ত 'উদাসীন' শব্দটি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হইয়া একাধিক বার শ্রীরাধা সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, শ্রীরাধার চমক-লাগা, বুক ফাটিয়া যাওয়া, জীবনে লজ্জার বিস্তার এবং নিজের আহার, নিদ্রা, বেশ বাস ও বন্ধুবান্ধব কিছুতেই তিলেকের জন্য মন না লাগা—সমস্তই পদকর্তার মৌলিক সংযোজনা এবং অপূর্ব কবিত্বে মণ্ডিত।

পূর্বরাগানুরঞ্জিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানের সংবাদ পাইয়া আর জীবন ধারণ করিতে চাহেন না। শ্রীরাধার সংলাপ শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিং।
তমালস্য স্কন্ধে সখি! কলিতদোর্বল্লরীরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ১১০)

অর্থাৎ—সখি, কৃষ্ণ যদি আমার উপর এইরূপ অকরুণ হন, তাহাতে তোমার অপরাধ কি? এইরূপভাবে আর বৃথা রোদন করিও না, পরন্তু তমালের স্কন্ধে আমার ঐ ভুজলতা আবদ্ধ করিয়া যাহাতে চিরদিন অবিচলিতভাবে বৃন্দাবনে আমার এই দেহ থাকে, এমনভাবে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিও।

শ্রীরূপের শ্লোকের কথাগুলিকে বাংলা ছন্দের রূপরেখায় ধরিতে গিয়া যদুনন্দন লিখিয়াছেন—

যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে।
তাহাতে বা কেবা দোষ দিবেক তোমারে॥
না কান্দিহ আরে সখি কহিয়ে নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণবিনে প্রাণ মুঞি না রাখিব দেহে॥
উত্তরকালের এক করিহ সহায়।
এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥
তমালের কান্ধে মোর ভুজলতা দিয়া।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিহ বান্ধিয়া॥
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ।
শুনিয়া কাতর যদুনন্দন দাস॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ৫৪)

উপরি-ধৃত পদে যদুনন্দন শ্রীরূপের শ্লোকেরই অনুবাদ করিয়াছেন, তবে শ্লোকে শ্রীরাধার মরণেচ্ছা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, অনুবাদে তাহা প্রকট হইয়াছে। তাহা ছাড়া, শ্লোকে দেখা যায় শ্রীরাধার দেহটি চিরদিন বৃন্দাবনে থাকিলেই ধন্য, অপর পক্ষে বাংলা পয়ারে দেখি পরমদয়িত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রাণহীন দেহটি দেখিলেই শ্রীরাধার অন্তরের বাসনা পূর্ণ হইবে।

যদুনন্দনের অনূদিত পদটি কেবলমাত্র অনুবাদ হিসাবেই চলে নাই, স্বতন্ত্র পদের মর্যাদাও পাইয়াছে; সেইজন্য আমরা দেখি, পদাবলী সঙ্কলন-গ্রন্থে (যেমন পদকল্পতরুর ১৮৫-সংখ্যক পদ হিসাবে) লেখাটি সঙ্কলিত হইয়াছে।

পদকর্তা ঘনশ্যাম দাসও শ্রীরূপের শ্লোকটিকে অনুসরণ করিয়া সুন্দর দীর্ঘ একটি পদ রচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

কমলবয়নি ধনী রাই।
ঢর ঢর সখীমুখ চাই॥
আপন করম দুখ জানি।
মৃদু মৃদু বোলই বাণি॥
শ্যাম বিমুখ ভেল মোয়।
ইথে কিয়ে দোখব তোয়॥
তুহু কাহে রোয়সি সজনি।
মঝুকু করম সব দৈবক করণি॥
অব অছ করবি বিচার।
ইথে লাগি তোহে পরিহার॥
ইহ বৃন্দাবন মাহে।
যতনে রাখবি মঝু দেহে॥
তমাল তরুবরে সোঁপি।
ভুজলতা রাখবি বোপি॥
রাইক অনুভব জান।
ঢর ঢর লোচন কান॥
সহচর বয়ান নেহারি।
লহু লহু কহত মুরারি॥
দেখ সখা কিয়ে পুন ভাগ।
কি কহব সখি অনুরাগ॥
হামারি পরশ অভিলাষে।
ছোড়ল জীবন আশে॥
ঘনশ্যাম দাস গুণ গায়।
ইহ রীত তোহে না জুয়ায়॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৬৭)

ঘনশ্যামের পদটিতে প্রথমেই পরিস্থিতি সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি শ্যামবিমুখতার জন্য সখীদের কাহাকেও যে দোষারোপ করেন নাই, এই বিষয়টি

পদকর্তার মৌলিক সংযোজনা। তাহা ছাড়া, শ্রীরাধা যখন জীবিত থাকিবেন না, তখন তাঁহার তমালবৃক্ষস্থিত দেহটি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কী কী করিবেন শ্রীরাধা তাহাও চিন্তা করিয়াছেন—এইরূপ চিন্তার উপস্থাপনা পদকর্তার মৌলিক অথচ সুন্দর কবি-কল্পনার পরিচায়ক।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎকারে উভয়েই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য-বিমুগ্ধতাকে বাণী দিতে গিয়া শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

অসৌদৃগ্‌ভঙ্গীভিঃ কুসুমশরমঙ্গীকৃতশরং
সৃজন্তী দন্তীন্দ্রক্রমণক মণীয়ালসগতিঃ।
অদূরে রম্ভোরুরিহ বদনবিম্বস্য সুষমা
সমারম্ভাদম্ভোরুহমধুরিমাণং দময়তি॥ (বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ১১৪)

অর্থাৎ—অদূরে এই রম্ভোরু (শ্রীরাধা) দৃগ্‌ভঙ্গীর দ্বারা কুসুমশরের শরকে অঙ্গীকার করিতেছে, গজেন্দ্রের গতি অপেক্ষা সুন্দর অলসগতির সৃষ্টি করিতেছে, বদনবিম্বের সুষমার স্ফুরণে পদ্মের মাধুর্যকেও দমন করিতেছে।

শ্লোকোক্ত কথাগুলিকে পদে বিন্যস্ত করিতে গিয়া যদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন—

দীঘল নয়ন ভঙ্গী করে শর বররঙ্গী
অঙ্গীকার করয়ে সৃজন।
মন্থরগমনী ধনী রমণীর শিরোমণি
গজপতি করয়ে দমন॥
ধনি ধনি এইরূপ অতি নিরুপমা।
বিজুরী ঝলকে অঙ্গ লাবণি অমিয়া ভঙ্গ
যে কহিয়ে নহে কেহো সমা॥
রামরম্ভাগণ জিনি উরুযুগ সুবলনী
উন্নত নিতম্ব মনোহরা।
উচ্চ কুচযুগ শোভা মাজাহীন কেশরী লোভা
তাতে নব যৌবনের ভরা॥
বদন কমল বন দমন মাধুরীগণ
তাহাতে মধুর মৃদু হাস।
শোভা দেখি স্তব্ধ মন হৈল কৃষ্ণ সেইক্ষণ
দেখি যদুনন্দন উল্লাস॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ৫৬)

পদকর্তা শ্রীরাধার অতুলনীয় বিদ্যুৎঝলকিত অঙ্গের বর্ণনায় যে লিখেন শ্রীরাধার দেহের লাবণ্য অমৃতের মতো,—এইগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক, শ্লোকে নাই। পদের শেষে শ্রীকৃষ্ণের, আরও ভক্তকবি নিজের অবস্থার কথা উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই সমস্ত অতিরিক্ত সংযোজন লইয়া পদটি স্বয়ংসম্পূর্ণ।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্তের জন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছেন। হঠাৎ জরতী আসিয়া পড়ায় শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, শ্রীরাধার অন্তরে জাগিয়াছে অতৃপ্তি। শ্রীরূপ শ্রীরাধার কথাগুলি নিম্নোক্তরূপ লিখিয়াছেন—

পীতং ন বাগমৃতমত্র হরেরশঙ্কং
ন্যস্তং ময়াহস্য বদনে ন দৃগঞ্চলঞ্চ।
রম্যে চিরাদবসরে সখি লব্ধমাত্র
হা! দুর্বিধির্বিরুরুধে জরতীচ্ছলেন॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ১২১)

অর্থাৎ—আমি এখানে হরির বচন-সুধা নির্ভয়ে পান করিতে পারিলাম না, ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) আননে নয়নপ্রান্ত স্থাপন করিতেও অসমর্থ হইলাম। বহুদিন পরে সুন্দর এই অবসর পাওয়া মাত্রই, হায়, দুর্বিধি জরতীরূপে আসিয়া বিরোধিতা করিল।

শ্রীরূপের এই শ্লোকের অনুসরণে যদুনন্দন লিখিয়াছেন—

অমৃত বদন মধুর বচন
শ্রবণ জুড়ায় তাতে।
হেন প্রাণীগণ ভরিয়া শ্রবণ
না শুনিনু ভাল রীতে॥
সই গো চিরদিন অবসরে।
এ হরি মিলিল বিধি বৈরী ভেল
দারুণ জরতি ছলে॥
মুখ নিরমল জিনিয়া কমল
হাসির অঙ্কুর তায়।
এ মোর নয়ান চঞ্চল হইতে
বিধি কৈল অন্তরায়॥

মরকত মণি দরপণ জিনি
ও গণ্ডযুগল শোভা।
তাহাতে সুন্দর মকরকুণ্ডল
দোলে মনমথ লোভা॥
ও ভাঙ ভঙ্গিম নয়ান বঙ্কিম
তেরছ সন্ধানে চায়।
এ যতুনন্দন কহে ধনী পুনঃ
মিলায়ব শ্যামরায়॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ৫৯-৬০)

পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলের যে সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকে নাই। পদপ্রান্তিকে ভক্তকবির আস্বাদন-বাণীটিও সম্পূর্ণ মৌলিক। পদটিকে সামান্যতম শ্লোকানুসরণের জন্য স্বতন্ত্র পদ না বলিবার কোন কারণ নাই।

শ্রীরূপ-কৃত বিদগ্ধমাধবের তৃতীয় অঙ্কে (১৩৮ হইতে ১৪০ পৃষ্ঠায়) পূর্বরাগিণী শ্রীরাধা পৌর্ণমাসী সমক্ষে নিজের হৃদয়ানুরাগ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—'অব্ভংলিহগ্গি ডহণে লডহং রঙ্গণলদং লিহন্তগ্গি' ইত্যাদি। কথাগুলির অর্থ—আকাশচুম্বী প্রচণ্ড অগ্নি রক্ষণলতা দগ্ধ করিতেছে, এমন অবস্থায় আকাশের শ্যামঘনের বর্ষণ ভিন্ন তাহার অন্য কি প্রতিকারের যুক্তি থাকিতে পারে?

শ্রীরাধার কথা শুনিয়া পৌর্ণমাসী 'জরত্যাস্ত্বং নপ্ত্রী স তু কমলয়া লালিতপদঃ ইত্যাদি উত্তর দিয়াছেন। পৌর্ণমাসীর কথাগুলি ভাষান্তরিত করিলে দাঁড়ায়—তুমি জরতীর নাতিনী, আর স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহার (শ্যামের) পদসেবা করিয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে তুমি সেই দুর্লভ বস্তু পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? কথা শুনিয়া মনস্থির কর, কৌতূহলের বশীভূত হইয়া হাত দিয়া আকাশের চাঁদ ধরিবার চেষ্টা করিও না।

শ্রীরাধা বলিলেন—'ময়া তে নির্বন্ধানুরবিজয়িনি রাগঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ—দেবি, আপনার নির্বন্ধাতিশয়ে আমি সেই মুরারির প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু আপনি আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহশীলা তাহাতে আমাকে এইরূপ আশীর্বাদ করুন, আমি যেন শ্রীহরির মুখসৌরভে মন দিয়া আজ সন্ধ্যাতেই তাঁহার বিমল মালায় মধুকরী হইয়া বিরাজ করিতে পারি।

ঐ কথা বলিয়া শ্রীরাধা বিবশতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিশাখা তাঁহার (শ্রীরাধার) অবস্থা দেখিয়া পৌর্ণমাসীকে বলিলেন—'ভঅবদি পরিত্তাহি' ইত্যাদি, অর্থাৎ—ভগবতী, পরিত্রাণ করুন। রাধিকা যে চোখ উপরে তুলিয়া এক নিদারুণ দশায় পৌঁছাইলেন।

অতঃপর পৌর্ণমাসী ও ললিতা দুইজনে শ্রীরাধাকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। পৌর্ণমাসী বলিলেন—হায়, হায় ধিক্, ধিক্ আমিই যে বল প্রকাশ করিয়া মহাবিপদরূপ কালসর্পিণীকে আকর্ষণ করিলাম। বৎসে, আশ্বস্ত হও, তোমার মনের ভাব জানিবার জন্য পরিহাস করিয়াছি। এখন ঠিক কথা বলিতেছি, শোন। সুন্দরি, জগৎগুরু অমিতপ্রভাবশালী শঙ্কর প্রভৃতি দেবতাও যাঁহার দর্শনমাত্র লাভ করিবার জন্য উৎকণ্ঠাভরে কত তপস্যা করিতেছেন, সেই সুতনু তোমার দর্শন-তৃষ্ণায় দিনে দিনে ক্ষীণ হইতেছেন। আহা, তোমার এমন দুর্জ্জের শুভভাগ্যের আর কি বলিয়া প্রশংসা করিব?

ললিতা বলিলেন—'ত্বদ্বার্তোত্তরগীতিগুম্ফিতমুখো' ইত্যাদি। অর্থাৎ—সখি, কৃষ্ণের বেণু সর্বদা চারিদিকে তোমার চরিত্রগানে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তোমার বেশ-রচনার উপযোগী শিল্পকর্মের কল্পনায় তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া নিযুক্ত হইয়াছে, তাঁহার গাভীগুলিকে আজ তিনি তোমারই নামে আহ্বান করিতেছেন, অন্য সমগ্র বৃন্দাবন যেন তুমিই লতারূপে পরিপূর্ণ করিয়াছ কংসারির নিকট এইরূপ প্রতিভাত হইতেছে।

শ্রীরূপের রচিত উপরি-উক্ত বর্ণনা ও সংলাপ বাংলা পদের মধ্যে ধরিতে গিয়া পদকর্তা যদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন—

এ ভূমি আকাশ ভরল হুতাশ
বহয়ে প্রচণ্ড জ্বালা।
তার মাঝে যেন কোমল রঙ্গণ
লতার বসতি ভেলা॥
কি কহিব আমি আর।
মনে বিচারিয়া বুঝ তুমি ইহা
কৈছে হয়ে প্রতিকার॥
মো পুনি বুঝিনু বুঝিয়া জানিনু
দাঁড়াই কহিয়ে সার।
শ্যাম ঘন বিনে ইহার জীবনে
উপায় না দেখি আর॥
কহে ভগবতী শুনিয়া এমতি
আরতি বচন তার।
তুমি সে সুধনি মুখরা নাতিনী
এই সে ভুবন সার॥

কমলা লালিত পদ সুললিত
সুলভ না হয় সে।
আমার বচন শুনহ এখন
হৃদয়ে বান্ধহ থে॥
আকাশের চাঁদে ধরিবারে সাধে
হাত পসারহ কেনে।
এ সব কৌতুকে ক্ষণ দেহ বুকে
বিচারিয়া নিজ মনে॥
এ বচন শুনি কহে সুবদনী
হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা।
অতি গদ গদ আধ আধ পদ
মুখে না নিকসে কথা॥
শুন ভগবতী এই মোর মতি
নির্বন্ধ কহিনু তোঁহে।
এ মোর পরাণ ভেল পরাধীন
তা বিনু না রহে দেহে॥
সে বরি চন্দন সৌরভ সদন
হরিল সে মতি মোর।
সে তনু মাধুরী বচন চাতুরী
কে কহ তাহার ওর॥
শুন ভগবতী আশীষ অতি
করহ চিত্তের সনে।
সে হরি গলায়ে ও নব মালায়ে
মধুকরি হঙ মনে॥
গোধূলি সময়ে গোরজ ভরয়ে
গোবিন্দ অলকাকেশে।
সে রূপ ভাসিতে আপনার চিতে
না হয় ধৈরজ লেশে॥

এই সব বাণী কহিতে সুধনী
আবেশ হইল গায়।
আকুল হইয়া কহয়ে ডাকিয়া
বিশাখা দেখিয়া তায় ॥
দেখ ভগবতী ধনী আন মতি
লভিল দারুণ দশা।
উত্তান নয়ন হইল এখন
কহয়ে কেমন ভাষা ॥
এ দশা হইতে তরাহ ত্বরিতে
চরণে ধরিয়ে তোর।
দেখি পৌর্ণমাসী অতি বেগে আসি
রাধিকা করিল কোর ॥
বিপান দারুণ কাল ভুজঙ্গম
গরলে জারিল তোমা।
আমার বচন শুনিয়া এখন
চিত্তে দেহ তুমি ক্ষমা ॥
এ তুয়া ভাবের জানিতে ব্যাভার
পরিহাস কৈল তোরে।
সত্য কথা শুন হরি বিবরণ
যৈছন ভৈগেল ভোরে ॥
যে হরি ভৈরব নহে অনুভব
দরশ রসের আশে।
করে জপ তপ ক্ষিতি গুরু ভব
সতত যোগীর বেশে ॥
তুমি পুণ্যবতী কি কহিব অতি
সে হরি তোমার ভাবে।
করয়ে অতনু জাগ দিয়া তনু
তোমা বিনা দরশনে ॥

তোমার চরিত গায় অবিরত
বেণু করি নিজ মুখে।
তোমার সমান করে বেশগণ
তোমা মানে আপনাকে ॥
ডাকে ধেনুগণে ভরমে যেখানে
লইয়া তোমার নাম।
শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণে
তোরে নিরখিয়ে শ্যাম ॥
এ ভূমি গগন তরুলতাগণ
তোঁময়ি মানয়ে হরি।
এ যদুনন্দন কহয়ে নবীন
অনুরাগ বলিহারি ॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ৬৮—৭০)

পদটি কিছু দীর্ঘ হইলেও আমরা দেখিতেছি, ইহার মধ্যে শ্রীরূপের শ্লোকের সমস্ত কথাই ধরা হইয়াছে। কয়েকটি বিষয়ে মৌলিকতা লক্ষণীয়। বাংলা ত্রিপদী রচয়িতা 'গোধূলি সময়ে গোরজ ভরয়ে' ইত্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে মৌলিকতা তো আছেই, কাব্যিক উৎকর্ষও অসামান্য। দ্বিতীয়তঃ, 'করয়ে অতনু' ইত্যাদি চরণে যদুনন্দন নূতন কথা লিখিয়াছেন এবং তৎপরে ললিতার উল্লেখ না করিয়াই তাঁহার কথাগুলি বিন্যস্ত করিয়াছেন।

বিদগ্ধমাধবের তৃতীয় অঙ্কে পূর্বরাগে-অনুলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণের উদ্বেগও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, প্রতীক্ষমান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা বা দূতী প্রভৃতিকে আসিতে না দেখিয়া বলিয়াছেন—

ধ্যাত্বা ধর্মং ধৃতিমুদয়িনীং কিং ববন্ধাদ্য রাধা
তীব্রাক্ষেপৈঃ কিমুত গুরুভির্লম্ভিতা বা নিবৃত্তিং।
কিংবা কষ্টামভজত দশাঃ তামবিস্পন্দমন্দা-
মিন্দৌ বিন্দত্যুদয়মপি যন্নাজগামাদ্য দূতী ॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ১৪৩)

অর্থাৎ—ধর্ম চিন্তা করায় ধৈর্যভাবের আবির্ভাবে কি শ্রীরাধা হৃদয় বন্ধন করিলেন? অথবা, গুরুজনের তীব্র তিরস্কারে তিনি নিবৃত্তি লাভ করিলেন? কিংবা চন্দ্র উদিত

হওয়ায় বিরহব্যথাতে তিনি স্পন্দনহীনা হইয়া পড়িয়াছেন ?—এইজন্যই কি এখনও দূতী আসিতে পারিল না ?

লতান্তরাল হইতে বিশাখা এই কথা শুনিয়া স্বগতোক্তি করিয়াছেন—

'এসো নূণং উক্কণ্ঠাএ মহজ্জেব্ব পঅবীং বিলোএদি কহ্ণো' ইত্যাদি।

কথাগুলির বঙ্গানুবাদ—এই যে (শ্রী)কৃষ্ণ উৎকণ্ঠাভরে আমার আগমন-পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অতএব ক্ষণকালের জন্য ইহার সহিত পরিহাস করি।

পদকর্তা যদুনন্দন দাস শ্রীরূপের পরিকল্পনাটি অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

সতী কুল কায় দুকুলের লাজ
ধরম দেখিয়া কেবা।
ধৈরজ উদয় হইল হৃদয়
রাধিকা অধিক সেবা॥
কিম্বা গুরুজন তর্জন বচন
কহিয়া নিবৃত্তি কৈল।
কিম্বা অতিশয় ক্ষীণ তনু হয়
চলিবারে না পারিল॥
নহিলে বা কেনে সুচন্দ্র গগনে
উদয় হইল অতি।
তবু এতক্ষণে সঙ্কেত ভবনে
না মিলিল সখী দূতী॥
কৃষ্ণের এ বাণী বিশাখিকা শুনি
দেখে গ্রীবা উঠাইয়া।
মনে বিচারয়ে কৃষ্ণ তাপ তায়ে
মোর পথ নিরখিয়া॥
আগেতে যাইয়া ছলে উঠাইয়া
পরিহাস করি আমি।
এ যদুনন্দন দাস কহে শুন
ভাল বিচারিলে তুমি॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ৭১)

শ্রীরূপের সব কথাগুলিই ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

বিশাখা পরিহাস করিলেও শ্রীকৃষ্ণ সব-কিছু গাম্ভীর্যের সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছেন সেজন্ত স্বভাবতঃ দুঃখিত হইয়া তিনি বলিয়াছেন—

প্রপয়তি বপুর্দুঃশীলো মে বলান্মলয়ানিলো
বিকিরতি করৈরিন্দুঃ ক্ষোদং তুষাগ্নিভরং রুষা।
মদনহতকস্তর্জত্যেষ স্ফুটৈরলিহুঙ্কৃতৈ-
স্ত্রুটিরপি বিনা রাধাং নেতুং যয়া ন হি শক্যতে ॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ১৪৬)

অর্থাৎ—দুঃশীল মলয় বাতাস বলপূর্বক আমার শরীরে ব্যথা দিতেছে, তাহাতে আবার চন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়া কিরণরাশির দ্বারা তুষাগ্নিতুল্য তাপ বর্ষণ করিতেছে। হায়, রাধিকা বিনা আজ তিলার্ধকালও যাপন করিতে পারিতেছি না।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া বিশাখা 'গোউলাণংদ! সমস্সস' ইত্যাদি ভাষায় বলিয়াছেন যে, গোকুলানন্দ স্থির হউন, সে (বিশাখা) পরিহাস করিতেছে মাত্র।

শ্রীরূপের উক্ত শ্লোকটির কিছু অনুসরণেই পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

কিয়ে হিমকর কর কিয়ে নিরঝর-ঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ
জলতহিঁ চন্দন-পঙ্ক ॥
অব অব ধারলুঁ রে, কানু তুয়া পরশক রঙ্ক।
নায়রি-কোরে তো বিনু মুরুছই
অপরূপ মদন-আতঙ্ক ॥ (তরু ২১৯)

এখানেও শ্লোকের স্থায় হিমকর কর বা চন্দ্রকিরণ, মলয় সমীরণ, এমনকি মদন-আতঙ্ক পর্যন্ত উল্লিখিত।

শ্রীরূপের রচিত শ্লোকটির অনুসরণে যদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন—

মলয় পবন এ নব কুসুম
বহয়ে সৌরভ যত।
সুখদায়ি ছিল দুঃখদায়ি ভেল
এ দুঃখ সহিত কত ॥

সখিহে কি আর কহিব তোরে।
সে রাধা বিহনে আমার জীবনে
শরীরে না রহে জোরে॥
চন্দ্রের কিরণ কৈল প্রসারণ
দেখিতে জ্বলয়ে তনু।
আমারে দহন করিতে মদন
তুষানল জ্বালে কনু॥
দারুণ মদনে করে তরজনে
ভ্রমর ঝঙ্কার করি।
কহত কেমতে তিলেক ইহাতে
রহিয়ে ধৈরজ ধরি॥
এতেক কহিতে হঞা মুরছিতে
পড়িল সেখানে হরি।
বিশাখা দেখিয়া সংভ্রম হইয়া
কহয়ে আশ্বাস করি॥
শুনহ গোবিন্দ গোকুল আনন্দ
ধৈরজ ধরহ চিত।
পরিহা তোহে কৈল কেন তাহে
মরমে বাসহ ভীত॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ৭২)

শ্লোকে আমরা দেখি, মলয় পবনের সাম্প্রতিক কাজটিই উল্লিখিত হইয়াছে, বাংলা ত্রিপদীতে কিন্তু তাহার পূর্ব রূপও বর্ণিত; পদকর্তা স্পষ্টই লিখিয়াছেন, নবকুসুমের সৌরভ বহন করিয়া মলয় পবন শ্রীকৃষ্ণের কাছে এতদিন সুখপ্রদ ছিল, এখন দুঃসহনীয় হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্লোকে বলা হইয়াছে, চন্দ্র কিরণরাশি দ্বারা তুষের আগুনের মতো তাপ বর্ষণ করিতেছে; বাংলা পদে বোধ করি ছন্দোরক্ষার তাগিদেই তুষাগ্নির কথাটি পদের মধ্যে ধ্রুবপদের মর্যাদা পাইয়া সকলকে তৃপ্ত করিয়াছে। এই পদটিতে শ্লোকানুসরণ তো আছেই, তদুপরি উপরি-উক্ত মৌলিকতা সংযোজিত হইয়াছে।

শ্রীরাধার অদর্শনে কাতর শ্রীকৃষ্ণকে প্রবোধ দিয়া 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে বিশাখা বলিয়াছেন—

দূরাদপ্যনুসঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে ত্বন্নামধেয়াক্ষরে
সোন্মাদং মদিরেক্ষণা বিরুদতী ধত্তে মুহুর্বেপথুং।
আঃ কিংবা কথনীয়মন্যদসিতে দৈবান্নবাম্ভোধরে
দৃষ্টে তং পরিরব্ধুমুৎসুকমতিঃ পক্ষদ্বয়ীমিচ্ছতি॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ১৪৭)

অর্থাৎ—দূর হইতে প্রসঙ্গান্তর্গত তোমার নামাক্ষর কর্ণে প্রবেশ করিলেই সেই মদিরেক্ষণা উন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতে করিতে কাঁপিতে থাকেন; হায় কষ্ট, কী বা বলিবার আছে। দৈবাৎ যদি কৃষ্ণবর্ণ নবজলধরে দৃষ্টি পতিত হয়, তবে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে তখনি দুইখানি পক্ষ পাইবার ইচ্ছা করেন।

শ্রীরূপের শ্লোক অনুসরণে যদুনন্দন দাস রচনা করিয়াছেন—

আনুসঙ্গ দূরে হৈতে তুয়া নাম শুনাইতে
খঞ্জন নয়ানী ধনী রাই।
অতি উন্মত্ত হইঞা কান্দে বহু বিল পিঞা
পুনঃ পুনঃ কাঁপে ক্ষমা নাঞি॥
শুন কৃষ্ণে ভাল তুয়া রীতে।
অখণ্ড কুলের নারী কৈলে তুমি সুবাউরী
যেন ভেল কুলটা চরিতে॥
বহু কি কহিব আর দেখিয়া মেঘের জাল
উড়িবারে চাহে পাখা করি।
দলিত অঞ্জন দেখি সঘনে ঝরয়ে আঁখি
শ্যামা সখী নিজ কোরে ধরি॥
গহন বনেতে যাঞা তমালেরে কোলে লঞা
মনে মানে তোমা কৈল কোর।
অতিশয় হরিষে গাঢ় আলিঙ্গন রসে
ধনী রহে হইয়া বিভোর॥
সুনীল বসন পরে নীলমণি হার ধরে
নেহারয়ে কালিন্দীর নীর।
এইরূপে অনুক্ষণ নাহি হয়ে অন্য মন
তিলেক না রহে গৃহে স্থির॥

সবাই কদম্ব বন করাইতে নিরীক্ষণ
পুলক ভরয়ে প্রতি অঙ্গে।
বদন না তেজে হাত সঘন অবনীনাথ
অকারণ হাসে কত ভঙ্গে॥
অঙ্গে অতিশয় তাপ পরশিল নহে তাত
বরণ হইল যেন আন।
কেহ লখিবারে নারে কি ব্যাধি হইল বোলে
কেবা জানে নিগূঢ় বিধান॥
কি গুণ করিলে তুমি জানিলাম এত আমি
তেঞিসে তাঁহার হেন কায।
কতেক কহিব আর যতেক দেখিল তার
দুকুলে হইয়া গেল লাজ॥
না করে ভোজন পান নিন্দ গেল অন্যস্থান
না শুনয়ে বচন কাহার।
এ যদুনন্দন ভণে না জানিয়ে এতক্ষণে
কি জানি হইয়া রহে আর॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ৭৩-৭৪)

যদুনন্দনের এই পদটিতে প্রথম ভাগে (আনুসঙ্গ দূরে·······নিজ কোরে ধরি॥) শ্লোকের অনুসরণক্রমেই দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণে শ্রীরাধার উন্মত্ত হওয়া এবং ক্রন্দন করিতে করিতে কাঁপিয়া ওঠা, আরও মেঘ-সন্দর্শনে পাখীর মতো উড়িবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। এই অংশের মধ্যেও ধ্রুবপদ হিসাবে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাও পদকর্তার মৌলিক সৃষ্টি, শ্রীরূপের শ্লোকের কোথাও শ্রীরাধার পাগলিনী হইবার এবং কুলবধূ-জনোচিত সংযম হারাইবার কথা নাই। গহন বনে গিয়া প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণভ্রমে তমাল তরুকে কোল দেওয়া, কালিন্দীর কালো জল বা কদম্ব কানন দেখিয়া তাঁহার (শ্রীরাধার) উল্লাস, দেহে ব্যাধির বিস্তার, সর্বোপরি আহারাদি ত্যাগ করিয়া যেখানে সেখানে তাঁহার নিদ্রা যাওয়া—শ্রীরাধার বিষয়ে এই সমস্ত বর্ণনাই পদকর্তা যদুনন্দনের মৌলিক সংযোজন। সুতরাং মূলের বা প্রথমাংশের সামান্য শ্লোকানুসরণ অতিক্রম করিয়া পদটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি পদে রূপান্তরিত হইয়াছে।

যদুনন্দনের তুলনায় পদকর্তা ঘনশ্যাম বরং কল্পনাকে অনেকখানি শ্লোকাশ্লিষ্ট রাখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

তুয়া গুণগান নাম শুনি সুন্দরি
দূর সঞে আন উপদেশে।
অনুক্ষণ রোই হোই অতি উনমতি
না জানি কি ভেল অভিলাষে॥
মাধব না বুঝিয়ে কিয়ে তুয়া রিত।
অবিচল কুলবতী মতি উমতায়লি
ভেল জনু কুলটা চরিত॥
লোচন যুগল সঘন মদঘূর্ণিত
কহইতে আখর বঙ্ক।
তুয়া অভিলাষে হেরি নব জলধর
বিহি সঞে মাগই পঙ্ক॥
কাঁপই থর থর কণ্ঠহি ঘর ঘর
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
হেরি তছু নয়ন নয়ন ভেল কাতর
ঘনশ্যাম দাস পরমাণ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৬০)

ঘনশ্যামের অনুদিত পদটি মূলানুগত, যদুনন্দনের পদের ন্যায় কিছুদূর মূলানুসরণ করিয়া স্বাধীনভাবে অগ্রসর হয় নাই। তথাপি এই পদেও মৌলিক কল্পনাবহুল ধ্রুবপদটি সংযোজিত হইয়াছে এবং বিস্ময়ের বিষয়, যদুনন্দনের ন্যায় ঘনশ্যামও শ্রীরাধার লোচন-যুগল বিঘূর্ণিত হওয়ার যে কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্লোকে নাই।

চতুর্থ অঙ্কে প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী নয়নসম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে বংশীবাদন করিতে দেখিয়া বলিয়াছেন—

সখি! মুরলি! বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনাত্মা গ্রন্থিলা নীরসাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন॥ (বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ১৮৯-১৯০)

অর্থাৎ—সখি মুরলি, তুমি বিশাল ছিদ্রজালে পরিপূর্ণা, লঘু, অতিশয় কঠিনাত্মা, গ্রন্থিযুক্ত ও রসহীনা। তথাপি কোন্ পুণ্যের ফলে তুমি নিয়ত হরির মুখচুম্বনের অপূর্ব আনন্দ এবং হরিকরের আলিঙ্গন লাভ করিতেছ ?

শ্লোকটির মর্মানুবাদকল্পে যত্নাথ দাস লিখিয়াছেন—

ছিদ্রজালে পূর্ণা তুমি শুনহ মুরলী।
অতি লঘু সুকঠিন অন্তর তোহারি॥
নীরস তোহার তনু গ্রন্থি তাহে হয়।
কৃষ্ণকরে থাক তুমি কোন শুভোদয়॥
কৃষ্ণের অধরে তুমি রহ অনুক্ষণ।
তাহাতে পাইলা তার নিবিড় চুম্বন॥
যত্নাথ দাসে বোলে শুনহ মুরলি।
নারীপ্রাণ লওয়া হেন কোথায় পাইলি॥ (তরু ৮২৪)

পদকর্তা যত্নাথ শ্লোকের সব কথা তো রাখিয়াছেনই, আরও নিজের উক্তিতে বাঁশীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, বাঁশী নারীর প্রাণ লইতে শিখিল কোথা হইতে। এই প্রশ্নে অপূর্ব আন্তরিকতার পরিচয় আছে।

যত্নন্দন দাসও শ্লোকটিকে কিছু অনুকরণ করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন—

শুন তোরে কি বলিব বাঁশী।
সতীকুল সকলি বিনাশি॥
গোবিন্দ অধর সুধারস।
পিয়া পিয়া মাতালি সাহস॥
জগত মোহসি মৃত্যুস্বরে।
রমসি শবদে যারে তারে॥
অথবা কি তুমি অতি দোষী।
বাঁশিনী বাঁশের জাতে বাঁশী॥
দারুতে গঢ়ল তুয়া দেহ।
কেবল দারুময়ী সেহ॥
এ যত্নন্দন দাস ভণে।
কি করুণা সুকঠিন জনে॥ (তরু ৮২২)

যদুনন্দন দাস এই পদে শ্রীরূপের আদর্শেই প্রথমতঃ লিখিয়াছেন যে, বংশী গোবিন্দের অধর-সুধারস পান করিয়া মত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পদের শেষাংশে বংশী দারুময়ী প্রভৃতি বলিয়া পদকর্তা তাহার কঠিনতার বিষয়েই ইঙ্গিত দিয়া লিখিয়াছেন, 'বাঁশীর ন্যায়' এমন সুকঠিন বস্তুকেও শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়াছেন। এখানে শ্রীরূপের শ্লোকের মতো বংশীর সৌভাগ্যই সূচিত হইতেছে।

চতুর্থ অঙ্কের ৩০-সংখ্যক শ্লোকে তিমিরাভিসারের জন্য সজ্জিতা শ্রীরাধাকে দেখিয়া ললিতা বলিয়াছেন—'ধম্মিল্লোপরি নীলরত্নরচিতো হারস্ত্বয়ারোপিতো' ইত্যাদি (পৃঃ ২০৮), অর্থাৎ সখি, এ কি, নীলরত্ন-রচিত হার তুমি ধম্মিল্লে ধারণ করিয়াছ, আর নীলপদ্ম-গ্রথিত গর্ভক নামক হার তুমি স্তন-মণ্ডলে ধারণ করিয়াছ; এ কি, তুমি যে কাজল অঙ্গে বিলেপন করিয়াছ এবং বিলেপনের কস্তুরিকা নেত্রে ধারণ করিয়াছ; হায়, হায়, কংসারির অভিসারে ব্যস্ত হইয়া তুমি যে জগৎ বিস্মৃত হইয়াছ দেখিতেছি।

যদুনন্দন শ্লোকটিকে উপজীব্য করিয়া লিখিয়াছেন—

কেশর বরণ ভ্রমর গঞ্জন
সহজে তিমির যেন।
তাহে নীলমণি রতন গাঁথনি
হার রচিয়াছে কেন॥
সখিহে হরি অভিসার কাযে।
জানিল সকল ভুবন ভুলল
ত্যজিয়া ধরম লাজে॥
নয়ান অঞ্জন শরীরে রঞ্জন
কস্তুরী রচিলা আঁখি।
উলটা বসন চরণে কঙ্কণ
করেতে মঞ্জীর দেখি॥
দেখ কুবলয় দোলয়ে হৃদয়
উলটা সকলে সাজে।
এ যদুনন্দন কহয়ে এমন
অতি হরিষের কাজে॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ৯৮)

পদটির মধ্যে শ্লোকের বর্ণনীয় বিষয় সমস্তই উপস্থাপিত হইয়াছে, তবে বিষয়গুলি বর্ণনার ক্রম ঠিক না রাখিয়া পদকর্তা শেষের দিকে হৃদয়ে সংলগ্ন হারের কথা বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, বসন ও কঙ্কণাদি যথাযথভাবে না পরার বর্ণনা পদকর্তার নিজস্ব, ইহাতে বর্ণনাটি অধিকতর সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে।

অভিসারিকার এমন বিপর্যস্ত বেশ-বিন্যাসের বর্ণনা শ্রীরূপের মৌলিক সৃষ্টি নহে, মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এ এবং ভাগবতের 'রাসলীলা'য় আছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীরূপ বিষয়টি গ্রহণ করাতেই তাঁহার আদর্শে গোবিন্দদাস পদকল্পতরুর ১০০৮-সংখ্যক পদে শ্রীরাধার বিপরীত বেশ-বিন্যাসের সুন্দর বর্ণনা উপস্থাপিত করিয়াছেন।

চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে বাসকসজ্জিতা শ্রীরাধার বর্ণনা রহিয়াছে। শ্রীরাধা সখী ললিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

রচয় বকুলপুষ্পৈস্তোরণং কেলিকুঞ্জে
কুরু বরমরবিন্দৈস্তল্পমিন্দীবরাক্ষি।
উপনয় শয়নান্তং সাধু মাধ্বীকপাত্রং
সহচরি! হরিরদ্য শ্লাঘতাং কৌশলং তে॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ২১১)

অর্থাৎ—সখি, কেলিকুঞ্জে বকুলপুষ্পের দ্বারা তোরণ রচনা কর এবং হে ইন্দীবরলোচনে, কমলপুষ্পের দ্বারা উৎকৃষ্ট শয্যা প্রস্তুত কর। শয্যার পার্শ্বে মধুপাত্রচয় শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখ। হে সহচরি, হরি যেন আজ তোমার শিল্প-কৌশলের প্রশংসা করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য গোবিন্দদাসের একটি পদে রহিয়াছে—

বাসিত বারি কর্পূরিত তাম্বুল
কুসুমিত মদনশয়ান।
উজোর দীপে সমীপহি জারহ
বিরচহ চারু বিতান॥
সখিহে কহই না যায় আনন্দ।
ঋতুপতি রাতি অবহু নবনাগর
বিলবহুঁ শ্যামর চন্দ॥
কুসুমিত মৌলি রসালক পরিমলে
ভ্রমরা ভ্রমরী রহু ভোর।
মদন মদালসে সগরিহু যামিনী
সুখে বঞ্চব হরিকোর॥

বিহি পায়ে লাগি মাগি হাম একু বর
চেতন রহু মঝু দেহ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি পরশহি
সো পুন হোয়ত সন্দেহ॥ (তরু ৩০৮)

পদটির মধ্যে শ্লোকের আদর্শেই শ্রীরাধা সখীকে সম্বোধন করিয়া শয্যাদি রচনা করিতে বলিয়াছেন। আরও, শ্রীরূপের শ্রীরাধার মতোই গোবিন্দদাসের শ্রীরাধাও কুসুম দিয়া শয্যা প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং শ্রীহরির ক্রোড়েই তিনি সুখে রাত্রি যাপন করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া গোবিন্দ-দাসের পদটিতে শ্রীরূপের শ্লোকের প্রভাব পড়িয়াছে বলিলে কিছু অসঙ্গত কথা বলা হয় না।

যদুনন্দন দাস শ্লোকটির অনুসরণে লিখিয়াছেন—

বকুল কুসুম তুলিয়া সুশম
কুঞ্জের বাহিরে ধনী।
নবীন কমল অতি পরিমল
রাখহ চৌদিকে ধরি॥
কি ফল চন্দন হৃদয়ে লেপন
হিয়ার পরশ সাধে।
কি কাজ ভূষণ নূপুর কঙ্কণ
কিঙ্কিণী করয়ে নাদে॥
সে তনু পরশে অধিক হরষে
এ নব কোকিল গান।
হরিকোরে সব রজনী বঞ্চিব
অমৃতে করিয়া স্নান॥
কি লাগি বিলম্ব করয়ে মাধব
না জানি কি আজি হয়।
এ যদুনন্দন দাস তহি ভণ
দেখিতে লাগয়ে ভয়॥

(রসকদম্ব, পৃঃ ৯৯)

পদটির প্রথম স্তবকেই শ্লোকের কথাগুলি আছে। তাহার মধ্যেও দুই জাতীয় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, শ্লোকে শ্রীরাধা বকুলপুষ্প তুলিয়া কেলিকুঞ্জের তোরণ রচনা করিতে বলিয়াছেন এবং কমলের দ্বারা শয্যা নির্মাণের নির্দেশ দিয়াছেন। পদের মধ্যে তোরণ বা শয্যার উল্লেখ নাই, দ্বিবিধ পুষ্পই কুঞ্জের বাহিরে রাশীকৃত করিতে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্লোকে শ্রীরাধা যে ললিতাকে মধুপাত্রচয় শয্যাপার্শ্বে রাখিতে বলিয়াছেন এবং কার্যের দ্বারা শ্রীহরির প্রশংসালাভের বিষয়ে উৎসাহিত করিয়াছেন—এই সমস্ত পদের মধ্যে বর্ণিত হয় নাই। দ্বিতীয় স্তবক হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্তই পদকর্তার মৌলিক কল্পনা। শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণকে সব-কিছু হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ শ্রীরাধা নিজ-অঙ্গ কোন কিছুতেই সজ্জিত করিতে চাহেন না, তাঁহার একমাত্র কাম্য দয়িত শ্রীকৃষ্ণের তনুস্পর্শ। শ্রীরাধার মর্মের কামনা, তিনি শ্রীহরির ক্রোড়ে থাকিয়া রজনী যাপন করিবেন, সেইজন্যই শ্রীহরির আগমন-বিলম্বে অত্যন্ত উদ্বেগবোধ করিতেছেন। পদকর্তা সম্ভাব্য চিন্তাতেই পদ রচনা করিয়া নিজ কবি-প্রতিভার শ্লাঘ্য পরিচয় রাখিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে খণ্ডিতা শ্রীরাধাকে দিয়া শ্রীরূপ বলাইয়াছেন—

মুক্তাস্তর্নিমিষং মদীয়পদবীমালোক্যমানস্য তে
জানে কেশররেণুভির্নিপতিতৈঃ শোণীকৃতে লোচনে।
শীতৈঃ কাননবায়ুভির্বিরচিতো বিম্বাধরে চ ব্রণঃ।
সঙ্কোচং ত্যজ দেব দৈবাহতয়া ন ত্বং ময়া দূষ্যসে॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ২২৮-২২৯)

অর্থাৎ, অনিমেষলোচনে আমার পথের দিকে চাহিয়া থাকিবার জন্য কেশররেণু নিপতিত হইয়া তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, আর শীতল কানন বায়ুর দ্বারাই তোমার বিম্বাধরে ব্রণ রচিত হইয়াছে। অতএব হে দেব, সঙ্কোচ ত্যাগ কর, এই হতভাগিনী তোমাকে কোন দোষ দিতেছে না।

যদুনন্দন শ্লোকটি অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

কি দোষ তোমার শুনহ সুন্দর
দূরদিনে কিবা নহে।
একে করে আন দূর বিধি কাম
কাহা হৈতে কি তার হয়ে॥

মাধব কি কাষ বিচারে আর।
তোমার আমার এক কলেবর
অভেদ জানিব তার ॥
মোর আগমন পথেতে নয়ন
থুইয়া আছিল তুমি।
তাহাতে পলক না ছিল তিলেক
কারণ জানিল আমি ॥
কেশর কুসুম রেণু অনুপম
ভরিল নয়নযুগে।
তেঞিসে নয়ন ভৈগেল অরুণ
কিম্বা প্রাত অনুরাগে ॥
বনের ভিতর অতি সুশীতল
পবন বহিল জানি।
অলসে দশন লাগে তেকারণ
ক্ষতাধর অনুমানি ॥
আমার নয়ন কাজর ভরম
অঞ্জন ভাজন লঞা।
চুম্বন করিতে অধর বিম্বতে
রহি গেল সে লাগিঞা ॥
সোনার বরণ বালিসে কুঙ্কুম
লেপন সুগন্ধ লাগি।
আমারে মারিয়া তারে কোলে লঞা
আছিলা রজনী জাগি ॥
সেই সে কুঙ্কুম হৃদয়ে লেপন
দেখি এই পরতেক।
অতেব কি ফল বিনয় কেবল
জীউ তুয়া হাম এক ॥

আমার বিহনে   আকুল হৃদয়ে
    ধেয়ানে আমারে লঞা।
সিন্দূর রচিলে   আপন কপালে
    এ মোর ললাট করিয়া॥
এ মোর অধীন   হইয়া সেবন
    করিতে চরণ তলে।
ভরমে যাবক   ভরিয়া অলক
    আপনা আপনি দিলে॥
বলয় কঙ্কণ   চিহ্ন মনোরম
    সেবে দেখি কেনা পিঠে।
সিন্দূর অধর   তাম্বুল সুরাগ
    কেনে বা যুগল দিঠে॥
নীল উতপল   জিনিয়া সুন্দর
    বরণ মাঝার ভেল।
এ যদুনন্দন   দাস তহি ভণ
    মদনে বেদনা দিল॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ১০৭-১০৮)

পদটির মধ্যে 'মোর আগমন পথেতে নয়ন' হইতে 'ক্ষতাধর অনুমানি' পর্যন্ত তিনটি মাত্র স্তবকে শ্লোকের বর্ণনীয় বিষয় বলা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত সর্বত্রই পদকর্তার মৌলিক কল্পনা। যদুনন্দনের রচনায় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে যে বলিয়াছেন দুইজনেরই এক কলেবর, তাহাতে অপূর্ব আন্তরিকতা ও শক্তি-শক্তিমানের তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে কাজল, কুঙ্কুম, সিন্দূর ও যাবকের চিহ্ন দর্শনে পদকর্তা সুন্দর ও সঙ্গত কবি-কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃত শ্লোকের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া রহিলেও পদটি স্বচ্ছন্দ বিন্যাসে স্বাতন্ত্র্যই লাভ করিয়াছে।

মানিনী শ্রীরাধার মানভঞ্জনের জন্য শ্রীরূপের গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

চঞ্চন্মীনবিলোচনাসি কমঠোৎকৃষ্টস্তনী সঙ্গতা
ক্রোড়েন স্ফুরতা তবায়মধরঃ প্রহ্লাদসম্বর্ধনঃ।
মধ্যোঽসৌ বলিবন্ধনো মুখরুচা রামাস্ত্বয়ানির্জিতা
লেভে শ্রীঘনতাড্য মানিনি মনস্যঙ্গীকৃতা কল্কিতা॥
(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ২৩০)

অর্থাৎ—হে মানিনি, তোমার চক্ষুদ্বয় মীনের ন্যায় চঞ্চল, স্তন দুইটি কূর্মের ন্যায় কঠিন এবং ক্রোড়ের দ্বারা স্ফুরিত, তোমার এই অধর প্রহ্লাদবর্ধন (নৃসিংহ), মধ্যদেশে অপূর্ব বলিবন্ধন, মুখকান্তির দ্বারা তুমি রামাগণকে বা রামকে জয় করিয়াছ, তুমি শ্রীঘনতা বা গ্রীবাকান্তির দ্বারা ঘনতা (নিবিড়তা) প্রাপ্ত হইয়াছ এবং মনে মানের জন্য কল্কিতা (কল্কিঅবতারের কথা) বা কলহভাব অঙ্গীকার করিয়াছ।

যদুনন্দন দাস শ্লোকটি লইয়া কোন পদ লিখেন নাই। কিন্তু ঘনশ্যামদাস শ্রীরূপের শ্লোকটি অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

পূরবে ধরল হাম দশ অবতার।
সো অব তোহারি অঙ্গে পরচার॥
চপল নয়ন তুয়া মীনক ভঙ্গা।
কুচকমঠাকৃতি তটিনী তরঙ্গা॥
কিয়ে শূকর ভুজ অন্তর ধরলি।
করু বলিবন্ধন মাঝহি ত্রিবলি॥
পহলা দশো হায়ন অধর অনুপামা।
মুখরুচি নির্জিত ত্রিভুবন রামা॥
শ্রীঘন সুন্দর তনুরিহ ভাঁতি।
হৃদয় কল্কিধর শ্যামর কাঁতি॥
ইথে যদি সুন্দরি মায়াবি আন।
পুছ ঘনশ্যামদাস পরমাণ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৭৮)

ঘনশ্যামদাস পদের প্রথম দুইটি চরণে শ্রীকৃষ্ণের দ্ব্যর্থক কথার প্রধান অর্থটি স্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছেন। কেবল শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা করা নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অবতারগুলির বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকটি অবতারেরই প্রকাশ রহিয়াছে শ্রীরাধার দেহে। অর্থাৎ, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অনেক বড়, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সম্পূর্ণ অধীন। এই পদের মাধুর্য অপরিমিত। শ্লোকের সংহত রূপের মধ্যে মাধুর্য অনেকখানি ঢাকা পড়িয়াছিল, পয়ারের রূপকল্পের মাধ্যমে সেই মাধুর্য-মন্দাকিনীর সহজ উৎসারণ ঘটিয়াছে।

মানের পর কলহান্তরিতা শ্রীরাধা বলিয়াছেন—

কর্ণান্তে ন কৃতা প্রিয়োক্তিরচনা ক্ষিপ্তং ময়া দূরতো
মল্লীদাম নিকামপথ্যবচসো সখ্যৈ রুষঃ কল্পিতাঃ।

ক্ষৌণীলগ্নশিখণ্ডিশেখরমসৌ নাভ্যর্থয়ন্নীক্ষিতঃ
স্বান্তং হন্ত মমাদ্য তেন খদিরাঙ্গারেণ দন্দহ্যতে ॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ২৪৯-২৫০)

অর্থাৎ—হায়, আমি প্রিয়ার উক্তি কানে তুলি নাই, তাঁহার দেওয়া মল্লিকা-মালাও দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি, সখী আমাকে হিতবচন বলিলেও আমি তাহাতে অহেতুক কোপ প্রকাশ করিয়াছি, সেই ময়ূরপুচ্ছমুকুটধারী শ্রীকৃষ্ণ ভূলুণ্ঠিত হইয়া সাধিলেও আমি তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহি নাই। এইজন্য আজ আমার অন্তঃকরণ যেন খদিরাঙ্গারে বারবার দগ্ধ হইতেছে। শ্রীরূপ এই বিষয়ে নূতনত্ব করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে মল্লিকার মালা বা হার দিতে গিয়াছেন, কিন্তু মানবতী শ্রীরাধা তাহা ফিরাইয়া দিয়াছেন। শ্রীরূপের এই মৌলিক কল্পনার প্রভাবেই কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

চরণে লাগি হরি হার পিন্ধায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাথ।
সো নাহি পহিরলুঁ দূরহি ডারলুঁ
মানিনি অবনত মাথ ॥ (তরু ৪৩৬)

শ্লোকানুসরণে যদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণ প্রিয় বাণী অমৃত দমনী
না কৈল শ্রবণ অন্তে।
এবে পিককুল শবদে জারিল
শ্রুতি মন পরমন্তে ॥
হায় হায় কেনবা করিনু মান।
নবীন পিরিতি নিবসলু অতি
তাপিত করিল প্রাণ ॥
সে কর কমল রচিত বিমল
উপেক্ষিণু মল্লী মালা।
সহচরীগণ সহিত বচন
অহিত মৌমন ভেলা ॥

হরি শিখণ্ড শেখর অখণ্ড
ধরণী লোটাইয়া কত।
মিনতি করিল তাহা না দেখিল
এ মোর নয়ন পথ॥
খদির অঙ্গার ধরি নিজ কর
আপন হৃদয়ে নিলু।
এ সব ভাবিতে ভাবিতে এ রীতে
পুড়িয়া পুড়িয়া মৈলু॥
ভগবতী শুনি এ সব কাহিনী
ললিতারে কহে পুতা।
এখনে তিলেক কথা পরতেক
শুনি পিরিতের কথা॥
পুনঃ রাই হিয়া চপলা হইয়া
কহয়ে মরম বাণী।
এ যত্নন্দন দাস তহি ভণ
ধৈরজ করহ প্রাণী॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ১১৬)

যত্নন্দন দাসের এই পদটি অনেকখানি মূলগত; তবে পিকুলের শব্দে বিরহিণী শ্রীরাধার অন্তর জারিত হওয়া, খদিরের অঙ্গার নিজ হাতে আপন হৃদয়ে লওয়া—এই সব বিষয়ে পদকর্তার স্বাধীন চিন্তার কিছু পরিচয় রহিয়াছে।

বিদগ্ধমাধবের পঞ্চম অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ সখা মধুমঙ্গলের কাছে বলিয়াছেন—

রাধা পুরঃ স্ফুরতি পশ্চিমতশ্চ রাধা
রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা।
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা
রাধাময়ী মম বভূব কুতস্ত্রিলোকী॥

(বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ২৬৫)

বাংলা ভাষায়ঃ শ্রীরাধা সম্মুখে বিরাজমানা, পশ্চাতেও শ্রীরাধা। বামে রাধা, দক্ষিণে রাধা, ভূমণ্ডলে রাধিকা, গগনেও রাধিকাকে দেখিতেছি। আমার নিকট ত্রিভুবন রাধাময় হইল কেন?

যদুনন্দন শ্লোকটির অনুসরণে লিখিয়াছেন—

নয়ন পুতলী রাধা মোর।
মনোমাঝে রাধিকা উজোর॥
ক্ষিতিতলে দেখি রাধাময়।
গগনেহ রাধিকা উদয়॥
রাধাময়ী ভেল ত্রিভুবন।
তবে আমি করিব কেমন॥
কোথা সেই রাধিকা সুন্দরী।
না দেখি ধৈরয হৈতে নারি॥
এ যদুনন্দন মনে যাগ।
কিনা করে নব অনুরাগ॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ১২৩)

আমরা দেখিতেছি, পদকর্তা শ্রীরূপের শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই; সেইজন্যই উপরি-ধৃত পদটির মধ্যে শ্লোকের আদর্শে সম্মুখ-পশ্চাৎ বাম ও দক্ষিণে যে শ্রীরাধা বিরাজমানা, সেকথা উল্লিখিত হয় নাই। শ্রীরূপের শ্লোকের মর্ম গ্রহণ করিয়াই যদুনন্দন স্বাধীনভাবে পদ রচনা করিয়াছেন। পদের প্রথম দুইটি চরণেই যে কেবল মৌলিকতা রহিয়াছে তাহা নহে, ষষ্ঠ হইতে শেষ চরণ পর্যন্ত সর্বত্রই পদকর্তার স্বাধীন কল্পনা-বিস্তার লক্ষ্য করা যায়।

পূর্বরাগে অনুলিপ্তা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়াও যখন পাইতেছেন না, অথচ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে সদাই বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন, তখন বংশীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

অমিয়ং পিঅসি সুমহুরং
বমসি রুঅং বিসৃসমোহণং বিসমং।
তুজ্‌ঝ ণ দূষণমধবা মূরলি!
জদো দারুণাসি কিদা॥ (বিদগ্ধমাধব, পৃঃ ২৭৯)

অর্থাৎ—হে মুরলি, তুমি সুমধুর অমৃত পান করিয়াও বিষম বিশ্বমোহন রব উদ্গীরণ করিতেছ। ইহাতে তোমার দোষ নাই; কারণ কঠিন কাষ্ঠের দ্বারা তুমি নির্মিত।

শ্রীরূপের এই শ্লোকটি পয়ারে ধরিতে গিয়া যদুনন্দন দাস রচনা করিয়াছেন—

শুন তোরে কি বলিব বাঁশী।
সতীকুল সকল বিনাশি॥

পিঞা পিঞা মাতাইয়া যশ ।
অবলারে করিল অবশ ॥
রমণ করসি যবে তারে ।
জগত মোহসি মৃত্নস্বরে ॥
অথবা কি তুমি অন্তি তুষী ।
বাঁশিনী বাঁশের জাতে বাঁশী ॥
দারুতে গঢ়ল তুয়া দেহ ।
কেবল দারুময় গেহ ॥
এ যত্নুনন্দন দাস ভণে ।
কি করে সে সুকঠিন মনে ॥ (রসকদম্ব, পৃঃ ১৩০)

উপরি-ধৃত পদে শ্লোকের কথাগুলি স্পষ্ট ব্যক্ত হয় নাই। বংশী যে অমৃত পান করিয়াও বিশ্ববিমোহন রব উদ্‌গীরণ করিতেছে, তাহা বলিতে গিয়া পদকর্তা যে বলিয়াছেন বাঁশী প্রিয়া প্রিয়া রবে ডাকিয়া শ্রীরাধাকে যশে মাতাইয়া তুলিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ যখন বাঁশীটি বাজান তখন জগৎ মধুর রসে মুগ্ধ হয়। এই কথাগুলিতে শ্লোকের অর্থ প্রকাশিত হইতে বাধা পাইয়াছে। শ্লোকে যেখানে বাঁশীকে একবারমাত্র কঠিন কাষ্ঠ-নির্মিত বলা হইয়াছে সেখানে পদে বারবার, যেমন—'বাঁশিনী বাঁশের জাতে বাঁশী', 'দারুতে গঢ়ল তুয়া দেহ', 'কেবল দারুময় গেহ' প্রভৃতি বলায় মাধুর্য সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যত্নুনন্দনের অন্ততঃ এই পদটি শ্লোকের সহচর হইতে পারে নাই, অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে।

শ্রীরূপের শ্লোকের প্রভাবে চৈতন্যোত্তর চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল ।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল ॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল ।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল ॥ (তরু ৮২৮)

শেষ চরণটি শ্রীরূপের শ্লোকের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে সূচিত করে না কি?

বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যে বিদগ্ধমাধবের প্রভাব নিরূপণ করিতে গেলে প্রথমেই শ্রীরাধার সূর্যপূজার কথা আসে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, শ্রীরাধা নিজ মনে চিন্তা করিতেছেন—হায়, আমি কি নির্লজ্জা, এমন গুণশালীর (শ্রীকৃষ্ণের) দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াও হতশরীর আজি ধারণ করিয়া আছি, এখন কালীয়হ্রদে প্রবেশ

করিবার ব্যবস্থা করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীরাধা প্রকাশ্যে বিশাখাকে বলিয়াছেন—বিশাখে, গুরুজনদের নিকটে জানাও যে, আমি দ্বাদশাদিত্যতীর্থে গিয়া সূর্যদেবের পূজা করিতে চাই। চতুর্থ অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অন্বেষণক্রমে বকুলকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া শ্রীরাধার সূর্য-আরাধনার বেদীটি দেখিতে পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'ইয়মেব রাধায়াঃ সূর্যারাধনবেদিকা, তদস্যাঃ পার্শ্বমাসাদয়ামি।' ষষ্ঠ অঙ্কে শ্রীরাধা প্রিয়সখী ললিতা ও বিশাখার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য বনস্থলীতে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বেণুনাদ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার উপর পুষ্পবাটিকা হইতে নির্গত এক সৌরভের ধারাও দূতীর ন্যায় আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-অভিসারে আগমনের বিষয়টি কিছু অনুমান করিয়া বিশাখা স্মিতহাস্যে শুধাইয়াছেন—সখি রাধে, তুমি ভ্রমরীর ন্যায় কি এক গন্ধের অন্বেষণ করিতেছ কেন?

শ্রীরাধা মনোভাব গোপন করিয়া উত্তর দিয়াছেন—বিশাখে, সম্মুখে প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয় দেখা যাইতেছে, ঐগুলি লইয়া মিত্রের (সূর্যের) পূজা করিব। ললিতা পরিহাস করিয়া বলিলেন—সখি, সত্যই মিত্রের (বঁধুর) অনুরাগ তোমাকে চঞ্চল করিয়াছে। তবে সেই মিত্র গহনচারী, গগনচারী নহেন। শ্রীরাধা ললিতার কথায় কপটরোষে বলিয়াছেন—অয়ি নিষ্ঠুরে, আমি কমলবন্ধুর (সূর্যের) কথা বলিতেছি। ললিতা উত্তর দিয়াছেন—আকার গোপন করিতেছ কেন? অর্থাৎ, কমলাবন্ধু (শ্রীকৃষ্ণ) বল, ইহাই ললিতার বক্তব্য। বিদগ্ধমাধবের এই ষষ্ঠ অঙ্কেই শ্রীকৃষ্ণ বনস্থলীতে প্রবেশ করিয়া যখন ললিতার বাধাদান সত্ত্বেও শ্রীরাধার হারটি হরণ করার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, তখন ললিতা বলিয়াছেন—ওহে রসিক, সূর্যদেবের পূজা করার জন্য প্রিয়সখী (রাধিকা) স্নান করিয়াছে, তুমি স্নান কর নাই; সুতরাং তাহাকে স্পর্শ করিও না।

এই সব দৃষ্টান্তে আমরা দেখি, শ্রীরূপ শ্রীরাধার সূর্যপূজার অবতারণা করিয়াছেন। কেবল বিদগ্ধমাধবেই নহে, শ্রীরূপ তাঁহার অন্যান্য রচনাতেও বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন। 'ললিতমাধব'-এর দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীরাধার সূর্যপূজার কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত আছে। আমরা ললিতমাধবের প্রসঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনা করিব। 'দানকেলিকৌমুদী'র ১৫২-সংখ্যক অনুচ্ছেদে শ্রীরাধা ও গোপীদের যজ্ঞস্থানে যাইবার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি মধুমঙ্গলকে বলিয়াছেন—সখে মধুমঙ্গল, গোকুলে প্রসিদ্ধা সূর্যোপাসিকা কিশোরীদের হৈয়ঙ্গবীণ অত্যন্ত মধুর, সেইজন্য প্রতি টঙ্কের যোগ্য কর তিন স্বর্ণটঙ্ক হয়। কিন্তু তাহা গ্রহণ না করিয়া এক টঙ্কের কনিষ্ঠ টঙ্ক হিসাবে কর গণনা করিও, কেননা ইহাদের উপর ভগবতী নান্দীমুখীর পক্ষপাতিত্ব রহিয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, কিশোরীদের অর্থাৎ শ্রীরাধা ও ললিতাদি সখীদের সূর্যোপাসিকা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'স্তবমালা'-ধৃত প্রেমেন্দুসুধাসত্র নামক

শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তরশতনামের ৭-সংখ্যক শ্লোকে 'বৃষভানুকুমারিকা' শ্রীরাধাকে 'ভানুভক্তিভরাভিজ্ঞা' অর্থাৎ সূর্যের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণা বলা হইয়াছে।

উপরের আলোচনাটি শ্রেণীবদ্ধ করিলে দেখা যায়, শ্রীরূপ মোট তিনটি বিষয়ে বলিয়াছেন—(১) শ্রীরাধা সূর্যোপাসিকা। (২) প্রায়শঃই শ্রীরাধা সূর্যপূজাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে অভিসার যাত্রা করেন। (৩) শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য বিপ্রবেশে সূর্যপূজা করাইতে আসেন, জটিলার সম্মুখেই পূজা করান।

শ্রীরাধা ও সখীদের এই যে সূর্যপূজা বা তৎসংক্রান্ত বৃত্তান্ত—ইহা শ্রীরূপের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি। শ্রীমদ্‌ভাগবতে গোপীদের কাত্যায়নী ব্রতের কথা আছে, কিন্তু সূর্যপূজার ইঙ্গিতমাত্রও নাই।

শ্রীরূপের উপস্থাপিত এই সূর্যপূজা-বৃত্তান্ত পরবর্তী কালের পদাবলীসাহিত্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর পদকর্তা কানুরাম, মাধবদাস, রায়শেখর এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পদকর্তা দীনবন্ধুদাস সূর্যপূজাচ্ছলে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা করিয়া শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধবের আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

দীনবন্ধুদাসের পদে রহিয়াছে—

সুরুজ আরাধন ছল করি সুন্দরি
নিধুবন করল পয়ান।
গোধন সঙ্গে রঙ্গে যমুনাতটে
বিহরই নাগর কান॥
বিদগ্ধ রসময় নাহ।
বিকশিত চম্পক হেরি বেয়াকুল
বাঢ়ল বিরহক দাহ॥
ঝর ঝর লোর ভোর দিঠি-পঙ্কজ
সঘন মোছই পীতবাসে।
ছল করি সহচর সংগতি পরিহরি
চলল রাই অভিলাষে॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৯৬২)

দ্বিতীয় ঘটনাটি বিশাখা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের চিত্র অঙ্কন এবং তাহা দেখিয়া শ্রীরাধার প্রেমমুগ্ধতা। নাটকের প্রথমাঙ্কে দেখা যায়, বৃন্দাবনে ললিতার সঙ্গে শ্রীরাধা যখন গুঞ্জাবলী চয়নে মন দিয়াছেন, তখন নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি হইয়াছে। শ্রীরাধা

তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। ললিতা মুরলীর শব্দ বলিয়া জানাইলেও, শ্রীরাধা সেই শব্দকে অন্য কিছুরূপে চিন্তা করিয়াছেন। তিনি সখীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—সাধারণ মুরলীর রব হইলে তাঁহাকে এত জ্বালা দিতেছে কেন, নিশ্চয় কোন মহানাগর মোহনমন্ত্র পাঠ করিতেছে। শ্রীরাধার যখন এইরূপ বিচলিত অবস্থা তখন চিত্রপট-হস্তে সখী বিশাখা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, শ্রীরাধাকে তাঁহার বিচলিত অবস্থার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। শ্রীরাধা বিশাখার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অন্যত্র গমন করিলে, বিশাখাও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন কর্ণিকার মণ্ডলীর ছায়াতে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট শ্রীরাধাকে দেখাইবেন এই আকাঙ্ক্ষায়। দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দিকেই লক্ষ্য করা যায়, শ্রীরাধা চিত্রপট দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। তিনি নিজ হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, যাঁহার প্রতিকৃতি দর্শনেই এমন অবস্থা, তাঁহার প্রতি অনুরাগ রাখা কী সমীচীন? বিশাখা এক্ষেত্রে শ্রীরাধার অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করিলে শ্রীরাধা ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিয়াছেন যে, বিশাখাই সব-কিছুর মূলে, সে-ই তাঁহাকে গহনবনে দারুণ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে।

বিশাখার রচিত চিত্রপট দর্শনে শ্রীরাধার পূর্বরাগের এই যে উন্মেষ, শ্রীরূপ অতি নিপুণতাসহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার আদর্শে পরবর্তী কালে বহু পদকর্তা পদ রচনা করিয়াছেন।

উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন—

কালিয়ার রূপ মরমে লাগিয়া
সোয়াস্থ্য না হয় মনে।
বিরলে বসিয়া সখীরে কহই
দেখাইলে রহে প্রাণে॥
এ বোল শুনিয়া বিশাখা ধাইয়া
শ্যাম কলেবর দেখি।
রাইয়ের গোচরে দেখাবার তরে
পটের উপরে লেখি॥
আনি চিত্রপট রাইয়ের নিকট
সমুখে রাখিলা সখী।
সে রূপ দেখিয়া মুরছিত হইয়া
পড়িলা কমলমুখী॥

মন্দাকিনী পারা কতশত ধারা
ও ছুটি নয়ানে বহে।
করহ চেতন পাবে দরশন
দাস উদ্ধবে কহে॥ (তরু ৩৫)

উদ্ধবদাসের এই পদে বিদগ্ধমাধবের বিপরীতক্রম সাক্ষাদ্দর্শনের পর যদিও শ্রীরাধা চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, তথাপি চিত্রপটদর্শনের ব্যাপারটি পুরাপুরি শ্রীরূপের রচনানুগ।

গোবিন্দদাসের পদে বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট অঙ্কন করিয়া আনিয়া শ্রীরাধাকে দেখাইতে চাহিতেছেন—

রাধে দেখ এক মূরতি মোহন।
অনেক যতন করি লিখিয়া অ্যানাছি গো
এক মনে কর দরশন॥ ইত্যাদি
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি, ৪৩৮)

রায়শেখরের পদে রহিয়াছে—

রহ রহ সখি ভালো করে দেখি
আঁখি না পিছলে মোর।
এই যে নাগর গুণের সাগর
বয়সে নবকিশোর॥
আলো সই কিবা সে দেখাইলে মোরে।
এই যে আকৃতি পিরীতি মুরতি
আন নাহি চাহি তোরে॥
দেখায়া সুন্দরী করিলে বাউরী
না দেখিলে প্রাণে মরি।
হিয়া পর ধর জুড়াক অন্তর
কহিছে ধরণী ধরি॥
লোচন যুগল লোরেতে ভরল
মুরছিত তহি ডোর।
হা হা প্রাণধন বলি অচেতন
ললিতা করল কোর॥

কহয়ে বচন চিত্রের রচন
পুরুষ এমন আছে।
ধরি তুয়া পায় যদি সত্য হয়
লৈয়া চল তার কাছে॥
এ দাস শেখর সঙ্গে চলু মোর
বুঝিতে রসিক রায়।
প্রতিবিম্ব দেখি লোরে পুরে আঁখি
কেমনে পরশি তায়॥
(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৩০৪)

যদিও পদটির মধ্যে চিত্র-রচয়িত্রী সখীর নামোল্লেখ নাই, তথাপি পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা বুঝা যাইতেছে সখী বিদগ্ধমাধবের বিশাখা ভিন্ন অন্ত কেহ নহে।

নরহরি চক্রবর্তী সখীর নামোল্লেখ করিয়াই লিখিয়াছেন—

কি বলিব সখি বিশাখা এমন
করিলে বিষম কাজ।
ঘুচাইলে মোর এ গুরু গৌরব
ধৈরজ ধরম লাজ॥
চারু চিত্রপট চাতুরি করি সে
সোঁপিল আমার হাতে।
কি দিব তুলনা অতি অপরূপ
পুরুষ বিলসে তাথে॥
প্রতি অঙ্গে কত অনঙ্গ মুরুছে
সুচারু বদনশশী।
সাধে সাধে মেনে তা পানে চাহিতে
হিয়ায় রহল পশি॥
ছাড়াইব বলি বিচারিতে চিতে
পরাণ ছাড়িয়া যায়।
কহে নরহরি ঠেকিলে সুন্দরি
ছাড়াইতে নারিবে তায়॥ (বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৮২৫)

বলা বাহুল্য, নরহরি চক্রবর্তীর এই পদে শ্রীরূপের ঘটনা-বিবৃতিই যথাযথভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।

তৃতীয় ঘটনা শ্রীরাধার সুবলবেশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন। বিদগ্ধমাধবের পঞ্চম অঙ্কে বয়স্য মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ সমীপে বলিয়াছেন যে, শ্রীরাধা নিশ্চিত কোন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা অবগত আছেন। কেন?—শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলে মধুমঙ্গল বলিয়াছেন, বৃদ্ধা গোপাঙ্গনাদের মধ্যে ভগবতী পৌর্ণমাসী যখন সমাসীনা ছিলেন, তখন জটিলা তিরস্কার করিতে করিতে শ্রীরাধাকে সেখানে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধা জটিলার অনেক তিরস্কারের পর শ্রীরাধা হঠাৎ তাঁহার মুখের উপরকার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন। সকলেই তাহাতে দেখিলেন, জটিলা যাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছেন তিনি শ্রীরাধা নহেন, সুবল।

মধুমঙ্গলের এই বর্ণনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাবেশধারী সুবলকে দেখিতে চাহিলেন। ক্ষণপরে সুবলবেশধারিণী শ্রীরাধা বৃন্দাসহ শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে আসিলে অনুভবে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, শ্রীরাধাই আগমন করিয়াছেন। শ্রীরাধার কণ্ঠে রঙ্গণমালা দেখায় শ্রীকৃষ্ণের ধারণা অধিকতর দৃঢ় হইল। তিনি শ্রীরাধাকে বলিলেন যে, শ্রীরাধার রূপের অনুকরণকারী সুবলকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি প্রেমময়ী সুদুর্লভা শ্রীরাধাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। পদকর্তা দীনবন্ধুদাস শ্রীরূপের বর্ণিত ঘটনার সমস্তটাই বর্ণনা করিয়া পদ লিখিয়াছেন। প্রথমতঃ, তিনি সুবলবেশধারিণী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-অভিসারে আগমনের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন—

বিপিনে ভরল অতি মনোহর
রাইর অঙ্গের গন্ধ।
চকিত নয়নে দশ দিশ পানে
হেরই গোকুল চন্দ॥
নাগরের অধিক বাঢ়ল সাধা।
সুবলের সনে নিকুঞ্জ ভবনে
অবহি মীলব রাধা॥
ভাবিতে ভাবিতে জাবটের পথে
রাইরে দেখিল একা।
মনে অনুমানে রসবতী বিনে
আইল সুবল সখা॥

বরণ বয়স সুবলের বেশ
কিছুই নাহিক ভেদ।
সুবল ফিরিঞা আইল বলিঞা
দ্বিগুণ বাঢ়িল খেদ ॥
নয়নের জল করে ছলছল
বিনয় করিয়া বলে।
অভিমান করি না আল্য সুন্দরী
কি দোষে ছাড়িল মোরে ॥
শ্যামের পিরিতি আদর আরতি
বুঝিতে কুলের বালা।
মনের কৌতুকে অবনত মুখে
রহিল করিঞা ছলা ॥
রসিক নাগর না পাঞা উত্তর
পড়িল ধরণীতলে।
রসিক নাগরী দু বাহু পসারি
বন্ধুরে করিল কোরে ॥
অঙ্গের পরশে রসের আবেশে
ভাঙ্গিল মনের ধন্দ।
অনেক দিনের ভুখল চকোর
পাইল শারদচন্দ ॥
রাধার অধর সুধার সাগর
নাগর করএ পান।
আনন্দের ভরে আপনা না ধরে
দীনবন্ধুদাস গান ॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৯৬৮)

পদটির মধ্যে শ্রীরূপের বর্ণনার অনুসরণ লক্ষ্য করা যাইলেও, পদকর্তার স্বাধীন স্বচ্ছন্দ কবিত্ব-বিস্তারও অনস্বীকার্য। শ্রীরূপের বর্ণনায় সুবলবেশধারিণী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই চিনিতে পারিয়াছেন, সেইজন্য সেখানে নাটকীয় বিস্ময় (dramatic

suspense) নাই ; পদকর্তা দীনবন্ধু কিন্তু শ্রীরাধাকে প্রথম হইতে চিনিতে না দিয়া অপূর্ব নাটকীয়তা আনিয়াছেন।

শ্রীরূপের বর্ণিত ঘটনার অপরাংশ অর্থাৎ সুবলের শ্রীরাধা বেশধারণ এবং তাহাতে জটিলার উপহাসাস্পদ হওয়া দীনবন্ধু দাস অতি নিপুণতার সহিত তাঁহার পদের মধ্যে অনুসীবন করিয়াছেন। দীনবন্ধু দাস লিখিয়াছেন—

বনে বনে আসি কুণ্ড পরবেশল
সুবল বিনোদিনী সাজে।
লহু লহু হাসি আসি পহুঁ মীলল
ধনি অবনত মুখ লাজে॥
রাইক হৃদয় জানি পহুঁ মাধব
বিদগ্ধ রসিক সুজান।
সুবলেরে পুছই সকল শুভ মঙ্গল
দিঞা আলিঙ্গন দান॥
গমনাবধি পুন কুণ্ড সমাগম
সুবল কহল শুভবাণী।
মল্লিক মাল গাঁথি পহুঁ রসবতি
সুবলে পরাওল আনি॥
মন্দির গমন শমন সব মানই
জর জর কাতর দেহ।
দীনবন্ধু কহে বিরহ বিপদ ভয়ে
বিছুরল পরিজন গেহ॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ: ৯৬৯)

শ্রীরূপের উপস্থাপিত ঘটনার সম্ভাব্য প্রাক্কথন হিসাবেই দীনবন্ধু দাস উপরি-ধৃত পদটি লিখিয়াছেন। পরের পদ-দুইটিতে তিনি শ্রীরূপের বর্ণিত ঘটনার ভিত্তিতেই নিজের কবিত্বকে দাঁড় করাইয়াছেন। দীনবন্ধু দাস লিখিয়াছেন—

(১) বধূর গমন বিলম্বে তখন
জটিলা কুটিলমতি।
যমুনার তটে কুঞ্জ নিকটে
চলিল ত্বরিত গতি॥

বনে বনে আসি রাধাকুণ্ডে পশি
দেখিল শ্যামের কাছে।
রাধা বিনোদিনী কুল কলঙ্কিনী
বধূ ডাড়াইঞা আছে॥
অবুধ পাগলি নিজ বধূ বলি
ধরে সুবলের করে।
সুবলের বেশে রাধিকা তরাসে
পলাইল নিজ ঘরে॥
লোহিত লোচন কঠিন বচন
সঘন তাজনী তাজে।
দীনবন্ধু বলে ধরি সুবলেরে
আনিল গোকুল মাঝে॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৯৬৯)

(২) যশোদা রোহিণী সকল গোপিনী
দেখিঞা পুছই কথা।
বধূর করেতে ধরি আচম্বিতে
কি লাগি আইলে হেথা॥
জটিলা কুটিল কহিল সকল
ধরি সুবলের হাথে।
নন্দের কুমার বনের ভিতর
দেখিলাম বধূর সাথে॥
তখনি সুবল হাসি খল খল
করল আপন সাজ।
যশোদার মন আনন্দে মগন
জটিলা পাইল লাজ॥
পবন গমনে আইলা ভবনে
হৃদয়ে ধরল ধন্দ।
আস্থ আস্থ বলে চরণ পাখালে
বিনোদিনী দীনবন্ধু॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৯৬৯-৯৭০)

'বিদগ্ধমাধব'-এ শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধান হইতেই শ্রীরাধাবেশধারী সুবলকে জটিলা যে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, এমন কথা নাই; আরও, সেই স্থানে সুবলবেশে শ্রীরাধাও অবস্থান করিতেছিলেন শ্রীরূপ তাহা লিখেন নাই। এই দুইটি বিষয়ে দীনবন্ধু দাস পূর্ববর্তী পদকর্তা গোবিন্দদাসকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়াছেন। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

ক্রোধেতে কুটিলা কহয়ে জটিলা
শুন শুন ওগো মাই।
শ্রীরাধা কুণ্ডেতে শ্যামের সঙ্গেতে
বসিয়া আছয়ে রাই॥
শুনিয়া জটিলা ক্রোধেতে চলিলা
লগুড় লইয়া করে।
অতি ক্রোধ চিতে যাইতে যাইতে
উছট খাইয়া পড়ে॥
রাধাকুণ্ড তীরে উঠিয়া সত্বরে
দেখয়ে রাধাকান।
বলে কলঙ্কিণী শ্যাম সোহাগিনী
দেখ তোর পরিণাম॥
দ্রুতগতি ধেয়ে ছুটি করে ধরে
শ্যাম ধরে বাম করে।
যশোদা গোচরে দেখাব সত্বরে
দন্ত কড়মড় করে॥
জটিলার ক্রোধ দেখিয়া তখন
হাসয়ে নাগররাজ।
সুবলের বেশে পলায় তরাসে
রাই আইলা গৃহমাঝ॥
গোবিন্দদাস দেখিয়া তখন
অতি আনন্দিত হইল।
রাই কানু হাতে চলে হরষিতে
জটিলা কুটিলা আইল॥

(পাঁচথুপির আচার্যের পুঁথি, পদ—৪৩৩)

কুটিলার মুখে শ্রীরাধার রাধাকুণ্ডে অবস্থান করার কথা শুনিয়া জটিলা বুড়ী লগুড়-হাতে ছুটিয়া চলিল। পদকর্তা এক্ষেত্রে কিছু রঙ্গরস পরিবেশনের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি লিখিয়াছেন যে, জটিলা রাগে ছুটিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ উছট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। বুড়ী রাধাকুণ্ডে উপনীত হইয়া শ্রীরাধাকে গালি দিয়াছে, তাঁহার পরিণাম কি হয় বলিয়া শাসাইয়াছে এবং দন্ত কড়মড় করিয়া বলিয়াছে যে, ব্যাপারটি যশোদাকে দেখাইবে। জটিলার এমন ক্রোধ দেখিয়া নাগররাজ শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে সুরু করিয়াছেন; সুযোগ বুঝিয়া সুবলবেশে শ্রীরাধা পলাইয়া ঘরে চলিয়া গিয়াছেন। এইখানেই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীরাধাবেশী সুবলকে যখন জটিলা তিরস্কার করিতেছিল, তখন সুবলবেশে শ্রীরাধা সেইখানেই অবস্থান করিতেছিলেন। এই কৌতুকপ্রদ ঘটনাটি গোবিন্দদাসের মৌলিক সৃষ্টি। জটিলা শেষ পর্যন্ত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া লইয়া কুটিলার সঙ্গে যশোদার উদ্দেশে চলিল। যশোদার সম্মুখে আসিয়াও জটিলা ক্রোধ কি কম দেখাইয়াছে?

জটিলা ক্রোধেতে আসি ডাকে যশোদারে।
দেখনা পুত্রের রীত বাহির দুয়ারে॥
তুমি বল মোর পুত্র কিছুই না জানে।
তে কারণে তব কাছে আনিল বন্ধনে॥
ধাইয়া যশোদা গিয়া দেখে অপরূপ।
মেঘেতে বিজরী যেন স্বপন স্বরূপ॥
অনিমিখে চাহে রানী দোঁহ বদন পানে।
অঙ্গ পুলকিত ধারা বহে দুনয়নে॥
দেখিয়া জটিলা তবে রানী প্রতি কয়।
মা হইয়া পুত্রে তুমি কিছু না বোলয়॥
শুনিয়া যশোদা কয় কিছু নাহি জানি।
পুত্র কাছে গিয়া রানী কহে প্রিয় বাণী॥
কেনরে অবোধ শিশু একি তোর কাম।
তোর লাগি আমি কত পাই অপমান॥
হাসিয়া বোলয়ে শ্যাম শুন ওগো মায়।
যাহা মনে কর মাগো তাহা কিছু নয়॥

গোঠেতে যাইয়া মোরা করি কত খেলা।
মিছা করি ধরি আনিল জটিলা ॥
যশোদা কহিছে বাপু এযে দেখি রাই।
রাই নহে সুবল সাজায়ে খেলায় ॥
অভিন রাধার মূর্তি সুবল আমার।
নিতি নিতি খেলা মোরা করি এ প্রকার ॥
বলিতে বলিতে শ্যাম বসন কাড়ি নিল।
ল্যাংটা সুবল তখন নাচিতে লাগিল ॥
লাজে বুড়ী গুড়ি গুড়ি পলাইতে যায়।
ধেয়ে গিয়ে ছুটি বাহু ধরে শ্যামরায় ॥
চূণ কালি আনি তখন বুড়ীর গালে দিল।
যশোমতী মা তখন হাসিতে লাগিল ॥
গোবিন্দদাস কহে যায় বলিহারী।
লীলায় বিহরে দোঁহে কিশোর-কিশোরী ॥

(পাঁচথুপির আচার্যের পুঁথি, পদ—৪৩৪)

'বিদগ্ধমাধব'-এর ঘটনাটুকু পরিপ্রেক্ষিতে রাখিয়া গোবিন্দদাস এখানে এক অপূর্ব নাটকীয়তার সৃষ্টি করিয়াছেন। জটিলার বারংবার দোষারোপে যশোদা বড় অপ্রতিভ হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অভিযোগের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ঘটনাটি শুধু ফাঁসই করিলেন না, সুবলের গা হইতে শ্রীরাধার সাজ কাড়িয়া লইলেন। ইহাতে খুবই কৌতুকের সৃষ্টি হইল, লজ্জাহীন অবস্থাতেই সুবল নাচিয়া উঠিল। বুড়ী জটিলা লজ্জা পাইয়া গুড়ি গুড়ি পলাইবার চেষ্টা করিলে কি হইবে, পলাইবার কি উপায় আছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ধরিয়া গালে চূণ কালি লেপিয়া দিলেন। শ্রীরূপের নাটকে জটিলার একটি সম্ভ্রমপূর্ণ স্থান আছে, সেক্ষেত্রে তাহার এমন শাস্তিবিধান অসম্ভব। তবে পদকর্তা রঙ্গরসকে চরমে তুলিবার জন্যই এমন পরিকল্পনা করিয়াছেন।

অন্য পদকর্তৃগণ শ্রীরূপের বর্ণিত ঘটনার সমস্তখানি যথাযথভাবে বর্ণনা করেন নাই। তাঁহারা শ্রীরাধার সুবলবেশ ধারণের ঘটনাটিমাত্র কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সকলেই কল্পনা করিয়াছেন যে, সুবল শ্রীরাধার অভিসার-যাত্রা সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য শ্রীরাধার বেশবাস নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া শ্রীরাধারূপে

অন্তঃপুরে রহিয়া গিয়াছেন, অপরপক্ষে শ্রীরাধা সুবলের পরামর্শেই তাঁহার (সুবলের) বেশবাস লইয়া সুবল সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গমন করিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের পদকর্তা জগন্নাথ দাস লিখিয়াছেন—

সুবলে পাইয়া হরষিত বিনোদিনি।
জিজ্ঞাসিলা যত কথা মধুররসবাণী॥
ধনী কহে ওরে সুবল মোর নিবেদন।
কিরূপে যাইব আমি কৈরাছি রন্ধন॥
সুবল বোলয়ে ধনি মোর নিবেদন।
মোর বেশ লইয়া তুমি করহ গমন॥
আপনার চূড়া সুবল দিল খসাইয়া।
রাধার শিরেতে বান্ধে যতন করিয়া॥
আভরণ রাখে করিয়া যতনে।
গুঞ্জাহার মকরকুণ্ডল দিলা কানে॥
সুবলের ধড়া রাই কটিতে পরিলা।
অলকা আবৃত ভালে তিলক রচিলা॥
গলায় শ্যামের হার বিরাজিত তায়।
তাহাতে কতেক শোভা কহনে না যায়॥
রাঙ্গা লড়ি হাতে আর চরণে নূপুর।
রাখালের বেশ ধরি অতি সুমধুর॥
নব আভরণ সুবল পরিলা যতনে।
রাই বেশ ধরি সুবল রহিলা রন্ধনে॥
সুবলের বেশে রাই করিলা গমন।
জগন্নাথ দাস হেরি আনন্দিত মন॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৫৬৩)

বরসুন্দরী শ্রীরাধার অনিন্দ্য রূপের দর্শন অভিলাষী বৈষ্ণব পদকর্তা। সেইজন্য জগন্নাথ দাস শ্রীরূপের বর্ণিত ঘটনার মধ্যে সুযোগ করিয়া লইয়া স্বাধীনভাবেই শ্রীরাধার সাজসজ্জা পদকর্তা যদুনাথের মতোই বিশদ্ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রীরূপের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষণীয়।

চতুর্থ ঘটনা শ্রীকৃষ্ণের নারীবেশধারণ। 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের সপ্তম অঙ্কে রহিয়াছে, একদা শ্রীরাধাকৃষ্ণ একত্র থাকার সময় শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমবশতঃ 'চন্দ্রা' কথাটি উচ্চারণ করেন। তাহাতে প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলীর নামোচ্চারণ করা হইয়াছে মনে করিয়া শ্রীরাধা মানযুক্তা হন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখ হইতে চলিয়া যান। মানবতী এই শ্রীরাধার মানভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে জানান যে, তিনি উত্তমা শ্রীমূর্তি ধারণ করিবেন। মধুমঙ্গলের পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণ গৌরীগৃহে বেশ রচনা করিতে থাকিলে, বৃন্দা শ্রীরাধা সমীপে গিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ক্রমশঃ কৌতূহলী করিয়া তুলেন। অবশেষে মানবতী শ্রীরাধা মান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য যখন তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তখন বৃন্দা জানান শ্রীকৃষ্ণ গৌরীগৃহে তাঁহার (বৃন্দার) ভগিনী নিকুঞ্জবিদ্যার সহিত আলাপ করিতেছেন। সকলে তাহার পর গৌরীগৃহে গমন করিয়া দেখিলেন যে, সেখানে নিকুঞ্জবিদ্যা একাই রহিয়াছেন। তাণ্ডবিক ময়ূর শ্রীকৃষ্ণ যেখানে থাকেন সেইখানেই অবস্থান করে। গৌরীগৃহের দ্বারে তাণ্ডবিক ময়ূরকে দেখিয়া অনেকেই সন্দেহপরায়ণ হইয়াছেন; কিন্তু বৃন্দা বলিয়াছেন সন্দেহের কোন কারণ নাই, শ্রীকৃষ্ণ গৌরীগৃহ যখন ছাড়িয়া গিয়াছেন তখন তন্দ্রাবশতঃই ময়ূর জানিতে পারে নাই। সেইজন্যই সে শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও অবস্থান করিতেছে। যাহা হউক, শ্রীরাধা সকলের সহিত গৌরীগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। নিকুঞ্জ-বিদ্যার সম্মুখে গিয়া শ্রীরাধা প্রথমতঃ অপরিচয়ের জন্য সম্ভ্রমযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে পারেন নাই। নিকুঞ্জবিদ্যাই শ্রীরাধার সঙ্কোচ কাটাইয়া দিয়াছেন। শ্রীরাধা অতঃপর নিকুঞ্জবিদ্যার কাছে বৃন্দা যেমন পান সেইরূপ স্নেহবন্ধন আকাঙ্ক্ষা করিলে, বৃন্দার পরামর্শে নিকুঞ্জবিদ্যারূপী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করেন। শ্রীরাধাকে মুহুর্মুহু চুম্বন, তাঁহার বক্ষোরুহে নখাঙ্কুর অর্পণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া সকলে বুঝিলেন নিকুঞ্জবিদ্যা স্বরূপতঃ কে।

এইভাবে গৌরীগৃহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যখন মিলন সংঘটিত হইতেছে, তখন জটিলা অভিমন্যুসহ সেখানে আসে বধূকে ধরিবার জন্য। জটিলা ও অভিমন্যুর আগমনের বিষয়ে জানিতে পারিয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাস্যা ও উপাসিকার ভূমিকা গ্রহণ করেন। নারীবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ দেবীরূপে দাঁড়ান, শ্রীরাধা তাঁহার নিকটে সকাতরে প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে থাকেন। এই অবস্থায় অভিমন্যু সেখানে উপস্থিত হইয়া নারীবেশী শ্রীকৃষ্ণকে মহেশ-মহিষীরূপে ধারণা করিয়া ভক্তিনম্রচিত্তে প্রণাম করে।

শ্রীকৃষ্ণের এই নারীবেশ ধারণের পরিকল্পনা শ্রীরূপের স্বকপোল-কল্পিত। ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বহু পদকর্তা সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন। বংশীদাস লিখিয়াছেন—

মাধব বোধ না মানয়ে রাই ।
নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহে ধনি নিবসই
তুরিতে গমন করু তাই ॥
এত শুনি নাগর নাগরি বেশ ধরি
সখি সঞে চলু বনমালী ।
যোই নিকুঞ্জে আছয়ে বরমানিনী
তাহা যাই উপনীত ভেলি ॥
নাগরি বেশ দেখি হরষিত সখীগণ
কহে সব বলিহারি যাই ।
কোপে সুধামুখি চরণে লিখয়ে মহী
পীছে রহল তহি যাই ॥
কাতর নয়নে নেহারই নাগর
ধনী মুখ অবনত কেল ।
বংশী কহয়ে ইবে থীর রহু মাধব
সব জন অনুমতি ভেল ॥ (তরু ৫৪৩)

'বিদগ্ধমাধব' হইতে পার্থক্যের মধ্যে এই যে, উপরি-ধৃত পদে বংশীদাস বলিয়াছেন—মানবতী শ্রীরাধা প্রথমাবধি নিকুঞ্জে ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণই নারীবেশ ধারণ করিয়া দূতীসহ সেখানে গমন করিয়াছেন। এমন পার্থক্য নিতান্তই নগণ্য।

বংশীদাস অন্য একটি পদে শ্রীরূপ-বর্ণিত ঘটনা যথাযথভাবে উপস্থাপিত করিয়া লিখিয়াছেন—

নাগরি বেশ হেরি হরষিত সহচরি
করে ধরি আদর কেল ।
কোপে কমলমুখি চরণে লিখয়ে সখী
তাক সমুখ লই গেল ॥
সুন্দরি হেরহ ইহ নবরামা ।
মাথুর নগরক ইহ নব রঙ্গিণী
তোহে মিলন ইহ শ্যামা ॥

ঐছন বচন শুনি বিমল বয়নি ধনি
বাহু পসারি করু কোর।
পরশহি জানল রসিক শিরোমণি
কো কহ কৌতুক ওর॥
টুটল মান আন মনে বৈঠল
সহচরি মুখ হেরি হাস।
অমল কমল মুখ হেরইতে বংশীক
পূরল মরম অভিলাষ॥ (তরু ৫৪৫)

বংশীদাসের এই পদে বিদগ্ধমাধবের বর্ণনার অনুসরণে নবরামা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন এবং পরশেই শ্রীরাধা জানিয়াছেন এই নবরামা কে।

জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণের নাগরী বেশধারণের সুন্দর কবিত্বময় পদ রচনা করিয়াছেন।

জ্ঞানদাস লিখিয়াছেন—

শুনি সখি বচন মনহি অনুমান।
নাগরি বেশ বনাওল কান॥
আগু পদ বাম বাম গতি চাহনি
বামা কুণ্ডল অনুপামা।
বামভুজে বসন ঢুলায়ত ঘন ঘন
যৈছন পেখলুঁ শ্যামা॥
পট অম্বর পরি অভিনব নাগরি
ঐছনে কয়ল পয়ান।
চারু সিঁথা পরি কামসিন্দূর পরি
লখই না পারই আন॥
এমন চতুরবর কবহু না পেখলুঁ
এ মহিমণ্ডল মাঝে।
মণিময় কঙ্কণ দুহু ভুজে সাজন
শঙ্খ শোভয়ে তছু মাঝে॥

পদতল অরুণ কিরণ মণি পেখলুঁ
তেঞি হোয়ত অনুমান।
জ্ঞানদাস কহে রাইক মন্দিরে
নাগর কয়ল পয়ান॥ (তরু ৫৩৫)

উপরি-ধৃত পদে ঘটনার দিকে বিদগ্ধমাধব হইতে পার্থক্য এই যে, শ্রীরূপের গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ নাগরীবেশে নিকুঞ্জে অবস্থান করিয়াছেন, শ্রীরাধাই তাঁহার উদ্দেশে গমন করিয়াছেন; পদটিতে রহিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার মন্দিরে গিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য নাই। শ্রীরূপের উপস্থাপিত ঘটনার পটভূমিতে পদকর্তা জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণের বেশবাসের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন মাত্র।

গোবিন্দদাস তাঁহার পদে ঘটনাই বিবৃত করিয়াছেন, সাজসজ্জার বিস্তৃত বর্ণনায় কল্পনাকে বিশেষ সম্প্রসারিত করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

কানু উপেখি রাই মহি লেখই
মানিনি অবনত মাথ।
নিরুপম নারি বেশ ধরি সো হরি
আওল সহচরি সাথ॥
সজনি কী ফল মানিনি মানে।
ঢীট কানাই কতয়ে ভঙ্গি জানত
কো করু কত অবধানে॥
শ্যামরি হেরি সখিক রাই পুছত
সো কহ ব্রজ-নব-রামা।
তুয়া সখি হোত যতনে ছলি আওল
কোরে করহ ইহ শ্যামা॥
করইতে কোরে পরশ সঞে জানল
কানুক কপট বিলাসা।
নাসা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত
হেরত গোবিন্দদাসা॥ (তরু ৫৩৬)

গোবিন্দদাসের আলোচ্য পদেও শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার নিকট গমন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বিদগ্ধমাধবের সমস্ত ঘটনাই প্রায় যথাযথ আছে। ‘শ্যামরি’ বা শ্যামলীকে দেখিয়া

শ্রীরাধার পরিচয় জিজ্ঞাসা, আলিঙ্গনে সব বুঝিতে পারা—এইগুলি শ্রীরূপের গ্রন্থকে পাঠমাত্র স্মরণ করাইয়া দেয়।

পদাবলীসাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের নাপিতানী, মালিনী, পসারিণী, দেয়াসিনী, বণিকিণী, বাদিয়া প্রভৃতি বেশে শ্রীরাধার মানভঞ্জনের যে বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা শ্রীরূপের বর্ণিত পূর্বোক্ত ঘটনার পরোক্ষ প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীরূপের পরিকল্পিত শ্রীকৃষ্ণের এক নারীমূর্তিই পদকর্তৃগণের বিচিত্র কল্পনায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। বিদগ্ধমাধবের পঞ্চম একটি ঘটনা (পৃঃ ৩৫—৩৮) এইরূপ—একদা শ্রীকৃষ্ণ গোচারণভূমিতে বংশীবাদন করিলে, মেঘের অন্তরাল হইতে তাঁহার বংশীর স্তুতি-গান উঠিল। বলরাম মনে করিলেন, দেবর্ষি নারদই এই গান করিতেছেন। পুনর্বার আকাশে কল কল শব্দ হইলে মধুমঙ্গল উপরের দিকে তাকাইয়াই ভয় পাইয়া গেলেন। 'আমি অবধ্য, অবধ্য'—এই বলিতে বলিতে তিনি পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন। শ্রীদাম বলিলেন—তুমি কি বাতুল যে অনবরত প্রলাপ বকিতেছ। মধুমঙ্গল উত্তর দিলেন—ওরে মূর্খ গোয়ালা, দেখিতে পাইতেছিস্ না একটা চতুর্মুখ হংসে বসিয়া উলঙ্গ সর্প হাতে লইয়া কোন একটা বেতালের সহিত ওই যক্ষ বা রাক্ষস এই দিকে আসিতেছে? ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া মধুমঙ্গল আবার বলিয়াছেন—এ যে দেখি, সর্বাঙ্গে চোখ-ভরা কোন এক দানবকে সম্মুখে লইয়া অন্যান্য অসুরেরা আকাশে বেড়াইতেছে। ইহারা কংসের চর নয় তো? মধুমঙ্গল ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে মুখ লুকাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—এই সমস্ত দিকপাল বেণুনাদ-মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া মেঘপথে উপস্থিত হইয়াছেন।

শ্রীরূপের বর্ণিত এই ঘটনাটিকে বিচিত্র কল্পনা-বিন্যাসে পরিবর্ধিত ও কিছু রূপান্তরিত করিয়া পদকর্তা লিখিয়াছেন—

শ্রীদাম কহিছে বাণী শুন ওগো নন্দরানী
নিতি যাই মোরা বনে।
যতেক বালক মেলি মাঝে রাখি বনমালি
ধেনু বৎস চরাই কাননে॥
মোহন মুরলি স্বরে নানা ছন্দে গান করে
ভুবন ভুলায় সেই রবে।
শুনিয়া মুরলী রব দিব্যমূর্তি লোক সব
আসি দরশন করে সবে॥

হংসের উপরে চড়ি   চতুর্মুখে মন্ত্র পড়ি
স্তব করে কানাইর চারিপাশে।
তারপর শূন্যপথে   ঐরাবতে বজ্রহাতে
দেখি মোরা পলাই তরাসে॥
কিন্তু প্রায় একজন   বৃষ পৃষ্ঠে আরোহণ
দিয়া শিঙ্গা ডমরু নিশান।
শিরে জটা ত্রিলোচন   ভস্ম অঙ্গে বিভূষণ
সদাই জপয়ে রামনাম॥
তার বামে এক নারী   তুলনা দিবার নারি
রূপে অন্ধকার নাশ করে।
স্বর্ণকান্তি শশিমুখি   ভালে শোভে তিন আঁখি
কোলে করি রহে গিরিধরে॥
কোলে লইয়া গিরিধরে   ননী খাওয়ায় দশ করে
কতই ননী খায় তার করে।
বলে ওরে বাছা কানু   আনন্দে চরাও ধেনু
কাননে নাহিক ভয় তোরে॥
গজমুখে একজন   মুষিকেতে আরোহণ
সিন্দুরে মণ্ডিত তনুখানি।
ষড়মুখে শিখি পরে   বাম হস্তে ধনু ধরে
কিবা তার কোচার বলনী॥
এ দাস শ্রীদামে কয়   মা তুমি না কর ভয়
কানু গেলে যত সুখ পাই।
শীতল তরুর ছায়   মোহন মুরলী বায়
মোরা সবে ধবলী চরাই॥

(মাধুরী—৪র্থ, পৃঃ ১৪৭-১৪৮)

প্রথমতঃ, আমরা দেখিতেছি শ্রীরূপের গ্রন্থে ঘটনাটি সরাসরি ঘটিয়াছে, কিন্তু পদে রাখাল-বালক উহা যশোমতীর নিকট বর্ণনা করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরূপ দশ দিকপালের আগমনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু পদে ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, গণপতি,

কার্তিকেয় প্রভৃতির আসার বৃত্তান্ত রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, পদে দুর্গার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া দশ হাতে ননী খাওয়ানোর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীরূপের বর্ণনায় এইসব নাই। এইরূপ কয়েকটি বিষয়ে কিছু পার্থক্য থাকিলেও, মূল ঘটনার দিক হইতে দুইয়ের এক অসামান্য মিল রহিয়াছে এবং সেইজন্যই আমরা পদটির উপর শ্রীরূপের গ্রন্থের প্রভাব পড়িয়াছে বলিতেছি।

বিদগ্ধমাধবের ষষ্ঠ ঘটনা যাহা পদাবলীসাহিত্যকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা হইতেছে শুক-সারীর দ্বন্দ্ব। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, নাটকের পঞ্চমাঙ্কে যেখানে ললিতাদির সহিত মধুমঙ্গলের শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ে তর্ক হইতেছে, সেখানে নেপথ্যে থাকিয়া শুক হঠাৎ বলিয়াছে—গোপীজনগণ কস্তুরিকার ন্যায় অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, মত্ততাকারী ও পিচ্ছিল; কিন্তু মুরারি শ্রীকৃষ্ণ বসন্ত বায়ুর ন্যায় সকল প্রাণীরই সুলভ ও সুখপ্রদ। শুকের এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ ও মধুমঙ্গল তাহাকে সাধুবাদ দিয়াছেন, কিন্তু গালি পাড়িয়াছেন ললিতা। সারীও এই সময় কথা কহিয়া উঠিয়াছে। সে নেপথ্য হইতে বলিয়াছে—ওহে চঞ্চল শুক, তোমার স্বামী সন্ধ্যাকালীন রক্তবর্ণ মেঘের ন্যায় মুহূর্তকালমাত্র অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীরাধিকা নূতন নবনীত পুত্তলিকার মতো সর্বদাই স্নেহ বহন করেন। ললিতা সারীর কথা শুনিয়া আনন্দভরে বলিয়াছেন—সখি সারিকে, তুমি সৌভাগ্যবতী হও, প্রত্যুত্তর দিয়া তুমি দুর্মুখ শুককে জয় করিলে।

এই বর্ণনার মাধ্যমে শ্রীরূপ কয়েকটি বিষয় বলিয়াছেন। তিনি শুকপাখীকে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত এবং সারীকে শ্রীরাধার ভক্তরূপে কল্পনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরূপ দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রূপগুণের উৎকর্ষ লইয়া শুক ও সারীতে অনেক সময়ই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়।

শ্রীরূপের উদ্ভাবিত এই বিষয়টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক পদকর্তা পরবর্তী কালে পদ রচনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর পদকর্তা জগদানন্দের একটি পদ উদ্ধৃত করি। পদটি এইরূপ—

রাধে জয় জয় বলিয়ে সারী নিধুবন ভরি গাজে।
নীল ওঢ়নি মুকুট টলিনি রাকা শশধর বদন জিনি
চরণ নূপুর মধুর মধুর রুণু ঝুণু বাজে॥
সারী বলে শুক তোমারে কই
রূপেতে কিশোরী হইল জই

কানু মনোহরা রাধিকা মূরতি
পরাভব নটরাজে।
আবীর কুঙ্কুম পাশা জলকেলী
সে সব সমরে তব বনমালী
জিনিবারে নারে রাই পদ ধরি
হারিয়াছে সখী-মাঝে॥
আমাদের কিশোরী রাজার কুমারী
সব সখীগণ পূজে।
তোমার নাগর রাখাল খেয়াতি
সদা থাকে গোঠ মাঝে॥
মৃগপক্ষ আদি যত বৃক্ষলতা
নিজরূপ সম করিল রাধা
তোমার নাগর হইল গৌর
লুকায়ত সখী-মাঝে।
যেই দিন রাধা করিল মান
দাসখত লেখি দিয়াছে শ্যাম
তার সাক্ষী আছে শুন হে শুক
নিশি-শেষে পিকরাজে॥
শুক কহে সারী কি কর দ্বন্দ্ব
দোঁহে সমগুণ কে কহে মন্দ
জগদানন্দ পরমানন্দ
রসবতী রসরাজে॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৮৭৭)

আলোচ্য পদের শুক-সারীর দ্বন্দ্বের পরিকল্পনাটিই শ্রীরূপের আদর্শে সম্ভব হইয়াছে, অন্য সব বক্তব্য পদকর্তার নিজস্ব। শুক-সারীর দ্বন্দ্ব-বিষয়ক পদাবলীর অধিকাংশই এইরূপ।

পদাবলীসাহিত্যে 'বিদগ্ধমাধব'-এর তৃতীয় প্রকার প্রভাব কতকগুলি নবসৃষ্ট চরিত্র বিষয়ে। এই সমস্ত চরিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে

প্রাসঙ্গিকভাবে করা হইয়াছে। এখানে কেবলমাত্র চন্দ্রাবলীর সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধা এক ও অভিন্ন। সেখানে শ্রীরাধারই এক নাম চন্দ্রাবলী। শ্রীরূপই প্রথম শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীকে পৃথকরূপে কল্পনা করেন। 'বিদগ্ধ-মাধব'-এ আমরা দেখি, শ্রীরাধার প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী; শ্রীরাধার যেমন ললিতা-বিশাখাদি অতি অন্তরঙ্গ সখী রহিয়াছেন, তেমনি চন্দ্রাবলীরও অন্তরঙ্গা সখী পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করায় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের উপর মান করিয়াছেন।

শ্রীরূপ কেবল 'বিদগ্ধমাধব'-এই শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর বিষয়ে বলেন নাই, 'ললিত-মাধব', 'শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থেও তাঁহাদের পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট মত ও পরিকল্পনা ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীরূপের এই পরিকল্পনার প্রভাবে পরবর্তী কালের প্রায় সমুদয় পদাবলীতেই আমরা দেখি, শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী। শ্রীরূপের পরিকল্পিত এই প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র দুইটি লইয়া পুরুষোত্তম দাস এক অভিনব মধুর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—

> রাইক দশমি দশা নিজ সখিমুখে শুনি চন্দ্রাবলি রোই।
> নিজ তনু ঢারি ধূলি গড়ি যাওত ভূতলে কুন্তল ফোই॥
> রাইক প্রেমে পুনহি নন্দ-নন্দন আওব করি ছিল আশ।
> সো সব মনরথ বিহি কৈল আন মত এতদিনে ভেল নৈরাশ॥
> এত কহি পুন পুন শিরে কর হানই মুরছিত হরল গেয়ান।
> পদ্মাদেবি কোরপর নেয়ল ঝর ঝর লোরে নয়ান॥
> বহুখনে চেতন পাই মলিনমুখি বৈঠল ছোড়ি নিশ্বাস।
> রাইক নিয়ড়ে লেই চলু সহচরি কহ পুরুষোত্তমদাস॥
>
> (তারকাত্রয়, পৃঃ ৮১)

বিরহিণী শ্রীরাধার মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া, চন্দ্রাবলী পূর্বের বিরোধ সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীমতীর দুঃখে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন। শ্রীরাধার প্রেমের আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ একদিন ফিরিয়া আসিবেন এতদিন চন্দ্রাবলীর এইরূপ আশা ছিল, কিন্তু বিধাতা সব-কিছুতে বুঝি বাদ সাধিলেন। চন্দ্রাবলী বিলাপ করিতে করিতে মস্তকে করাঘাত করিয়া মূর্ছিত হইলেন। তাঁহার সখী পদ্মা সজল চোখে মূর্ছিত দেহখানি কোলে তুলিয়া লইলেন। বহুক্ষণ পরে চেতনা ফিরিয়া আসিতেই চন্দ্রাবলী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—তিনি শ্রীরাধার নিকটে যাইবেন, সখী তাঁহাকে লইয়া চলুক। এখানে পুরুষোত্তমের এই পদে শ্রীরাধার বিরহ-দুঃখে সমব্যথী চন্দ্রাবলী। শ্রীরূপ এমন

পরিকল্পনা না করিলেও, তাঁহারই পরিকল্পিত চরিত্রকে নবরূপে রূপায়িত করিয়াছেন পদকর্তা পুরুষোত্তম।

এই অধ্যায়ের পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। গ্রন্থের নামকরণে 'বিদগ্ধ' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন শ্রীরূপ। তিনি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে (দক্ষিণ, ১ লহরী, পৃঃ ২৫৬) বিদগ্ধের লক্ষণ বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—'কলাবিলাস-বিদগ্ধাত্মা বিদগ্ধ ইতি কীর্ত্যতে, অর্থাৎ শিল্প-বিলাসাদিতে পণ্ডিতকে বিদগ্ধ বলে। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, শব্দটির প্রচলিত যে অর্থ বিদ্বান বা পণ্ডিত, তাহা হইতে শ্রীরূপ পৃথক অর্থই চিন্তা করিয়াছেন।

শ্রীরূপ মাধবকে বিদগ্ধ বলিয়াছেন, কারণ তিনি লীলা-বিলাসে অতিশয় নিপুণ। নাটকখানির মধ্যে সেই লীলা-বিলাসের বর্ণচ্ছটাময় সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে বলিয়াই শ্রীরূপ গ্রন্থের শিরোনামে লিখিয়াছেন 'বিদগ্ধমাধব'।

শ্রীরূপের বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত এই 'বিদগ্ধ' কথাটি সুরসিক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পদকর্তা-দের অনেকেই ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, যদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন—

অতিশয় আদর বিদগধ নাগর
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
(মাধুরী—৫য়, পৃঃ ৩২৬)

শিবরাম দাস লিখিয়াছেন—

দোতি-বচন শুনি বিদগধ শিরোমণি
কুঞ্জে মিলল ধনি পাশ। (তরু ১৬১৮)

'বিদগ্ধ' শব্দ হইতে বিশেষ্য 'বৈদগ্ধি' বা 'বৈদগধি' করিয়া গোবিন্দদাসও লিখিয়াছেন—

বিশদ বারণ- বাহু-বৈভব
বলয়-বন্ধ নিবন্ধ।
বিবিধ বৈদগধি- বচন-বিরচন-
বিবশ দাস গোবিন্দ॥ (তরু ২৭১৪)

এ সমস্তই শ্রীরূপের 'বিদগ্ধমাধব'-এর শব্দগত প্রভাবে সম্ভব হইয়াছে।

———

॥ ললিতমাধবের প্রভাব ॥

বিদগ্ধমাধবের পরিপূরক নাটক এই 'ললিতমাধব' শ্রীরূপ ১৪৫৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে ভদ্রবনে সমাপ্ত করেন। মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুর-লীলা বর্ণনা করিবার জন্যই শ্রীরূপ 'ললিতমাধব'-এর পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলেন—

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাতে ॥

শ্রীচৈতন্যের এই নিষেধ বাক্যে শ্রীরূপ নূতন করিয়া পরিকল্পনা করেন। 'বিদগ্ধমাধব'-এ তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা বর্ণনা করিয়া 'ললিতমাধব'-এ তাহারই একটি আপাত রূপ হিসাবে দ্বারকাপুর-লীলা রূপায়িত করেন। তাই আমরা দেখি, শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা সকলেই দ্বারকাপুরে গিয়া সত্যভামা, রুক্মিণী প্রভৃতি ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছেন। মনে হয়, 'ললিতমাধব' গ্রন্থখানি দ্বারা শ্রীরূপ দুই জাতীয় বৈষ্ণব উপাসকদের মধ্যে একটা সম্প্রীতি আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পুরলীলার উপাসক, তাঁহারা স্বকীয়াবাদী এবং ভগবানের ঐশ্বর্যের প্রকাশেও শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু যাঁহারা ব্রজলীলার ভজনা করেন, তাঁহারা পুরাপুরি পরকীয়াবাদী:, ভগবানের ঐশ্বর্যের কথা চিন্তা করিলেও তাঁহাদের বিবেচনায় রসাভাস ঘটে। এই দুই সম্প্রদায়ের উপাসকদের মধ্যে একটা বিরাট রকম বিরোধ ছিল। শ্রীরূপের 'ললিতমাধব' নাটকের মধ্য দিয়া এই বিরোধেরই অবসান ঘটাইবার চেষ্টা হইয়াছে। এক্ষেত্রে 'ললিতমাধব'-এর প্রভাব অবশ্যই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় পদাবলীর উপরে ইহার প্রভাব কতখানি।

পদাবলীসাহিত্যে 'ললিতমাধব'-এর প্রভাব দুইভাবে পড়িয়াছে। প্রথমতঃ, শ্লোকের প্রভাব।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে (পৃঃ ১৩৩) পৌর্ণমাসীর মুখে শ্রীরূপ নিম্নোক্ত শ্লোকটি দিয়াছেন—

ভানোর্বিম্বে ত্বরিতমুদয়প্রস্থতঃ প্রস্থিতেঽসৌ
যাত্রানান্দীং পঠতি মুদিতস্যন্দনে গান্ধিনেয়ঃ।
তাবৎ তূর্ণং স্ফুটখুরপুটৈঃ ক্ষৌণীপৃষ্ঠং খনন্তো
যাবন্নামী হৃদয় ভবতো ঘোটকাঃ স্ফোটকাঃ স্যুঃ ॥

অর্থাৎ—হে হৃদয়, উদয়গিরিতে সূর্যবিম্ব উদিত হওয়ায় রথে চড়িয়া অক্রূর যে সময় পর্যন্ত মঙ্গল পাঠ করিতেছেন, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি বিদীর্ণ হও; নতুবা খুর দিয়া যাহারা ভূপৃষ্ঠ খনন করে, সেই অশ্বগুলিই তোমাকে বিদীর্ণ করিবে।

পৌর্ণমাসী কথাগুলি বলিলেও, এইগুলি শ্যামলার বিলাপ। ভগবতী পৌর্ণমাসী বৃন্দার কাছে এই বিলাপের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ-রচিত শ্লোকটি অনুসরণ করিয়া ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

নিশি অবশেষ কপোত শুক সারিক
কোকিল করই ফুৎকার।
দিনকর কিরণে অরুণ উদয়াচল
দূরে গেল ঘন আঁধিয়ার॥
দেখ সখি পাপ অক্রূর।
সাজি বাজিরথে করল আরোহণ
মঙ্গল পঢ়ই প্রচুর॥
যব ধরি চলইতে চপল তুরঙ্গম
খুরপুটে অবণি না খনই।
কাহে মোর হৃদয় নিলজ প্রাণ সঞে
তব ধরি ফাটি না পড়ই॥
প্রাণনাথ যব চলু মথুরাপুর
তব কিয়ে জীবন আশ।
নিশ্চয়ে সাজি অনল তনু তেজব
অব ঘনশ্যামর দাস॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৯০)

ঘনশ্যাম এই পদে শ্রীরূপের শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের পটভূমিটি বিরহিণী সখী পদের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু শ্লোকে ঠিক পটভূমির বর্ণনা নাই। ঘনশ্যাম প্রভাতের একটি সুন্দর-বর্ণনা দিয়াছেন। বাহিরের ঘন অন্ধকার বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু শ্রীরাধার হৃদয়ে উহা যেন জমাট বাঁধিল—এই উৎপ্রেক্ষারও আভাষ আছে। পদের মধ্যে রহিয়াছে, চপল অশ্ব চলিতে গিয়া যে পর্যন্ত মৃত্তিকা খনন না করিতেছে, সেই সময়ের ভিতর আমার এই হৃদয় নির্লজ্জ প্রাণের সঙ্গে কেন ফাটিয়া পড়িতেছে না: শ্লোকে কিন্তু কথাগুলি অন্যরূপ—সেখানে

রহিয়াছে যে, খুর দ্বারা ভূখননকারী অশ্বগুলি হৃদয় স্ফুটিত করিবে যদি এই সময়ের মধ্যে হৃদয় (আপনা হইতে) ফাটিয়া না পড়ে। ঘনশ্যাম পদের শেষ স্তবকে নিজের কল্পনাবলেই বিরহিণীর মৃত্যুবরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীরূপ 'ললিতমাধব'-এর তৃতীয় অঙ্কে বৃন্দার সংলাপে লিখিয়াছেন—

ক্ষণং বিক্রোশন্তী বিলুঠতি শতাঙ্গস্য পুরতঃ
ক্ষণং বাষ্পগ্রস্তাং কিরতি কিল দৃষ্টিং হরিমুখে।
ক্ষণং রামস্যাগ্রে পততি দশনোত্তম্ভিত-তৃণা
ন রাধেয়ং কং বা ক্ষিপতি করুণাম্ভোধি-কুহরে॥

(ললিতমাধব, পৃঃ ১৪১-১৪২)

অর্থাৎ—শ্রীরাধা কখনও বা বিলাপ করিতে করিতে রথের সম্মুখে লুটাইতেছেন, কখনও বা সজল চোখে শ্রীকৃষ্ণের মুখখানে তাকাইতেছেন, কখনও বা দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া বলরামের সম্মুখভাগে (আছড়াইয়া) পড়িতেছেন। হায়, ইহা দেখিয়া কাহার না অত্যন্ত দুঃখ হয়। এই শ্লোকটি একাধিক পদকর্তার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে।

শিবরাম দাস লিখিয়াছেন—

খেণে ধনি রোই রোই খিতি লুঠত
খেণে গীরত রথ আগে।
খেণে ধনি সজল-নয়নে হেরি হরি-মুখ
মানই করম অভাগে॥
দেখ দেখ প্রেমক রীত।
করুণা-সাগরে বিরহ-বিয়াধিনি
ডুবায়ল সবজন-চীত॥
খেণে ধনি দশনহি তৃণ ধরি কাতরে
পড়লহিঁ রাম সমুখে।
শিবরাম দাস ভাষ নাহি ফুরয়ে
ভেল সকল মন দুখে॥ (তরু ১৬২৬)

শ্লোকের প্রায় প্রত্যেকটি কথা বর্ণনা করিয়াও সহজ ও সাবলীল এই পদটি পদকর্তা গড়িয়া তুলিয়াছেন। বাহুল্য চিন্তা করিয়াই তিনি শ্রীরাধার নামটি কোথাও উল্লেখ করেন নাই।

শ্লোক দৃষ্টান্তে রাধামোহন ঠাকুরও লিখিয়াছেন—

খেণে খেণে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে
খেণে খেণে হরি-মুখ চাহ।
খেণে খেণে মনহি করত জানি ঐছন
কানু সঞে জীবন যাহ॥
সজনি ইহ সুখ-সাগর মাঝ।
কো নাহি ড বল ঐছন হেরইতে
গোকুল-গোপ-সমাজ॥
খেণে তৃণ মুখে ধরি রামক আগুসরি
আছাড়ি পড়ল নিজ অঙ্গে।
খেণে পুন মুরছই খেণে পুন উঠই
ড বই বিরহ-তরঙ্গে॥
রাধামোহন পহুঁ আগমন সঙ্কেতে
করি অছু হরল গেয়ান।
হেরি অক্রুর পুন সময়হি ঐছন
রথ লেই করল পয়ান॥ (তরু ১৬২৭)

রাধামোহন প্রথম চরণে শ্লোকের অনুসরণক্রমেই লিখিয়াছেন যে, শ্রীরাধা ক্রন্দন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে রথের সম্মুখে লুটাইতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে তিনি শ্রীহরির মুখপানে চাহিতেছেন। কিন্তু পরের চরণেই পদকর্তা যে বলিলেন, শ্রীরাধা ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ মনে করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবনও চলিয়া যাইতেছে; অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চলিয়াছেন, এই কথা পদকর্তার সম্পূর্ণ মৌলিক সংযোজনা। ইহা খুব সঙ্গতভাবেই পদের মধ্যে আসিয়াছে। ধ্রুবপদটি পদকর্তা শ্লোকানুসরণে রচনা করিয়াছেন। তৃণ মুখে করিয়া শ্রীরাধার বলরামের সম্মুখে আছড়াইয়া পড়াও তদনুরূপ। কিন্তু শ্রীমতী যে ক্ষণে মূর্ছিত হইতেছেন, আবার ক্ষণকালের মধ্যে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া উঠিয়া পড়িতেছেন, তিনি বিরহের তরঙ্গে যে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছেন, এই সমস্ত রাধামোহন ঠাকুরের নিজস্ব সংযোজনা। পদের শেষে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের সময়ে শ্রীরাধার অচৈতন্য হইয়া পড়া এবং অক্রুরের রথ লইয়া প্রস্থান, এইগুলিতেও পদকর্তা স্বাধীনভাবে কল্পনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপ 'ললিতমাধব'-এর ওই তৃতীয় অঙ্কেই (পৃঃ ১৪৬) মাথুরের প্রলাপদশা অবলম্বনে এক সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক রচনা করিয়াছেন। বৃন্দা ও পৌর্ণমাসী যখন বিরহ-ব্যাকুল শ্রীরাধার উন্মাদনা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন, তখন হঠাৎ নেপথ্যে বিরহোন্মাদিনী শ্রীমতীর প্রলাপ শোনা গিয়াছে—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ।
ক্ব মন্দ্র-মুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্র-নীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরস-তাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্॥
(ললিতমাধব, শ্লোক ২৫)

অর্থাৎ—নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? (সেই) শিখিপুচ্ছভূষণ কোথায়? মুরলীর রবরূপ মন্ত্রে যিনি আমাদের আকর্ষণ করেন, তিনি কোথায়? সুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই নীলমণি কোথায়? রাসরসে যিনি অতি উচ্ছলভাবে নৃত্য করিতেন, তিনি কোথায়? সখি, (আমার) জীবনরক্ষার ঔষধস্বরূপ, আমার মহারত্ন, সুহৃদ্‌শ্রেষ্ঠ কোথায়? হায় বিধাতা, তোমাকে ধিক, তুমি তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেলে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ কিরূপ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা 'উজ্জ্বলনীলমণির প্রভাব' অধ্যায়ে দেখাইয়াছি।

ঘনশ্যামও লিখিয়াছেন—

যাকর দরশ পরশ রস লালসে
তেজিলুঁ কুল অভিমান।
নিশি দিশি অলস বৈরি করি মানল
সো অত ভৈ গেল আন॥
এ সখি কাঁহা গেয়ো ব্রজকুলচাঁদ।
কাঁহা সোই মধুর মুরলীরব মাধুরী
কাঁহা গেয়ো শিখিপুচ্ছচাঁদ॥
কাঁহা মৃদু ভাষ হাস মধুরাধর
কাঁহা রূপ সরমক ঠান।
কাঁহা সোই রাস রসিক রস আগর
কাঁহা সোই কমল নয়ান॥

কাঁহা সোই অরুণ চরণে মণিমঞ্জির
কাঁহা সে ললিত পীতবাস।
কাঁহা সোই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম নটনাগর
কাঁহা নৃত্যগীত বিলাস॥
কাঁহা সে সুহৃদনিধি জীবন মহৌষধি
ধিক ধিক দারুণ ধাতা।
ধিক মোর জীবন ভসম না হোয়ত
ঘনশ্যাম দাস দুখ গাঁথা॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৯৫)

শ্রীরূপের শ্লোকটি যেমন সুন্দর, ঘনশ্যামের পদটিও সেইরূপ মনোরম। পদে শ্রীরাধা বলিতেছেন, যাঁহার দর্শন ও স্পর্শে আনন্দ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় কুলের অভিমান আমি ত্যাগ করিলাম, দিবারাত্র আলস্যকে শত্রুরূপে মনে করিয়া যাঁহার মনোনয়নের চেষ্টা করিলাম, তিনিই এখন অন্যরূপ হইয়া গেলেন। শ্রীরাধা দুঃখ করিয়া এই যে কথাগুলি বলিতেছেন, ইহা পদকর্তার মৌলিক পরিকল্পনা। শ্লোকে এইরূপ কথা বলা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকে নন্দকুলচন্দ্র না বলিয়া ব্রজকুলচাঁদ বলায় অর্থ ব্যাপকতর হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নন্দকুলচন্দ্র হইলে গোপীদের তাঁহার বিরহে যতখানি দুঃখবোধ করার অধিকার থাকে, ব্রজকুলচন্দ্র বলিলে সেই অধিকার যেন অনেকগুণ বাড়িয়া যায়। ঘনশ্যাম পদের মধ্যে শ্লোকের কথা-কয়টিই লিখেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যত রকম প্রশ্ন বিরহিণী শ্রীরাধার মনে জাগিতে পারে সবগুলিই লিখিয়াছেন। পদের শেষে শ্রীমতী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিত জীবন ভস্মীভূত হইতেছে না কেন বলিয়া যে বিলাপ করিতেছেন, তাহা খুবই সঙ্গত চিন্তা। ঘনশ্যাম মৌলিকভাবেই চিন্তার রূপরেখাটি অঙ্কন করিয়াছেন।

তৃতীয় অঙ্কের ২৮-সংখ্যক শ্লোকে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

উত্তাপীপুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো
দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশল্যাদপি।
তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকা-নিচয়তোঽপ্যুচ্চৈর্মমায়ং বলী
মর্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ॥

(ললিতমাধব, পৃঃ ১৪৯)

অর্থ—গোকুলপতির বিরহের জন্য আমার যে অন্তর্জ্বালা তাহা রন্ধনের তপ্ত কড়াই অপেক্ষাও উত্তপ্ত, তীব্র বিষ হইতেও মোহকারী, বজ্র হইতেও দুঃসহ, বক্ষশূলের

অপেক্ষাও যন্ত্রণাদায়ক, পাকাপাকি হইয়াছে যে বিসূচিকা ব্যাধি তাহা অপেক্ষাও তীব্র; ইহা অতিশয় দর্পের সহিত আমার মর্মকে ভেদ করিতেছে। শ্লোকটি মাথুরের ব্যাধিদশা সম্পর্কেই লেখা হইয়াছে। ইহার অনুসরণে ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

বিরহ জ্বরে জারি সো বর নাগরী
বয়নে নাহি আধ ভাখ।
জনু গরল পরবল শরীর পূরল
তপত জিনি পুটপাক ॥
শুন শুন গোকুলচন্দ।
হেরি দুখ হেন সহই কো জন
বজর গতি ভেল মন্দ ॥
যৈছে ব্রণময় দেহ ভেলয়
হৃদয় ভেদন শেল।
তোহারি দারুণ বিরহ বেদন
তাঁসো উৎকট ভেল ॥
অসিত শশী যেন ক্ষীণ অনুদিন
ঐছে ভেল তনু শোয়।
বুঝল ঘনশ্যাম শুনহ নবঘন
করুণা লব নাহি তোয় ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৯৫-৯৬)

ঘনশ্যাম পদটির মধ্যে মৌলিকতা যথেষ্টই দেখাইয়াছেন। সুরুতেই তিনি স্বাধীনভাবে বলিতেছেন যে, সেই সুন্দরী শ্রীরাধা বিরহ-জ্বরে জারিত হইয়াছেন, তাঁহার মুখ হইতে এক-আধটি ভাষাও সরিতেছে না। শ্রীরাধার শরীর যেন তীব্র গরলে পরিপূর্ণ হইল, তাই পুটপাক হইতেও দেহটি উত্তপ্ত। গরলের প্রসঙ্গটি শ্লোকানুসারী। শ্রীরূপের শ্লোকের আদর্শে বজ্রের কথাও পদকর্তা আনিয়াছেন, কিন্তু নিজের উক্তিতে গোকুলচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তাহা বলার মধ্যে পদকর্তা কিছু অভিনবত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্লোকের মধ্যকার বিসূচিকা-ব্যাধি পদের ভিতরে দেহের ব্রণে পর্যবসিত হইয়াছে। ইহাতে দুঃখের তীব্রতা যেন অনেক কমিয়া গিয়াছে।

পদকর্তা শেষ স্তবকে বলিয়াছেন যে, শ্রীরাধার দেহ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের মতো দিনের

পর দিন ক্ষীণ হইয়া গেল; ইহাতেও যখন শ্রীকৃষ্ণের দয়া হইতেছে না, তখন তিনি (পদকর্তা) বুঝিতে পারিতেছেন নবজলধরকান্তি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে কণামাত্রও করুণা নাই।

'ললিতমাধব'-এর সপ্তম অঙ্কে বেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণভ্রমে শ্রীরাধা বলিয়াছেন—

দগ্ধং হন্ত ! দধানয়া বপুরিদং যস্যাবলোকাশয়া
সোঢ়া মর্মবিপাটনে পটুরিয়ং পীড়াতিবৃষ্টির্ময়া।
কালিন্দীয়তটী-কুটীরকুহর-ক্রীড়াভিসারব্রতী
সোঽয়ং জীবিতবন্ধুরিন্দুবদনে ! ভূয়ঃ সমাসাদিতঃ।

(ললিতমাধব, পৃঃ ৩৬৪)

বাংলায় অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—হায়, যাঁহার দেখা পাইবার আশায় এই পোড়া দেহ ধারণ করিয়া মর্মবিদারী ব্যাধিরূপ অতিবৃষ্টিও সহ্য করিয়াছি, হে চন্দ্রমুখি, যমুনাতীরের কুঞ্জকুটীরে ক্রীড়া করিবার জন্য আসায় অভ্যস্ত সেই প্রাণবন্ধুকেও আজ আবার সত্যসত্যই পাইলাম।

শ্লোকটি সামনে রাখিয়া ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

তুয়া এক চিহ্ন রতনমণি চাহিতে
তো সঙে দরশন ভেল।
বুঝলহু জগত লখিমি তুহু সকরুণে
মঝু মনে আনন্দ দেল॥

ঘরে ঘরে নগরে নগরে জনু ভ্রমইতে
দারিদ্র চনক পিয়াসে।
বিহি অনুকূল কণক মাহা বরিখনে
পূরল তাকর আশে॥

যৈছন জলদ নেহারই চাতক
যৈছন চান্দ চকোর।
তৈছন ঐছন তোহারি ধেয়ানে তনু
অনুক্ষণ জর জর অন্তর মোর॥

কহইতে গদ গদ তুহু ভেল আকুল
সরস পরশ রস আশে।
নব জলধর কিয়ে বিজুরি আগোরল
বলিহারি ঘনশ্যাম দাসে॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ১০২)

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—তোমার একটু দেখা পাইবার আশা করিয়া সত্যই তোমার দর্শন পাইলাম। বুঝিলাম জগৎলক্ষ্মীর হৃদয় আছে, তিনি আমার মনে আনন্দ-বিধান করিলেন। পদের মধ্যে লিখিত শ্রীরাধার এই কথাগুলি শ্লোকের কোথাও নাই, তবু যে অসঙ্গত হইয়াছে এমন নহে। পদে শ্রীরাধা আরও বলিয়াছেন—দরিদ্র যেমন নগরে নগরে সামান্য চণক বা চানা চাহিয়া ফিরে সেইরূপ তাঁহার অবস্থা ছিল, এখন যেন দৈব সদয় হওয়ায় বড় রকম স্বর্ণবৃষ্টিতে তাঁহার সমস্ত আশা পূর্ণ হইল। পরমদয়িত শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাওয়া শ্রীরাধার কাছে দরিদ্রের মুঠি মুঠি সোনা পাওয়ার মতোই পরম আনন্দের বিষয়—এই কথা লিখিয়া মরমীকবি ঘনশ্যাম শ্রীরাধার অন্তরের অপার আনন্দকে সুন্দর অথচ মৌলিক অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন। শ্রীরাধা কতখানি আন্তরিকতা লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে চাহিতেছিলেন তাহা বলিতে গিয়া পদকর্তা ঘনশ্যামের শ্রীমতী বলিয়াছেন যে, চাতক যেমন মেঘের জন্য, আরও চকোর চাঁদের দেখা পাইবার আশায় যেমন দুশ্চর সাধনা করে তেমনি তিনি করিয়াছেন। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে তাঁহার তনু-মন জর জর হইয়াছে। এই কথাগুলিও শ্লোকে নাই, পদকর্তা নিজ কল্পনা-বলে লিখিয়াছেন। পদটির এতদূর পর্যন্ত বিশ্লেষণে আমরা দেখিয়াছি, শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন আকাঙ্ক্ষা, অতিবৃষ্টি এইরূপ কয়েকটি কথামাত্র গ্রহণ করিয়া সেইগুলির মনোমত প্রয়োগে পদকর্তা সর্বজন-আস্বাদ্য অপূর্ব পদ-মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঘনশ্যাম যে শ্রীরূপের শ্লোকের পটভূমিটিও মনে রাখেন নাই তাহার প্রমাণ শেষ স্তবকে তিনি লিখিয়াছেন যে, গদগদ ভাষ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা দুইজনেই সরস স্পর্শজনিত আনন্দ পাইবার আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের মিলনটি মেঘের সহিত বিদ্যুতের সম্মিলনের মতো। শ্রীরূপের শ্লোকের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া পদকর্তা ঘনশ্যাম রসঘন মৌলিক এক পদ রচনা করিয়াছেন।

'ললিতমাধব' নাটকের দ্বিতীয় প্রকার প্রভাব ঘটনাগত। নাটকের দুইটি ঘটনা পরবর্তী কালের পদাবলীকে কিছু প্রভাবিত করিয়াছে দেখা যায়। প্রথম ঘটনাটি হইতেছে বিপ্রবেশে শ্রীকৃষ্ণের সূর্যপূজা। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—সূর্যপূজার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইলে কুন্দলতা জটিলাকে বলিলেন, সূর্যপূজা করাইতে

পারেন এইরূপ একজন ব্রাহ্মণের পূর্ব হইতে সন্ধান করেন নাই কেন। জটিলা তাহাতে নিজের ত্রুটির বিষয় বুঝিয়া কুন্দলতাকেই সত্বর একজন ব্রাহ্মণ-বালকের সন্ধান করিতে বলিল। কুন্দলতা ব্রাহ্মণের খোঁজ করিতে গিয়া বিপ্রবেশী শ্রীকৃষ্ণ ও মধুমঙ্গলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া থাকিলেও সখীগণ-সহ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি বা তাঁহার সখীরা কেহই সোরগোল তুলিলেন না। সূর্যপূজা করিতে আসিয়াই পেটুক মধুমঙ্গল লাড্ডু প্রভৃতি খাইতে চাহিলেন। তাহাতে খুব চটিয়া গেল জটিলা। মধুমঙ্গলকে সে চতুর শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য বলিয়া চিনিতে পারিয়া বিতাড়িত করিতে চাহিল। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ সূর্যের পূজা করিতে লাগিলেন। মন্ত্র-উচ্চারণচ্ছলে তিনি অস্ফুট ভাষায় শ্রীরাধার সহিত রসালাপ করিলেন। ভালো শোনা যাইতেছে না, ইহা কোন্ জাতীয় মন্ত্র?—জটিলা এমন প্রশ্ন করিয়া বসিলে মধুমঙ্গল তাহাকে কিছু ধমক দিয়া থামাইয়া দিলেন। শান্ত হইয়া জটিলা বলিল—পূজা এমনভাবে করাও যাহাতে আমার ছেলে অভিমন্যু কোটি গাভী লাভ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ পূজা শেষ করিলে জটিলা তাঁহাকে দক্ষিণা লইতে অনুরোধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, অন্য কোন দক্ষিণার প্রয়োজন নাই; তিনি গোকুলবাসীদের বন্ধুত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন। মধুমঙ্গল তথাপি দক্ষিণা হিসাবে খণ্ডমোদকাদি আবার খাইতে চাহিলেন। জটিলা তাঁহাকে ভোজন করাইবার জন্য এবার নিজের ঘরে লইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাকে অচিরে কুঞ্জে আসিতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

শ্রীরূপের বর্ণিত এই কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার প্রভাবে মাধবদাস লিখিয়াছেন—

জটিলা গমন কথা শুনি সশঙ্কিত।
সূর্যের মন্দিরে সভে হৈলা উপনীত॥
প্রবেশিলা সভে সূর্যমন্দির ভিতরে।
হেনকালে তথা আসি জটিলা উতরে॥
দিনমণি প্রণমিতে আইলা জটিলা।
দেখে বসিয়াছে যত আভীরীর বালা॥
কুন্দলতা দেখি কথা কহে ব্যাজ কেনে।
কুন্দলতা কহে বিপ্র না পাই এখানে॥
জটিলা কহয়ে কেনে কোথা গেল বটু।
কুন্দ কহে গেল তব কথা শুনি কটু॥

আর এক বিপ্র আছে গর্গমুনির শিষ্য।
জটিলা কহয়ে তবে আনহ অবশ্য॥
শুনি কুন্দলতা গেল ব্রাহ্মণ আনিতে।
মাধব চলিল তার পাছেতে পাছেতে॥ (তরু ২৬৭৪)

এখানে যতটুকু ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, সবটাই 'ললিতমাধব'-এর ঘটনার অনুরূপ।

মাধবদাস অন্য একটি পদে লিখিয়াছেন—

মিত্র পূজাইয়া বিশ্বশর্মা দ্বিজরাজ।
বটুরে লইয়া সাধিলেন নিজ কাজ॥
মুদ্রা সহিতে বটু নৈবেদ্য বান্ধিলা।
বিদায় হইয়া দোঁহে কাননে চলিলা॥
সখাগণ মাঝে কৃষ্ণ যাইবার তরে।
ব্রাহ্মণের বেশ সব করিলেক দূরে॥
চূড়া বান্ধি বেত্র বাঁশী লইলেন হাতে।
কৌতুকে মিলিলা সব সখার সহিতে॥
বটুর অঞ্চলে বান্ধা নৈবেদ্য দেখিয়া।
খোলয়ে রাখাল সব চৌদিকে ঘেরিয়া॥
বলরামের ইঙ্গিতে সকল সখাগণ।
নৈবেদ্য সহিতে নিল তাহার বসন॥
ক্রোধে শাপ পাড়ে বটু কৃষ্ণ করে মানা।
তবে তারে বস্ত্র দিল করি বিড়ম্বনা॥
কৃষ্ণ লৈয়া সখাগণ নানা ক্রীড়া করে।
অপরাহ্ন হইল বলি মাধব ফুকারে॥ (তরু ২৬৭৬)

পদটিতে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বশর্মা দ্বিজরাজরূপে শ্রীরাধার সূর্যপূজা করাইবার জন্য আসিয়াছেন। তিনি বটুকে (মধুমঙ্গলকে) দিয়া পূজা সম্পন্ন করাইলেন। এই বিষয়ে ললিতমাধবের ঘটনার সহিত কিছু বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে। জটিলার উপস্থিতির কথা পদের মধ্যে কোথাও নাই; তাহা ছাড়া, পূজা সাঙ্গ করার পরের যে ঘটনা লঘুহাস্যরস সৃষ্টির জন্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও পদকর্তার মৌলিক কল্পনা। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, শ্রীরূপের বর্ণিত ঘটনার উপর কল্পনাকে পুরাপুরি স্থির না রাখিয়া পদকর্তা অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া পদটি লিখিয়াছেন।

যদুনন্দন দাস তাঁহার একটি দীর্ঘ পদে 'ললিতমাধব'-এর ঘটনাটি যথাযথভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। পদটি এইরূপ—

জটিলা আসিয়া তবে কহয়ে সভারে এবে
পুরোহিত আনহ যাইয়া।
শুনি পুন কুন্দলতা হৈলা অতি হর্ষ-চিতা
সেইক্ষণে চলিলা ধাইয়া॥

দেখ কৃষ্ণের অপরূপ লীলা।
ধীর শান্ত কলেবর সাক্ষাৎ বিপ্র বেশ ধর
কেহ নাহি লখিতে পারিলা॥

আসি কুন্দলতা দেবী কহয়ে বৃন্দারে ভাবি
মাথুর-দেশীয় গর্গ-ছাত্র।
শুনি সেই হর্ষমতি করয়ে মিনতি স্তুতি
ত্বরান্বিতা কহয়ে বধূরে।
এই বিপ্র বিজ্ঞবর সুশীল সর্বগুণধর
পৌরোহিত্যে বরহ ইহারে॥
শুনিয়া রাই হর্ষ হৈয়া ধীরে ধীরে কহে যাঞা
এই মোর মিত্র পূজিবারে।
বিশ্বশর্মা নাম খ্যাত জগত-মঙ্গল-গোত্র
পুরোহিতে বরিলু তোমারে॥
তবে সেই বিপ্রবর কুশাগ্রে কর্ষিয়া কর
রাই হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিল।
নমো নমো মিত্রবরে এই মন্ত্র উচ্চারে
অর্ঘ্য দিয়া পূজা সমাপিল॥
তবে বৃন্দা হর্ষ ভরে দক্ষিণা লইতে তারে
পুন পুন যত্নেতে সাধিল।
তেঁহো কহে কার্য নাই তোমা সভার প্রীতি চাই
এই মোর দক্ষিণা হইল॥

তবে সেই তুষ্ট হৈয়া রতন মুদ্রাদি দিয়া
কহে নিত্য করাবে পূজন।
দণ্ডবৎ প্রণতি কৈলা রাইকে লইয়া গেলা
সঙ্গে চলু এ যদুনন্দন ॥ (তরু ২৬৭৫)

শেখরের তিনটি পদে (তরু ২৭৯৭, ২৭৯৮, ২৭৯৯) আমরা দেখি, পদকর্তা শেখর মাধবদাসের মতোই শ্রীরূপের বর্ণিত ঘটনা হইতে অধিকদূর অগ্রসর হইয়া স্বাধীনভাবে নূতন ঘটনা গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, একদিন শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রবেশে শ্রীরাধার সূর্যপূজা করিতে মন্দিরে আসিলে, জটিলা ও আয়ান ঘোষ ঠগের মুখ হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া ফেলে। তাহারা দুইজনে শ্রীকৃষ্ণকে হাতেনাতে ধরিবার জন্য সূর্যমন্দিরে হানা দিলে, ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ পূজাবেদীর ফুলপাতার মধ্যে লুকাইয়া পড়িয়া সূর্যের ভূমিকা লইয়া বলেন যে, অচিরে আয়ানের মৃত্যু হইবে। শ্রীরাধা কপটভয়ে শিহরিত হইয়া সূর্যের কাছে নানান্ আবেদন-নিবেদন করিলে, শেষ পর্যন্ত সূর্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মঙ্গল ঘোষণা করেন। জটিলা ও আয়ান মন্দিরের বাহির হইতে তাহা শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া ঘরে ফিরে। এই ঘটনা-সম্বলিত পদগুলির উপর শ্রীরূপের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার বর্ণিত ঘটনার জন্যই এইরূপ নূতন ঘটনা চিন্তা করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া পদগুলিতে পরোক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য।

'ললিতমাধব'-এর কৌতূহলোদ্দীপক দ্বিতীয় ঘটনা—শ্রীকৃষ্ণের আয়ান-বেশ ধারণ। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে (পৃঃ ২২৭—২৪১) রহিয়াছে যে, একদিন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার আলয়ে আসিয়া হঠাৎ অভিমন্যুকে দেখিয়া দ্বারের কাছে আত্মগোপন করেন। অভিমন্যু তখন দেশের বাহিরে থাকিত, সেইক্ষণেই তিনশত গাভী কিনিবার জন্য স্বর্ণমুদ্রা লইতে ঘরে ফিরে। জননী জটিলা কিন্তু পূর্বেই শুক-সারীর কথোপকথন হইতে শুনে যে, শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুবেশে আসিবেন। সেইজন্য সত্যিকার অভিমন্যুকে দেখিয়াও জটিলা চিনিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণভ্রমে তাহাকে ধরিয়া সাজা দিতে যায়। অভিমন্যু মায়ের কাছে অনেকভাবে কাকুতি-মিনতি করিলে, মা অবশেষে পুত্রকে চিনিতে পারে। লজ্জায় সে অভিমন্যুর চোখের আড়ালে চলিয়া যায়। অভিমন্যু আপন কাজে চলিয়া গেলে, সুযোগ বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ আয়ান-বেশ ধরিয়া শ্রীরাধার নিকটে আসেন। জটিলা তাহা দেখিয়া আর কোনরূপ সন্দেহই করে না। আয়ান-বেশী শ্রীকৃষ্ণ জটিলার মত লইয়া গোমঙ্গলাপূজার ছলে শ্রীরাধাকে সন্ধ্যাবেলায় নিজের সঙ্গে কুঞ্জস্থলে লইয়া যান।

ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া দ্বিজ অকিঞ্চন একটি পদে লিখিয়াছেন—

আয়ান আসিয়া ডাকিছে হাঁকিয়া
দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে।
দ্বার খোল বলি মাতা ও ভগ্নীরে
ঘন ঘন ডাক ছাড়ে॥
উপরে থাকিয়া কুটিলা কহিছে
রাঙা করি দুটি আঁখি।
তোর চতুরতা আজি বুঝিয়াছি
নিতি নিতি দাও ফাঁকি॥
উপরে যেমন বরণ কালিম
ভিতরে তেমনই কালি।
দুরন্ত রাখাল কুল মজানিয়া
নতুবা খাইবি গালি॥
শ্রমেতে কাতর আয়ান তখন
রক্তিম নয়নে চায়।
বলে দ্বার খোল নতুবা কুটিলা
মরিবি পাঁচনি ঘায়॥
শুনিয়া কুটিলা দ্বিগুণ কুপিল
ইষ্টিক লইয়ে হাথে।
যত পারে মুখে দেয় গালাগালি
মারে আয়ানের মাথে॥
ভূতে ধরিয়াছে ভাবিয়া আয়ান
ওঝা ডাকিবারে গেল।
দ্বিজ অকিঞ্চন আয়ান প্রহার
হরিষেতে বিরচিল॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ১০৪১)

এখানে অভিমন্যুকে (আয়ানকে) নির্যাতন করার বিষয়ে কুটিলার একটু ভূমিকা রহিয়াছে। নির্যাতনও চরমে উঠিয়াছে। প্রকৃত বিষয়টি বুঝাইবার শত চেষ্টা করিয়াও হতাশ হইয়া, মা ও ভগিনীর ঘাড় হইতে ভূত তাড়াইবার জন্য অভিমন্যু শেষ পর্যন্ত

ওখার বাড়ী গিয়াছে। এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলিতে কিছু পার্থক্য থাকিলেও, পদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিজ অকিঞ্চন শ্রীরূপের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া লিখিয়াছেন। কেবল আয়ানের নির্যাতনের বিষয় কেন, পরে শ্রীকৃষ্ণের আয়ান-বেশ ধারণের ব্যাপারটিও অকিঞ্চন বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার পদ—

অতঃপর কিছু পরে রাধা বিনোদিনী।
চলিলা মন্দিরে নিজ লইয়া সঙ্গিনী ॥
আয়ানের বেশ ধরি শ্রীহরি তখন।
জটিলা নিকটে ত্বরা করিলা গমন ॥
কহিলা শুনহ মাতা সে লম্পট হরি।
আসিবে রাধার গৃহে সম বেশ ধরি ॥
কদাচ তোমরা তারে পশিতে না দিবে।
যদি না নিষেধ মানে ইষ্টক মারিবে ॥
বহির্দ্বার বন্ধ করি বৈসহ উপরে।
চলিলাম আমি এখন রাধার মন্দিরে ॥
এত বলি চলিলেন মনেতে উল্লাস।
আনন্দিত হৈল অতি অকিঞ্চন দাস ॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ১০৪১)

মনে হয়, অকিঞ্চন এই পদটি পূর্বপদের ভূমিকা হিসাবেই রচনা করিয়াছেন ; সেইজন্যই এই পদে কপট শ্রীকৃষ্ণের ইষ্টক নিক্ষেপ করার বিষয়ে যে পরামর্শ রহিয়াছে, তাহাই আমরা পূর্বপদে কার্যকরী হইতে দেখি। পদ দুইটির এইরূপ সম্বন্ধ সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে, পদকর্তা শ্রীরূপের বর্ণিত ঘটনার ক্রম ভঙ্গ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের আয়ান-বেশ ধারণের পদটিতে আমরা দেখি পরামর্শ দেওয়ার বিষয়ে পদকর্তার পরিকল্পনা মৌলিক।

এতদূর আলোচনা করিবার পরও আমরা বলিতে বাধ্য যে, পদাবলীসাহিত্যে 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের যেরূপ প্রভাব পড়িয়াছে, তাহার তুলনায় 'ললিতমাধব'-এর প্রভাব অনেক কম। ইহার সঙ্গত কারণ মনে হয়, অধ্যায়টির সুরুতে আলোচিত সেই দুই উপাসক সম্প্রদায়ের বিরোধ এবং অচিরেই বৃন্দাবন-লীলার উপাসকদের একাধিপত্য। বৃন্দাবন-লীলাকে প্রচ্ছন্ন রাখিলেও, 'ললিতমাধব' নাটকের বাহিরের রূপে আছে দ্বারকাপুর-লীলা। একান্ত মাধুর্যবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে তাহা অশ্রদ্ধেয় না হইলেও পরম আস্বাদ্য নহে।

॥ দানকেলিকৌমুদীর প্রভাব ॥

রঘুনাথদাস গোস্বামী রাধাকুণ্ডের তীরে নির্জন ভজনকুটীরে ভগবল্লীলারস-আস্বাদনে সর্বদাই বিভোর থাকিতেন। তিনি নাকি শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব পড়িয়া শ্রীরাধার বিরহজ্বালা অনুধ্যানে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন। দাসগোস্বামীর অন্তরের ব্যাকুলতা কিছুটা প্রশমিত করিয়া দিবার জন্যই শ্রীরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লঘু-হাস্যপরিহাসযুক্ত এই 'দানকেলিকৌমুদী' রচনা করেন। ইহা পাঠ করিয়া রঘুনাথদাস গোস্বামী অনেকখানি শান্ত হন। তিনিও শ্রীরূপের আদর্শ ভক্তিভরে অনুসরণ করিয়া 'শ্রীদানচরিত' বা 'দানকেলি-চিন্তামণি' রচনা করেন। গ্রন্থশেষে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

> গ্রথিতা সুমনঃসুখদা যস্য নিদেশেন ভাণিকা-স্রগিয়ম্।
> তস্য মম প্রিয়সুহৃদঃ কুঞ্জতটীং ক্ষণমলঙ্কুরুতাম ॥

অর্থাৎ—যাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে সজ্জনগণের সুখদ এই ভাণিকারূপ মালা গাঁথা হইল, আমার সেই প্রিয়বন্ধুর শ্রীকুণ্ডতটপ্রদেশকে ইহা ক্ষণকালের জন্যও অলঙ্কৃত করুক।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, রঘুনাথদাস গোস্বামীর অভিপ্রায় অনুসারেই শ্রীরূপ গ্রন্থখানি রচনা করেন।

'দানকেলিকৌমুদী'র রচনাকাল নির্দেশ করিতে গিয়া শ্রীরূপ গ্রন্থের উপান্ত-শ্লোকেই লিখিয়াছেন—

> গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমন্বিতে।
> নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্মিতা ॥

অর্থাৎ—নন্দীশ্বরে বাসকালে আমার দ্বারা ১৪৭১ শকে এই ভাণিকা রচিত হইল।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, ১৪৭১ শক অর্থাৎ ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দানকেলি-কৌমুদী রচনা সমাপ্ত হইয়াছে।

এই বিষয়ে একটি সমস্যার উদ্ভব হয় এই যে, 'দানকেলিকৌমুদী' ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইতেছে, অথচ ১৪৬৩ শক বা ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে দানকেলিকৌমুদীর কোন কোন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা কি করিয়া সম্ভব? সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করিয়া উদ্ধৃত শ্লোকগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দানকেলিকৌমুদীর ৭, ৫৫, ৭৯ সর্বোধ্বে ১১৭ অনুচ্ছেদ হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, অথচ দানকেলিকৌমুদীতে মোট অনুচ্ছেদ

আছে ৪১৪টি। সুতরাং স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচনা করিতে বসিয়া সেই সময় পর্যন্ত দানকেলিকৌমুদীর যতখানি রচিত হইয়াছিল তাহা হইতেই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। দানকেলিকৌমুদী গ্রন্থখানি অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া শ্রীরূপ প্রথমতঃ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' সমাপ্ত করিয়াছেন; তৎপরে আবার হাত দিয়াছেন 'দানকেলিকৌমুদী'তে।

শ্রীরূপের 'দানকেলিকৌমুদী' যে ভাণিকা, তাহা তিনি নিজেই গ্রন্থের উপান্ত-শ্লোকে বলিয়া গিয়াছেন। এখন প্রশ্ন, এই ভাণিকা-প্রণয়নে শ্রীরূপ কোন্ আলঙ্কারিকের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার 'সাহিত্যদর্পণ'-এর (৬, ৩০৮—৩১৩) ভাণিকালক্ষণে বলিয়াছেন যে, ভাণিকা নামক উপরূপকে বসন প্রভৃতি বেশবাসের সূক্ষ্মতা থাকিবে; ইহাতে 'মুখ' ও 'নির্বহণ'-সন্ধি, কৈশিকী ও ভারতীবৃত্তি, একটিমাত্র অঙ্ক, উৎকৃষ্ট নায়ক-নায়িকা এবং সাতটি অঙ্গ থাকিবে। অঙ্গগুলির নাম—উপন্যাস, বিন্যাস, বিরোধ, সাধ্বস, সমর্পণ, নিবৃত্তি ও সংহার। শ্রীরূপ 'দানকেলিকৌমুদী'র ৮-সংখ্যক অনুচ্ছেদে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাদক্রীড়ার মাধুর্য বর্ণনা করার পর ৯-সংখ্যক অনুচ্ছেদে নটকে প্রবেশ করাইয়াছেন। নট প্রবেশ করিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছে—

অবগণিত সন্ধিভূমা নাট্যকলেয়ং বলিষ্ঠসপ্তাঙ্গা।
পরমসুবৃত্তি যুগাঢ্যা বররাজ্যশ্রীরিব স্ফুরতি ॥

(দানকেলিকৌমুদী, অনু ৯)

অর্থাৎ—এই নাট্যকলা (নাটকটি) মুখ, প্রতিমুখ, গর্ব, বিমর্ষ ও নির্বহণ পঞ্চ প্রকার সন্ধিকে তিরস্কার করিয়া সপ্তাঙ্গে অর্থাৎ উপন্যাস, বিন্যাস, বিরোধ, সাধ্বস, সমর্পণ, নিবৃত্তি ও সংহারে বলিষ্ঠ হইয়া স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই সাতটি অঙ্গবিশিষ্ট রাজ্যশ্রীর ন্যায় পরমসুবৃত্তি যুগলে—সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

এখানেই আমরা দেখিতেছি, বিশ্বনাথের বর্ণিত ভাণিকার সাতটি অঙ্গ স্বীকার করিয়াই শ্রীরূপ 'দানকেলিকৌমুদী' প্রণয়ন করিতেছেন। সুতরাং গ্রন্থখানির উপর 'সাহিত্যদর্পণ'-এর কিছু প্রভাব অবশ্যই আছে। তবে শারদাতনয়-কৃত 'ভাবপ্রকাশন' নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব বোধ হয় অনেক বেশী। 'ভাবপ্রকাশন'-এ বলা হইয়াছে যে, ভাণিকার বিষয়বস্তু হইবে শ্রীহরির চরিত্র, ইহাতে শৃঙ্গাররস অঙ্গী, নৃত্য ও সঙ্গীত অঙ্গ হইবে এবং চতুর পরিহাস বাক্য থাকিবে। শ্রীরূপের গ্রন্থে ইহার প্রত্যেকটি রহিয়াছে।

শ্রীরূপের আখ্যানটি মৌলিক। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, বসুদেব নিজপুত্র বলরাম ও

বন্ধু-তনয় শ্রীকৃষ্ণের শান্তি কামনা করিয়া গর্গের জামাতা ভাগুরিকে দিয়া গোবিন্দকুণ্ডের তীরে এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। গুরুজনদের আদেশে ওই যজ্ঞে ঘৃত সরবরাহ করিবার জন্য শ্রীরাধা সখীগণের সহিত পথে বাহির হন। শ্রীরাধা এইভাবে যে ঘৃত বিক্রয় করিতে যাইবেন, তাহা পূর্ব হইতে জানিয়া পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই সুযোগ বুঝিয়া যথাসময়ে গোবর্ধনপর্বতের নিকট দানঘাটের রক্ষকরূপে শ্রীরাধা ও তাঁহার সহচরীদের কাছে শুল্ক দাবি করিলেন। শ্রীরাধার দলও ওই শুল্কদানে হইলেন পরাঙ্মুখ। ফলে, অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিল। অবশেষে পৌর্ণমাসী মধ্যস্থতা করিয়া যথাযোগ্য শুল্কদানের ব্যবস্থা করিলেন।

এখানে শ্রীরূপের রচনায় আমরা দেখি, শ্রীরাধা সখীগণের সহিত গোবিন্দকুণ্ডের তীরে যজ্ঞস্থলে ঘৃত উপহার লইয়া যাইতেছেন। শ্রীরূপের পূর্বে অন্য কেহ কিন্তু এই কথা বলেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি লিখিয়াছেন যে, শ্রীরাধা প্রত্যহ সখীগণের সহিত মথুরার হাটে দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-নবনী বিক্রয় করিতে যান। একদিন শ্রীরাধা এইরূপ যখন যাইতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ দানীবেশে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া শুল্ক দাবি করেন।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, দানলীলার মূল আখ্যান-চিন্তায় শ্রীরূপ তাঁহার পূর্বের পদকারদের হইতে স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন। শ্রীরূপের এই মৌলিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অনেক পদকর্তা দানলীলার পদে যজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলি যদুনাথ দাস লিখিয়াছেন—

ধেনুগণ বনে বনে ফিরয়ে আনন্দ মনে
কানাই আইলা গোবর্ধনে।
দান সাধিবার ছলে দাঁড়াইয়া তরুতলে
সুবল মধুমঙ্গলের সনে॥
ললিত ত্রিভঙ্গ হইয়া অধরে মুরলী লইয়া
রাধা বলি লাগিলা ডাকিতে।
সে ধ্বনি শুনিয়া কানে চিতে ধৈর্য নাহি মানে
গর গর সখীর সহিতে॥
গুরুগণে অনুমতি যজ্ঞস্থলে ঘৃত দিতে
আর তাহে মুরলীর ধ্বনি।
ঘৃতের পসরা মাথে রঙ্গিয়া বড়াই সাথে
বাহির হইলা বিনোদিনি॥

সহচরী সঙ্গে রঙ্গে চলু বর কামিনী
কত কত মনের উল্লাসে।
চারিদিকে নবরঙ্গিণী মাঝে ভায় ভানুনন্দিনী
শোভা নিরখে যদুনাথ হাসে॥
(মাধুরী—৩য়, পৃঃ ৩২২-৩২৩)

যদুনাথ দাসের পদটিতে শ্রীরূপের বর্ণনামতো কেবলমাত্র যে গুরুজনের অনুমতিতে শ্রীরাধা সখীগণসহ যজ্ঞস্থলে ঘৃত দিতে যাইতেছেন তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি শুনিয়াও হৃদয়ে উল্লাস বোধ করিতেছেন। শ্রীরূপের 'দানকেলিকৌমুদী'র ১৬-সংখ্যক অনুচ্ছেদে রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ সম্ভ্রমের সহিত সখাদের বলিতেছেন—ওহে সখাগণ, শীঘ্র তোমরা মহাঘট্টের অধিকার সূচিত হয় এমন শৃঙ্গ বাদ্য কর, আমিও বিম্বাধরে বংশী অর্পণ করি। এই বলিয়া সকলে তাহাই করিলেন। বংশীধ্বনির ফল আপন মনে বর্ণনা করিতে গিয়া ঐ অনুচ্ছেদেই বৃন্দা বলিয়াছেন—'বেণোরেব কলস্বনঃ.........রাধাধৈর্যধরাধরেন্দ্রদমনে দম্ভোলিরুন্মীলতি', অর্থাৎ বেণুর এই কলস্বন শ্রীরাধার ধৈর্যরূপ পর্বতরাজের দমনের জন্য বজ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। পদকর্তা কি ইহার কিছু অনুসরণেই লিখেন নাই—'সে ধ্বনি শুনিয়া কানে, চিতে ধৈর্য নাহি মানে'? পদটিতে শ্রীরূপের দ্বারা আরও প্রভাবিত হইয়া পদকর্তা সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন ইহা যেমন সত্য, তেমনি বড়ু চণ্ডীদাসের দানলীলার পদের কিছু প্রভাবে পড়িয়া বড়াইকেও আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন।

যদুনন্দন দাস 'দানকেলিকৌমুদী'র ঘটনা যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

সুন্দরি শুনহ আজুক কথা।
তাপ দূরে গেল সব ভাল হৈল
ইহা উপজিল যথা॥
অরুণ উদয়ে ব্রাহ্মণ-নিচয়ে
আইল গোকুল মাঝ।
জরতীর স্থানে করি নিবেদনে
আপন মনের কাজ॥
গোবর্ধন পাশে আমরা হরিষে
করিব যজ্ঞের কাম।
যে গোপ-যুবতি ঘৃত দিতে তথি
ইষ্ট বর পাবে দান॥

জটিলা শুনিয়া আমারে ডাকিয়া
যতন করিয়া বৈল।
বধূরে সাজাঞা গাবী-ঘৃত লৈয়া
তুরিতে তাহাঁই চৈল॥
এ সব বচনে সব সখীগণে
রাইয়ের আনন্দ হোয়।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
দরশ হইবে মোর॥
এত মনে করি অতি রসে ভরি
অঙ্গহি সুবেশ কেল।
ঘৃতের পসার সাজাঞা সত্বর
সভে মেলি চলি গেল॥
এ কথা জানিয়া সে যে বিনোদিয়া
বান্ধিয়া ত চূড়া চান্দে।
সুবলাদি লইয়া আধ পথে যাইয়া
রহল দানী ছান্দে॥
বেণুর নিসান করয়ে সঘন
বাজায় ও জয়-তুরী।
এ যদুনন্দন করে দরশন
নিবিড় আনন্দে ভরি॥ (তরু ১৩৩২)

শ্রীরূপ তাঁহার 'দানকেলিকৌমুদী'তে যেখানে গুরুজনদের আদেশের কথা সাধারণভাবে বলিয়াছেন, সেখানে কল্পনার রঙ চড়াইয়া পদকর্তা ব্রাহ্মণদের জরতীর কাছে আসিয়া যজ্ঞে ঘৃত দেওয়ার কথা বলা এবং তাহাতে সম্মত হইয়া জরতী জটিলার পক্ষে শ্রীরাধাকে অনুরোধ করার বিষয় নিপুণতাসহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সুবলাদিকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের দানী সাজিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়ানো এবং শ্রীরাধার চিত্তহরণ করিবার জন্য বেণুরব সমস্তই শ্রীরূপের বর্ণনানুগ।

গোবিন্দদাসও শ্রীরূপের দ্বারা কিছু প্রভাবিত হইয়া লিখিয়াছেন—

এই ত বৃন্দাবন পথে।
নিতি নিতি করি গতায়তে॥

হাতে করি লইয়ে যাই সোণা।
তুমি কেনা বলে কোন জনা॥
তুমি দেখি পুছহ বড়াই।
কিসের দান চাহেন কানাই॥
সঙ্গে যজ্ঞ ঘৃতের পসার।
তাহে কেনে এতেক জঞ্জাল॥
তুমি বরজ যুবরাজ।
তুমি কেনে করিবে অকাজ॥
দূর কর হাস পরিহাস।
কহতহি গোবিন্দদাস॥

(মাধুরী—৩য়, পৃঃ ৩৩৫-৩৩৬)

এই পদে বড়ু চণ্ডীদাসের প্রভাবে বড়াই আসিয়া উপস্থিত হইলেও, যজ্ঞকথায় শ্রীরূপের 'দানকেলিকৌমুদী'র প্রভাব সূচিত হইতেছে। 'দানকেলিকৌমুদী'তে শ্রীরূপের মৌলিকতার দ্বিতীয় নিদর্শন শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেক। বৃন্দা, নান্দীমুখী, চিত্রা প্রভৃতির কথার মধ্য দিয়া শ্রীরূপ ইহা পরোক্ষে বর্ণনা করিয়াছেন। ২৮১ হইতে ২৮৯-সংখ্যক অনুচ্ছেদ পর্যন্ত এই বিষয়ে ভূমিকা করা হইয়াছে, তাহার পর ২৯০ হইতে ৩১৩-সংখ্যক অনুচ্ছেদের মধ্যে সবিস্তারে অভিষেক-ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপ-বালকদের সহিত আসিয়া শ্রীরাধা ও গোপীদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া দান বা শুল্ক চাহিয়াছেন, তখন শ্রীরাধার পরামর্শমতো ললিতা বলিয়াছেন যে, তাঁহারাও গোপ-বালকদের হাত হইতে নিজেদের বৃন্দাবন রক্ষা করিবেন। বিশাখা স্পষ্টই জানাইয়াছেন, গোপবর্গ বৃন্দাবনের লতাকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া গো-চারণ করিয়াছে, বৃক্ষের ফলমূল পাড়িয়া নিজেরা আহার করিয়াছে। এইরূপ ক্ষতি আর স্বীকার করা হইবে না; হয় গোপবর্গ অন্যত্র চলিয়া যাউক, নতুবা যথোচিত কর প্রদান করুক। কথাগুলি বলা সত্ত্বেও গোপেরা যখন বৃন্দাবনের উপর শ্রীরাধার আদৌ কোন কর্তৃত্ব আছে কিনা সেই বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিল, তখন চিত্রার অনুরোধে নান্দীমুখী শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেক মহোৎসব পুনরায় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নান্দীমুখী ও বৃন্দা পর্যায়ক্রমে কথা বলিয়া সমস্ত বৃত্তান্তটি উপস্থাপিত করিলেন।

মুকুন্দের আজ্ঞানুক্রমে আকাশবাণীর ছল করিয়া বৃন্দা একদিন ভগবতী পৌর্ণমাসীকে গিয়া বলিয়াছেন, 'হে যোগেশ্বরি, আকাশবাণীর নির্দেশ, এই বৃন্দাবন রাজ্যে শ্রীরাধার অভিষেক করুন।' বৃন্দার কথা শুনিয়া পৌর্ণমাসী পাঁচজন দেবীকে আহ্বান করিলেন।

দেবকীর যে কন্যা কংসকে ভৎ'সনা করিয়াছিলেন তিনি, সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা ও ছায়া, সূর্যকন্যা যমুনা এবং মানসগঙ্গা—এই পাঁচজন দেবী উপস্থিত হইলেন। সব শুনিয়া ছায়া বলিলেন, মহীয়সী শ্রীরাধার পক্ষে ষোল ক্রোশ বিস্তৃত বৃন্দাবন-রাজ্য পরিমিত নহে, তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডাধিপত্যে অভিষিক্ত করাই সমীচীন। এই কথার উত্তরে দেবকীকন্যা অনংশা সর্ববীর্যযুক্ত বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মথুরা নগর যে শ্রেয়, আবার মথুরা অপেক্ষা বৃন্দাবন যে অধিকতর গুণান্বিত, তাহা ব্যক্ত করিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বৃন্দাবনের এক প্রদেশেই কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য রহিয়াছে। অনংশার কথায় সকলে আনন্দিত হইলেন। অতঃপর যমুনা জানাইলেন, ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী দিব্য-পেটিকা লইয়া পৌর্ণমাসীর আহ্বানের অপেক্ষা করিতেছেন। পৌর্ণমাসী মুহূর্তে নিজ কর্তব্য বুঝিয়া সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন। সরস্বতী উপস্থিত হইয়া পেটিকা খুলিয়া বলিলেন যে, ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী পদ্মমালা, ইন্দ্রজায়া শচী স্বর্ণ-সিংহাসন, কুবের-গৃহিণী ঋদ্ধি রত্নালঙ্কার, বরুণপ্রিয়া গৌরী ছত্র, পবনপত্নী শিবা চামরদ্বয়, অগ্নির ভার্যা স্বাহা বস্ত্র-দুইখানি এবং যমজায়া ধূমোর্ণা মণিদর্পণ সানন্দে তাঁহাকে (সরস্বতীকে) দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।

ইহার পর স্বর্গের বাদ্যধ্বনি আকাশমণ্ডলকে গম্ভীর করিয়া তুলিল। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বেরা মেঘান্তরালে গান ধরিল, অপ্সরারা মাতিয়া উঠিল নৃত্যচ্ছন্দে। এই সমস্তের মধ্যে দেবীরা শ্রীরাধার অভিষেক উৎসব সুরু করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতেই দেবীরা পৌর্ণমাসীর নির্দেশমতো সখীদের চারিপাশে রাখিয়া শ্রীরাধাকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। তাহার পর স্বর্গের মহৌষধি রসামৃতে মণিকুম্ভগুলি পূর্ণ করিয়া তাহা দিয়া তাঁহারা শ্রীরাধার অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অভিষেকের ফলে শ্রীরাধা পাইয়াছিলেন বৃন্দাবন-রাজ্যের আধিপত্য।

যমুনা তাঁহার মায়ের-দেওয়া সৌগন্ধিক মালা উপহার দিতে চাহিলে, দেবকীকন্যা তাহা লইয়া শ্রীকৃষ্ণের গলায় পরাইয়া দিলেন। ইহাতে যমুনা প্রতিবাদ করায়, অনংশা তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত ভুল সংশোধন করিয়া লইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের গলা হইতে মালা খুলিয়া শ্রীরাধার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। সূর্যপুত্রী যমুনা সকৌতুকে বলিলেন যে, একবার যে মালা কঠিন হৃদয়ের সঙ্গলাভ করিয়াছে, তাহাতে আর প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিয়া যমুনা শ্রীরাধার গলা হইতে মালাটি লইয়া আবার শ্রীকৃষ্ণকে পরাইয়া দিলেন। দেবকীকন্যা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল হইতে মৃগমদ আহরণ করিয়া শ্রীরাধার কপালে তিলক আঁকিয়া দিলেন। ভগবতী পৌর্ণমাসী সানন্দে বৃক্ষ, বিহঙ্গ ও পশুকুলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তাহারা অসঙ্কোচে বিকশিত হইতে বা বিচরণ করিতে পারে; কেননা, শ্রীরাধা সখীরূপ সেনাপতিদের লইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বৃন্দাকে করিয়াছেন অমাত্য।

শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেকে কুন্দলতা শত শত উৎকণ্ঠা ধারণ করিলেন, চিত্রা স্তন ও কপোলে আঁকিলেন তিলক, নূতন মালায় সজ্জিত হইয়া ললিতা হাস্ত করিতে লাগিলেন। আরও চম্পকলতার ন্যায় বিশাখা অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

যমুনা বলিয়াছিলেন, তাঁহার তীর-স্থিত কাননে এইবার স্বচ্ছন্দে ফুল তুলিবেন ললিতা। দেবকীকন্যা তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ফুলগুলি মাধবেরও অধীন।

যাহা হউক, শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেকে দেবকীকন্যা তিলক দিয়াছিলেন, শনির জননী ছায়া শ্রীরাধার চূড়া বন্ধন করিয়াছিলেন, ত্বষ্টার নন্দিনী সংজ্ঞা চুল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সখীরা শ্রীরাধাকে নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়াছিলেন। যমুনা শ্রীরাধার গায়ে চামর ঢুলাইতেছিলেন এবং সরস্বতী মাথায় ধরিয়াছিলেন মণিচ্ছত্র।

শ্রীরূপের বর্ণিত শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেক এখানে এত বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করার অর্থ এই যে, আমরা দেখাইতে চাহিতেছি, শ্রীরূপ এই বিষয়ে কোনরকমে একটি মৌলিক পরিকল্পনা করিয়াই দায়িত্ব শেষ করেন নাই, পরিকল্পনাটিকে সুন্দর ও সঙ্গত ভাষায় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরাধার এই রাজ্যাভিষেক বর্ণনায় শ্রীরূপের অসামান্য কবিত্বও প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহার প্রভাবে পরবর্তী কালের কিছু কিছু বৈষ্ণব পদ গড়িয়া উঠিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের পদকর্তা মোহন লিখিয়াছেন—

একদিন সুন্দরি রাই সুনাগরি
সব সহচরিগণ সঙ্গ।
শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ নিকেতনে
বৈঠল কৌতুক রঙ্গ॥
তহিঁ পুন ভগবতি পৌর্ণমাসী দেবি
ব্রজ-বনদেবিনি সাথ।
রাইক শুভ অভি- ষেক করণ লাগি
আওল উলসিত গাত॥
কত শত ঘট ভরি বারি সুবাসিত
তাহি করল উপনীত।
দধি ঘৃত গোরস কুঙ্কুম চন্দন
কুসুম হার সুললীত॥

বাস ভূষণ উপ- হার রসায়ণ
আনল কত পরকার।
রতন-বেদি পর বৈঠল শশিমুখি
সখিগণ দেই জয়কার॥
শ্রীবৃন্দাবন ভূমীশ্বরি করি
ভগবতি করু অভিষেক।
চৌদিকে জয় জয় মঙ্গল কলরব
আনন্দে মোহন দেখ॥
(তরু ১৫৮১)

'দানকেলিকৌমুদী'র বর্ণনার আদর্শেই মোহনের পদেও ভগবতী পৌর্ণমাসী ও ব্রজবন-দেবী অর্থাৎ বৃন্দা শ্রীরাধাকে অভিষিক্ত করিবার বিষয়ে প্রথমে উদ্যোগী হইয়াছেন। পদকার বিভিন্ন বসন-ভূষণের কথাও আনিয়াছেন, কিন্তু মাধুর্যের হানি হইতে পারে এইরূপ ভয়েই বোধ করি শ্রীরূপ-বর্ণিত দেবীদের কথা উপস্থাপিত করেন নাই।

নারায়ণ দাসের রচিত দীর্ঘ একটি পদে শ্রীরূপের রচনার আনুগত্য অধিকতর সুস্পষ্ট—

সিংহাসনে লইয়া রাধিকা বসাইয়া
সব বৃন্দাবন প্রজা।
অভিষেক করি তিলক সঞ্চারি
রাই বৃন্দাবনে রাজা॥
সিংহাসনোপরি রাধিকা সুন্দরী
সভাই আনন্দে দেখে।
অষ্টোত্তর শত ঘট তীর্থোদক
সারি সারি সব রাখে॥
দেখে একমনে গন্ধর্বের গণে
গাইছে মঙ্গল গীত।
নানা ভঙ্গি করি স্বর্গে বিদ্যাধরী
নৃত্য করে মনোনীত॥

শচী তিলোত্তমা যত দেবাঙ্গনা
জয় জয় ধ্বনি করি।
দেব পুষ্প যত গন্ধে পারিজাত
ডারয়ে রাইয়ের উপরি ॥
শঙ্খ করতালি মহরি মুরলী
মুরুজ দুন্দুভি বাজে।
পাখোয়াজ মৃদঙ্গ বীণা উপাঙ্গ
মধুর সুন্দর গাজে ॥
আনন্দিত হৈয়া সখিগণ লৈয়া
বিশাখা তুরিত যাঞা।
সুপক তৈলেতে নানা গন্ধ তাতে
সুন্দর হরিদ্রা দিঞা ॥
দশবাণ সোণা নহে যে তুলনা
রাই কলেবর শোভা।
গন্ধদ্রব্য দিয়া মার্জন করিয়া
অতি আনন্দিত লোভা ॥
হেমেতে খেচনি পদ্মরাগমণি
তাহার পিঠের উপরি।
অভিষেক লাগি সভে অনুরাগী
বেদি রহে সারি সারি ॥
কোকিলিনীগণ গায় মনোরম
ময়ূর নাচিছে রঙ্গে।
ভ্রমরা ঝঙ্কৃতি করে নানা ভাতি
ভ্রমরিণীগণ সঙ্গে ॥
সুগন্ধি সহিত বহিছে মারুত
কুসুমিত লতাগণ।
রাই রাজা হবে ইহা কহি সভে
অতি আনন্দিত মন ॥

তবে পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণী আসি
কনক কলস হাতে।
জয় জয় স্বরে অভিষেক করে
ঘন সহস্র ধারাতে॥
ললিতা তখন সুচেলি বসনে
আনন্দে শ্রীঅঙ্গ মোছে।
রক্তপাট সাড়ি সুবর্ণের পাড়ি
পরাইতে বিচিত্র কোচে॥
নীলিম বসনে অতি মনোরমে
করি উবটন বাস।
স্বর্ণ সিংহাসনে বসিলা আপনে
সুখে মৃদু মন্দ হাস॥
নানা আভরণে আনি দাসীগণে
বেশ লাগিল করিতে।
মাল্য গন্ধযুত নানা ভাঁতি কত
দেই আনন্দে হিঁয়াতে॥
একা নাসা ভাতা (?) শ্যামলা দেবতা
তার বক্ষের চন্দনে।
ভগবতী লইয়া রাজটীকা দিয়া
রাই রাজা বৃন্দাবনে॥
এসব দেখিয়া আনন্দিত হইয়া
সব সখিগণ হাসে।
শ্রীজগদানন্দ ভাবি পদদ্বন্দ্ব
কহে নারায়ণ দাসে॥

(মাধুরী—৩য়, পৃঃ ৪৪৭-৪৪৮)

প্রথমতঃ, এই পদে শ্রীরূপের রচনা অনুসরণ করিয়াই পদকর্তা লিখিয়াছেন যে, শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেকের সময় সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত, গন্ধর্বেরা মঙ্গলগীত করিতেছে, বিদ্যাধরী অর্থাৎ অপ্সরারা নাচিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরূপের বর্ণনায় শচী প্রভৃতি

দেবীদের কথা থাকায়, পদকর্তা তাহা একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, শচী, তিলোত্তমা প্রভৃতি দেবাঙ্গনারা সোল্লাসে জয়ধ্বনি দিতেছেন। তৃতীয়তঃ, শ্রীরূপের অনুসরণক্রমেই পদকর্তা তাঁহার পদটির মধ্যে ললিতা, বিশাখাদির প্রসঙ্গ আনিয়াছেন, তবে 'দানকেলিকৌমুদী' অনুসারে প্রত্যেকের কাজ নির্দিষ্টরূপে রাখেন নাই। চতুর্থতঃ, 'দানকেলিকৌমুদী'তে যে বর্ণনা রহিয়াছে দেবকীকন্যা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ হইতে চন্দন লইয়া শ্রীরাধার কপালে তিলক অঙ্কন করিলেন, পদকর্তা তাহাও অনুসরণ করিয়াছেন; তবে তিনি দেবকীকন্যার স্থলে পৌর্ণমাসীকে দিয়া কাজটি সম্পাদন করাইয়াছেন। এইগুলি পদটির উপর শ্রীরূপের রচনার প্রভাব কতখানি পড়িয়াছে, তাহারই পরিচায়ক। কিন্তু এমন প্রভাব সত্ত্বেও পদকর্তার মৌলিকতা ও কবিকুশলতা বড় কম নহে। রাজ্যাভিষেকের স্থানে দেবীদের না আনিয়া, সখীদের দিয়া অতি মধুর ঘরোয়াভাবেই যেন পদকর্তা অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছেন। প্রাকৃতিক পটভূমি-বর্ণনায় পদকর্তার অসামান্য কবিত্বের পরিচয় আছে।

শ্রীরূপের পরিকল্পনাটি অবলম্বন করিয়া কল্পনার বৈভব-বিস্তারে আরও যেন অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন পদকর্তা বংশীদাস। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

কোটাল হইল শ্যাম মুরলীবদন।
রাধিকা রাজার জয় দেয় ঘনেঘন॥

(মাধুরী—৩য়, পৃঃ ৪৪৯)

শ্রীরূপ:শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে এমনভাবে রাই রাজার কোটাল করিয়া দেন নাই।

'দানকেলিকৌমুদী'তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাশাখেলার বর্ণনায় শ্রীরূপের মৌলিকতার তৃতীয় পরিচয় সুব্যক্ত। ভাণিকাটির ২৬৭ হইতে ২৬৮-সংখ্যক অনুচ্ছেদের মধ্যে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, সুবল সখীদের নিকট হইতে দান অর্থাৎ শুল্করূপ পাঁচটি স্বর্ণকলস একা আহরণ করিতে পারিতেছেন না শুনিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নামে সুবল, কিন্তু কাজে দুর্বল বলিয়া রসিকতা করিলেন। তাহার উত্তরে সুবল বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের মধ্যে কেবল বলের দর্প প্রকাশিত, তাঁহার বিক্রম ভালভাবেই জানা গিয়াছে, কেননা একদিন শ্রীরাধার সহিত তিনি পাশা খেলিতে বসিলে ললিতা তাঁহার প্রিয়সখীর মিথ্যা জয় ঘোষণা করিয়া মুরলী কাড়িয়া লইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেক্ষেত্রে কিছুই প্রতিকার করিতে পারেন নাই। অবশ্য, পরে তিনি কৌস্তুভমণি গোপন করিয়া গোপাঙ্গনাদের কটাক্ষে ভীষণ ভয় পাইয়াছিলেন।

কেবলমাত্র 'দানকেলিকৌমুদী'তেই নহে, 'স্তবমালা'র 'উৎকলিকাবল্লরিঃ' (শ্লোক

৫৩) প্রভৃতির মধ্যেও শ্রীরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাশাখেলার কথা এবং ওই খেলায় শ্রীরাধার জয়লাভের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপের এই মৌলিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরবর্তী কালে কিছুসংখ্যক বৈষ্ণব পদ রচিত হইয়াছে। অকিঞ্চন দাস লিখিয়াছেন—

নিকুঞ্জ মন্দির ঘরে ধরি কিশোরীর করে
কহিছেন রসময় হরি।
বিশাখাকে কহে ডাকি পাশা আন প্রাণসখি
রাই সঙ্গে খেলাইব সারি॥
ললিতা কহয়ে হাসি হারিলে লইব বাঁশী
রাই দিবে গজমোতি হার।
হাসিয়া কহেন হরি আমি যদি জিনি সারি
রাই চুম্ব দিবে শতবার॥
শুনিয়ে শ্যামের কথা কহিছে চম্পক লতা
থাক বন্ধু ভরমে সরমে।
কহিবার কথা নয় রায়ের যদি জয় হয়
যা করিব তাহা আছে মনে॥
পরিহাস হাস্যরসে মুখানি ঝাঁপিয়ে বৈসে
রাই সারি দিল খেলাইয়া।
রাই ফেলে দশ চারি ললিতা চালায় সারি
জয় জয় আনন্দিত হইয়া॥
হাসিয়া হাসিয়া হরি করেতে লইলা সারি
পাশাতে পড়িল তিন বিন্দু।
নাগরের মুখ হেরি হাসে যত ব্রজনারী
হারিলে হারিলে শ্যামবন্ধু॥
এক সখী হাসি হাসি কাড়িয়া লইল বাঁশী
করতালি সবাই বাজায়।
অকিঞ্চন দাসে কয় রাধার হইল জয়
গোপীর অধীন শ্যামরায়॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ১০৩৮)

এই পদের সুরসিক পাঠকদের কি বলিয়া দিতে হইবে যে, শ্রীরূপের আদর্শেই এখানেও শ্রীরাধার জয় ঘোষিত হইয়াছে, সখী শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী কাড়িয়া লইয়াছেন। সখীটি যে কে, তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝি। তিনি শ্রীরূপের বর্ণিত ললিতা ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

শ্রীরূপের কল্পনাভূমিতে বিচিত্র রঙের তুলি বুলাইয়া অজ্ঞাতনামা কোন পদকর্তা চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন—

রাই কানু পাশা খেলে নিজ চিত্ত কুতূহলে
পণ কৈলে সুরঙ্গ রঙ্গিণী।
পহিলে গোবিন্দ জিনে বটু আনন্দিত মনে
বাঁধন সে রঙ্গিণী হরিণী॥

যুব-দ্বন্দ্ব খেলে পুন মুরলী শারিকা পণ
দ্বিতীয়ে জিতল সুবদনী।
আনন্দে ললিতা খেলে কৃষ্ণকর হৈতে লয়ে
লুকায়ে রাখয়ে বংশী আনি॥

কৃষ্ণরাধা পুনর্বার খেলে পুন দুহুঁ হার
হেনকালে বটু মিথ্যা করি।
কৃষ্ণ উপদেশ দান জিনিবার অধিষ্ঠান
কহে কৃষ্ণ মার এই সারি॥

কলোক্তি শারিকা শুনি ভয়ে কহে দৈন্যবাণী
বৃক্ষশাখা আগে উড়ি যায়।
রাইকানু তাহা দেখি সকৌতুকে হইয়া সুখী
হাসে দুহুঁ আনন্দ হিয়ায়॥

চতুর্থে রাখিল পণ নিজ সহচরগণ
রাধিকার জয় অনুমানি।
বটু সশঙ্কিত হৈয়া চালে পাশা ভয় পাঞা
গোবিন্দের হীন দান জানি॥

জিনিল জিনিল বলি এক পাশা কৈল চুরি
দেখি ক্রোধ করি সখীগণে।
বটুর বন্ধন কাজে সব সখীগণ সাজে
অত্যন্ত কলহ তার সনে॥

(মাধুরী, ৩য়—পৃঃ ২৯৯-৩০০)

শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাশাখেলায় এইরূপ একের পর এক পণ রাখিয়া যাওয়া মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের অক্ষক্রীড়াকে স্মরণ করাইয়া দেয় না কি? যাহা হউক, পদটির মধ্যে শ্রীরূপের রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব বলিতে কেবলমাত্র পাশাখেলার অনুষ্ঠানেই নহে, শ্রীকৃষ্ণকর হইতে ললিতার বাঁশী কাড়িয়া লওয়াকেও গণ্য করা যায়। এই পদে প্রত্যক্ষ প্রভাবের তুলনায় পরোক্ষ প্রভাবও বড় কম নহে। বটুকে আনিয়া যে রঙ্গরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে শ্রীরূপের গ্রন্থাদি পাঠের ফলশ্রুতি। এই বটু আর কেহ নহেন, 'বিদগ্ধমাধব'-এর মধুমঙ্গল স্বয়ং।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত পদাবলীসাহিত্যে 'দানকেলিকৌমুদী'র যে প্রভাবের কথা বলিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ ঘটনাগত। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলা বোধ হয় অসমীচীন হইবে না যে, 'দানকেলিকৌমুদী'র প্রায় কোন শ্লোক লইয়াই পদকারগণ পদ রচনায় ব্রতী হন নাই। কেবল একটিমাত্র শ্লোকের অনুসরণে ঘনশ্যাম কবিরাজ যে সুন্দর পদটি রচনা করিয়াছেন, আমরা তাহা 'উজ্জ্বলনীলমণি'র আলোচনা-প্রসঙ্গে মূল শ্লোকসহ উদ্ধৃত করিব।

দানলীলা-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ শ্রীরাধার যে কিলকিঞ্চিতভাব হইয়াছে বলিয়াছেন (দানকেলিকৌমুদী, অনু—১), তাহার অর্থ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে একই সঙ্গে গর্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সাতটি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবের দ্বারা ত বটেই, এমনকি 'কিলকিঞ্চিত' শব্দটির দ্বারাও প্রভাবিত হইয়া রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন—

গরবহি সুন্দরী চলল আনপথ
নাগর পন্থ আগোর।
কহতহি বাত দান দেহ মঝু হাত
আন ছলে কাঁচলি তোড়॥
অপরূপ প্রেম তরঙ্গ।
দান-কেলি-রস কলিত মহোৎসব
বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ॥

অলপ পাটল ভেল অথির দৃগঞ্চল
তহি জলকণ পরকাশ।
ধুনাইতে ভ্রূধনু পুলকে পূরল তনু
অলখিত আনন্দ হাস ॥
ঐছন হেরি চকিত পুন তৈখন
বাহুড়ল পদ দুই চারি।
রাধা মাধব দুহুঁ কর পদতলে
রাধামোহন বলিহারি ॥

(মাধুরী—৩য়, পৃঃ ৩৩৬-৩৩৭)

॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রভাব ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভগবৎ-তত্ত্বচিন্তা ও রস-পরিকল্পনা একটি বিধিবদ্ধ পথে যাহাতে পরিচালিত হয়, তাহার জন্যই শ্রীরূপ ১৪৬৩ শকাব্দে বা ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা করেন। ২১৪১টি শ্লোক-সম্বলিত এই বৃহদায়তন গ্রন্থের পত্রপুটে শ্রীরূপ উত্তমা ভক্তি; সাধন, ভাব ও প্রেমভেদে তিন প্রকার শুদ্ধাভক্তি; ভক্তিরসের আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব; সপরিকর ভক্তির বৈশিষ্ট্য; পঞ্চ প্রকার রস; রসমিশ্রণ এবং তিন প্রকার রসাভাসের স্বরূপ-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেন। তত্ত্বচিন্তা ও ভজনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভক্তি-লক্ষণ কাজে লাগিলেও, পদাবলীসাহিত্যের আসরে রসেরই আনাগোনা। সুতরাং সেখানে ভক্তি-লক্ষণগুলির প্রভাব খোঁজার প্রয়োজন নাই। রসমিশ্রণ ও রসাভাস সম্বন্ধে অনুরূপ কথাই বলিতে হয়।

অতঃপর আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি রসের আলোচনার মধ্যে সীমিত হইয়া আসিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারতে শান্ত-ভক্তিরসকেই অঙ্গীরস হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তাহাতে অপূর্ণতা বোধ করিয়া (ভা ১।৪।২৯-৩০) নারদের উপদেশে তিনি অখিল রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনে শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতের (১০।৪৩।১৭) কংসরঙ্গ-প্রসঙ্গে ভাবার্থদীপিকায় প্রীত-ভক্তিরসকেই (দাস্যরসকে) 'সপ্রেমভক্তিক' রসোত্তম বলিয়াছেন। শ্রীনামকৌমুদীর লক্ষ্মীধর দাস্যরসকে সামান্যভাবে অর্থাৎ বিশেষ

নামকরণ বিভাব প্রভৃতি প্রদর্শন না করিয়াই রসরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুদেব প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ শান্তরসরূপে প্রীতরস বা দাস্তরসই বর্ণনা করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, 'মুক্তাফল'-কার বোপদেব, হেমাদ্রি প্রভৃতি রসজ্ঞেরা শান্ত-রসকে ভক্তিরসের স্থান দিয়াছেন। পূর্বের আচার্যদের এইরূপ রস বিশ্লেষণ লক্ষ্য করিয়া শ্রীরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত (৩।২৫।৩৮) 'যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্' ইত্যাদি কপিলদেবের শ্লোকটি হইতে শান্ত প্রভৃতি পাঁচটি মুখ্য রতিকে নিত্য স্থায়িভাবের সূত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই পাঁচটি হইতে যে পঞ্চ প্রকার রসের উৎপত্তি হয়, সেইগুলির পূর্ণ বিশ্লেষণ ও পর্যাপ্তি দেখাইয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী পঞ্চ প্রকার রস স্বীকার করিলেও, আমরা দেখি, শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী বৃন্দাবনে শান্তরসের বিশেষ কোন স্থান নাই; কারণ সেখানে তরুলতা প্রভৃতিও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে মমতাযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের দাসগণও নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দমহারাজের ভৃত্য বলিয়া জানেন, সুতরাং নন্দদুলালের সহিত তাঁহাদের ব্যবহার সখার ন্যায়। এই সমস্ত কারণেই বৃন্দাবন-লীলায় শান্ত ও দাস্য রস বাদ পড়িয়াছে। বৈষ্ণব পদকারগণও তাই এই দুইটি রস লইয়া পদ লিখেন নাই। আমরা সেইজন্য এই অধ্যায়ে সখ্য ও বাৎসল্য রসের সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং প্রসঙ্গক্রমে পদাবলী-সাহিত্যের উপর তাহাদের প্রভাব নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিব। মধুররসের আলোচনার প্রয়োজন নাই; কারণ তাহা 'উজ্জ্বলনীলমণি'র আলোচনা-প্রসঙ্গে সবিস্তারেই করা হইবে। শ্রীরূপ সংখ্যরসকে প্রেয়োরস বলিয়াছেন। এই রসের সংজ্ঞা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

> স্থায়ী ভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ।
> নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রস প্রেয়ানুদীর্যতে॥
>
> (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৭০৮)

অর্থাৎ—স্থায়ী ভাব নিজের অনুরূপ বিভাবাদি দিয়া সৎব্যক্তির মনে সখ্যরসকে পুষ্ট করিয়া তুলিলে উহা প্রেয়োরসরূপে কীর্তিত হয়। এই প্রেয়োরসের আলম্বন শ্রীহরি ও তাঁহার সখাগণ। আলম্বন প্রভৃতি সম্পর্কে মূলতঃ শ্রীরূপকে অনুসরণ করিয়াও 'প্রেয়োভক্তিরসার্ণব'-কার নয়নানন্দ কিছু অগ্রসর হইয়া লিখিয়াছেন—

> বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ সখ্যরসে হন।
> আশ্রয়াবলম্বন সখা বয়স্যের গণ॥
>
> (প্রেয়োভক্তিরসার্ণব, পৃঃ ১৫)

নয়নানন্দ বিষয়াবলম্বন শ্রীকৃষ্ণ আবার কোথায় কি রূপে থাকেন, তাহা শ্রীরূপানুসরণে ছন্দানুবন্ধে লিখিয়াছেন—

তাহে হরি আলম্বন সর্বগুণযুত।
ব্রজপুরে ভগবান দ্বিভুজ খেয়াত ॥
যেন নবঘনশ্যাম ইন্দ্রনীলমণি।
বরণ রমণ অতি সুমোহন জানি ॥
মুখে মৃদু হাস অতি কুন্দধবল।
নয়ন কটাক্ষযুক্ত শোভিত কজ্জল ॥
স্বর্ণকেতকী জিতি বসন অতিশোভা।
বনমালা বনধাতু মুনি মনোলোভা ॥
বেণু-রঞ্জিত মুখ, করে গোঠ-পয়ান।
হরয়ে সখার মন দিয়া বেণু শান ॥

(প্রেয়োভক্তিরসার্ণব, পৃঃ ১৫)

মথুরা বা দ্বারকায় এই শ্রীহরির রূপ অন্যপ্রকার। শ্রীরূপের 'চঞ্চৎ কৌস্তুভকৌমুদী-সমুদয়ং কৌমোদকীচক্রয়োঃ' ইত্যাদি শ্লোকের অনুসরণে নয়নানন্দ লিখিয়াছেন—

সখ্যে কৃষ্ণ আলম্বন—এই রূপে হন।
মথুরা দ্বারকাপুরে শুন বিবরণ ॥
নবজলধর বর্ণ পাঞ্চজন্য ধরে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম নানায়ুধ করে ॥
চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ রূপে হয়ে আলম্বন।
পীতবাসা কৌস্তুভধারী ভুবনমোহন ॥
সর্বগুণ-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
সখ্যে কৃষ্ণগুণ কহি, কর অবধান ॥

(প্রেয়োভক্তিরসার্ণব, পৃঃ ১৫)

সখ্যরসের আলম্বন শ্রীহরির লীলাস্থলী অনুসারে এই যে দুইটি রূপের কথা শ্রীরূপ বলিয়া দিলেন, তাহাতে আমরা দেখি, মাধুর্যপরায়ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীহরির ঐশ্বর্য-ভাবশূন্য দ্বিভুজ মূর্তিই সাধনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়াছেন। পদকর্তৃগণও সখ্যরসের পদ লিখিতে গিয়া কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভুজরূপে কল্পনা করেন নাই।

দ্বিতীয় প্রকার আলম্বন সখাদের প্রসঙ্গে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

রূপবেশগুণাদ্যৈস্তু সমাঃ সম্যগযন্ত্রিতাঃ।
বিশ্রম্ভ সংভৃতাত্মানো বয়স্যাস্তস্য কীর্তিতাঃ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৭১০-৭১১)

অর্থাৎ—রূপ, গুণ ও বেশে যাঁহারা সমান, দাসের মতো যন্ত্রণা যাঁহাদের নাই এবং যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহাদিগকেই বয়স্য বা সখা বলে।

শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট সখার কিছু বৈশিষ্ট্য মনে রাখিয়াই কোন অজ্ঞাতনামা পদকার লিখিয়াছেন—

আজু বন বিজই রাম কানু।
আগে পাছে শিশু ধায় লাখে লাখে ধেনু॥
সমান বয়েস বেশ সমান রাখাল।
সমান হৈঁ হৈ রবে চালাইছে পাল॥ (তরু ১১৯১)

এই সখাদের শ্রীরূপ ব্রজ ও পুর সম্বন্ধে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, অর্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী ও শ্রীদাম ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের পুর-সম্বন্ধীয় সখা। ব্রজ-সম্বন্ধীয় সখাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া শ্রীরূপ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বাংলা অর্থ এইরূপ—যাঁহারা ক্ষণকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দেখা না পাইলে অত্যন্ত দুঃখিত হন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্বদাই বিহারে রত এবং শ্রীকৃষ্ণগত প্রাণ, সেই সব ব্রজবাসীরাই শ্রীকৃষ্ণের সখা। এই জাতীয় সখা আর সকল সখা হইতে প্রধান।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শ্রীরূপ ব্রজলীলার সখাদের পক্ষপাতী; শ্রীরূপের অনুমত আদর্শ লইয়া চলিয়াছেন বলিয়া পদকর্তৃগণ তাঁহাদের সখ্যরসের পদাবলীতে ব্রজের সখাদের কথাই লিখিয়াছেন। ভুলক্রমেও তাঁহারা পুরলীলার সখাদের লইয়া লিখেন নাই।

ব্রজলীলার সখাদের শ্রীরূপ চারি শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন—সুহৃদ, সখা, প্রিয়সখা, প্রিয়নর্মসখা।

'তত্র সুহৃদঃ' বলিয়া শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

বাৎসল্যগন্ধিসখ্যাস্তু কিঞ্চিত্তে বয়সাধিকাঃ।
সায়ুধাস্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষাপরায়ণাঃ॥
সুভদ্রমণ্ডলীভদ্র-ভদ্রবর্ধনগোটাঃ।
যক্ষেন্দ্রভট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র মহাগুণাঃ
বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সুহৃদস্তস্য কীর্তিতাঃ॥
(সিন্ধু, পৃঃ ৭২১)

অর্থাৎ—যাঁহারা সুহৃদ, তাঁহাদের সখ্য বাৎসল্যগন্ধ-বিশিষ্ট ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা বয়সেও কিছু বড়, অস্ত্র ধারণ করেন এবং সর্বদা দুষ্টদের হাত হইতে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁচান। শ্রীকৃষ্ণের এই রকম সুহৃদ্ সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র।

শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—'সুহৃৎসু মণ্ডলীভদ্র বলভদ্রৌ কিলোত্তমৌ', অর্থাৎ সুহৃদদের মধ্যে মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র অবশ্যই উত্তম। শ্রীরূপের এই কথাটি স্মরণে রাখিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ ; সেইজন্য তাঁহারা পদাবলী-সাহিত্যে সুহৃদদের মধ্যে একমাত্র বলভদ্র বা বলরামকে রূপায়িত করিয়াছেন। শ্রীরূপের নির্দেশমতো এই বলরাম সুহৃদ, সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়সে বড় এবং বিপদে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিতে পারেন। বোধ করি এই চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়াই কোন অজ্ঞাতনামা পদকার যশোমতীর আর্তি বুঝাইতে লিখিয়াছেন—

হের আয়রে বলরাম হাত দে মোর মাথে।
ধড় রাখিয়া প্রাণ দিয়ে তোর হাতে ॥
আর এক কথা কহি শুন হলধর।
যশোদার বালক বলি না ভাবিহ পর ॥
যাচিয়া নবনী দিহ নিকটে রাখিবে।
বেলি অবসান হৈলে সকালে আসিবে ॥ (তরু ১১৮৮)

এত রাখাল-বালকের মধ্যে কেবলমাত্র বলরামের হাতেই যশোমতী শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিতেছেন কেন ? শুধু ছাড়িয়া দেওয়া নহে, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠকালীন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও যশোমতী বলরামের উপর দিতেছেন। এই সমস্তই সম্ভব হইয়াছে বলরাম যথার্থ সুহৃদ বলিয়া।

সখা সম্বন্ধে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়সে ছোট, দাস্যগন্ধী সখ্যরস যাঁহাদের মধ্যে বর্তমান তাঁহাদিগকেই সখা বলে। এই সখা—বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমপীড়, মণিবন্ধ ও করন্ধম। শ্রীকৃষ্ণের সেবা বিষয়েই এই সখাদের একমাত্র অনুরাগ। শ্রীরূপের এই কথা পদকর্তৃগণ মনে রাখিয়া চলিয়াছেন ; সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাখাল-বালকদের ক্রীড়াবিলাসাদিবহুল সখ্য-রসের পদে এই সখাদের আনিয়া উপস্থিত করেন নাই।

ব্রজলীলার তৃতীয় প্রকার বয়স্য বা সখা—প্রিয়সখা। এই প্রিয়সখা সম্বন্ধে শ্রীরূপ বলিয়াছেন—যাঁহাদের বয়স সমান এবং সখ্যকেই যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই

প্রিয়সখা। প্রিয়সখাদের নাম—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক। ইহারা বিভিন্ন রকম ক্রীড়া-কৌতুকে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করেন। প্রিয়সখাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীদাম।

শ্রীরূপের নির্দিষ্ট প্রিয়সখাদের নাম ও লক্ষণ পদকর্তৃগণ মনে রাখিয়াই পদ লিখিয়াছেন, সেইজন্য সখ্যরসের অধিকাংশ পদে শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতির নামের উল্লেখ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর পদকর্তা বলরাম দাস শ্রীদামকে রীতিমতো প্রাধান্য দিয়া কতকগুলি পদ লিখিয়াছেন। আমরা এখানে দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া।
মাথামাথি রণ করে শ্রমযুত হইয়া॥
প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ॥
আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে।
সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সভারে॥
মলিন হইল কানাই মুখখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সভাকার॥
বেলি অবসান হইল চল ঘরে যাই।
কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই॥ (তরু ১২০৬)

(২) পাল জড় কর শ্রীদাম শান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মায় পথ পানে চাইয়া॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরামদাস কহে শুনি কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে দ্রুত রোল॥ (তরু ১২০৭)

দেবকীনন্দন 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় বলরাম দাসকে 'সঙ্গীত-কারক বন্দো বলরামদাস, নিত্যানন্দচন্দ্রে তাঁর অকথ্য বিশ্বাস' বলিয়াছেন। নিত্যানন্দের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা-সম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে শ্রীরূপের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কালক্রমের দিক দিয়া অসম্ভব নহে।

সখাগণের চতুর্থ প্রকার—প্রিয়নর্মসখা। শ্রীরূপ বলিয়াছেন যে, ইহারা পূর্বের তিন প্রকার সখা হইতে শ্রেষ্ঠ, বিশেষ ভাবশালী এবং অতিশয় রহস্তপরায়ণ। ইহাদের নাম—সুবল, অর্জুন, বসন্ত ও উজ্জ্বল। প্রিয়নর্মসখাদের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বল প্রধান।

শ্রীরূপের পূর্ব হইতেই সুবলকে সখারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে এইরূপ প্রিয়নর্মসখা করিয়া তোলা শ্রীরূপের মৌলিক অবদান। শ্রীরূপের পর হইতে পদকর্তৃগণ সখ্যরসের পদে, শ্রীকৃষ্ণলীলার অন্তবিধ পদেও, যেখানেই সুবলের ভূমিকা আনিয়াছেন, সেইখানে তাঁহাকে প্রিয়নর্মসখারূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, বলরাম দাসের একটি পদে রহিয়াছে—

আমরা ফিরাইতে ধেনু তাহা নাহি দেয় কানু
সদা ফিরে সুবলের পাছে।
সুবলে করিয়া কোলে প্রেমে গদগদ বোলে
না জানি মরম কিবা আছে॥
কিবা লীলা করে এহ বুঝিতে না পারে কেহ
অপরূপ চরিত বিহরে।
বলরাম দাস ভণে বলাই দাদা নাহি জানে
আনে কিবা বুঝিবে অন্তরে॥ (তরু ১২১৩)

সখ্যরসের উদ্দীপন বিভাব বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

উদ্দীপনা বয়োরূপ শৃঙ্গবেণুধরা হরেঃ।
বিনোদ নর্ম বিক্রান্তি গুণাঃ প্রেষ্ঠজনাস্তথা।
রাজ-দেবাবতারাদি-চেষ্টানুকরণাদয়ঃ॥
(সিন্ধু, পৃঃ ৭৩৫)

অর্থাৎ—শ্রীহরির বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ; আরও বিনোদ, পরিহাস, পরাক্রম প্রভৃতি গুণ, প্রিয়জন এবং রাজা, দেবতা, অবতার প্রভৃতির ন্যায় চেষ্টা—এইগুলিকেই সখ্যরসের উদ্দীপন বলে।

শ্রীরূপ শ্রীহরির বয়স-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইহা তিন প্রকার। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কৌমার, দশ বৎসর পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর। গোকুলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কৌমার ও পৌগণ্ড বয়স এবং দ্বারকাপুর ও গোকুল উভয়ক্ষেত্রেই কৈশোর। পৌগণ্ড বয়সকে তিন ভাগ করিয়া শ্রীরূপ আদি-পৌগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বনমধ্যে গোচারণ, বাহুযুদ্ধরূপ খেলা এবং নৃত্যশিক্ষা সম্ভব বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। শ্রীরূপের এই

নির্দেশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পদকর্তৃগণ পদ রচনা করিয়াছেন। গোচারণের বিষয়টি বহু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া ওই বিষয়ের পদাবলীতে শ্রীরূপের প্রভাব নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে বাহুযুদ্ধ খেলা ও নৃত্যাদি বিষয়ে শ্রীরূপের মৌলিকত্ব রহিয়াছে বলিয়া পদাবলীসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব নির্ণয় করা কঠিন নহে। শ্রীরূপের নির্দেশিত বাহুযুদ্ধ খেলা হইতে সরিয়া আসিয়া পদকর্তারা অন্যবিধ খেলা, যেমন গেড়ুয়াখেলা (তরু ১১৯৫) প্রভৃতি লইয়া পদ লিখিয়াছেন। বাহুযুদ্ধ বাদ পড়িলেও, গোষ্ঠ-বিষয়ক পদাবলীর মধ্যে খেলার সহিত কিছু দৈহিক বলের পরীক্ষা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ঘনরামের দুইটি পদে (তরু ১১৯৬ ও ১১৯৭) আমরা দেখি, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ও গোপ-বালকদের খেলার শর্ত হইয়াছে যে, বিজয়ীকে পরাজিতের কাঁধে করিতে হইবে। এখানে ভগবানের ঐশ্বর্যবুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে।

গোচারণের প্রসঙ্গে নৃত্যের কথা অনেক পদকর্তাই বলিয়াছেন। দুইটি দৃষ্টান্ত দেই। গোষ্ঠলীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা যাদবেন্দ্র লিখিয়াছেন—

নাচত গায়ত বেণু বাজায়ত
ধেনু চালায়ত রঙ্গে (তরু ১১৯২)

নবচন্দ্র দাস লিখিয়াছেন—

গলায় ফুলের দাম গো-ধূলি সব গায়।
নাচিয়া যাইতে সে মঞ্জীর বাজে পায়॥ (তরু ১১৯৩)

অবশ্য শ্রীরূপ নৃত্যশিক্ষার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু পদকারগণ একেবারেই শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের নৃত্য সুরু করাইয়া দিয়াছেন।

মধ্য-পৌগণ্ডের ক্রিয়াকর্ম নির্দিষ্ট করিতে গিয়া শ্রীরূপ ভাণ্ডীরতটে ক্রীড়া ও পর্বত উত্তোলনের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই নির্দেশ অনুসরণে ভাণ্ডীরতটে ক্রীড়া লইয়া ষোড়শ শতাব্দীর সুন্দর দাস লিখিয়াছেন—

মধু-মঙ্গল বামে সুবল
সমুখে চিকণ কালা।
তার মাঝে রাম জিনি কোটি কাম
যমুনা দুকূল আলা॥
সখাগণ সনে ভাণ্ডীরের বনে
যমুনা পুলিনে রৈয়া।
চরায়ে ধেনু বাজায়ে বেণু
দাস সুন্দরে লৈয়া॥ (তরু ১৩২৮)

পর্বত উত্তোলনের ব্যাপার অর্থাৎ গোবর্ধনলীলার বিষয় শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে ; সুতরাং ঐ বিষয়ের পদে শ্রীরূপেরই প্রভাব পড়িয়াছে বলা যায় না। অন্ত্য-পৌগণ্ডের কাজ হিসাবে শ্রীরূপ বলিয়াছেন যে, এই সময়ে নর্মসখাদের সহিত রহস্যালাপ এবং তাহাদের নিকটে গোকুল-বালিকাদের শোভার প্রশংসা সুলভ হইয়া উঠে।

শেষ কথাটিতে শ্রীরূপ সখ্যরসের সহিত মধুররসের সংমিশ্রণ আনিয়াছেন। শ্রীরূপের পরবর্তী পদকর্তৃগণ এই দৃষ্টান্তে সখ্যরসের ক্ষেত্রে অসঙ্কোচে মধুররস বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানদাস তাঁহার বিখ্যাত পদে লিখিয়াছেন যে, গোচারণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ সকলের অগোচরে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইতে চলিয়া যান। দিনশেষে তিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে ফিরিলে গোপ-বালকেরা তাঁহার অনুপস্থিতির বিষয় জিজ্ঞাসা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লালদাস-রচিত 'উপাসনাচন্দ্রামৃত'-এ (পৃঃ ১৫২) রহিয়াছে— শ্রীকৃষ্ণ যখন মাতাপিতার কাছে বিদায় লইয়া রাখাল-বালকদের সহিত আনন্দে গোষ্ঠে যাইতেছেন, তখন—

ব্রজাঙ্গনাগণ যত কৃষ্ণ দেখিবারে।
লতা আড়ে রহে কেহ অট্টালিকোপরে ॥

সখ্যরসের উদ্দীপনের মধ্যে শ্রীরূপ রাজার ন্যায় চেষ্টার কথা যে বলিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষেত্রে বক্তব্য এই, রাজার মতো চেষ্টা হইতে কিছু সরিয়া পদকর্তৃগণ চিন্তা করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে গোপ-বালকেরা বনে রাজা করিয়া খেলিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন—

রাখালে রাখালে মেলা খেলিতে বিনোদ খেলা
অতিশয় শ্রম সভাকার।
ননীর পুতলী শ্যাম রবির কিরণে ঘাম
স্রবে যেন মুকুতার হার ॥
শ্রীদাম আসিয়া বোলে বৈসহ তরুর তলে
কানাই হইবে মাঠে রাজা।
যমুনা পুলিনে ভাই কংসের দোহাই নাই
কেহ পাত্র মিত্র কেহ প্রজা ॥
বনফুল আন যত সপত্র কদম্ব শত
অশোক পল্লব আম্রশাখা।
শুনি শ্রীদামের কথা সকল আনিল তথা
নবগুঞ্জাগুচ্ছ শিখীপাখা ॥

গাঁথিয়া ফুলের মালে কদম্ব তরুর তলে
রাজপাট করি নিরমাণ।
এ উদ্ধবদাসে ভণে কক্ষ তালি খনে খনে
আবা আবা বাজায় বয়ান ॥ (তরু ১২৩৭)

শ্রীরূপ সখ্যরসের অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব প্রভৃতি বহু খুঁটিনাটি বিষয়ের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ওই বিষয়ের প্রভাব পদাবলীসাহিত্যে বিশেষ পড়িতে দেখা যায় না। সামান্য এই সব উপাদান-উপকরণের কথা ত অনেক পরে, মূল সখ্যরসই পদাবলীসাহিত্যকে তেমন প্রভাবিত করিতে পারে নাই। ইহার গূঢ় কারণও রহিয়াছে। সখ্য বা প্রেয়োরস শ্রীরূপের উদ্ভাবিত হইলেও মধুররস-আস্বাদনকামী শ্রীরূপ ইহাকে বিশেষ প্রাধান্য দিতে চাহেন নাই; সেইজন্যই তিনি সখ্যরসের মধ্যে মধুররসেরও সমাবেশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীরূপের এই দৃষ্টান্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকারগণও মূলে সখ্যরস ছাড়িয়াই পদ লিখিয়াছেন। কিন্তু সখ্যরস একেবারে উপেক্ষিত হয় নাই শ্রীনিত্যানন্দের জন্য। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শিষ্যদের লইয়া নদীয়া-মণ্ডলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক সময় গোষ্ঠলীলার অনুষ্ঠান করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

পারিষদো সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ, বলয়, মল্ল, নূপুর সু-হার ॥
শিঙ্গা, বেত্র, বংশী, ছাঁদডোড়ি, গুঞ্জামালা।
সভে ধরিলেন গোপালের অংশ-কলা ॥
এইমত নিত্যানন্দ স্বানুভাবরঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্ষদ করি সঙ্গে ॥
(চৈতন্যভাগবত—অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়)

শ্রীনিত্যানন্দের অনুপ্রেরণায় তাঁহার শিষ্য পদকর্তৃগণ সখ্যরসের পদ-রচনায় ব্রতী হন। এইভাবেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন পদকর্তা বলরাম দাস, পুরুষোত্তম, সুন্দরানন্দ (সুন্দর দাস) প্রভৃতি সখ্যরসের পদে কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম হন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই অবিমিশ্র সখ্যরসের পদ লিখেন। পরবর্তী কালে পদাবলীসাহিত্যে ইঁহাদের সখ্যরসের পদ থাকার দরুণ অন্য পদকর্তৃগণ যখন সখ্যরস লইয়া লিখিতে গেলেন, তখন নিছক সখ্যরস লইয়া অন্তরে তাঁহারা তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সেইজন্য পূর্ববর্তী আচার্য শ্রীরূপের পন্থানুসরণ করিয়া পদকর্তৃগণ যে কয়টি সখ্যরসের পদ লিখিলেন, সেইগুলিরও অনেকাংশেই মধুররস প্রবেশ করাইয়া দিলেন। উপরে এক স্থানে 'উপাসনাচন্দ্রামৃত'

হইতে আমরা যে দৃষ্টান্ত তুলিয়াছি, তাহা এই বিষয়েরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জ্ঞানদাসের একটি সুপ্রসিদ্ধ পদে আছে যে, সরলমতি সখারা শ্রীকৃষ্ণের দেহে বিলাস-চিহ্ন দেখিয়া ভাবিতেছেন, তাঁহার গায়ে বুঝি কাঁটার আঁচড় লাগিয়াছে—

হিয়ায় কণ্টক দাগ বয়নে বন্দন রাগ
মলিন হইয়াছে মুখশশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া কোন বনে ছিলে গিয়া
তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি॥ (তরু ১৩১৬)

গোবিন্দদাস প্রভৃতিও দুই রসের সংমিশ্রণে পদ লিখিয়াছেন। সখ্যরসের পদে মধুর-রস ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে করিতে বোধ করি সখ্যরসের বৈশিষ্ট্যই নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাই শেষ পর্যন্ত সখ্যরসের পদ-রচনার ধারা অব্যাহত থাকিতে দেখি না।

বাৎসল্যরসকে শ্রীরূপ বৎসলভক্তিরস বলিয়াছেন। তিনি এই রসের সংজ্ঞায় লিখিয়াছেন যে, বাৎসল্য বিভাবাদির দ্বারা পুষ্ট হইলে বৎসলভক্তিরসের সৃষ্টি হয়। শ্রীরূপ বৎসলভক্তিরসের আলম্বন হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার গুরুজনবর্গকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, ব্রহ্মার দ্বারা অপহৃত রাখাল-বালকদের জননীরা, দেবকী ও তাঁহার সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব এবং সান্দীপাণি ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন সত্য; শ্রীরূপ বলিয়াছেন ইঁহাদের মধ্যে ব্রজেশ্বরী ও ব্রজরাজ প্রধান। এই ব্রজেশ্বরী যশোদা ও ব্রজরাজ নন্দের প্রসঙ্গ শ্রীমদ্‌ভাগবতেও আছে, সুতরাং এখানে শ্রীরূপের মৌলিকতা কিছু নাই। পদাবলীসাহিত্যে বাৎসল্যরসের ক্ষেত্রে নন্দ-যশোমতীর বহু বিচিত্র পরিচয় আমরা পাই, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণেই তাহাকে আমরা শ্রীরূপের দ্বারা প্রভাবিত বলিতে পারি না। বৎসলভক্তিরসের প্রসঙ্গে মথুরা-প্রবাসী শ্রীকৃষ্ণের জন্য যশোমতীর চিন্তা, বিষাদ, নির্বেদ প্রভৃতি হইতে উন্মাদ ও মোহ দশা পর্যন্ত শ্রীরূপ অতি সূক্ষ্মতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

যশোমতীর উন্মাদদশা বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

ক্ক মে পুত্রো নীপাঃ কথয়ত কুরঙ্গাঃ কিমিহ বঃ।
স বভ্রামাভ্যর্ণে ভণত তত্নদস্তং মধুকরাঃ।
ইতি ভ্রামং ভ্রামং ভ্রমভরবিদূনাযত্নপতে
ভবন্তং পৃচ্ছন্তী দিশি দিশি যশোদা বিচরতি॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৮০৬-৮০৭)

অর্থাৎ—আমার পুত্র কোথায়, কদম্ববৃক্ষগুলি, তোমরা বল; কুরঙ্গগণ, আমার পুত্র কি

তোমাদের নিকট দিয়া গিয়াছে ; ভ্রমরগণ, তোমরাও তাঁহার খবর বল—হে বদুপতি, (তোমার জননী) যশোদা ভ্রমভরে অতিশয় কাতর হইয়া চতুর্দিকে তোমার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

শ্লোকটির অনুসরণে শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য পদকর্তা পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন—

গোকুল নগরে ভ্রময়ে জনু বাউরি উদাসল কুন্তলভার।
কাঁহা মঝু প্রাণ তনয় ব্রজ-নন্দন কহইতে বহে জলধার॥
মাধব সো জননী নন্দরানী।
তুয়া বিরহানলে উমতি পাগলি জনু কাহারে কি পুছয়ে বাণী॥
অব কাহে বেণু-শবদ নাহি শুনিয়ে কোন কানন মাহা গেল।
বুঝি বলরাম সঙ্গে নাহি গেয়ল কি পরমাদ আজু ভেল॥
ঐছে বিলাপ শুনই পুর-সহচরি রোই আওত তছু পাশ।
বহু পরবোধবচনে গৃহে আনত কহ পুরুষোত্তম দাস॥
(তরু ১৭৫৬)

মথুরা-প্রবাসী মাধবের কাছে কেহ সংবাদ দিতেছেন—যশোমতী এলোচুলে পাগলিনীর ন্যায় সমস্ত গোকুল নগরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান। আমার প্রাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেল, এই কথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলেন। এখানে আমরা দেখিতেছি, পাগলিনীর ন্যায় যশোমতীর শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ানো শ্লোকের অনুসরণেই বর্ণিত হইয়াছে। সংবাদদাতা পদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে আরও বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ, তোমার বিরহরূপ আগুনে দগ্ধ হইয়া যশোমতী পাগলিনীর ন্যায় কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে এই সংবাদ-জিজ্ঞাসা পুরাপুরি শ্লোকের ছায়াবলম্বনে পরিকল্পিত হইয়াছে। পদে বিলাপিনী যশোদা বলেন, গোপাল কোন্ বনে গেল? তাহার বংশীধ্বনি আর শুনি না কেন? বোধ করি বলরামের সঙ্গে আজ গোষ্ঠে না যাওয়ায় অর্থাৎ একাকী গমন করার ফলেই কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। যশোমতীর এইসব বিলাপ পদকর্তার নিজস্ব সংযোজনা। ইহার দ্বারা পদকার সুযোগমতো বেশ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

পুত্র-বিচ্ছেদ-দুঃখে যশোমতীর যে মোহদশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা চিত্রিত করিতে গিয়া শ্রীরূপ 'কুটম্বিনি মনস্তটে বিধুরতাং বিধৎসে কথং' ইত্যাদি (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৮০৭) লিখিয়াছেন। শ্লোকটির অর্থ এইরূপ—ওগো আপনজন, কেন মনে মনে কষ্ট পাইতেছ? একবার চোখ খুলিয়া দেখ, তোমার ছেলে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

হে গৃহিণী, আমার ঘর শূন্য করিও না। —তোমার পিতা নন্দ ব্যাকুল হইয়া তোমার জননীর কাছে এইরূপ শোক প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীরূপ-বর্ণিত যশোমতীর এইরূপ মোহদশার কিছু অনুসরণে পুরুষোত্তম দাস লিখিয়াছেন—

রজনী প্রভাতে মাতা যশোমতি নবনী লইয়া করে।
কানাই বলাই বলিয়া ডাকয়ে নিঝরে নয়ান ঝরে॥
তবে মনে পড়ে তারা মধুপুরে তবহিঁ হরয়ে জ্ঞান।
কুন্তল কুন্তলে লোটায় ভূতলে ক্ষেণে রহি মুরছান॥
শ্রীদাম সুবলে আসিয়া সে বলে শ্রবণে বদন দিয়া।
তুয়া নাম করি উঠয়ে ফুকরি শুনি থির বান্ধে হিয়া॥
চেতন পাইয়া সুবলে লইয়া যতেক বিলাপ করে।
সে কথা শুনিতে মনুজ পশুজ পরাণ নাহিক ধরে॥
তিল আধ তোরে না দেখিলে মরে বনে না পাঠায় যেহ।
এ পুরুষোত্তম কহয়ে সে জন কেমনে ধরিবে দেহ॥ (তরু ১৭৫৫)

এখানেও কেহ মথুরা-প্রবাসী শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহার জননীর অশেষ বিরহব্যাকুলতা (মোহদশা) বর্ণনা করিতেছেন। শ্লোকের মতো পিতা নন্দের কথা পদের মধ্যে না থাকিলেও, রানী যশোমতী গোপালের বিরহে যে মূর্ছা যান এবং তাঁহার কানের কাছে পুত্রের নাম করিতেই আবার যে তিনি সংজ্ঞা ফিরিয়া পান, এই সমস্তই শ্লোকানুসরণে বর্ণিত হইয়াছে। শ্লোকে যশোমতীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার একটা অস্ফুট ব্যঞ্জনা আছে, পদে কিন্তু জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর তিনি সুবলকে লইয়া কি করেন না করেন সমস্ত স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।

শ্রীরূপ বৎসলরস-প্রসঙ্গে পুত্র-বিচ্ছেদে কাতরা যশোমতীর বর্ণনাই সবিস্তারে দিয়াছেন, নন্দরাজের সম্পর্কে তেমন কিছু বলেন নাই। নন্দরাজের পক্ষেও যশোমতীর মতোই বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক, এই কথা বিবেচনা করিয়া পদকর্তা পুরুষোত্তম তাঁহার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন—

সোই জনক ব্রজরাজ।
না যায়ত ধেনু-সমাজ॥
বসিয়া রহয়ে নিশিদিন।
তিলে তিলে হোয়ত ক্ষীণ॥

কাহুঁক না কহ কছু বাত।
অবনত করি রহু মাথ॥
ব্রজবালকগণ যাই।
কত পরবোধয়ে তাই॥
বহুত যতনে ব্রজনাথ।
ফুকরি কহয়ে কছু বাত॥
কহ কহরে ব্রজবাল।
কাঁহা মঝু প্রাণগোপাল॥
সহচর ভিন কাহে ভেল।
লালন কাঁহা মঝু গেল॥
শুনি বালকগণ রোয়।
সো দুখ কি কহব তোয়॥
শ্রীদামে করয়ে নিজ কোর।
সীচয়ে নয়নক লোর॥
তুয়া অভিলাষে অগেয়ান।
চুম্বয়ে তাক বয়ান॥
ঐছন বিরহ-হুতাশ।
কহ পুরুষোত্তম দাস॥ (তরু ১৭৫৭)

এই পদে নন্দ মহারাজা যে ব্রজ-বালকদের জিজ্ঞাসা করেন—আমার প্রাণগোপাল কোথায় গেল, ইহাতে শ্রীরূপ-বর্ণিত যশোমতী চরিত্রের কি ছায়া পড়ে নাই? শ্রীদামকে কোলে করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণভ্রমে নন্দ যে চুম্বন করেন, ইহাতে নন্দের উন্মাদদশা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এই ব্যঞ্জনার মূলে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে ব্যাখ্যাত যশোদার উন্মাদদশার বর্ণনা নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এতদূর আলোচনার পরও আমরা বলিতে বাধ্য যে, বালগোপাল হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা মধুররসের আস্বাদনকামী বৈষ্ণবেরা বিশেষ অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই সাধক পদকর্তৃগণ বৎসলভক্তিরস লইয়া নিজেদের কবিকল্পনা বিস্তারের বিশেষ সুযোগ লন নাই। যাঁহারা এই বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন, বলরাম দাস, পুরুষোত্তম প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভিন্ন অধিকাংশই গতানুগতিকভাবে স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন; শ্রীরূপের পরিকল্পনায় এই বিষয়ে নূতনত্ব কি আছে, তাঁহার কতখানি অনুসরণ করা যায়, পদকর্তৃগণ এই সমস্ত কিছুমাত্র চিন্তা করেন নাই। ফলে পদাবলীসাহিত্যে শ্রীরূপ-বর্ণিত বৎসলভক্তিরসের প্রভাব বেশ কমই রহিয়া গিয়াছে।

॥ উজ্জ্বলনীলমণির প্রভাব ॥

'উজ্জ্বলনীলমণি' শ্রীরূপ গোস্বামীর সৃজনী-প্রতিভা ও রস-বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডক্টর সুশীলকুমার দে, বৈষ্ণব সাহিত্যে পারদর্শী পণ্ডিত হরিদাস দাস বাবাজী বা অন্য কোন পণ্ডিত 'উজ্জ্বলনীলমণি'র রচনা-কাল সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং শ্রীরূপ তাহার পরে 'উজ্জ্বলনীলমণি' লিখিতে আরম্ভ করেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। উজ্জ্বলনীলমণিতে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উল্লেখ আছে।

'উজ্জ্বলনীলমণি'র অনুভাব-প্রকরণে (বহরমপুর সংস্করণ, পৃঃ ৫২৭) রঘুনাথ দাসের 'মুক্তাচরিত্রম্'-এর 'কান্তা লতাঃ ক বা সন্তি কেন বা কিল রোপিতাঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, 'মুক্তাচরিত্রম্' রচিত হইবার পরে উজ্জ্বল-নীলমণি লেখা হইয়াছে। আবার, 'মুক্তাচরিত্রম্'-এর অভ্যন্তরে আমরা দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, গ্রন্থশেষে শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী লিখিয়াছেন—

যস্য সঙ্গবলতোঽদ্ভুতা ময়া
মৌক্তিকোত্তমকথা প্রচারিতা
তস্য কৃষ্ণকবিভূপতে র্ব্রজে
সঙ্গতির্ভবতু মে ভবে ভবে ॥

অর্থাৎ—আমি যাঁহার সঙ্গবলে এই অদ্ভুত মৌক্তিকোত্তম কথা প্রচার করিলাম, আমার জন্মে জন্মে এই ব্রজমণ্ডলে সেই কৃষ্ণ কবিভূপতির সঙ্গ হউক।

ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রজমণ্ডলে কৃষ্ণনামধারী কবিখ্যাতি-সম্পন্ন একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজকেই পাওয়া যায়। এখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বা প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন নাই। তাঁহাদের তিরোধানের বেশ কিছুদিন পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে আসেন, বৃন্দাবনে কবিখ্যাতি লাভ করিতেও তাঁহার অবশ্য কিছুদিন লাগিয়াছিল। এই সমস্ত যুক্তিবলে আমাদের মনে হয়, ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে 'মুক্তাচরিত্রম্'-এর উদ্ধৃতি-সমৃদ্ধ উজ্জ্বলনীলমণি রচিত হয় নাই। অপরপক্ষে, ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পরেও উজ্জ্বলনীলমণি লেখা হইতে পারে না; কারণ, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের বৃহৎবৈষ্ণবতোষণী টীকা ঐ বৎসর সমাপ্ত করেন এবং তিনি টীকামধ্যে লিখিয়াছেন—'বিবৃতং চৈতন্মদনুজবরৈঃ শ্রীরূপমহাভাগবতৈ রুজ্জ্বলনীলমণেঃ স্থায়িভাব বিবরণে।' সুতরাং বৃহৎবৈষ্ণবতোষণী টীকা সমাপ্তির কাল ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই উজ্জ্বলনীলমণি রচিত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে মধুর বা উজ্জ্বল রসের বিস্তৃত

বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। নায়কাদি ভেদ-প্রকরণে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয় আলোচনা আমরা প্রথম অধ্যায়েই করিয়াছি। এখানে এইটুকুমাত্র বলা প্রয়োজন যে, নায়কভেদ প্রসঙ্গে শ্রীরূপ ধৃষ্ট নায়কের উদাহরণ দিতে গিয়া যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, নিছক তাহার প্রভাবেও পদ রচিত হইয়াছে। শ্লোকটি এই—

নখাঙ্কা ন শ্যামে ঘনঘুসৃণরেখাততিরিয়ং
ন লাক্ষান্তঃক্রূরে পরিচিনু গিরের্গৈরিকমিদম্।
ধিয়ং ধৎসে চিত্রং বত মৃগমদেঽপ্যঞ্জনতয়া
তরুণ্যাস্তে দৃষ্টিঃ কিমিব বিপরীতস্থিতিরভূৎ ॥

অর্থাৎ—শ্যামের দেহে নখের চিহ্ন নয়, এইগুলি ঘন কুঙ্কুমের রেখা। হে অন্তঃকুটিলে, ইহা লাক্ষা নয়, চিনিয়া লও (দেখ) ইহা গিরির গৈরিক। খুবই বিস্ময়কর মনে হইতেছে যে, তুমি মৃগমদকে চোখের কাজল মনে করিতেছ! তুমি তরুণী, তোমার দৃষ্টি কি করিয়া বৈপরীত্যে গিয়া পৌঁছাইল?

গোবিন্দদাস শ্লোকটির ভাব লইয়া লিখিয়াছেন—

কাঁহ নখ-চিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
এ নব কুঙ্কুম-রেহ।
কাজর ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জসি
ঘন মৃগমদ-পদ এহ ॥
সুন্দরি মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি
দিনহিঁ তরুণি দিঠি মন্দ ॥
গৌরিক হেরি বৈরি সম মানসি
উর পর যাবক-ভানে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দু-মুখি নিন্দসি
সিন্দূর করি অনুমানে ॥
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনি
ভৈ গেল অরুণ নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ (তরু ৪২৪, সং ৩৮১)

গোবিন্দদাসের এই পদে শ্লোকের অনুসরণেই নখচিহ্ন ও নব কুঙ্কুমরেখা, কাজল ও মৃগমদ, আলতা ও গৈরিক প্রভৃতির অবতারণা হইয়াছে। এমন কি, তরুণী নায়িকা, এত শীঘ্র তাঁহার দৃষ্টি খারাপ হইল কেন সে-কথাও আছে; তবে গোবিন্দদাস তাহাতে একটু রঙ চড়াইয়া লিখিয়াছেন যে, দিনের বেলাতেই তরুণী শ্রীরাধার এমন দৃষ্টিভ্রংশ ঘটিল কেন। পদের শেষে সিন্দুর ও ফাগ, আরও চক্ষু রক্তবর্ণ হইবার প্রসঙ্গ 'অধিকন্তু ন দোষায়' হিসাবেই আসিয়াছে।

নায়িকাভেদ-প্রকরণে আমরা দেখি, শ্রীরূপ স্বকীয়া, পরকীয়া ও সাধারণী এই তিন প্রকার নায়িকা নির্ণয় করিয়াছেন। স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকাদের তিনি আবার মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন মধ্য ও প্রগল্‌ভা নায়িকা ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা—তিন প্রকার হইতে পারে। এই পর্যন্ত যে পঞ্চদশ প্রকার নায়িকার কথা বলা হইল, শ্রীরূপ প্রত্যেককে আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা, (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্তৃকা ও (৮) স্বাধীনভর্তৃকা।[১]

ডক্টর সুশীলকুমার দে প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, শ্রীরূপের এই নায়িকাভেদ-বিবৃতিতে বিশেষ কিছু মৌলিকতা নাই।[২] বাস্তবিক, ১২০৫ সালে সঙ্কলিত শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃতে এবং আলাউদ্দীনের নাম-ঋদ্ধ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমাংশে রচিত বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে নায়িকাদের পূর্বোক্ত রূপভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই নায়িকাভেদ-প্রকরণে যেখানে শ্রীরূপের মৌলিকতা নাই, সেখানে পদাবলী-সাহিত্যে তাঁহার প্রভাব অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই।

'উজ্জ্বলনীলমণি'র স্থায়িভাব-প্রকরণের অন্তর্গত মহাভাবের বর্ণনা হইতেই শ্রীরূপের মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেৎ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ (শ্লোক ১৫৪)

'রসবিলাসবল্লী' গ্রন্থে ইহার অর্থ করা হইয়াছে—

অনুরাগ নিঃসীম বাঁচিলে মহাভাব।
ইবে শুন কহি যেন তাহার স্বভাব॥

১। এই স্বাধীনভর্তৃকা কথাটিকে ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁহার গ্রন্থে 'স্বাধীনপতিকা' লিখিয়াছেন।

২। ডঃ দে-র 'Early History Of Vaishnava Faith And Movement Of Bengal', পৃঃ ১৫৫।

একের হৃদয়ে ভাব করয়ে উদয় ।
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী জন মাত্রে প্রকাশয় ॥
সূর্য যেন রবিকান্তমণিরে দ্রবায় ।
এই মত দ্রবময় করয়ে সভায় ॥

উদ্ধৃতির শেষ চারিছত্রে দৃষ্টান্ত উপলক্ষে সুন্দর কবিত্বের প্রকাশ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, আমরা মহাভাবাখ্য যে সীমাহীন অনুরাগের পরিচয় পাইলাম, শ্রীরূপ তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—রূঢ় ও অধিরূঢ়।

॥ রূঢ়-মহাভাব ॥

রূঢ়-ভাবের অনুভাব বর্ণনায় শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

নিমেষাসহতাসন্নজনতাহৃদ্বিলোড়নম্ ।
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্তিশঙ্কয়া ॥
মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদিসর্ববিস্মরণং সদা ।
ক্ষণস্য কল্পতেত্যাদ্যা যত্র যোগবিয়োগয়োঃ ॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৭৬৮)

অর্থাৎ—

ইহাতে নিমেষকাল না যায় সহন ।
দেখি চিত্তে ক্ষোভ নিকটস্থ জন ॥
অতি অল্পকাল কল্পকাল বলি মানে ।
যেইক্ষণে নিজকান্ত দেখয়ে নয়নে ॥
নায়কের সুখেতেও দুঃখ শঙ্কা করে ।
তাথে ক্ষীণ হয় সদা ধৈর্য নাহি ধরে ॥
একক্ষণ কান্তে যদি না দেখে নয়নে ।
অতি অল্পক্ষণ কল্পকাল বলি মানে ॥

(উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৫০-১৫১)

শ্রীরূপের স্বরূপ-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

যো মুখ নিরখনে নিমিখ না সহই ।
তাহে পরবোধসি আওব কহই ॥

শুন সখি কি বোলব তোয় ।
নীলজ প্রাণ সহজে রহু মোয় ॥
সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড় ।
তিল এক জিবইতে লাজ বহু মোর ॥ (তরু ১৯৫১)

এই পদে শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখার বিষয়ে নিমেষ ফেলিতেও পারেন না, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিত তিলমাত্র কাল জীবনধারণও যে তাঁহার কাছে বহু লজ্জার বিষয়, তাহাতেই রূঢ়-মহাভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে ।

॥ অধিরূঢ়-মহাভাব ॥

অধিরূঢ়-মহাভাব সম্বন্ধে শ্রীরূপ বুঝাইয়াছেন যে, যেখানে অনুভাবগুলি রূঢ়-মহাভাবের অনুভাব অপেক্ষা অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য পায়, সেখানেই অধিরূঢ়-মহাভাবের সৃষ্টি ।

ইহার লক্ষণ বলিতে গিয়া শ্রীরূপ শিববাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

লোকাতীতমজাণ্ডকোটিগমপি ত্রৈকালিকং যৎসুখম্
দুঃখঞ্চেতি পৃথগ্ যদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাং ।
নৈবাভাসতুলাং শিবে তদপি তৎকূটদ্বয়ং রাধিকা-
প্রেমোদ্যৎসুখদুঃখসিন্ধুভবয়োর্বিন্দেত বিন্দ্বোরপি ॥
(উজ্জ্বল, পৃঃ ৭৮০-৭৮১)

হে গৌরি, বৈকুণ্ঠ ও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সুখ-দুঃখ যদি পৃথক পৃথকরূপে রাশীকৃত হয়, তাহা হইলেও ওই দুই (সুখ-দুঃখ) শ্রীরাধার প্রেম হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের সমুদ্রের বিন্দুমাত্রও হইতে পারে না।

এই সম্বন্ধে 'রসবিলাসবল্লী'-কার লিখিয়াছেন—

কোটি ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠাদ্যের সর্ব সুখ ।
সর্প বৃশ্চিকাদের দংশনে যত দুঃখ ॥
এই সব সুখ দুঃখ কিছুই না জানে ।
কৃষ্ণের বিয়োগ যোগ সুখ দুঃখ মানে ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে যে সুখ শ্রীরাধা অনুভব করেন, তাহার তুলনায় কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ও বৈকুণ্ঠাদির সুখকে অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। আবার শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধা

যে গভীর দুঃখ পান, তাহার তুলনায় বৃশ্চিকের এমনকি সর্পের দংশনও কিছুই মনে হয় না।

এই মহাভাবের উপর শ্রীরাধার আর্তিবহুল অধিকাংশ পদ দাঁড়াইয়া আছে, সুতরাং বিশেষ করিয়া ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

উজ্জ্বলনীলমণি অনুসারে অধিরূঢ়-মহাভাব দ্বিবিধ—মোদন ও মাদন। যে অধিরূঢ়-মহাভাবে নায়িকা ও নায়কের স্তম্ভ প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব অতিশয় উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকে 'মোদন' বলে। 'মোদন'-এর অনুভাব-বিশ্লেষণে শ্রীরূপ দুইটি বিষয়ের কথা বলিয়াছেন—(১) কান্তাদের সহিত বিরাজ করিতে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার জন্যই ক্ষোভ জন্মে, (২) গৌরী প্রভৃতি হইতেও শ্রীরাধার প্রেম শ্রেষ্ঠ।

শ্রীরূপ মোদন সম্বন্ধে শ্লোক রচনা করিয়াছেন—

> অদ্বৈতাদ্গিরিজাং হরার্ধবপুষং সখ্যাৎ প্রিয়োরঃস্থিতাং
> লক্ষ্মীমচ্যুতচিত্তভৃঙ্গনলিনীং সত্যাং চ সৌভাগ্যতঃ।
> মাধুর্যান্মধুরেশজীবিতসখীং চন্দ্রাবলীঞ্চক্ষিপন্
> পশ্যারুদ্ধ হরিং প্রসার্য লহরীং রাধানুরাগাম্বুধিঃ॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৭৮৬)

অর্থাৎ—শ্রীরাধার অনুরাগ-সমুদ্র লহরী বিস্তার করিয়া অদ্বয়ভাবে মহেশ্বরের অর্ধাঙ্গরূপা গৌরীকে, সখ্যের জন্য প্রিয়তমের বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীকে, সৌভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণের মনোভৃঙ্গের কাছে নলিনীতুল্য সত্যভামাকে এবং মাধুর্যহেতু মথুরানাথের প্রাণসখী চন্দ্রাবলীকেও দূরে সরাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রুদ্ধ করিয়াছে।

শ্রীরূপের শ্লোকটি অনুসরণ করিয়া উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন—

মোদন মধুরা রাধিকার।
অতি প্রেম বিভূষিতা কান্তাগণ যে বিখ্যাতা
অতিক্রমকারী তা সভার॥

হর-অর্দ্ধ-অঙ্গ খ্যাতি গিরিজা যে পার্বতী
অদ্বিতীয়া নিজ কান্ত সনে।
কৃষ্ণচন্দ্র সহ রাসে অদ্বিতীয়া পরকাশে
তার গর্ব করিল হরণে॥

নারায়ণ-হৃদি স্থিতা কান্তা লক্ষ্মী সুবিখ্যাতা
বিলসয়ে সখ্যতা বিধানে।
কৃষ্ণ সহ সম্মিলনে প্রেমরস আলাপনে
খর্ব করে সে সখ্যতা গুণে॥
কৃষ্ণচিত্ত-মধুকর রহে যে পদ্মিনী পর
সত্যভামা সৌভাগ্য অধিকা।
খর্ব করি নিজগুণে করে কান্ত আকর্ষণে
যাঁহার সৌভাগ্য সর্বাধিকা॥
কৃষ্ণচন্দ্র-প্রিয়তমা চন্দ্রাবলী অনুপমা
মাধুর্য প্রকাশি বিলসয়ে।
তাঁহারে আক্ষেপ করি যাঁর অঙ্গ সুমাধুরী
গুণ সর্বোপরি বিরাজয়ে॥
অনুরাগ রাধিকার প্রেমরত্ন গুণাধার
স্বভাব-লহরী-প্রসারণে।
সভারে আক্ষেপ করি দেখ রুদ্ধ কৈল হরি
উদ্ধব করয়ে দরশনে॥
(শ্রীশ্রীরসকলিকা, পৃঃ ২০৯)

এখানে পদকর্তা শ্রীরূপের শ্লোকটির অনুবাদই করিয়াছেন; তাই দেখি, প্রেমরত্নের আধারস্বরূপা শ্রীরাধার অনুরাগ পার্বতী, লক্ষ্মী, সত্যভামা ও চন্দ্রাবলীর প্রেমকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

'মাদন' সম্বন্ধেও উদ্ধবদাস পদ লিখিয়াছেন—

শ্রীরাধিকার ভাব যে মাদন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণকান্তাগণে করিল যে বিক্ষোভণে
কুরুক্ষেত্রে হঞা প্রকটন॥
অত্যদ্ভুত নদীরীতে প্রেমউর্মি প্রকাশিতে
রাধাকৃষ্ণ-সমুদ্র-মিলনে।
যত রঙ্গ দরশনে কৃষ্ণকান্তা-নদীগণে
নিজগর্ব খর্ব করি মানে॥

ভদ্রা শুষ্ককরস্থিতা সরস্বতী নদী যথা
ধারাহীনা কৃষ্ণসিন্ধু সনে।
কালিন্দী কৃষ্ণদয়িতা কালিন্দজা নদীমতা
বাষ্পধারা করয়ে মোচনে ॥
আর দেবী সত্যভামা নদী যে নর্মদানামা
স্বভাব প্রবাহখর্বা হৈলা।
ভীষ্মসুতা যে রুক্মিণী নদী সুরতরঙ্গিণী
বিবর্ণতা ধারণ করিলা ॥
অত্যন্ত গাম্ভীর্যভাজা তরঙ্গিণীগণ-রাজা
কৃষ্ণসিন্ধু ক্ষোভ ধরে মনে।
অপূর্ব তরঙ্গ হেরি হস্ত হরি আহা মরি
উদ্ধব করয়ে প্রশংসনে ॥

(শ্রীশ্রীরসকলিকা, পৃঃ ১০৮)

পদটির মধ্যে দেখিতেছি, পদকর্তা প্রথমেই 'শ্রীরাধার ভাব যে মাদন' বলিতেছেন, ইহার পিছনে শ্রীরূপের মহাভাব ব্যাখ্যার প্রভাব সুস্পষ্ট। শ্রীমদ্‌ভাগবতে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণের এবং বৃন্দাবন হইতে নন্দ-যশোমতীসহ গোপীগণের কুরুক্ষেত্রে আগমন বর্ণিত হইয়াছে। পদে দেখি, সেই সময়ে শ্রীরাধার মাদনভাব দেখিয়া দ্বারকার মহিষীরা নিজদিগকে খুব ছোট বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-রূপ সমুদ্রের সহিত শ্রীরাধা-রূপ নদীর মিলনে যে প্রেমতরঙ্গ উঠিল, তাহা দেখিয়া মহিষী ভদ্রা সরস্বতী নদীর ন্যায় শুষ্কা হইয়া গেলেন। রানী কালিন্দী কালো অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। সত্যভামা নর্মদার ন্যায় ক্ষীণপ্রবাহা হইলেন এবং রুক্মিণীদেবী গঙ্গার ন্যায় হইলেন বিবর্ণা।

এই পদটি 'উজ্জ্বলনীলমণি'র (পৃঃ ৭৮৪-৭৮৫) আক্ষরিক অনুবাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।[১] কিন্তু বাংলাভাষায় লিখিত হওয়া সত্ত্বেও পদটির ভাব ও ভাষা এত কঠিন যে, বিনা টীকায় ইহার অর্থোপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। সেইজন্যই কোন সঙ্কলন-গ্রন্থে পদটি স্থান পায় নাই।

১। হন্ত শুষ্ককরম্বিতা ভুবি কুরোর্ভদ্রা সরস্বত্যভূদ্
বাষ্পং ভাস্করজা মুমোচ তরসা সত্যাভ্রমন্নর্মদা।
ভেজে ভীষ্মসুতা চ বর্ণবিকৃতিং গাম্ভীর্যভাগপ্যসৌ
কৃষ্ণোদম্বতি রাধিকাদ্ভুতনদী প্রেমোর্মিভিঃ সংবৃতে ॥

॥ মোহন ॥

'মোদন' বিরহদশায় হয় 'মোহন'। গোবিন্দদাস একটি পদে লিখিছেন—

কহিতে কহিতে ধনি মুরছিত ভেল।
ধাইয়ে সহচরি কোর পর নেল॥
খরতর বহতহি হাহা হুতাশ।
কোই নলিনি-দলে করত বাতাস॥
ঘন ঘন কাঁপই খীণ নিশাস।
সখিগণ অন্তরে পায়ল তরাস॥
রাই জিয়াইতে করু আশোয়াস।
শ্যাম বুঝাইতে চলু গোবিন্দদাস॥

(গোবিন্দদাসের পদাবলী—ডঃ মজুমদার সঙ্কলিত, পৃঃ ৬৪৩)

পদটির মধ্যে বিরহিণী শ্রীরাধার মূর্ছার কথা বলা হইয়াছে, এই মূর্ছা স্তম্ভের নামান্তর-মাত্র। বেপথু-ভাবও ব্যক্ত হইয়াছে 'ঘন ঘন কাঁপই' কথাটির মাধ্যমে।

এখানে গোবিন্দদাস 'মোহন' মহাভাবটিকেই রূপায়িত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম শ্রীরূপের মোহন-লক্ষণটিকে যেন সম্মুখে রাখিয়া পদ রচনা করিতে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

মাধব ঐছন তুয়া প্রতি রাগ।
পাণ্ডুর কাঁতি কান্তি ধরু সুন্দরী
জীবই বহু পুনভাগ॥
ঘন ঘন কম্প কণ্ঠ সব ঘট্ট ঘট্ট
বচন না পুরই রাধা।
দশন আঘাত শবদ শুনি ছটছট
উতকট বিরহক বাধা॥
তনু পুলকাকুল জনু কণ্টকীকুল
রহই না পারই থীরে।
গোকুল তটিনী জননী পদ পায়ল
যা কর লোচন নীরে॥

তুয়া বিনু ঐছে দশা ধরু মোহন
সোহন কাঞ্চন গোরী।
কহ ঘনশ্যাম দাস তুহুঁ মধুপুর
নাগরী কোর আগোরী॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৪০)

শ্রীরাধার 'পাণ্ডুর কাঁন্তি', অর্থাৎ বৈবর্ণ্য দেখা গিয়াছে, 'ঘন ঘন কম্প'-ও রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, তিনি কথা বলিতে যাইয়া খেই হারাইয়া ফেলেন, বাক্য আর পূর্ণ করিতে পারেন না। তাঁহার দেহ রোমাঞ্চে পূর্ণ; চোখের জলে যমুনা উছলিয়া উঠিতেছে, তাই সে সকল নদীর মায়ের মতন হইয়াছে। এই সমস্ত সাত্ত্বিক লক্ষণের জন্য শ্রীরাধার মধ্যে 'মোহন' মহাভাবটি যে মূর্ত হইয়াছে, পদকর্তা তাহা দ্ব্যর্থবহুল শব্দ ব্যবহার করিয়া কৌশলে জানাইয়া দিয়াছেন—'তুয়া বিনু ঐছে দশা ধরু মোহন।' এক অর্থ—মোহন দশা, অন্য অর্থ—হে মোহন শ্রীকৃষ্ণ।

মোহনের অনুভাবগুলি বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীরূপ প্রথমতঃ কান্তা লিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্ছার কথা বলিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদের পদকর্তা অনন্ত দাস লিখিয়াছেন—

ধনী-অঙ্গ-মধুর সৌরভে শ্যাম আকুল
উছলল প্রেম-তরঙ্গ।
রাইক কোরে ভোরি নন্দ-নন্দন
কাতর মুরছিত অঙ্গ॥

(অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, ৩৯৩)

মাধবীদাসেরও পদে রহিয়াছে—

পরশিতে রাই তনু আপনে ভুলল কানু
মুরছি পড়ল ধনী-কোর। (তরু ৭৭৬)

শ্রীরূপ যেখানে তাঁহার পূর্বে রচিত কোন শ্লোকে দৃষ্টান্ত না পাইয়া স্ব-রচিত শ্লোকে দ্বারকায় রুক্মিণীর আলিঙ্গনের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের মূর্ছা বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে অনন্ত ও মাধবীদাস শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনস্থলেও যে এমন কথা বলিলেন, তাহা শ্রীরূপের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে।

মোহনের দ্বিতীয় অনুভাব হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীরাধার হাজার দুঃখ হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের যেন পরমসুখ হয় এই বাসনা।

অসহ্য আপন দুঃখ করে অঙ্গীকার।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য তথাপি রাধার॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৪০-৪১)

দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

স্যান্নঃ সৌখ্যং যদপি বলবদ্গোষ্ঠমাপ্তে মুকুন্দে
যদ্যল্পাপি ক্ষতিরুদয়তে তস্য মাগাৎ কদাপি।
অপ্রাপ্তেঽস্মিন্ যদপি নগরাদার্তিরুগ্রা ভবেন্নঃ
সৌখ্যং তস্য স্ফুরতি হৃদি চেত্তত্র বাসং করোতু॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৭৯১)

শ্লোকটি বাংলা ছন্দের বন্ধনে সুন্দর একটি কবিতার রূপ পাইয়াছে—

মোর সুখ হয় কৃষ্ণ আইলে এথায়।
ইথে যদি প্রিয় মোর কৃষ্ণ দুঃখ পায়॥
না আইলে কৃষ্ণ যদি মোর হয় দুঃখ।
তাহে যদি কৃষ্ণ মোর পায় বহু সুখ॥
গোকুলে আসিয়া তবে নাহি প্রয়োজন।
সুখে মধুপুরে রহু শ্রীনন্দ-নন্দন॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৪১)

ইহার তুলনায় উজ্জ্বলচন্দ্রিকায় 'হরি আসে ব্রজপুরে' ইত্যাদি পয়ার (পৃঃ ১৫৩) অনেকখানি স্বাদহীন। মোহনের এই অনুভাবটি সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও পদাবলীসাহিত্যে ইহার প্রভাব বিশেষ পড়ে নাই। গোবিন্দদাসের একটি পদে ইহার আভাষ পাই—

তুহুঁ যদি লাখ গোপিনী সহ বিলসহ
পায়সি পরম আনন্দ।
সো মঝু ঐছে কোটি সুখ সম্পদ
তৈছে নাহি কিছু মন্দ॥

(কীর্তনগীতরত্নাবলী, পৃঃ ২৮৪)

তৃতীয় অনুভাব ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিতা। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

নারং চুক্রোশ চক্রং ফণিকুলমভবদ্ব্যাকুলং স্বেদমূহে
বৃন্দং বৃন্দারকাণাং প্রচুরমুদমুচন্নশ্রু বৈকুণ্ঠভাজঃ।

রাধায়াশ্চিত্রমীশ ভ্রমতি দিশি দিশি প্রেমনিঃশ্বাসধূমে
পূর্ণানন্দেঽপ্যুষিত্বা বহিরিদমবহিশ্চার্তমাসীদজাণ্ডং ॥
(উজ্জ্বল, পৃঃ ৭৯২-৭৯৩)

অর্থাৎ—শ্রীরাধার প্রেমনিশ্বাসজাত ধূম চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকিলে, তাহা দেখিয়া নরকুল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, সর্পেরা ব্যাকুল হইল, দেবগণ স্বেদ বহন করিতে লাগিলেন, বৈকুণ্ঠস্থিতা লক্ষ্মী প্রভৃতিরও চোখের জল পড়িল; এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর ও বাহিরের সমস্তই পূর্ণানন্দে বাস করা সত্ত্বেও অতিশয় পীড়িত হইয়াছে।

শ্রীরূপের নির্দিষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিতা স্মরণে রাখিয়াই বুঝি নিত্যানন্দ-শাখার অন্তর্গত পুরুষোত্তম দাস লিখিয়াছেন—

হরি হরি কি ভেল গোকুল মাহ।
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
বিরহ-দহনে দহি যাহ॥

তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল
তেজল কুসুম-বিকাশ।
গলয়ে শৈলবর পৈঠে ধরণিপর
স্থল-জল কমল হুতাশ॥ (তরু ১৮৭২)

পদকর্তা আরও একটি সুন্দর পদে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিত বৃন্দাবনের পশু, পক্ষী, তরু, লতা, তৃণ, গুল্ম—এককথায় স্থাবর-জঙ্গম সব-কিছুর মর্মান্তিক দুঃখের বা ক্ষোভের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—

গোকুল ছোড়ি যবহুঁ তুহুঁ আয়লি
তব বিহি প্রতিকূল ভেল।
বরজবাসি কিয়ে থাবর জঙ্গম
বিরহ-দহনে দহি গেল॥

তুয়া প্রিয় যতহুঁ সুরভিকুল আকুল
তৃণ-কবল করি মুখে।
হেরি মথুরাপুর লোচন ঝরঝর
পাণি না পীবত দুখে॥

কোকিল ভ্রমরা সারী শুকবর
রোয়ত তরু পর বৈঠি।
তোহারি ময়ূর মৃগীকুল লুঠয়ে
শকতি নাহি বনে পৈঠি॥
তরুকুল পল্লব সবহুঁ শুখায়ল
তেজল কুসুম-বিকাশে।
এতহুঁ বিপদে তোহেঁ কতয়ে নিবেদয়
দুখি পুরুষোত্তম দাসে॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয়, পৃঃ ৭৮)

ঘনশ্যাম দাস একটি পদে লিখিয়াছেন—

মাধব কি কহব দুঃখ এক তুণ্ডে।
প্রেম নিশাস ধুম জছু পীড়িত
বহিরন্তর অজ অণ্ডে॥
পেখলু অখিল মনুজ অতি কাতর
রবয়তু সঘন গভীর।
ফণিকুল ভূতল হৃদয় অতি ব্যাকুল
রহই না পারই থীর॥
সুরপুর সমূহ দেবকুল আকুল
স্বেদ অঙ্গে পরকাশি।
লোচন অরুণ অশ্রু ঘন ঝরঝর
যত বৈকুণ্ঠনিবাসী॥
তোহারি বিয়োগ যোগ অছু দারুণ
ঐছে উতাপিত রাই।
কহে ঘনশ্যাম দাস শুন মাধব
না বুঝিয়ে তোহারি বড়াই॥
(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৪২)

ঘনশ্যামের পদে 'বহিরন্তর অজ অণ্ডে' অর্থাৎ বাহিরের ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীরাধার দারুণ বিরহ-দুঃখের স্পর্শ লাগিয়াছে, সেইজন্যই 'মনুজ অর্থাৎ মানুষেরা অতি কাতর', মাটির তলায়

ফণিকুল ব্যাকুলচিত্ত, সুরপুরে দেবগণ স্বেদাক্তকলেবর এবং বৈকুণ্ঠবাসীরা ঝর ঝর ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। ঘনশ্যাম এই সব বর্ণনা করিয়া এই যে বিরলদৃষ্ট পদটি লিখিয়াছেন, ইহার মূলে রহিয়াছে শ্রীরূপের অনুভাব বর্ণনা।

পশু-পক্ষীর রোদনকে শ্রীরূপ চতুর্থ অনুভাব বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি 'পদ্যাবলী'র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

যাতে দ্বারবতীপুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
কালিন্দীতটকুঞ্জবঞ্জুললতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া।
উদ্‌গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকূজিতম্‌॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৭৯৪-৭৯৫)

'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা'-কার অনুবাদ করিয়াছেন—

মধুপুর ছাড়ি হরি চলে দ্বারাবতী পুরী
সে সম্বাদ রাধিকা শুনিল।
কৃষ্ণের উত্তরী বাস করিয়া গলার পাশ
কুঞ্জ মধ্যে কান্দিতে লাগিল॥
দেখ রাধা-প্রেম সর্বোত্তম।
যাহার বৈকল্য দেখি কান্দে সব পশু পাখী
জলে কান্দে জলচরগণ॥ (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৫৩)

বোধ করি ইহার প্রভাবে গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

কিয়েঘর বাহির চীত না রহে থির
জাগরে নিদঁ নাহি ভায়।
গঢ়ল মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গত
কিয়ে সখি করব উপায়॥
কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে
সঘনে রোয়ত শুকসারি।
গোবিন্দদাস আনি সখী পুছই
কাহে এত বিঘিনী বিথারি॥

(রসকলিকা, ১৫৩)

যদিও পদটির মধ্যে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই যে, শ্রীরাধার ভাবী-বিরহের দুঃখে ভ্রমর গুঞ্জরণ ছাড়িয়াছে বা শুকসারী রোদন করিতেছে, তথাপি শ্রীরাধা যখন এইগুলি বর্ণনা করিতেছেন তখন অবশ্যই তাঁহার দুঃখের সহিত ইহাদের সহানুভূতি আছে। এইরূপ ব্যঞ্জনা সত্য হইলে পদটি নিঃসন্দেহে শ্রীরূপ-কথিত অনুভাবের দৃষ্টান্ত।

মরণ বরণ করিয়াও নিজের দেহের রূপ-রসাদি পঞ্চভূতে মিলাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষাকে শ্রীরূপ 'মোহন'-এর পঞ্চম অনুভাব বলিয়াছেন। তিনি ইহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিতে গিয়া ষান্মাসিক নামক কবির লেখা একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তি স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরং।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥

অর্থাৎ—এই দেহ পঞ্চত্ব লাভ করিয়া স্পষ্টরূপে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে প্রবিষ্ট হয়। আমি প্রণাম করিয়া মাথা নোয়াইয়া বিধাতার কাছে এই একটিমাত্র বর চাহিতেছি যে, তাঁহার জলাশয়ে জল, তাঁহার মুকুরে জ্যোতি, তাঁহার অঙ্গনের (অর্থাৎ অঙ্গনের উপরের) আকাশে আকাশ, তাঁহার পথে মৃত্তিকা এবং তালবৃন্তে (যেন) বাতাস হই।

শ্রীরূপ এই শ্লোকটি যখন উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন তাহা অনেকখানি গুরুত্ব পাইয়াছে। শ্রীরূপের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও এই শ্লোকটির কথাবস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া গোবিন্দদাস তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পদে লিখিয়াছেন—

যাঁহা পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হইয়ে তহিঁ মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ॥
যো দরপনে পহুঁ নিজমুখ চাহ।
মঝু-অঙ্গ জ্যোতি হই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥

যাঁহ যাঁহা ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরী।
সো মরকত তনু তোহে কি বিছুরী॥

(সমুদ্র ৩৬৯, তরু ১৯৫৩)

গোবিন্দদাস এই পদে যাম্মাসিকের শ্লোকটির প্রায় অনুবাদ করিয়াছেন। শ্লোকটির মধ্যে কোথাও শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার উল্লেখ নাই, তথাপি গোবিন্দদাস যে শ্লোকোক্ত কথাগুলিকে শ্রীরাধার উক্তিরূপে রূপায়িত করিয়াছেন তাহার পিছনে নিশ্চয়ই শ্রীরূপের প্রভাব কাজ করিয়াছে।

মোহনের পঞ্চম অনুভাব লইয়া অজ্ঞাতনামা কোন পদকার লিখিয়াছেন—

হৃদয় ফাটিয়া মোর নিকসে পরাণি।
না পাইনু বন্ধুর দেখা রহিল পোড়নী॥
বারাণসী গিয়া মুঞি সুতলি করিমু।
অরুণ তুলহ কর তবে সে পাইমু॥
হইয়া কুসুম-মালা হৃদয়ে থাকিমু।
পীতধটি হৈয়া কটিতটে বেড়াইমু॥
যাইব হিঙ্গলার দেশ এ তনু দহামু।
বিবিধ রতনমালা হইয়া জনমিমু॥
পায়েতে নূপুর হইমু কটিতে কিঙ্কিনী।
দেখিয়া জুড়াবে যেন চান্দমুখখানি॥
সাগর-সঙ্গমে কতবার ঝাঁপ দিমু।
পুনঃ পুনঃ জনমিঞা কামনা করিমু॥
হইব বাঁশের বাঁশী সে পিয়ার করে।
নিরবধি আস্বদিমু অরুণ অধরে॥

(শ্রীশ্রীরসকলিকা, পৃঃ ১১৬)

পদে শ্রীরাধা যে এই জীবন বিসর্জন দিয়া পরজন্মে কুসুমমালা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গলায় থাকিতে চাহিতেছেন, পীতধটিরূপে শ্রীকৃষ্ণের কটিদেশ বেষ্টন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা করিতেছেন, রত্নমালা হইয়া দেহকে, নূপুর হইয়া চরণযুগলকে কিংবা কিঙ্কিণী হইয়া

কটিকে অলঙ্কৃত করিবার বাসনা করিতেছেন, সর্বশেষে 'বাঁশের বাঁশী' হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত যে নিরবধি আস্বাদন করিতে চাহিতেছেন, এই সমস্তই শ্রীরূপের প্রভাবে পরিকল্পিত।

মোহন-মহাভাব যখন অনির্বচনীয় দশায় উত্তরিত হয়, তখন নানারকম চিত্ত-বিভ্রম আসে; শ্রীরূপ ইহাকে 'দিব্যোন্মাদ' বলিয়াছেন। এই দশার বর্ণনা শ্রীরূপের মৌলিক আবিষ্কার। দিব্যোন্মাদের উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি ভেদও শ্রীরূপ দেখাইয়াছেন।

উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ যে 'স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্য চেষ্টিতং' বলিয়াছেন (উজ্জ্বল, পৃঃ ৭৯৭), তাহার অর্থ—'(অঙ্গের) বিবশতা হয়ে নানা চেষ্টা হয়' (উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা, পৃঃ ১৫৪)।

যদুনন্দন লিখিয়াছেন—

তোহারি সঙ্কেত কুঞ্জে কুসুম শর-পুঞ্জে
রহিল একেশ্বরিয়া।
তনুবন বিরহ- দহনে ধনী দগধই
প্রাণ-হরিণী যায়ে জরিয়া॥
মাধব ধৈরজ গমন তোঁহারি।
ও ক্ষণ লাখ কলপ করি মানই
তপল ভরয়ে দিঠি বারি॥
তোঁহারি সন্দেশ আশে ধনী কুলবতী
খোঅল কুল তনু কাঁতি।
নিকরুণ মদন বেদন নাহি জানই
হানই খর শরপাঁতি॥
পরাণ প্রেম আশ-গুণে বান্ধল
ভাষ না নিকসই বদনে।
ভণ যদুনন্দন সো যদি টুটয়ে
অতএ চলহ সোই সদনে॥

(সমুদ্র ১৬২, তরু ৩৩৬)

পদে যদুনন্দন দেখিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে না পাওয়ার জন্য শ্রীরাধার তনুরূপ বন বিরহ-রূপ আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে; দেহের দীপ্তিও বিদূরিত হইতেছে। ইহা অবশ্যই বৈবশ্যের সূচক। এই বৈবশ্যের জন্যই শ্রীরাধার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না।

সুতরাং আমরা দেখি, যদুনন্দন শ্রীরূপের উল্লিখিত উদ্‌ঘূর্ণাই মনে রাখিয়া পদটি লিখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পদে স্পষ্টভাবে কোথাও উদ্‌ঘূর্ণা শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। ঘনশ্যামের পদে উহা সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার পদে রহিয়াছে—

মাধব সো সুকুমারি ধনী রাধা।
তোহারি বিচ্ছেদে সতত উদ্‌ঘূর্ণিত
দারুণ উৎকট বাধা॥
ভরমহি কবহি করত উৎকণ্ঠিত
তুয়া অভিসারক লাগি।
সাজই বাসক সেজ কবহি ধনী
নিকুঞ্জে যামিনী জাগি॥
লোচন যুগল করহি মদ্‌ঘূর্ণিত
পূর্ণিত অন্তর মানে।
ভরমহি তোহারি নেহারি নীলজলধর
তরজই তুয়া রূপ ভানে॥
কিয়ে নিশি দিবস অবস তনু সুন্দরী
কিয়ে কিয়ে দশা নাহি ভেল।
কহ ঘনশ্যাম দাস শুন মাধব
জীবন আশ রহি গেল॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৪৪)

শ্রীরাধা উদ্‌ঘূর্ণার মধ্যে পড়িয়াছেন; তাই তিনি অভিসারের জন্য উৎকণ্ঠা বোধ করেন, বাসর সাজাইয়া রাত জাগেন, চক্ষু দুইটিকে সর্বদা ঘুরান আর নীল জলধরকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া চিন্তা করিয়া ভর্ৎসনা করেন। শ্রীরাধার এইরূপ নানান্ চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বোধ করি ঘনশ্যাম এই পদটি তাঁহার পিতামহ গোবিন্দদাসের 'তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ' ইত্যাদি সুবিখ্যাত পদের (সমুদ্র ৩৭৪, তরু ১৯৬৩) প্রভাবে রচনা করিয়াছেন।

॥ চিত্রজল্প ও তাহার বিভাগ ॥

প্রিয়জনের সুহৃদের সহিত দেখা হইলে প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া গর্ব, অসূয়া, দৈন্য, চপলতা, ঔৎসুক্য প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া, অবশেষে তীব্র উৎকণ্ঠাময় আলাপকেই শ্রীরূপ 'চিত্রজল্প' বলিয়াছেন।

শ্রীরূপ চিত্রজল্পের বিভিন্ন বিভাগ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার অনুসরণে 'রস-বিলাসবল্লী'-কার লিখিয়াছেন—

প্রজল্প পরিজল্প আর বিজল্প উজ্জল্প।
সংকল্প অবজল্প আর অভিজল্প আজল্প ॥
অতিজল্প সুজল্প সহ হয় দশ সংজ্ঞা।

(রসবিলাসবল্লা, পৃঃ ৪৪)

'প্রজল্প'-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

অসূয়েৰ্য্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া।
প্রিয়স্যাকৌসলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ সতু কীর্ত্যতে ॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৭৯৯)

অর্থাৎ—অসূয়া, ঈর্ষ্যা এবং মদযুক্ত অবজ্ঞার দ্বারা প্রিয়ব্যক্তির যে অকৌশলোদ্গার, তাহাকে 'প্রজল্প' বলে।

শ্রীরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক (১০।৪৭।১০) উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদনুসরণে জ্ঞানদাস লিখিয়াছেন—

অলিহে না পরশ চরণ হামারি।
কানু-অনুরূপ বরণ গুণ যৈছন
ঐছন সবহুঁ তোহারি ॥
পুর-রঙ্গিণি-কুচ কুঙ্কুম-রঞ্জিত
কানু-কণ্ঠে বন মাল।
তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল ॥ (তরু ৪।৭।১৬৫৬)

পদটিতে শ্রীরাধা অলিকে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে নিষেধ করার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ ও পুররমণীবিলাসের বিষয়ে নিন্দা করিয়াছেন। মূল কৃষ্ণার্তি গোপন করিয়া শ্রীরাধা এই যে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিতেছেন, ইহা শ্রীরূপ-বিশ্লেষিত 'প্রজল্প'।

ঘনশ্যাম দাস 'প্রজল্প'-এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

পুরনাগরি কুচ কুঙ্কুমে রঞ্জিত
চপল অঙ্গ বনমাল।
সো পুন তোহারি বদনে ভেল ধূসর
পিবইতে মধু সুরসাল ॥

মধুকর অতয়ে সে কহলম তোয়।

তুহুঁ শঠ বন্ধু চরণ নাহি পরশবি

জগতে বিনিন্দিত মোয় ॥

পুরপতি পুর- নাগরিগণে পরশন

নিশি দিশি করু অভিলাষ।

তা সঞে লেহ তৈছে হিয় যাকর

ইথে নাহি কহবি অছু ভাষ ॥

কি কহব তাকর যৈছে সুজন পণ

তুহুঁ ভেলি যাকর দূত।

যাদব সকল সভা উপহাসত

তাহা গণিয়ে অদভুত ॥

সহজই গরল মুরতিময় শ্যামর

রহ পুন শ্যামর পাশে।

তাহা কিয়ে দেখি দৈব যাহা না গল

ভণ ঘনশ্যামর দাসে ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৪৫)

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে 'শঠ', 'পুরনাগরিগণে পরশনে' সতত অভিলাষী, 'সহজই গরল' বলিয়া মধুকরের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন। সর্বশেষে শ্রীরাধা 'তাহা কিয়ে দেখি দৈব যাহা না গল' মন্তব্য করিয়া পরম উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন। শেষের এই ভাবটি বিশেষ করিয়া শ্রীরূপের প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

উদ্ধবদাসের পদে রহিয়াছে, শ্রীরাধা মুরলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

খলের বদনে থাক নাম ধরি সদা ডাক

গুরুজনা করে অপযশ।

খল হয় যেই জনা সে কি ছাড়ে খলপণা

তুমি কেন হও তার বশ ॥ (তরু ৮২১)

মুরলীকে ভালো বলিয়া ধরিয়া তাহার শ্রীকৃষ্ণবদনাশ্রয় করার ন্যায় অসঙ্গত কাজটির দোষ দেখাইতে গিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণকে খল বলিয়া নিন্দা করার মধ্যে 'প্রজল্প' অনুস্যূত।

নন্দকিশোর দাস তাঁহার পদে লিখিয়াছেন—

স্বপদ-কমল সৌরভ চঞ্চল
ভ্রমত ভ্রমর হেরি।
তঁহি প্রজল্পতি দিব্যোন্মাদবতী
শ্রীবৃষভানুকুমারী ॥

(শ্রীশ্রীরসকলিকা, পৃঃ ১২২)

পদকার শ্রীরূপের প্রজল্প-পরিকল্পনার প্রভাবে যে পদ লিখিতেছেন, তাহা 'তঁহি প্রজল্পতি' কথায় স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। পদটির মধ্যে শ্রীরাধা 'মধুরার্তজনবন্ধু' মধুপকে শ্রীকৃষ্ণের প্রবঞ্চনা ও ধূর্ততার কথা জানাইয়াছেন—

বৃন্দাবনে রাসে আপনি সে ভাষে
মুঞি ত সভার ঋণী।
গমনের কালে দূতদ্বারে বোলে
ত্বরিতে আসিব আমি ॥
এতেক কহিয়া রহে পাসরিয়া
প্রবঞ্চক অতিশয়।
অতএব তারে ধূর্ত কহি তোর
বৃথা দুঃখ উপজয় ॥

ইহা ত প্রত্যেকটি লক্ষণ মিলাইয়া শ্রীরূপের তত্ত্বের অনুসরণ।

'পরিজল্প'-এর সংজ্ঞায় শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

প্রভোর্নির্দয়তা-শাঠ্য-চাপল্যাদ্যুপপাদনাৎ।
স্ববিচক্ষণতা-ব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতং ॥

ইহার অনুবাদ হিসাবে 'রসবিলাসবল্লী'-প্রণেতা লিখিয়াছেন—

পরদ্রোহ নির্দয় শঠতা চপলতা।
প্রকাশ করয়ে প্রভু কৃষ্ণেতে সর্বথা ॥
ভঙ্গি করি আপনাতে মানে বিচক্ষণ।
এই ত জানিহ পরিজল্পিত লক্ষণ ॥

'পরিজল্প'-এর উদাহরণ হিসাবে শ্রীরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের যে অংশ (১০।৪৭।১৩) উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা'-কার শচীনন্দন তাহার পদ্যানুবাদ করিয়াছেন মাত্র—

অধরের সুধা যেই পরম মোহন সেই
আমাদিকে করাইল পান।
ভৃঙ্গ যেন ছাড়ে ফুল করিতে মন ব্যাকুল
হরি কৈল মথুরা পয়ান ॥
এই বড় অদ্‌ভুত মোরে।
কিবা এই তার গুণ লক্ষ্মীর হরিল মন
সেই আসি পদ সেবা করে॥ (পৃঃ ১৫৫)

কিন্তু ঘনশ্যাম শ্রীরূপের উপস্থাপিত সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া সুন্দরও মৌলিক পদ রচনা করিয়াছেন—

জনি কহ কৈছে মথুরাপতি নিন্দসি
সো কি করল অপকার।
শঠজন গুণ দেখি কিয়ে নিরূপণ
সহজ ঐছে ব্যবহার ॥
মধুকর হামারি বচন অব শুনবি।
সো চঞ্চল চরিত শুনিতে হিয় জর জর
পুন পুন ঐছে না কহবি ॥
তো সম ছুরমদ জন মধু পীয়ই
কুসুম ছোড়ি পুন ধাব।
সো ঐছে অধর সুধা দেই ছোড়ন
তুহুঁ তুহুঁ এক স্বভাব ॥
কৈতব বচন সোই বহু জানত
মোহন কত পরকার।
অতয়ে সে কমলা কমল পদ সেবই
অনুভবি না করি বিচার ॥
ইথে কিয়ে করব বচন ময় চাতুরি
ঐছন না করবি আশ।
কাটকি বাণ শিখর কিয়ে ভেদত
ভণ ঘনশ্যামর দাস ॥
(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৪৫)

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রথমতঃ 'শঠজন গুণ' দেখিতেছেন, পরে বলিতেছেন 'সো চঞ্চল চরিত'; 'কাটকি বাণ শিখর কিয়ে ভেদত'—অর্থাৎ, কাঠের বাণ কি পর্বত-শিখরকে ভেদ করিতে পারে। এই প্রশ্ন করিয়া শ্রীরাধা শেষে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, তাঁহার মতো বুদ্ধিমতীর নিকট বচন-চাতুর্যে কিছু কাজ হইবে না। এই সমস্তই 'পরিজল্প'-এর লক্ষণাক্রান্ত।

অতঃপর 'বিজল্প'। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া।
অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তির্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ॥
(উজ্জ্বল, পৃঃ ৮০৬)

অর্থাৎ—

ব্যক্ত অসূয়া যাথে গূঢ় মান ধরে।
'বিজল্পে'তে কৃষ্ণচন্দ্রে কটাক্ষোক্তি করে॥
(উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৫৫)

জ্ঞানদাসের পদে শ্রীরাধা বলিতেছেন—

ওরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখেতে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী যথা নিদারুণ হরি
আমার মন্দিরে কিবা কাজ॥ (তরু ১৬৫৭)

নির্লজ্জ ভ্রমরের পক্ষে নিদারুণ হরির নিকট যাওয়াই সঙ্গত, এই কথা বলিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষোক্তি করিয়াছেন।

ঘনশ্যাম এই বিষয়ে লিখিয়াছেন—

আমরা অবলা নারী নিশি দিশি বনচারী
কভু নাহি জানি গৃহবাস।
সে হয় মথুরানাথ পুরনারীগণ সাথ
সদত পূরয়ে অভিলাষ॥
শুন অহে মধুকর রাজ।
সে গুণ চরিত কথা শুনিতে মরম বেথা
না কহিয় এহেন সমাজ॥
ইবে যার আলিঙ্গনে অবিরত পরশনে
কুচরোগ মেটিল যাহার।
তা সভার আগে যায় চপল-চরিত গায়
মনোরথ পূরিবে তোমার॥

পুন পুন কহি তোয় না শুনি দগধ মোয়
না বুঝি কি তুয়া অভিলাষ।
সদা তোর শঠ সঙ্গ পরসহ শঠ অঙ্গ
তেঞি কহে ঘনশ্যাম দাস॥
(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৪৬)

বিরহিণী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের এক-আধটুকু সংবাদ শুনিবার জন্যও আগ্রহান্বিতা, কিন্তু মধুকরের নিকটে সেই মনোভাবটি প্রকাশ করিতেছেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে আপাতবিরূপতাই শুধু দেখাইতেছেন না, উহার মধ্যে কিছু আসক্তিও প্রকাশ করিয়াছেন। মধুকরকে তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা না বলিয়া যেখানে শ্রীকৃষ্ণ আছেন সেইখানেই চলিয়া যাইতে বলিতেছেন।

'উজ্জল্প'-সংজ্ঞায় শ্রীরূপ যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ-বিস্তারকল্পে 'রসবিলাসবল্লী'-কার লিখিয়াছেন—

গর্বযুক্ত চিত্তে তাহে ঈর্ষার মিলনে।
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কহে কুহক আখ্যানে॥
অসূয়াতে আক্ষেপ করয়ে বহুক্ষণ।
এই ত জানহ সবে উজ্জল্প লক্ষণ॥ (পৃঃ ৪৭)

এই উজ্জল্প বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতের দৃষ্টান্তটিকে অন্তরে ধারণ করিয়া ঘনশ্যামদাস পদ রচনা করিয়াছেন—

জনি কহ তোহারি ধেয়ানে তনু জর জর
মদন দহনে অবসন্ন।
ইথে লাগি মোহে পাঠায়ল সো হরি
করইতে তুয়া পরসন্ন॥
মধুকর বুঝল তোহারি চতুরাই।
ঐছন বচন কহবি তুহুঁ তা সঞে
যো তুয়া বচনে পাতাই॥
যাকর কুটিল ভাঙুযুগ ভঙ্গিম
কপট মনোহর হাসে।
কো জনি ঐছে রমণী তিন ভুবনে
তুর্লভ তাকর পাশে॥

শুন শুন মধুকর হামারি বচন ইহ
যতনে সম্বাদ বিতায়।
দিন হীন কৃপণে করুণা করু যো জন
শত জন তা গুণ গায়॥
যাকর চরণ কমল নিতি সেবই
কমলা হৃদয় অভিলাষে।
বনচরী রমণী তাঁহা কাঁহা লিখব
ভণ ঘনশ্যামর দাসে॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৪৭)

পূর্বপক্ষরূপে কোন আপত্তি উঠাইয়া তাহা খণ্ডন করার কথা শ্রীরূপ বলেন নাই। কিন্তু ঘনশ্যাম নৈয়ায়িকদের ঐ রীতি অবলম্বন করিয়া শ্রীরাধার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। পদে শ্রীরাধা মধুকরকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার জন্য 'তনু জর জর' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দূত পাঠাইয়াছেন, এই কথা তিনি (শ্রীরাধা) বিশ্বাস করেন না; তিনি মধুকরের চাতুরি ধরিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং যে তাহার (মধুকরের) কথা বিশ্বাস করিবে তাহার কাছেই মধুকরের যাওয়া উচিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণের কপটতার কথা বলা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধার গর্বযুক্ত ঈর্ষাও প্রকাশ পাইয়াছে। উজ্জল্পের অন্য উপাদান আক্ষেপও পদটির শেষাংশে সূচিত হইয়াছে।

'উজ্জল্প'-এর পর 'সংজল্প'। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া।
তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতোবুধৈঃ॥

(পৃঃ ৮১১)

অর্থাৎ—সোল্লুণ্ঠ, গূঢ় আক্ষেপ সহ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) যে অকৃতজ্ঞতার উক্তি, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'সংজল্প' বলেন।

এই সংজল্প-পরিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ঘনশ্যাম পদ রচনা করিয়াছেন—

কপট বিনয় বহু জানত সোয়।
কৈতব বচনে ভুলত সব কোয়॥
তুহুঁ অনুচর বহু চাতুরি জান।
সো কি করব ইহ চতুরক ঠান॥

হে ষট্পদ মধু চরণে না ধরবি।
ঐছে কপটপণ ইথে নাহি করবি ॥
যাহে লাগি কুলশীল করু সমাধান।
সো পুন তেজি চলত আন ঠাম ॥
জানলু তোহারি মুরুখ ব্যবহার।
ধরম করম তাহে নাহিক বিচার ॥
তেজই না পারিয়ে সো পরথাব।
না দেখি উপায় ঘনশ্যাম দুঃখ লাভ ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৪৭-৪৮)

পদের মধ্যে শ্রীরাধা বলিয়াছেন যে, যাঁহার জন্য কুলশীল পরিত্যাগ করিলাম, সে এখন আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছে। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে অকৃতজ্ঞ তাহাই শ্রীরাধা বুঝাইতেছেন, এতদ্ব্যতীত শ্রীরাধার আক্ষেপ পদের সমস্ত অংশেই জড়াইয়া রহিয়াছে। সুতরাং পদটি যে সংজল্পের, সে-বিষয়ে কোন মতভেদ নাই।

'চিত্রজল্প'-এর ষষ্ঠ প্রকার রূপ হইতেছে 'অবজল্প'। 'হরৌ কাঠিন্য-কামিত্ব' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরূপ যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—শ্রীহরির কাঠিন্য, কামিত্ব ও ধূর্ততা থাকার জন্য নিজ আসক্তির সম্পূর্ণ অযোগ্য তিনি যখন ঈর্ষ্যাযুক্ত ভয়ের সহিত এই কথা বলা হয়, তখন তাহাকে 'অবজল্প' বলে।

এই অবজল্পের যে দৃষ্টান্ত শ্রীরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধস্থ (শ্লোক ১৬) ভ্রমর-গীত হইতে চয়ন করিয়াছেন, তাহা শচীনন্দন ছন্দানুবন্ধে ধরিয়াছেন—

পূর্ব জন্মে রাম হঞা বালি কপি বিনাশিয়া
যেহ কৈল ব্যাধের আচার।
সূর্পনখার নাসাকর্ণ তাহা কৈল ছিন্নভিন্ন
বড়ই নির্দয় মন তার ॥
পুনশ্চ বামন হয়া বলির সর্বস্ব লয়া
পুনঃ তারে করিল বন্ধন।
হেন কৃষ্ণ বর্ণ যে তার সখ্য চাহে কে
তভু তারে নাহি ছাড়ে মন ॥

(উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৫৬-১৫৭)

শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব পূর্ব অবতারে চিন্তা করার ক্ষেত্রে শাস্ত্রোক্ত কোন নিষেধ নাই, অন্ততঃ সেই যুক্তিবলে শ্রীরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে উপরি-উক্ত দৃষ্টান্ত চয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যের কিছু প্রকাশ আছে, তাই পরবর্তী কালের মাধুর্যবাদী পদকারগণ ইহার দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যে অবজল্প মহাভাবের পদ একটিও আমাদের চোখে পড়ে নাই।

'অভিজল্প'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়া শ্রীরূপ 'ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য' ইত্যাদি বলিয়াছেন; অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ যখন পাখীদের দুঃখ দেন, তখন তাঁহাকে ত্যাগ করা উচিত, ভঙ্গী দ্বারা এইরূপ অনুতাপ-বচন যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে 'অভিজল্প' বলে।

এই অভিজল্প-পরিকল্পনাটিও পদাবলীসাহিত্যকে অনুপ্রাণনা দিতে পারে নাই।

'আজল্প' সম্বন্ধে শ্রীরূপ বলিয়াছেন যে, যাহাতে নির্বেদহেতু শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা এবং দুঃখপ্রদত্ব বর্ণিত থাকে, অপরপক্ষে ভঙ্গী দ্বারা অন্যের সুখদানের গুণ কীর্তন হয়, তাহাকে 'আজল্প' বলে।

ঘনশ্যামদাস তাঁহার একটি পদে লিখিয়াছেন—

তাহার কুটিল বাণী আমি সব সত্য মানি
যত দুখ কহিব কাহারে।
কুলিকের গানে যেন লুব্ধ হয়ে মৃগীগণ
স্বরভেদে নিজদেহ পীড়ে॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৪৯)

ইহা ভাগবতের ১০।৪৭।১৯ শ্লোকের ভাব লইয়া লেখা। এই অংশে শ্রীরাধা যে তাঁহার দুঃখ কাহাকেও বলিতে পারিতেছেন না, তাহাতে নির্বেদই প্রকাশ পাইয়াছে। কুলিকের গানে প্রতারিত মৃগীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের কুটিল বাণীতে শ্রীরাধা দুঃখ পাইয়াছেন, এই কথা বলায় 'আজল্প'-এর অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা ও দুঃখপ্রদত্ব সুপ্রকট হইয়াছে।

এই পদেরই অন্য অংশে ঘনশ্যাম যেখানে বলিয়াছেন 'অতএব তাহার কথা, শুনিতে মরমে ব্যথা, না কহিয় মোসভার আগে' সেখানে শ্রীরাধা বাচনভঙ্গীতে যেন বুঝাইতেছেন, তাঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কথা না বলিয়া অন্যের কথা বলিলে তাঁহারা তৃপ্ত হইতে পারেন। ভঙ্গীর দ্বারা এইরূপে অন্যের সুখপ্রদানের সামর্থ্য বুঝানোয় 'আজল্প'-এর দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে।

'প্রতিজল্প'-সংজ্ঞায় 'দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্' ইত্যাদি শ্লোকে (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮১৮) শ্রীরূপ যাহা বলিয়াছেন পয়ারে তাহাই দাঁড়াইয়াছে—

স্ত্রীসঙ্গ গোবিন্দ কভু না পারে ছাড়িতে।
আমাদের প্রাপ্তি তাথে হইবে কেমতে॥
দূতের সম্মান করি এই কথা কয়।
রস-শাস্ত্রে 'প্রতিজল্প' তার নাম হয়॥

(উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৫৭)

এই প্রতিজল্পের প্রভাবে পদাবলী বিশেষ লিখিত হইতে দেখা যায় না।

'চিত্রজল্প'-এর সর্বশেষ বিভাগ 'সুজল্প'। যেখানে সরলতার জন্য গাম্ভীর্য, দৈন্য, চপলতা ও উৎকণ্ঠা—এই সব লইয়া শ্রীহরির বিষয়ে প্রশ্ন হয়, সেখানেই সুজল্পের সৃষ্টি।

ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

ছোড়ি নিয়ড় পুন আয়লি কাহে।
পুন কি এ কানু পাঠায়ল তোহে॥
শুন মধুকর চপলক মিত।
কিয়ে অভিলাষ কহবি তুয়া চিত॥
যো তুহুঁ যাচবি অব পূরব আশ।
বেকতহি কহবি হৃদয় অভিলাষ॥
যুবতিক পরশ তেজত নাহি যোয়।
অনুভবি তাহে মিলায়ই মোয়॥
দূর কর ইহ সব চাতুরি বচনে।
হামারি বচন অব শুনবি শ্রবণে॥
অব কৈছে কুশলে আছয়ে পিয়া রঙ্গে।
কভু কি কহয়ে মোসভার পরসঙ্গে॥
বন্ধু বান্ধব কিয়ে জনক মন্দির।
কভু কি স্মরয়ে সেই রসিক সুধীর॥
সুগন্ধি কমল কর ধরিব কি শিরে।
ঘনশ্যাম কহে কবে দুঃখ যাবে দূরে॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৫০-৫১)

শ্রীরাধার উক্তি-সম্বলিত এই পদটি আদ্যোপান্ত সরলতা-মণ্ডিত, ইহাতে যখন যাহা মনে হইয়াছে শ্রীরাধা তখনি সরাসরি সেই কথা বলিয়াছেন। মধুকরকে তিনি যে বলিয়াছেন

'যো তুহুঁ যাচবি অব পূরব আশ'—অর্থাৎ, তুমি যাহা চাহিবে এখন (সকল বিষয়েই) আশা পূর্ণ হইবে, ইহার মধ্যে বেশ গাম্ভীর্য প্রকাশ পাইয়াছে। 'যুবতিক পরশ তেজত নাহি যোয়'—অর্থাৎ যুবতীর স্পর্শ ত্যাগ করা যায় না, শ্রীকৃষ্ণের এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের দোষ দেখাইবার ছলে নিজের মনের বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরাধা মধুকরের চাতুর্যপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া শুনিয়া যেন ধৈর্য হারাইয়াছেন, সেইজন্য হঠাৎ অনেকখানি চঞ্চলতা লইয়া বলিয়াছেন—'দূর কর ইহ সব চাতুরি বচনে, হামারি বচন অব শুনবি শ্রবণে'—অর্থাৎ, এই সব চাতুর্যপূর্ণ বাক্য ত্যাগ করিয়া এখন আমার কথা শুন। সর্বশেষে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাই ব্যক্ত হইয়াছে; তিনি আগ্রহভরে মধুকরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, প্রিয়তম (শ্রীকৃষ্ণ) রঙ্গ-কৌতুকে কুশলে আছেন ত? আমাদের প্রসঙ্গ কি তাঁহার মনে পড়ে? সেই রসিক সুধীর বন্ধুবান্ধব, পিত্রালয়, সমস্ত কিছুকে কি স্মরণ করেন?

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, ঘনশ্যাম 'সুজল্প'-এর প্রত্যেকটি লক্ষণ স্বীকার করিয়া 'ছোড়ি নিয়ড় পুন আয়লি কাহে' পদটি রচনা করিয়াছেন।

॥ মাদন ॥

'মোদন' বা 'মোহনের' পর 'মাদন' সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন শ্রীরূপ। তিনি লিখিয়াছেন—

সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

অর্থাৎ—সর্বভাবের উদ্গম হইতেও (মোদন-মহাভাব হইতেও) উৎকর্ষ-বিশিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ এই মাদন (মহাভাব) হ্লাদিনী শক্তির সারভূতা রাধার মধ্যে সর্বদা বিরাজ করে।

এই 'মাদন' যে দুইটি লক্ষণের দ্বারা চেনা যায়, তাহা হইতেছে—(১) ঈর্ষার অযোগ্যের উপরেও ঈর্ষা। শ্রীরূপ এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া স্বরচিত 'দানকেলি-কৌমুদী' হইতে 'বিশুদ্ধাভিঃ সার্ধং ব্রজহরিণনেত্রাভিরনিশং' ইত্যাদি (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮২৫-৮২৬) শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'রসবিলাসবল্লী'-কার তাহাই সুন্দর পদে রূপান্তরিত করিয়া লিখিয়াছেন—

বনমালা শুন যে কহিয়ে।
কুন্তল অবধি পদ পরশিয়া অবিরত
রহি কৃষ্ণ মহত হৃদয়ে॥

আমরা অবলা জাতি সতত বিশুদ্ধ মতি
নাহি জানি কপটের লেশ।
তৃণজ্ঞান করি মনে এত অহঙ্কার কেনে
মোসভারে সদা কর দ্বেষ ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৫১)

যদুনাথ দাস 'আপেক্ষানুরাগের' পদে লিখিয়াছেন—

শ্রীরাধা বাঁশীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,

নীরস তোহার তনু গ্রন্থি তাহে হয়।
কৃষ্ণ-করে থাক তুমি কোন শুভোদয় ॥
কৃষ্ণের অধরে তুমি রহ অনুক্ষণ।
তাহাতে পাইলা তার নিবিড় চুম্বন ॥ (তরু ৮২৪*)

'কোন শুভোদয়' কথায়, না জানি বাঁশী কোন্ শুভক্ষণে সৃষ্ট হইয়াছে যাহাতে সে শ্রীকৃষ্ণের করে থাকে এবং তাঁহার অধরসুধা সর্বদা পান করে, এই কথা শ্রীরাধা বলিতেছেন। এমন কথা বলার মধ্যে বাঁশীর সৌভাগ্যের বিষয়ে শ্রীরাধার ঈর্ষাও যেন প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা মাদন-ভাবের পদ। যদুনাথ দাস শ্রীরূপের তত্ত্ব ব্যাখ্যানের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই পদটি লিখিয়াছেন।

'মাদন'-এর দ্বিতীয় লক্ষণ—সর্বদা সম্ভোগ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের গন্ধ, বাতাস প্রভৃতিতে ব্যস্ততা। শ্রীরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবত (১০।২১।১৭) হইতে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন
লিম্পত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৮২৬-৮২৭)

হে সখি, শবরস্ত্রীগণ ধন্য ; কেননা যে কুঙ্কুম প্রথমে দয়িতাদের স্তনে অনুলিপ্ত, পরে রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের অরুণিমায় কান্তিপ্রাপ্ত, বারবার বনমধ্যে পরিভ্রমণের দরুণ যাহা তৃণে সংলগ্ন হইয়াছে, সেই কুঙ্কুম লইয়া আপনাদের স্তনে ও মুখে লেপন করিয়া

---

* পদটি শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে (পৃঃ ২১৯) যদুনন্দনের বলিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু পদকল্পতরুতে আমরা যদুনাথ দাসের নামে দেখিতেছি। 'বৈষ্ণব পদাবলী'র আকর পুঁথি যদি পদকল্পতরু অপেক্ষা প্রাচীনতর হয়, তাহা হইলে উহা স্বীকার করা যায়, অন্যথায় নহে।

কামব্যথা বিদূরিত করিতেছে। যদি বল কামব্যথা কিরূপে হইল, উত্তরে বলি কুচকুঙ্কুমদর্শনেই কামরূপ তাপ জন্মিয়াছিল।

শবরস্ত্রীদের উল্লেখ না করিয়া ঘনশ্যাম শ্লোকটির অনুসরণে পদ লিখিয়াছেন—

দয়িতা কুচকুঙ্কুম যো রঞ্জিত।
দয়িত চরণতল সো ভেল দণ্ডিত॥
সো পুন বিপিন ভ্রমণ যব কেল।
পদকুঙ্কুম তৃণমণ্ডিত ভেল॥
ধনি ধনি সব রমণীগণ ভাগ।
যাকর ঐছে উদয় অনুরাগ॥
তৃণকুঙ্কুম ধরি কুচযুগ মাহ।
মদন কদন দুখ করু নিরবাহ॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৫২)

ইহার তুলনায় 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা'র অনূদিত পদ 'পুলিন্দী রমণীগণ রম্য তার জীবন' ইত্যাদি (পৃঃ ১৫৯) একেবারেই স্বাদহীন।

॥ উজ্জ্বল-রস ॥

শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক মহাভাবরূপ স্থায়িভাব বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই স্থায়িভাব ক্রমশঃ রসতা প্রাপ্ত হইয়া শৃঙ্গার, মধুর বা উজ্জ্বলরসে পরিণত হয়। প্রাকৃত জনের ক্ষেত্রে শৃঙ্গাররসের কথা নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকেরা অনেকেই বলিয়াছেন, কিন্তু এই শৃঙ্গাররসকে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া ভক্তিরসের অন্যতম উজ্জ্বল বা মধুর রস নামে অভিহিত করার ব্যাপারটি শ্রীরূপের মৌলিক অবদান। উজ্জ্বল নামটিও শ্রীরূপ ভরতের শৃঙ্গার প্রসঙ্গ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—'তত্র শৃঙ্গারো নাম রতিস্থায়িভাবপ্রভব উজ্জ্বলবেষাত্মকঃ। যৎকিঞ্চিল্লোকে শুচি মেধ্যমুজ্জ্বলং দর্শনীয়ং বা (ভবতি) তৎ শৃঙ্গারেণোপমীয়তে।' (৫১, ভরতনাট্যশাস্ত্রম্)। অর্থাৎ—শৃঙ্গার তাহাই যাহাতে রতিরূপ স্থায়িভাব উজ্জ্বল ও আস্বাদনযোগ্য হয়। লৌকিক জগতে যাহা-কিছু পবিত্র, উজ্জ্বল বা দর্শনীয় তাহা শৃঙ্গারশব্দবাচ্য হইয়া থাকে। এই যে শৃঙ্গার-প্রসঙ্গে ভরত 'উজ্জ্বল' কথাটি ব্যবহার করিলেন, ইহাই শ্রীরূপকে প্রভাবিত করিয়াছে।

শৃঙ্গাররসের শ্রেণী-বিভাগ ভরত প্রভৃতি আলঙ্কারিকেরা করিয়াছেন। ভরত নাট্যশাস্ত্রে লিখিয়াছেন—'তস্য দ্বে অধিষ্ঠানে, সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ।' অর্থাৎ—সেই

শৃঙ্গাররসের দ্বিবিধ অধিষ্ঠান—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ (অভিনবভারতী)। রুদ্রট-ও (খ্রীঃ ৮২৫—৮৭৫) এই মতের অনুবর্তী। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে 'দশরূপক'-প্রণেতা ধনঞ্জয় শৃঙ্গারের তিন প্রকার ভেদ করিয়াছেন—'অযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সংভোগশ্চেতি স ত্রিধা' (৪।৫০); সেই (শৃঙ্গার) অযোগ, বিপ্রয়োগ ও সংভোগ তিন ভাগে বিভক্ত। ধনঞ্জয় যে 'অযোগ' ও 'বিপ্রয়োগ' বলিয়াছেন, ওই দুইটি ভরতের 'বিপ্রলম্ভের অবান্তর ভেদমাত্র'; সুতরাং ধনঞ্জয়ের নির্দেশে ভরতের শাস্ত্রব্যাখ্যা খণ্ডিত হইয়া যায় নাই। 'ধ্বন্যালোকে' শৃঙ্গারকে অঙ্গীরসরূপে গণ্য করিয়া সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। একাদশ শতাব্দীর মম্মট 'কাব্যপ্রকাশে' লিখিয়াছেন 'তত্র শৃঙ্গারস্য দ্বৌ ভেদৌ—সংভোগো বিপ্রলম্ভশ্চেতি।' এই সব পূর্বসূরিদের নির্দিষ্ট শ্রেণী-বিভাগ অনুসরণ করিয়া শ্রীরূপ উজ্জ্বলরসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

বিপ্রলম্ভের সংজ্ঞা দিতে গিয়া শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥

অর্থাৎ—

মিলনে অমিলনে হয় 'বিপ্রলম্ভ' স্থিতি।
অভীষ্টালিঙ্গনাদ্যের যাথে নাহি প্রাপ্তি॥
এই 'বিপ্রলম্ভ' বলি কবিগণ বায়।
'বিপ্রলম্ভ' হলে 'সম্ভোগ' অতিশয়॥ (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৬১)

বিপ্রলম্ভকে শ্রীরূপ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। এই শ্রেণী-বিভাগেও শ্রীরূপের মৌলিকতা বিশেষ কিছু নাই। নবম শতাব্দীর রুদ্রট বিপ্রলম্ভের ভাগ করিয়াছেন চারিটি—প্রথমানুরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। দশম শতাব্দীর আলঙ্কারিক ধনঞ্জয় 'দশরূপকে' 'মানপ্রবাসভেদেন' অর্থাৎ মান ও প্রবাস ভেদে বিপ্রয়োগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মম্মট বিপ্রলম্ভের শ্রেণী বলিয়াছেন পাঁচটি—অভিলাষ (পূর্বরাগ), বিরহ (বিরহোৎকণ্ঠিতার), ঈর্ষা (মান), প্রবাস ও শাপহেতুক। বোপদেব-প্রণীত মুক্তাফল গ্রন্থের কৈবল্যদীপিকা টীকায় হেমাদ্রি[১] বিপ্রলম্ভের চারি প্রকার ভেদ করিয়াছেন—

১। 'মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত দেবগিরির যাদববংশীয় রাজা মহাদেব ও রামচন্দ্রের সভায় হেমাদ্রি ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।' (গৌড়ীয়ার তিনঠাকুর: সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, পৃঃ ৫৭২)

'স চতুর্ধা পূর্বানুরাগ-মান-প্রবাস-বৈচিত্ত্যভেদাৎ।' অর্থ—সেই (বিপ্রলম্ভ) পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও বৈচিত্ত্যভেদে চারি প্রকার। 'রসার্ণব-সুধাকর'-প্রণেতা সিঙ্গভূপাল (ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর) বিপ্রলম্ভের ভেদ বলিয়াছেন চারি প্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। আমরা দেখিতেছি, শ্রীরূপ বিপ্রলম্ভের শ্রেণী-পরিকল্পনায় ধনঞ্জয়ের ন্যায় দুইটি ভেদ, মম্মটের মতো শাপহেতুক বা সিঙ্গভূপালের নির্দিষ্ট করুণকে স্বীকার করেন নাই। এই বিষয়ে হেমাদ্রির মতের সহিত শ্রীরূপের মতের আশ্চর্যজনক সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে।

শ্রীরূপের পরেও 'রসগঙ্গাধর'-প্রণেতা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর জগন্নাথ বিপ্রলম্ভের অনুরূপ বিভাগ করিয়াছেন—প্রবাস, অভিলাষ (পূর্বরাগ), বিরহ (গুরুজনদের নিকট লজ্জাবশতঃ নায়ক-নায়িকার প্রতিবন্ধকতা), ঈর্ষা (মান) ও শাপহেতুক। কবিকর্ণপূর 'অলঙ্কারকৌস্তুভে' বলিয়াছেন যে, শাপহেতুক ব্যাপারটি কেবল মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য। সুতরাং শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলার ক্ষেত্রে বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ; যথা—পূর্বরাগ, বিরহ (ভাবী, ভবন ও ভূত), ঈর্ষা (মান) ও প্রবাস। ভূত বিরহ ও প্রবাসের মধ্যে টীকায় ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিরহশেষে পুনর্বার কান্তের সহিত মিলন হইবে নায়িকার এইরূপ ভাবোদ্রেকে কালকৃত বিরহ বা ভূতবিরহ হয়; কিন্তু যেখানে কান্তের মথুরাগমন উপলক্ষে নায়িকা-মনে দেশ-ঘটিত বিরহ সেখানেই প্রবাসের সৃষ্টি। জগন্নাথ বা কবিকর্ণপূর শ্রীরূপের পরে শ্রীরূপ হইতে পূর্বোক্তরূপ পৃথক কথা বলিলেও, বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ সকলেই শ্রীরূপের পন্থানুসরণ করিয়া পদ প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং এই বিষয়ে আমরা শ্রীরূপের প্রভাব লক্ষ্য করি।

॥ পূর্ব্বরাগ ॥

'রসার্ণব-সুধাকর'-এ সিঙ্গভূপাল পূর্বরাগের সংজ্ঞা দিয়াছেন—

যৎ প্রেম সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণোদ্ভবম্।
পূর্বানুরাগঃ স জ্ঞেয়ঃ শ্রবণং তদ্‌গুণশ্রুতিঃ॥ (২।১৭২)

শ্রীরূপের 'উজ্জ্বলনীলমণি'তেও প্রায় অনুরূপ কথাতেই পূর্বরাগ-লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ—

'দর্শন' 'শ্রবণ' আদি সঙ্গমের পূর্বে।
দোঁহার রতি 'পূর্বরাগ' কহে কবি সর্বে॥ (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৬১)

সিঙ্গভূপাল যাহাকে পূর্বানুরাগ বলিয়াছেন, শ্রীরূপ তাহাকেই পূর্বরাগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সংজ্ঞার মধ্যে এইরূপ সামান্য পার্থক্য ব্যতীত আমরা অন্য কিছু দেখি না।

দর্শনজনিত পূর্বরাগ তিনভাবে জন্মাইতে পারে। শ্রীরূপ বলিয়াছেন—

সেই দরশন হয় তিন প্রকার।
সাক্ষাৎ চিত্রপট স্বপ্নদর্শন আর॥ (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৬১)

প্রথমতঃ, সাক্ষাৎ দর্শন। শ্রীরূপ-ব্যাখ্যাত এই বিষয়টির প্রভাবে অনেক পদকর্তা পদ লিখিয়াছেন।

জ্ঞানদাসের পদে রহিয়াছে—

কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে সেখানে ভুলিলুঁ বাটে
তিমিরে গরাসিল মোরে॥ (তরু ১২০)

জ্ঞানদাসের পদে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধার এই যে পথ ভুলিয়া যাওয়া, কৃষ্ণের কালো রূপের দ্বারা তিনি যেন আচ্ছন্ন হইলেন, ইহা পূর্বরাগেরই সূচক। এমন পূর্বরাগের সহিত বিদ্যাপতি-বর্ণিত পূর্বরাগের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বিদ্যাপতির পদে চটুলা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই ভালবাসিয়াছেন সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কালো রূপের অতলে একেবারে তলাইয়া যান নাই। শ্রীরাধা কৌশল করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার দেখিয়াছেন, দেখিয়া যেন পরখ করিয়া লইয়াছেন। বিদ্যাপতির সহিত জ্ঞানদাসের পূর্বরাগ পরিকল্পনার এই যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, এখানেই আমরা শ্রীরূপের প্রভাব অনুমান করি।

সাক্ষাৎ দর্শনে পূর্বরাগ জন্মাইবার বর্ণনা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর আছে। সুতরাং এই বিষয়ে শ্রীরূপের প্রভাব খোঁজা ঠিক নহে।

দর্শনজনিত পূর্বরাগের উপায় চিত্রপট। চিত্রপটদর্শনে শ্রীরাধার যে পূর্বরাগ জন্মায় তাহা শ্রীরূপ কেবল 'উজ্জ্বলনীলমণি'তেই বলেন নাই, 'বিদগ্ধমাধব' গ্রন্থাদিতেও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার প্রভাবে বহু পদকর্তা পদ-রচনায় প্রয়াস পাইয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদের পদকর্তা শেখরের পদে রহিয়াছে—

রহ রহ সখি ভাল করে দেখি
আঁখি না পিছলে মোর।
এই যে নাগর গুণের সাগর
বয়সে নবকিশোর॥

আলো সই কিবা সে দেখাইলে মোরে।
এই যে আকৃতি পিরীতি মুরতি
আন নাহি চাহি তোরে॥ (মাধুরী, ১।৮৬)

শ্রীরাধা সখী-প্রদর্শিত চিত্রপট দেখিয়া যে আর কাহাকেও চাহিতেছেন না, সেইখানেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে পূর্বরাগ ব্যক্ত হইতেছে।

শ্রীরূপোত্তর চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

আমি সে অবলা অখলা হৃদয়
ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাইল আনি॥
হরি হরি এমন কেনে বা হইল।
বিষম গড়ের আনল মাঝারে
আমারে ঢেকিয়া দিল॥ (কীর্তনানন্দ ৬৪, তরু ১৪৩)

বিশাখা-রচিত চিত্রপট দেখিয়া শ্রীরাধা পূর্বরাগে পড়িয়াছেন, তাঁহাকে যেন গড় দিয়া ঘেরা অগ্নির মধ্যে ঠেলিয়া ফেলা হইয়াছে। বিশাখা-রচিত চিত্রপটের কথায় শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধবের প্রথমাঙ্কের প্রভাব তো আছেই, উজ্জ্বলনীলমণির প্রভাবেও এমন চিত্রপটদর্শন-জনিত পূর্বরাগকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরূপের পূর্ববর্তী কোন পদকারের, এমন কি বিদ্যাপতির পদাবলীতেও চিত্রপটদর্শনে শ্রীরাধার পূর্বরাগের কথা নাই।

ঘনশ্যাম দাসও শ্রীরূপের প্রভাবে লিখিয়াছেন—

যে দেখেছি যমুনার তটে।
সেই দেখি এই চিত্রপটে॥
যার নাম কহিল বিশাখা।
সেই এই পটে আছে লিখা॥ (তরু ৩৬)

তৃতীয় উপায় স্বপ্নদর্শন। এই বিষয়েও শ্রীরূপের মৌলিকতা অনস্বীকার্য। শ্রীরূপের পূর্ববর্তী কোন পদকারই স্বপ্নদর্শনে শ্রীরাধার পূর্বরাগ-উন্মেষের বিষয় লিখেন নাই।

শ্রীরূপের পরবর্তী কালে জ্ঞানদাস লিখিয়াছেন—

আমার বিতথা সে যে দেবতা
হাসিয়া ভুলিল রঙ্গে।
চন্দন বসন সব আভরণ
স্বপনে দিয়াছি অঙ্গে॥

এ বোল শুনিয়া ননদী ঠমকি
বেড়ায় আইখের ঠারে।
জ্ঞানদাস কহে ননদী শুনাতে
কিবা পরমাদ তোরে॥ (কীর্তনানন্দ, ৭৮)

জ্ঞানদাস আরও একটি পদে স্বপ্নদর্শনে শ্রীরাধার পূর্বরাগ-সঞ্চারের কথা বলিয়াছেন—

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কার নই॥ (তরু ১৪৪)

পদকর্তা ঘনশ্যাম দাস লিখিয়াছেন—

অলপ রজনী কি জানি কি খেণে
শুতিলু অলস দে।
কিবা অপরূপ স্বপনে দেখিলুঁ
না জানি নাগর কে॥

শ্রীকৃষ্ণকেই যে শ্রীরাধা স্বপ্নে দেখিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট নাগরের অপরূপ সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ। এই পদ-পরিকল্পনা শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণির উপর নির্ভর করিয়াই সম্ভব হইয়াছে।

নটবর দাসের পদে রহিয়াছে—

কালিন্দি কাল সলিল কুল মাধবি-
কুঞ্জে মধুপকুল গাবইরে।
কোকিল কুহরে কপোত শুকসারিক
শিখিকুল উনমত বাবইরে॥
সহচরি আজু স্বপনে হাম দেখলি রে।
তহি এক কান্ত ধ্বান্ত পুঞ্জ সম
পন্থ রোধি মোহে রাখলি রে॥
তব ধরি মঝু মন সঘন উচাটন
মদন দহন তনু দাহই রে।
কহয়ে নটবর দাস পরশ রস লালসে
রসনিধি না হই রে॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৫৬)

পদটিতে শ্রীরূপের 'স্বপ্নে দৃষ্টা সহচরি' ইত্যাদি শ্লোকের অনুসরণক্রমে স্বপ্নদর্শনে নায়িকার পূর্বরাগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

'শ্রবণ'-জনিত পূর্বরাগের বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ 'বন্দি দূতী সখী বক্ত্রাৎ গীতাদেশ্চ শ্রুতির্ভবেৎ' বলিয়া যে চতুর্বিধ শ্রবণের কথা বলিয়াছেন, তাহাই ছন্দে গাঁথিয়া 'রসবিলাসবল্লী'-কার বলিয়াছেন—

বন্দী দূতি সখী আর গীতাদি শ্রবণ।
চতুর্বিধ শ্রবণ এই শুন সর্বজন॥ (পৃঃ ৫৬)

এখানে আমরা দেখিতেছি, মুরলীধ্বনি-শ্রবণে শ্রীরাধার পূর্বরাগের উন্মেষের কথা শ্রীরূপ যেন বাদ দিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। 'গীতাদেশ্চ' অর্থাৎ 'গীতাদি হইতে' বলিয়া বংশীগীতকেও হয়তো তিনি বুঝাইয়াছেন; কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে বংশীধ্বনির কথা আছে শ্রীরূপ জানেন, বিদগ্ধমাধব নাটকে তিনি নিজেও বংশীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধার পূর্বরাগোন্মেষের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার পরে তিনি কোনক্রমেই উজ্জ্বলনীলমণিতে বংশীগীতকে বিস্মৃত হইতে পারেন না। তবে পরবর্তী ব্যাখ্যাতারা কিছু অসুবিধায় পড়িয়াছেন, কারণ গীতাদির দৃষ্টান্তে শ্রীরূপ বংশীগীতের দৃষ্টান্ত দেন নাই।

উজ্জ্বলনীলমণিতে স্পষ্টতঃ যে চতুর্বিধ শ্রবণের কথা রহিয়াছে, সেইগুলির মধ্যে প্রথম 'বন্দিমুখে শ্রবণ'। ভাট বা বন্দিমুখে শ্রবণ-বিষয়ক পূর্বরাগের পদ পদবলীসাহিত্যে বিশেষ দেখা যায় না, তবে যে একেবারে নাই তাহাও নহে।

নরহরি-ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

বেশ বিরচি বিশেষ সখি মঝু
ভেল হিয়কি হুলাস।
তুরিত নিরজনে যাই বৈঠলু
রহি ন দোসর পাশ॥
হেরি তহি নব বল্লবীচয়
চপল অন্তর মোর।
তোড়ি কুসুম সু- হার গুথন
লাগি কৌতুক জোর॥
সোই সময় সু দূর রহু বর
বন্দিগণ মন মাতি।
পরসপর উহ শ্যাম সুন্দর
চরিত ভণ কত ভাঁতি॥

তাক শুনক এ শ্রবণ পরশত
হরল সকল গেয়ান।
হোয়ল অতি বিপ- রীত অন্তর
মরম নরহরি জান॥

(গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১১০)

পদের মধ্যে আমরা দেখিতেছি, শ্রীরাধা যখন নির্জনে বসিয়া আপন মনে মালা গাঁথিতেছেন, তখন দূর হইতে বন্দিদের শ্যাম-বন্দনাগান তাঁহার কানে ভাসিয়া আসিয়াছে। এই বন্দনাগানই শ্রীরাধার 'হরল সকল গেয়ান' সমস্ত জ্ঞান হরণ করিল, তিনি পূর্বরাগে অনুলিপ্তা হইলেন। ঘনশ্যাম এইভাবে যে বিরলদৃষ্টান্ত বিষয়ে পদ রচনা করিয়াছেন, ইহার পিছনে শ্রীরূপের প্রভাব আছে।

নীলকণ্ঠ একটি পদে লিখিয়াছেন—

ভাট গণে মহারাজ নন্দভবন সঞে
আনল ঘোষ সমাজ।
অভিমন্যু ঘেরি সকল গোপগণ
বৈঠলি করই সুসাজ॥
ভাটক নাম শুনি ধনী তুরিতহি
বৈঠল উপর অটালি।
আধ কবাট মোচন করি শুনত
সঙ্গী রঙ্গী সব আলি॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, ৭১৩)

শ্রীরাধাকে ভাটমুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করাইবার জন্য পদকর্তা এইভাবে যে অট্টালিকার উপরে উপবেশন করাইলেন, ইহার পিছনে শ্রীরূপ-রচিত কেশবাষ্টকের প্রভাব রহিয়াছে।[১] শেষপর্যন্ত ভাটের মুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান শুনিয়া শ্রীরাধা পূর্বরাগে আবদ্ধ হইলেন। পদকর্তা লিখিয়াছেন—শ্রীরাধা সখীদের কাছে স্বীকার করিতেছেন—

শুনলুঁ হাম শ্রীকৃষ্ণ নাম তছু
সোই হরল মঝু চিত।

১। উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবক সঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্॥

শ্রীরাধা যে ভাটমুখে শুনিয়াই চিত্ত হারাইলেন, এই বিষয়ে পদকর্তা শ্রীরূপের 'উজ্জ্বলনীলমণি'কে অনুসরণ করিয়াছেন।

শ্রবণজ পূর্বরাগের দ্বিতীয় উপায় 'দূতীমুখে শ্রবণ'। শ্রীরূপ 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা ছন্দোবন্ধনে ধরিতে গিয়া শচীনন্দন লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণকে দূতী বলিতেছে—

তোমার দূতিকা হয়া তারার নিকটে যায়া
তোমার রূপ কহিলাম আমি।
তারার কণ্ঠ হল রুদ্ধ অঙ্গ হল ভাবে বদ্ধ
কহিতে নারিল কিছু বাণী॥
(উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৬২)

ঘনশ্যাম কিন্তু শ্রীরূপ-প্রদত্ত এই দৃষ্টান্তটি লন নাই। তিনি শ্রীরূপের তত্ত্ব-ব্যাখ্যান অনুসরণ করিয়া দূতীমুখে-শ্রবণে শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন।

ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

মঝুমুখে শুনইতে তুয়া পরসঙ্গ।
নিবিড় পুলক ভরু রাইক অঙ্গ॥
অবনত নয়ন বয়ন রহু গোরি।
প্রেমক গহন দহন দহে ভরি॥
পুছইতে তুয়া কাহিনী অভিলাষ।
কণ্ঠহি গদগদ রোধল ভাষ॥
ইথে জানি মাধব মালবিয়ান।
ঘনশ্যাম দাস রহত পরমাণ॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৫৬-৫৭)

'কৃষ্ণকীর্তন'-এর শ্রীরাধা দূতীর সংবাদ প্রথমে শুনিয়া অপমান করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। উহার সহিত এই ভাবের কি ঘোরতর পার্থক্য! শ্রীকৃষ্ণ দূতীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূতী ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দিতেছে যে, তাহার মুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ শোনামাত্র শ্রীরাধার সর্বাঙ্গ নিবিড় পুলকে ভরিয়া গেল। প্রেমের অতি গূঢ় দহনে শ্রীরাধার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল, তিনি লজ্জাবনতমুখী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিতে গেলে শ্রীরাধার কণ্ঠ গদ্‌গদভাবে রুদ্ধ হইয়া গেল। এই সমস্তই দূতীমুখে শ্রবণে শ্রীরাধার পূর্বরাগ।

নরহরি চক্রবর্তীর পদেও রহিয়াছে—

কি কব সজনি মেঘঘটা পানে
চাহিতে উলস হিয়া।
অতি ত্বরাতরি নিরজনে ওগো
একাকী বসিলু গিয়া॥
চাঁপা ফুলকলি তুলিয়া কত না
যতনে গাঁথিয়া হার।
সে সময়ে আমা পাশে আইসে মোর
দূতী সুচরিত তার॥
মধুর মধুর হাসি ভাষি মুখে
মো সহ কহয়ে কথা।
এই মেঘ পারা মুরুতি সুন্দর
জনেক আছয়ে এথা॥
ইহা শুনি মন অবশ হইল
তারে না জানিলু কে?
নরহরি ভণে মনে অনুমানি
রমণীমোহন সে॥ (গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১১০)

শ্রীরাধা মেঘসন্দর্শনে উল্লসিত হইয়া নির্জনে গিয়া বসিয়াছেন, চাঁপাফুলের কলি তুলিয়া মালা গাঁথা সুরু করিয়াছেন। এই অবসরে দূতী শ্রীরাধার পাশে গিয়া বলিয়াছে এমন মেঘবর্ণ সুন্দর একজন পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ) আছেন। দূতীর কথা শুনিয়াই পূর্বরাগ সঞ্চারে শ্রীরাধার দেহ অবশ হইল, তিনি শুধু প্রশ্ন করিলেন, তিনি কে জানিলাম না তো। দূতীমুখে শোনার ফলে এমন পূর্বরাগ উজ্জ্বলনীলমণিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

'দূতীমুখে শোনা'র পর 'সখীমুখে শ্রবণ'। 'সখীবক্ত্রাদ্‌যথা' বলিয়া শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

যাবদুন্মদচকোরলোচনা মন্মুখাত্তব কথামুপাশৃণোৎ
তাবদঞ্চতি দিনং দিনং সখী কৃষ্ণ শারদনদীব তানবম্॥
(পূর্বরাগ, পৃঃ ৮৪২)

অর্থাৎ—হে কৃষ্ণ, উন্মদচকোরলোচনা সখী (শ্রীরাধা) যখনই আমার মুখ হইতে তোমার

কথা শুনিলেন, তখন হইতেই দিনে দিনে তাঁহার দেহ শরৎকালের নদীর ন্যায় ক্ষীণ হইতেছে।

শচীনন্দন উপরি-ধৃত শ্লোকটির অনুবাদ করিয়াছেন—

মোর সহচরী তোমার এ রূপ
শুনিয়া বচনে মোর।
সেদিন অবধি তনু অতি ক্ষীণ
ভাবিয়া না পাই ওর॥

(উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৬৩)

শচীনন্দনের অনুবাদে শ্লোকের মূলভাবটি ঠিকই আছে, কিন্তু কবিত্বপূর্ণ দুইটি কথা বাদ গিয়াছে। শ্রীরাধার বিশেষণ 'উন্মদচকোরলোচনা' কথাটি অনুবাদে অনুপস্থিত, 'শরৎকালের নদীর ন্যায়' যে শ্রীরাধার কলেবর ক্ষীণ হইতেছে তাহাও বলা হয় নাই।

ঘনশ্যাম কিন্তু শ্রীরূপের শ্লোকের প্রায় সব কয়টি কথা বলিয়াও মৌলিক এক পদ রচনা করিয়াছেন—

কহইতে বচন বয়নে নাহি যাওয়ে।
তুয়া বিনু রাইক আন না ভাওয়ে॥
নিরুপম লাবণি রূপ গুণ তোরি।
যব ধরি মঝু মুখে শুনল গোরি॥
দিন অনু তব ধরি ভেলী অতি ক্ষীণ।
শরত সরিতি জনু নীর বিহীন॥
ঝামরু ভেল অতি কমল বয়ান।
ঘনশ্যাম করু তহি বিজন আদান॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৫৭)

ঘনশ্যামের এই পদে 'উন্মদচকোরলোচনা'র স্থলে 'কমল বয়ান' বলা হইয়াছে। পদটিতে সখীমুখে শ্রবণে শ্রীরাধার পূর্বরাগের বিষয়টি সুন্দরভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে।

নরহরি চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—

কি বলিব ওগো দিবা অবসানে
হৈল কি চঞ্চল হিয়া।
অতি ত্বরাতরি বেশ বনাইতে
বিরলে বসিলু গিয়া॥

সাধে সাধে সখী কেশ খসাইতে
কুসুমে কবরী বান্ধে।
কুঙ্কুম কস্তুরী চন্দনেতে চিত্র
রচয়ে বিচিত্র ছান্দে ॥
অঞ্জনে রঞ্জই আঁখিযুগ গলে
দিয়া নীলমণি হার।
ধীরে ধীরে কহে তার গুণগণ
অঞ্জন বরণ যার ॥
আহা মরি মেন হেন নাহি শুনি
কিবা সে অমিয়া ধারা।
নরহরি জানে কানে সামাইয়া
করিলে বাউরী পারা ॥

(গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১১০-১১১)

পদে শ্রীরাধা যখন বিরলে কবরী-রচনায় ব্যস্ত, তখন সখী তাঁহার নিকট অঞ্জনবরণ শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিল। শ্রীকৃষ্ণের গুণগান শ্রীরাধার কর্ণে অমৃতধারার ন্যায় প্রতিভাত হইল। পদকর্তা স্বয়ং বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীরাধার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উন্মাদিনী করিয়া দিল। শ্রীরাধার এমন অবস্থা পূর্বরাগ-উন্মেষের ফল এবং সখীমুখে শ্রবণেই এই পূর্বরাগ জন্মিয়াছে।

'গীতাদি শ্রবণে' পূর্বরাগ সঞ্চারিত হইবার বিষয়ে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, কোশল-রাজসভায় নিজের ইচ্ছায় আসিয়া নারদ শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণাবলী বীণাসহযোগে গান করিতে থাকিলে, অন্তঃপুরস্থ চন্দ্রশালার গবাক্ষ হইতে নাগ্নজিতী তাহা শুনিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া নিজের সখীকে ঔৎসুক্যভরে প্রশ্ন করিলেন—হে সখি, আমার পিতার সভায় নিপুণবুদ্ধি মুনি বীণাযোগে সজলনয়নে কাহার কথা লইয়া যে গান করিতেছিলেন, তাহা শুনিয়া তখন হইতেই আমারও চক্ষুতে অশ্রু-প্রবাহ বহিতেছে, বল দেখি—তিনি কে?

শ্রীরূপ-প্রদত্ত এই দৃষ্টান্তটি না লইলেও তাঁহার উপস্থাপিত তত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নরহরি চক্রবর্তী পদ লিখিয়াছেন—

কো উহ শ্যাম সুজান।
কি মধুর মধুর তাক গুণমাধুরি
কো শুনি ধবর পরাণ ॥

গায়ক সুর পর- বীণ বীণসহ
গায়ত কত কত ভাঁতি।
লাগল কুবুধি সাধে কত যতনহি
দূরে শুনলু শ্রুতি পাঁতি॥
চলইতে চরণ অচল চিত চঞ্চল
ধৈরজ রহব কি মোর।
লোচন বারি নিঝরে ঝরু ঝর ঝর
নহই নিবারণ থোর॥
হোয়ল বিষম কি করব প্রাণসখি
আন শ্রবণ নাহি ভায়।
নরহরি ভণ তছু ঐছে রীত ধনি
তা বিনু বিফল উপায়॥

(গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১১১)

প্রবীণ গায়ক বীণসহ শ্যামের যে গুণমাধুরি গান করিয়াছে, দূর হইতে কান পাতিয়া শ্রীরাধা তাহা শুনিয়াছেন। ওই শ্রবণের পর শ্রীরাধার চরণ আর চলে না, চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অশ্রু অবিশ্রান্ত ধারায় গড়াইয়া পড়িতেছে। শ্রীরাধার যে কি বিষম অবস্থা হইল, তিনি অন্য কিছুও শুনিতে পারেন না! এই অবস্থা শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট পূর্বরাগ, অন্য কিছু নহে।

গীতাদি বলিতে শ্রীরূপ গীত ভিন্ন অন্য কিছুকেও যে বুঝাইয়াছেন, তাহা নরহরি চক্রবর্তীর দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। পদকার নরহরি চক্রবর্তী 'শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়' গ্রন্থে (পৃঃ ১১১) প্রথমে 'অথ গীতাদ্ যথা'—বলিয়া 'কো উহ শ্যাম সুজান' ইত্যাদি পদ রচনা করিয়াছেন, পরে 'অথাদি পথে'—'আকস্মিক শুকমুখ বংশীত্যাদি' লিখিয়া তিনি ক্রমান্বয়ে অকস্মাৎ (পৃঃ ১১১), শুকমুখ (পৃঃ ১১১) ও বংশীশ্রবণে (পৃঃ ১১২) পূর্বরাগ সঞ্চারের পদ রচনা করিয়াছেন। এখানে শ্রীরূপের পরোক্ষ প্রভাব রহিয়াছে বলা যায়।

দর্শন ও শ্রবণ-জনিত পূর্বরাগ বর্ণনার পরে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

অপি মাধবরাগস্য প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি।
আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তা স্যাচ্চারুতাধিকা॥

(উজ্জ্বলনীলমণি, পৃঃ ৮৪৩)

অর্থাৎ—

যদ্যপি মাধব-রাগে প্রাখর্য সম্ভবয় ।
আদৌ নায়িকা-রাগে মাধুর্য বাঢ়য় ॥ (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৬৩)

মূলের 'মৃগাক্ষী' স্থলে 'নায়িকা' শব্দটি বসাইলেও 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা'-কার অনুবাদে অন্যবিধ ত্রুটি করেন নাই।

মাধবের রাগের প্রাখর্য সম্ভব হইলেও, নায়িকা শ্রীরাধার পূর্বরাগ মাধুর্যের জন্যই পূর্বে বর্ণিত হইবে—শ্রীরূপ এই কথা যে বলিলেন, ইহা হইতে আমরা একটি বিষয়ে নির্দেশ পাই। পদবিন্যাসের সম্পর্কে শ্রীরূপ জানাইয়াছেন, পূর্বে শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদাবলী বিন্যস্ত করিয়া, পরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ-বিষয়ক পদাবলী স্থাপন করিতে হইবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে না হইলেও, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার বিষয়ে এইরূপ কথা প্রাচীনেরাও কেহ কেহ বলিয়াছেন; তাঁহাদের পন্থানুসরণেই শ্রীরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদাবলী বিষয়ে এমন নির্দেশ দিয়াছেন।

রাধামোহন ঠাকুর-সঙ্কলিত পদামৃতসমুদ্রে (বহরমপুর সংস্করণ) প্রথমে শ্রীরাধার পূর্বরাগ (২৬-সংখ্যক পৃষ্ঠা হইতে ৬৫-সংখ্যক পৃষ্ঠা পর্যন্ত) বর্ণিত হইয়াছে, পরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ (৮১ পৃষ্ঠা হইতে ১২১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) রহিয়াছে। 'শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়' সঙ্কলন করিতে গিয়া নরহরি চক্রবর্তী স্পষ্টই বলিয়াছেন—

শ্রীরাধিকা-পূর্বরাগ রসের পাথার।
প্রথমে গাইয়ে শ্রীউজ্জ্বল-অনুসার ॥ (গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ৯৮)

শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়ের ৯৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শ্রীরাধার বহুবিধ পূর্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে, তৎপরে ২৮৬ পৃষ্ঠা হইতে খণ্ডিত গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা ৪২১ পর্যন্ত পরিসর শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদাবলীতে পরিপূর্ণ। গৌরসুন্দর দাস কীর্তনানন্দের ৪৭-সংখ্যক পৃষ্ঠা হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াদের পূর্বরাগ বিষয়ক পদাবলী সঙ্কলন করিয়া ১১২ পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বিষয়ক প্রথম পদটি স্থাপন করিয়াছেন। পদকল্পতরুতেও বৈষ্ণবদাস প্রথম শাখার দ্বিতীয় পল্লবে শ্রীরাধার পূর্বরাগ বিষয়ক পদপুঞ্জ বিন্যস্ত করিয়া তৃতীয় পল্লবে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদাবলী ধরিয়াছেন এবং তাহার পরে এই ধারাতেই ওই প্রথম শাখার অষ্টম পল্লব পর্যন্ত চলিয়াছেন। এইসব দৃষ্টান্তে আমরা শ্রীরূপের নির্দেশের কার্যকরত্ব স্পষ্টই বুঝিয়া লইতে পারি।

পূর্বরাগের সঞ্চারিভাব বর্ণনায় শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

অত্র সঞ্চারিণো ব্যাধিঃ শঙ্কাসূয়া শ্রমঃ ক্লমঃ।
নির্বেদৌৎসুক্যদৈন্যানি চিন্তানিদ্রাপ্রবোধনং ॥
বিষাদো জড়তোন্মাদো মোহমৃত্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
(উজ্জ্বলনীলমণি, পৃঃ ৮৪৪)

অর্থাৎ—

ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, সঞ্চারি হয় তার।
শ্রম, ক্লম, নির্বেদ, ঔৎসুক্য দৈন্য আর॥
চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধন, করয়ে বিষাদ।
মোহ, মৃত্যু আদি করি জড়তা উন্মাদ॥
(উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৬৩-১৬৪)

এই মহাভাবগুলি স্থায়িভাবের সহিত স্বাভাবিকভাবেই আসে, শ্রীরূপ চিন্তাবলে এই-গুলিকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। স্থায়িভাব ছাড়িয়া সঞ্চারিভাবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পদকারগণ পদ লিখিয়াছিলেন এমন মনে হয় না, সেইজন্য এই বিষয়ে প্রভাবানুসন্ধান না করাই বিধেয়।

॥ পূর্ব্বরাগের শ্রেণী ॥

পূর্বরাগের শ্রেণী সম্বন্ধে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

প্রৌঢ়ঃ সমঞ্জসঃ সাধারণশ্চেতি সতু ত্রিধা। (উজ্জ্বলনীলমণি, পৃঃ ৮৪৪) অর্থাৎ—সেই (পূর্বরাগ) প্রৌঢ়, সমঞ্জস ও সাধারণ—এই তিন প্রকার।

প্রৌঢ় পূর্বরাগ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীরূপ 'সমর্থরতিরূপস্তু' ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—সমর্থারতিতে জাত পূর্বরাগকে প্রৌঢ় বলে। এই প্রৌঢ়ে লালসা হইতে মরণ পর্যন্ত দশা[১] হয়। পূর্বোক্ত সঞ্চারিভাবগুলির উৎকটত্বের জন্য অনেক প্রকার হইলেও, প্রাচীন পণ্ডিতেরা সংক্ষেপে এই প্রৌঢ়ের দশ দশা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুরোধেই ওই দশ অবস্থার লক্ষণ বলা হইতেছে।

১। সূফী সাধনপন্থার কিছু প্রভাবেই বোধ করি এই দশার পরিকল্পনা। জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"In...Sufi worship, Lyrics by eminent Sufi poets (in Persian, of course) are sung, and some members of the congregation are so worked up that frequently they fall into a hysterical or fainting fit, or into a trance; and when this takes place, the particular passage in the song which synchronized with the trance is repeated with greater vehemence near the postrate body of the worshipper with a view to bring him round. A similar thing is in evidence in Chaitanya Vaishnavism. What is particularly noteworthy is that this ecstatic fit or trance is known in the terminology of Tasawwuf as Hāl, which is an Arabic word meaning simply 'state, or condition'; and the word in use among the Bengal Vaishnavas is the Sanskrit Daśā, which also means exactly the same thing. It should be enquired into how old is Hāl in Sufism, and Daśā in Bengal Vaishnavism; but one thing is clear—this special sense of the word is very late in Sanskrit, and appears to be confined only to Bengal."

—*Islamic Mysticism*, Iran and India: Indo-Iranica, Vol. I, Oct. 1946
—Dr S. K. Chatterjee, M. A., D. Litt.

॥ পূর্ব্বরাগের দশ দশা ॥

শ্রীরূপ যে প্রাচীন পণ্ডিতদের বর্ণিত দশ দশার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, সেই বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখি, 'প্রতাপরুদ্র যশোভূষণ' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে বিদ্যানাথ বলিয়াছেন—

> চক্ষুঃ প্রীতির্মনঃ সঙ্গঃ সঙ্কল্পোঽথ প্রলাপিতা।
> জাগরঃ কার্শ্যমরতির্লজ্জাত্যাগোঽথ সংজ্বরঃ॥
> উন্মাদো মূর্চ্ছনং চৈব মরণং চরমং বিদুঃ।
> অবস্থা দ্বাদশ মতাঃ কামশাস্ত্রানুসারতঃ॥

অর্থাৎ—চক্ষুপ্রীতি, মানস আসক্তি, সঙ্কল্প, প্রলাপ, জাগরণ, কৃশতা, আরতি, লজ্জাত্যাগ, সংজ্বর, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মরণ—কামশাস্ত্র অনুসারে এই দ্বাদশ প্রকার অবস্থা জানিবে।

'ভাব-প্রকাশে' আছে—

> দশধা মন্মথাবস্থা ভবেদ্ দ্বাদশধাঽপি বা।
> ইচ্ছোৎ কণ্ঠাভিলাষশ্চ চিন্তা স্মৃতি গুণস্তুতি॥
> উদ্বেগোঽথ প্রলাপঃ স্যাদুন্মাদো ব্যাধিরেব চ।
> জাড্যং মরণমিত্যান্তে দ্বে কৈশ্চিদ্বর্জিতে বুধৈঃ॥

অর্থ—কামাবস্থা দশ প্রকার, কখনও বা দ্বাদশ প্রকার হয়। এইগুলি ইচ্ছা, উৎকণ্ঠা, অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণস্তুতি, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ ও ব্যাধি। জাড্য ও মরণ এই দুইটিকে কোন কোন পণ্ডিত বর্জন করেন।

কক্কোক-কৃত 'রতিরহস্য'-এ দশ দশা বর্ণিত হইয়াছে—

> নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ।
> নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ।
> উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতা স্মরদশা দশৈব স্যুঃ॥

অর্থাৎ—স্মরদশা দশ প্রকার—নয়নপ্রীতি, চিত্তাসঙ্গ, সঙ্কল্প, নিদ্রাহীনতা, কৃশতা, বিষয়-নিবৃত্তি (নির্বেদ), ত্রপানাশ (জড়তা), উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু।

দশরূপকেও দশবিধ দশার কথা উল্লিখিত।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, দশটি দশা গণনায় সত্যই শ্রীরূপের মৌলিকতা নাই।

শ্রীরূপ দশটি দশা কী কী বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

> লালসোদ্বেগজাগর্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু।
> বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥

(উজ্জ্বলনীলমণি, পৃঃ ৮৪৫)

অর্থাৎ—লালসা, উদ্বেগ, জাগর্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশা।

শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট এই দশাগুলি পূর্বোল্লিখিত আলঙ্কারিকদের বর্ণিত দশার সহিত আমরা যদি তুলনা করি, তাহা হইলে দেখি, এই বিষয়ে শ্রীরূপের অবশ্যই মৌলিকতা রহিয়াছে। সামান্য নয়নপ্রীতিকে শ্রীরূপ স্বতন্ত্র একটি দশার স্থান দেন নাই, 'রতিরহস্যো'ক্ত বিষয়নিবৃত্তিরূপ নির্বেদকেও যথাযথভাবে স্বীকার না করিয়া তাহা অপেক্ষা ব্যাপকতর বৈয়গ্র্যকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট দশ দশার প্রভাব পদাবলীসাহিত্যে যথেষ্ট আছে।

প্রথম দশা 'লালসা'। ইহার স্বরূপ-বিশ্লেষণে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

অভীষ্টলিপ্সয়া গাঢ়গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।
অত্রৌৎসুক্যং চপলতা ঘূর্ণাশ্বাসাদয়স্তথা॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৪৬)

শচীনন্দন অনুবাদ করিয়াছেন—

অভীষ্ট লাভের লাগি গাঢ় লোভ হয়।
'লালসা' বলিয়া তারে রসশাস্ত্রে কয়॥
লালসাতে ঔৎসুক্যের চপলতা আর।
ঘূর্ণা, নিশ্বাস আদি সঞ্চারি বিকার॥ (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৬৪)

শ্রীরূপের এই পরিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নরহরি চক্রবর্তী পদ লিখিয়াছেন—

হেদেহে রসিকরাজ।
হরিলে হরিণী- নয়নীর মন
করিলে বিষম কাজ॥
অচপল মতি ধৃতি অতিশয়
কেবা না আদরে তারে।
চপলার পারা চঞ্চল হইল
সকল তেজিল দূরে॥
নানা মণিগণে খচিত যে হেন
আঙ্গিনা পানে না যায়।
সে নব কদম্ব বন পানে চায়
পাগলী হইয়া ধায়॥

সখীগণ সহ কৌতুকেতে যার
লোচন কমল হাসে।
এবে সে নয়ন- বারি নিবারিতে
নারে নরহরিদাসে॥

(গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১১৫-১১৬)

পদে দেখা যাইতেছে 'হরিণনয়নী' শ্রীরাধা পূর্বে 'অচপলমতি' ছিলেন, কিন্তু রসকরাজ তাঁহার মন হরণ করিয়া লইলে তিনি (শ্রীরাধা) চপলার (বিদ্যুতের) মতো চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি 'নব কদম্ববন পানে' তাকান, পাগলিনীর ন্যায় সেই দিকে ধাবিত হন। ইহাতে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণসহ মিলনের ঔৎসুক্যই প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কাছে না পাইয়া যে ক্রন্দন করেন, তাহাতে শ্রীরূপের 'ঘূর্ণা নিশ্বাসাদি' বিষয় প্রশ্রয় পাইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখি, নরহরি যেন শ্রীরূপের লালসা-লক্ষণ মিলাইয়া পদ লিখিয়াছেন।

ঘনশ্যামের পদে রহিয়াছে—

সখীগণ সঙ্গে নাহি হাস পরিহাস।
অনুখন ধরণী শয়নে অভিলাষ॥
এ হরি যব ধরি পেখল তোয়।
তদবধি দিনে দিনে ঐছন হোয়॥
নয়ন কমলে জল গলয়ে সদায়।
বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গায়॥
তঁহি যদি প্রিয়সখা আওত কোই।
চরণে লিখত মহী নিশবদ হোই॥
যতনে পুছিয়ে যব মরমক বোল।
উতর না দেই রোয় উতরোল॥
কিএ পুন আছয়ে হিয়-অভিলাষ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস॥

(অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী ১৯৭, তরু ১৫৫, কীর্তনানন্দ ৮৫)

হরিকে দর্শন করার পর শ্রীরাধা যে নিয়ত অশ্রু বিসর্জন করেন, বিরলে বসিয়া হরির গুণগান করেন, ইহাতে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার উৎসুক্যই প্রকাশ পায়। কেহ যখন সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখন প্রেমবতী শ্রীরাধা নিঃশব্দে মাটিতে পায়ের দাগ

কাটেন, ইহাতে তাঁহার গোপন আকাঙ্ক্ষা ও চপলতা প্রকাশিত। শ্রীরূপ-বর্ণিত পূর্বরাগের লালসা দশার কয়েকটি লক্ষণই আমরা এই শ্রীরাধার মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছি।

দ্বিতীয় দশা 'উদ্বেগ'। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিঃশ্বাসচাপলে।
স্তম্ভশ্চিন্তাশ্রু-বৈবর্ণ্য-স্বেদাদয় উদীরিতাঃ॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৪৮)

অর্থাৎ—মনের চাঞ্চল্য উদ্বেগ; ইহাতে নিশ্বাস, চাপল্য, স্তম্ভ (স্তব্ধতা), চিন্তা, অশ্রু, বিবর্ণতা, স্বেদ প্রভৃতি উদিত হয়।

'উদ্বেগ' বিষয়টি লইয়া গোবিন্দদাস পদ রচনা করিয়াছেন—

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে
লোচন মন তুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি আগি জলু অন্তরে
জীবন রহ কিএ যাব॥
মাধব তোহে কি কহব করি ভঙ্গী।
প্রেম অগেয়ান দহনে ধনী পৈঠলি
জনু তনু দহত পতঙ্গী॥
কহত সংবাদ কহই না পারই
কাহে বিশোআসব বালা।
অনুখন ধরণী- শয়নে কত মেটব
সুতনু অতনু শর-জ্বালা॥
কালিন্দীকূল কদম্বক কানন
নামে নয়নে ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব
কৈছে জীঅবি বরনারী॥

(ক্ষণদা ১৪।৪, সমুদ্র ৫২, তরু ১৫৮)

দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ হেরিতেই শ্রীরাধার চক্ষু ও মন দুই তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রতি ধাবিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ পাওয়ার জন্য শ্রীরাধার অন্তর জ্বলিয়া

যাইতেছে। এইসব কথায় শ্রীরাধার মনের চঞ্চলতা প্রকটিত হইয়াছে। উদ্বেগের লক্ষণও শ্রীরাধার মধ্যে দেখা যাইতেছে, তিনি অনুক্ষণ ধরণী-শয়নে আছেন, ইহার দ্বারা স্তব্ধতা ব্যঞ্জিত। কদম্বকাননের নামোল্লেখেই শ্রীরাধা অশ্রু বিসর্জন করেন, এই অশ্রু উদ্বেগের অন্যতম লক্ষণ।

নরহরি-ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

মাধব! কি কহব বয়নে।
যাই নিরিখ নিজ নয়নে॥
সো ধনী সহচরী পাশে।
দগধয়ে মদন-হুতাশে॥
যতনে না ধৈরজ ধরই।
ঝর ঝর লোচন ঝরই॥
কহইতে বাত না কহয়ে।
নিশসি মৌন গহি রহয়ে॥
তনু-রুচি কনক-কসেলা।
সো কাজর-সম ভেলা॥
ইথে ঘনশ্যাম সন্দেহা।
কৈছে ধরব অব দেহা॥ (গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১১৭)

পদটির মধ্যে দেখা যাইতেছে, শ্রীরাধা 'মদন-হুতাশে' দগ্ধ হইতেছেন; তিনি চেষ্টা করিয়াও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিতেছেন না, অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে চঞ্চলতা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি ঝর ঝর ধারায় অশ্রুপাত করিতেছেন। 'নিশসি মৌন গহি রহয়ে' ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, শ্রীরাধা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন। শ্রীরাধার 'কনক-কসেলা' 'তনু-রুচি' কষিত কাঞ্চনের মতো দেহের দীপ্তি কাজরের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ দেহে বৈবর্ণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং আমরা ঘনশ্যামের এই পদে শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট উদ্বেগ দশার অধিকাংশ লক্ষণেরই সন্ধান পাইতেছি। ঘনশ্যাম শ্রীরূপের লক্ষণ-বিশ্লেষণ সম্মুখে রাখিয়াই পদটি লিখিয়াছেন।

প্রৌঢ় পূর্বরাগের তৃতীয় দশাটি হইতেছে 'জাগর্যা'। এই 'জাগর্যা'র প্রসঙ্গে শ্রীরূপের উক্তি—নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্যাস্তম্ভাশোষগদাদিকৃৎ।

অর্থ—নিদ্রার ক্ষয়কে জাগর্যা বলে। এই জাগর্যায় স্তম্ভ, শোষ ও রোগাদি উৎপন্ন হয়।

কবিশেখর লিখিয়াছেন—

তুহু মন মোহন কি কহব তোয়।
মুগধিনী রমণি তোহারি লাগি রোয়॥
নিশি দিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম।
থরহরি কাঁপি পড়ই সোই ঠাম॥
যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজ উঠয়ে তব রোয়॥
সখীগণ যত পরবোধই তায়।
তাপিনী তাপ ততহি নাহি ভায়॥
ইহ কবিশেখর তাহে উপায়।
রচইতে তবহি রজনি বহি যায়॥ (তরু ১৬০)

মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধা 'নিশি দিশি জাগি' নাম জপ করেন। তিনি 'থরহরি কাঁপি' যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানেই পড়িয়া যান, ইহা স্তম্ভেরই পূর্ব লক্ষণ। মধ্যরাত্রে শ্রীরাধা ক্রন্দন সুরু করেন; সখীরা যতই প্রবোধ দিক, তাপিনী শ্রীরাধার হৃদয়োত্তাপ কিছুতেই বিদূরিত হয় না। এই সমস্ত জাগর্যা দশার লক্ষণ। পদটি শ্রীরূপের তত্ত্বব্যাখ্যার প্রভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

নরহরি চক্রবর্তী 'গীতচন্দ্রোদয়ে' 'উজ্জ্বলনীলমণি' হইতে জাগর্যা দশার লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া তদনুসারে নিজের পদ সংযোজিত করিয়াছেন। এমন সংযোজন হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, নরহরি শ্রীরূপের রচিত 'উজ্জ্বলনীলমণি'র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন।

নরহরি লিখিয়াছেন—

এ মন মোহন বরজকিশোর।
তুয়া গুণ গুণি গুণি গোরী বিভোর॥
পীড়িত মদনে সদন নাহি ভায়।
চমকি চমকি চহু দিশ ঘন চায়॥
মুখশশী সরস নীরস ভই গেল।
অরুণিম নয়ন পলক নাহি দেল॥
সহচরী কহি কত চাতুরী বাণী।
কুসুমিত শেজে শুতায়ই আনি॥

তাকর পরশ দহন সম লাগি।
উসসি উসসি সব নিশি রহু জাগি॥
কাতর হৃদয় ধরণি গড়ি যায়।
নরহরি কত আশোয়াসব তায়॥

(গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১১৭)

শ্রীরাধা মদনপীড়ায় পীড়িত, তিনি বারংবার চমকিত হইয়া চতুর্দিকে চাহেন। তাঁহার মুখচন্দ্রমা ম্লান হইয়া গিয়াছে, নয়ন হইয়াছে আরক্তিম। কুসুমশয্যায়ও শ্রীরাধা ঘুমাইতে পারেন না, তিনি সারা নিশি জাগিয়া কাটান। পদটির আভ্যন্তরীণ পরিচয়েও আমরা দেখিতেছি, শ্রীরূপের বর্ণিত জাগর্যা দশার অনুসরণে ইহা রচিত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরূপ জাগর্যা দশার দৃষ্টান্ত দেওয়ার মানসে যে 'শ্যামং কঞ্চন কাঞ্চনোজ্জ্বলপটং' ইত্যাদি শ্লোক রচনা করিয়া দিয়াছেন, তাহার অনুসরণে ঘনশ্যাম 'সজনি এ দুঃখ কহিব কাহায়' ইত্যাদি পদ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

শ্যামং কঞ্চন কাঞ্চনোজ্জ্বলপটং সন্দর্শ্য নিদ্রা ক্ষণং
মামাজন্ম সখী বিমুচ্য চলিতা রুষ্টৈব নাবর্ততে।
চিন্তাং প্রোহ্য সখি প্রপঞ্চয় মতিং তস্যাস্তমাবর্তনে
নান্যঃ স্বাপ্নিকতস্করোপহরণে শক্তো জনস্তাং বিনা॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৪৯)

অর্থাৎ—নিদ্রা নামে আমার আজন্ম সখী উজ্জ্বল সোনার রঙের কাপড় পরিহিত কোন এক শ্যামবর্ণ পুরুষকে ক্ষণকালের জন্য দেখাইয়াছিল (অর্থাৎ, স্বপ্নে আমি দেখিয়াছিলাম), তাহার পরে রুষ্ট হইয়া আমাকে ছাড়িয়া জন্মের মতো চলিয়া গিয়াছে। এ পর্যন্ত সে ফিরিয়া আসিল না। সখি, চিন্তা ত্যাগ করিয়া ওই নিদ্রাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা কর; উহা ছাড়া সেই স্বপ্নের তস্করকে আর কেহ আনিতে পারিবে না। শ্লোকে অনেক কথা অস্পষ্ট রহিয়াছে। কথাগুলি আরও স্পষ্ট করিয়া ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

সজনি এ দুঃখ কহিব কাহায়।
মরমক বেদন মরমহি জানত
কো পরবোধব তায়॥

অপরূপ আজু সপনে কিয়ে হেরল
কহইতে বচন না ফুর।
শ্যাম মুরতি দরশাই ঐছে মোর
নয়নক নিন্দ গেল দূর ॥
অভিনব নীল ললিত তনু সোহন
মোহন আভরণ সাজ।
বিনিবিত পীত বসন কটি কিঙ্কিণী
নবঘনে বিজুরী বিরাজ ॥
তব ধরি হৃদয় দহই বিরহানল
হেরইতে পুন অভিলাষ।
ছোড়ল প্রিয়সখি অলস ঐছে পুন
রোখে না যাওত পাশ ॥
শুনইতে বচন কহত প্রিয় সহচরী
অব চিন্তা কর দূর।
সমতি বিথারি যুগতি করু ঐছন
যৈছে মনোরথ পূর ॥
যতনহি নিন্দ সঘন পুন আওত
এ তুয়া যুগল নয়ানে।
সো বিনু আন শকতি নহি কাহুক
ঘনশ্যাম দাস পরমাণে ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৬১)

পদকর্তা শ্লোকের প্রত্যেকটি কথা বজায় রাখিয়াই কিছু রূপ ও রঙ আরোপ করিয়াছেন। শ্লোকে নিদ্রাকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য সখীকে অনুরোধ করিয়াছেন প্রেমানুরাগিণী, কিন্তু পদটির মধ্যে ওই উপায়টি সখীই নির্ধারণ করিয়া জানাইয়াছে। ঘনশ্যামের এই রচনাটির মধ্যে আমরা দেখি অনুবাদের গুটি কাটিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ পদের সুন্দর প্রজাপতি যেন পাখা মেলিয়াছে।

চতুর্থ দশা 'তানব'। ইহার লক্ষণ নিরূপণে শ্রীরূপ যে লিখিয়াছেন 'তানবং কৃশতাগাত্রে দৌর্বল্যভ্রমণাদিকৃৎ'—তাহার অর্থ, শরীরের কৃশতা 'তানব'। ইহাতে দৌর্বল্য ও ভ্রমণাদি উৎপন্ন হয়।

ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

মাধব ! বিরহে বিকল সুকুমারী।
সখী পরবোধ সহই নাহি পারি ॥
বারিজ নয়নে গলই জলধার।
মনমথ দাহ দহই অনিবার ॥
ভ্রমইতে ভূরি অবশ নিশিদিন।
অসিত চতুরদশী শশিসম ক্ষীণ ॥
তিলে তিলে বিষম কি কহু ঘনশ্যাম।
না সহে বিলম্ব চলহ তছু ঠাম ॥

(গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১১৮)

শ্রীরাধা 'ভ্রমইতে ভূরি অবশ নিশিদিন' অর্থাৎ দিনরাত্র প্রচুর ভ্রমণ করিয়া অবসাদগ্রস্ত, তাঁহার কলেবর 'অসিত চতুরদশী শশিসম ক্ষীণ' অর্থাৎ কৃষ্ণাচতুর্দশীর চন্দ্রের মতোই কৃশ। এখানে লক্ষণাবলী-সহ তানব দশাই সুপ্রকট হইয়াছে।

বোধ করি, এই তানব-চিন্তায় শ্রীরূপ বা তদনুসারী পদকারদের নূতনত্বের দাবি কিছু নাই। বিদ্যাপতি 'মাধব ! কি কহব সো বিপরীতে' ইত্যাদি পদে শ্রীরাধার তানব দশার অপূর্ব বর্ণনা দিয়াছেন। পদটির মধ্যে বিদ্যাপতি 'তানবে'র ভ্রম লক্ষণের ব্যঞ্জনা দেন নাই সত্য, কিন্তু শরীরের ক্রম-ক্ষীয়মাণতা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন— 'তনু ভেল কুহু শশি ক্ষীণা'। ঘনশ্যাম শ্রীরাধার শরীরের কৃশতা প্রসঙ্গে বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহারও পদে 'ক্ষীণ শশী'র কথা আসিয়াছে।

'তানব' দশার স্থলে অনেকে 'বিলাপ' পাঠ করান, শ্রীরূপ 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে ইহাও জানাইয়াছেন। শ্রীরূপের এই নির্দেশ মনে রাখিয়া ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

সুন্দরি হেরইতে তোহারি নয়ান।
দগধ জীবন মন সঘন উচাটন
অনিমিখ ঝরয়ে নয়ান ॥
চৌদশী অসিত উদয় জনু হিমকর
হেরি কিনা হেরিয়ে রেহ।
শুনইতে মুরলিক মধুর আলাপন
ঐছন খিনী ভেলী দেহ ॥

অঙ্গুরি বলয় গলিত কর কিসলয়
বসন ভূষণ নহ থির।
সোসই অধর বদন ভেল মানিল
নয়ন শূন ভেল নীর ॥
হরি হরি দৈব চরিত অতি বিপরীত
এক চাহিতে হোয়ে আন।
কানুক মুরলি আলাপন ঐছন
ঘনশ্যাম দাস পরমাণ ॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৬২)

'তানব' বা 'বিলাপ'-এর পর 'জড়িমা'। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরং।
দর্শনশ্রবণাভাবো জড়িমা সোঽভিধীয়তে ॥
অত্রাকাণ্ডেঽপি হুঙ্কারস্তম্ভশ্বাসভ্রমাদয়ঃ ॥
(উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৫১-৮৫২)

শচীনন্দন অনুবাদ করিয়াছেন—

ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান নাহি প্রশ্নের উত্তর।
দর্শন শ্রবণ নাহি 'জড়িমা' অন্তর ॥
অকস্মাৎ হুঙ্কার ছাড়ে, স্তম্ভ হয়া রয়।
নিশ্বাস ভ্রম আদি জড়িমার গুণ হয় ॥
(উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৬৬)

'ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং'-এর অনুবাদ হইয়াছে 'ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান নাহি', কিন্তু 'প্রশ্নেষ্বনুত্তরং'? পূর্ব বিষয়ের 'নাহি' কথাটি আরেক বার গ্রহণ করিয়া কোনক্রমে অর্থ করিতে হয়, 'প্রশ্নে অনুত্তর' কথাটি লিখিলে অর্থ ও ছন্দ দুই রক্ষা পাইত। শ্লোকের 'অত্রাকাণ্ডেঽপি হুঙ্কারঃ' কথাটির অনুবাদ হইয়াছে 'অকস্মাৎ হুঙ্কার ছাড়ে', 'অকাণ্ডে', 'অকারণে' বা 'অ-ব্যাপারে' লিখিলে শ্রীরূপের বক্তব্য ঠিক প্রকাশিত হইত।

এই জড়িমা সম্বন্ধে ঘনশ্যাম পদ লিখিয়াছেন—

হেরইতে তুয়া মুখ কমল নীরস মঝু
হৃদয়ে জ্বলত জনু আগি।
পরিজন বাচি হোত কিয়ে মঙ্গল
সো জানবি বহু ভাগি ॥

সুন্দরি না বুঝিয়ে মরমকি বাত।

সখিগণ বচন শ্রবণে নাহি শুনসি

অবিরত অবনত মাথ ॥

ভালমন্দ একু নয়নে নাহি হেরসি

কারণ বিনহি হুঙ্কার।

থরতর শ্বাস নিচল তনু ভরমহি

কত কত ভাব বিথার ॥

সহজহি নয়নে বচন নাহি বোলসি

পুছইলে উতর না পাই।

করলহি বধির মুরলিরব মাধুরি

ঘনশ্যাম পহু গুণ গাই ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৬২-৬৩)

শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মুখখানি দর্শন করার পর হইতে শ্রীরাধার অন্তরে যেন আগুন জ্বলিতেছে। শ্রীরাধা কিসে মঙ্গল হয় জানেন না, সখীদের বচন শুনেন না এবং ভাল-মন্দ কোন কিছুই চোখে দেখেন না। 'কারণ বিনহি' অর্থাৎ বিনা কারণে তিনি হুঙ্কার করেন, তাঁহার নিশ্বাস দ্রুত বহে এবং 'পুছইলে উতর না পাই।' অর্থাৎ সখী বলিতেছে, প্রশ্ন করিলেও তাঁহার নিকট হইতে উত্তর পাওয়া যায় না। শ্রীরাধার এইসব ভাব-বিকার শ্রীরূপের ব্যাখ্যাত জড়িমার লক্ষণাবলী অনুসরণে কি লেখা হয় নাই?

নরহরি চক্রবর্তীর অন্য পদে রহিয়াছে—

চল চল মাধব কি কহব তোয়।

ঐছন কাজ উচিত নাহি হোয় ॥

সো অবলা বিলসয়ে সখী সঙ্গ।

কবহি না জানই রস পরসঙ্গ ॥

বিশম কুসুমশর হানলি তায়।

ধৈরজ ধরম দেয়লি উলটায় ॥

অসময় সঘনে রচই হুহুঙ্কার।

ধরই খিয়ান নয়নে জলধার ॥

অঙ্গ অবশ ভ্রম উপজই তায়।
দীঘ নিশাসে হৃদয় দহি যায়॥
কহ ঘনশ্যাম বিলম্ব অনুচিত।
তিলে তিলে বিরহ বাঢ়ই বিপরীত॥ (গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১১৯)

সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পূর্বরাগিণী শ্রীরাধার সম্বন্ধে বলিতেছে যে, শ্রীরাধা 'অসময় সঘনে রচই হুহুঙ্কার' অর্থাৎ অসময়ে ঘন হুঙ্কার দেন। তাঁহার অবশ অঙ্গে ভ্রম উৎপন্ন হয় এবং দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। এখানেও আমরা শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট জড়িমার লক্ষণগুলি স্পষ্ট খুঁজিয়া পাইতেছি।

রাধামোহন একটি পদে লিখিয়াছেন—

থোরি বয়স ধনি ভালমন্দ নাহি জানি
খেলত সখীগণ সাথ।
বাট-ঘটিত তুয়া কামদ রূপ হেরি
দৈবে পড়ল পরমাদ॥
শুন শুন মাধব ইথে কাহে বোলসি আন।
তু অচলমতি পুন তাহে কুলবতী
নীচয়ে তুহুঁ সে নিদান॥
তাহে তুহুঁ সুমধুর মুরলী আলাপলি
মুনিজন-মোহন সোয়।
মুরলি নিসান শ্রবণে যব পৈঠল
তবহি চঞ্চল ভই রোয়॥
তব ধরি জাগর ক্ষীণ কলেবর
দিন রজনী নাহি জান।
তুয়া প্রেম বিষমে জড়িত ভেল অন্তর
কছুই না শুনই কাণ॥
বরজ সুধাকর বোলই সব জন
তাহে কাহে অকরুণ ভেল।
রাধামোহন কহ অব যাই মিলহ
মরমে রহয়ে জানি শেল॥

(সমুদ্র ৫৫, তরু ১৬৫)

'তুয়া প্রেম বিষমে জড়িত ভেল অন্তর' এই কথার মধ্যে শ্রীরাধার অন্তর যে জড়িত, অর্থাৎ তাঁহার যে জড়িমা দশা সমুপস্থিত, তাহা পদকর্তা বলিয়াই দিয়াছেন। পদকর্তা রাধামোহন আরও বলিয়াছেন—'কছুই না শুনই কাণ'—শ্রীরাধা কানেও কিছু শুনেন না। এইসব বর্ণনা সম্পূর্ণ ই শ্রীরূপানুসারী।

প্রৌঢ় পূর্বরাগের ষষ্ঠ দশা 'বৈয়গ্র্য'। উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিত হইয়াছে—

বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্যবিক্ষোভাসহতোচ্যতে।
অত্রাবিবেকনির্বেদখেদাসূয়াদয়োমতাঃ॥ (পৃঃ ৮৫২)

অর্থাৎ—ভাবগাম্ভীর্যজনিত বিক্ষোভের অসহিষ্ণুতাকে বৈয়গ্র্য বলে। ইহাতে অবিচার, নির্বেদ, খেদ, অসূয়াদি প্রকটিত হয়।

নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—

ওহে নিকরুণ কহিব কত।
অবলা-পরাণে সহে কি এত॥
না জানি কি কৈলে আঁখির ঠারে।
সে সব কাহিনী কহিতে নারে॥
হিয়ার মাঝারে করিয়া থানা।
দিলে নিরমল কুলেতে হানা॥
আহা মরি মরি কি হৈল তারে।
দেখি কে ধৈরজ ধরিতে পারে॥
নিরজনে নিজ সখীরে লইয়া।
না জানি কি কহে শপথ দিয়া॥
নিরবেদে ধনী না বাঁধে থেহা।
নরহরি কহে বিষম লেহা॥ (গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১১৯)

নরহরির এই পদে 'অবলা-পরাণে সহে কি এত' কথায় শ্রীরাধার মনোগত বিক্ষোভের অসহিষ্ণুতাই ব্যক্ত হইয়াছে। 'নিরবেদে ধনী না বাঁধে থেহা' চরণে শ্রীরাধার নির্বেদও উল্লিখিত। সুতরাং পদটি শ্রীরূপের বৈয়গ্র্য দশা সম্বন্ধীয় নির্দেশ অনুসারেই লেখা হইয়াছে।

'বৈয়গ্র্য' সম্বন্ধে রাধামোহনেরও পদ রহিয়াছে। যথা—

তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান।
সো অব বিছুরব ধনি মন মান॥

মাধব, তুয়া খেদ সহই না পার।
মানই সো নিজ জীবন ভার॥
তুয়া বিসরণ লাগি করত সঞ্চার।
আন জন যাহা লাগি করে পরকার॥
মন অবধারি পহ সুসংবাদ।
ভণে রাধামোহন যাউক বিবাদ॥ (সমুদ্র ৫৮, তরু ১৬৮)

পদের মধ্যে সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিতেছে 'মাধব, তুয়া খেদ সহই না পার' অর্থাৎ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে না পাওয়ার জন্য যে খেদ বা বিষাদ তাহা সহ্য করিতে পারেন না। এখানে শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট বৈয়গ্র্য লক্ষণই সুব্যক্ত।

'বৈয়গ্র্য'-এর পর 'ব্যাধি'। শ্রীরূপ ব্যাধিদশা বর্ণনা করিয়াছেন—

অভীষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ।
অত্র শীত-স্পৃহা-মোহ-নিঃশ্বাস-পতনাদয়ঃ॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৫৩)

অর্থাৎ—

অভীষ্ট অলাভে হয় 'ব্যাধি'র জনম।
পাণ্ডুতা হৃদয়ে তাপ, তাহার লক্ষণ॥
শীত, স্পৃহা, মোহ, শ্বাস, ধরণী পতন।
এ সব বিকার তাথে কহে কবিগণ॥

(উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৬৭)

ব্যাধি বিষয়ে শ্রীরূপ 'দবদমনতয়া নিশম্য ভদ্রা' ইত্যাদি শ্লোক লিখিয়াছেন; শ্লোকটির অর্থ—হে মুরারি, তুমি দাবাগ্নি নাশ করিয়াছ শুনিয়া সখী ভদ্রা মদনরূপ দাবদাহের যন্ত্রণায় তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল এবং তিনি ভস্মময়ীর ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ হইলেন।

ঘনশ্যাম ইহারই অনুবাদকল্পে লিখিয়াছেন—

মরমহি সঘন দহই মদনানল
সহই না পারই গোরি।
শুনি দাব দহন- দমন তোহে সুন্দরি
যতনহি হৃদয়ে অগোরি॥

মাধব পেখলু অপরূপ রঙ্গ।
সো ভেল ব্যাধি আদি কিয়ে বারব
দ্বিগুণ জ্বলত পুন অঙ্গ ॥
ক্ষণে ক্ষণে শীত ভীত ক্ষণে ভরমহি
ক্ষণে ক্ষণে অবনত মাথ।
ক্ষণে তনু তাপ মুরছি মহি লুঠই
ভৈগেল পাণ্ডুর গাত ॥
খরতর পবন বহই জনু ঘন ঘন
ঐছন দীঘ নিশাস।
না বুঝিয়ে চরিত রীত অতি বিপরীত
ভণ ঘনশ্যামর দাস ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৬৪)

অনূদিত ত্রিপদীতে ঘনশ্যাম 'ভদ্রা'র উল্লেখ না করিয়া শ্রীরাধার ব্যাধিদশারও পরিচয় গ্রহণে সুযোগ দিয়াছেন। প্রথম দুইটি স্তবকেই পদকর্তা শ্রীরূপের শ্লোকোক্ত কথাগুলি কাব্যসুষমামণ্ডিত করিয়া বলিয়া লইয়াছেন, এমনকি প্রণয়িনীর ব্যাধিদশা যে চলিতেছে তাহাও বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন 'সো ভেল ব্যাধি' ইত্যাদির মাধ্যমে। শেষের দুইটি স্তবকে শ্রীরূপানুসরণে প্রণয়িনীর ব্যাধিদশার বিকারগুলি ঘনশ্যাম কবিভাষায় নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'শীত', 'পাণ্ডুর গাত', 'দীঘ নিশাস'—সমস্ত ব্যাধি-লক্ষণই ঘনশ্যাম তুলিয়া ধরিয়াছেন।

পদকর্তা যদুনন্দন-ও শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি অনুসরণে ব্যাধিদশা সম্বন্ধে পদ লিখিয়াছেন—

নিরমল কুলশীল কাঞ্চন গোরী।
পাণ্ডুর কয়ল বিরহজ্বর তোরি ॥
অনুখণ খল খল নিগদই রাই।
নিশি দিশি রোয়ই সখীমুখ চাই ॥
শুন শুন গোকুল মঙ্গল শ্যাম।
কথি লাগি তাক মরমে ভেলি বাম ॥
তুয়া রূপ জগজনলোচন শোহ।
একল তাহ নয়ন মনমোহ ॥

রসবতী নিরিখয়ে নয়ন পসারি।
সোঙরিতে তাক নয়নে ঝরু বারি॥
আন ধনী বিছরি করত আন কাম।
তাকর মনহি না ভায়ই আন॥
তুহুঁ বর নাগর রসিক সুজান।
যদুনন্দন তোহে কি কহব আন॥
(সমুদ্র ৫৮, গীতচন্দ্রোদয় ১২০, তরু ১৭০, পদরত্নমালা ৯৯)

যাঁহার কুলশীল নির্মল এবং যিনি কাঞ্চন গৌরবর্ণা, সেই শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় 'বিরহজ্বর' 'পাণ্ডুর কয়ল', সুতরাং ব্যাধিদশায় উপনীতা শ্রীরাধা। তিনি দিবারাত্র রোদন করেন, এক ভুলিয়া অন্য কাজ করেন, তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহ প্রকাশ পায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পদকর্তা রাধামোহন লিখিয়াছেন—

কবহি গেয়ান- শূন হোই চাহই
না চিহ্নই নিজ সখিবৃন্দ।
রমণিক হুঙ্কৃতি কতিহুঁ না পেখলুঁ
শুনইতে লাগই ধন্দ॥
প্রেম-গজ-দলন সহই নাহি পারই
জিবইতে করই ধিকার।
অন্তর-গত তুহুঁ নিরগত করইতে
কত কত করত সঞ্চার॥
অথির নয়ন-শর- ঘাতে বিষম জর
ছটফট জলজ শয়ান।
রাধামোহন কহ ইহ অপরূপ নহ
যাহে লাগয়ে পাঁচ-বাণ॥ (সমুদ্র ৫৯, তরু ১৭১)

এই পদটিতে লালসা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাধি পর্যন্ত সমস্ত দশার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রথম চরণে ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্যের সহিত লালসা প্রকাশ পাইল। তারপর উদ্বেগ, অনিদ্রা এবং শেষে গদগদবাণী প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীরাধা অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দূর হইতে দেখিয়া তাঁহার একটু পরশ পাইবার জন্য যেন পাগলিনী হইয়া গেলেন।

কুলবধূসুলভ লজ্জা ও ভয় দুই-ই তিনি ত্যাগ করিয়া ব্রজের প্রান্তদেশ পর্যন্ত একবার যাইতে লাগিলেন, আবার ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীরাধা সখীর দেহ আশ্রয় করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহার মন চঞ্চল, তাই ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন তখন হইতেই তাঁহার নিদ্রা দূরে পলায়ন করিয়াছে, অন্তর শোষিত হইয়াছে এবং স্পষ্ট করিয়া কথা বলিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে।— তিনি শুধু গদ্‌গদভাবে অস্ফুট কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করেন। দূতী মাধবকে শ্রীরাধার এইরূপ ব্যাধিদশার বর্ণনা শুনাইয়া বলিলেন যে, তোমার রূপের বিচিত্র ফাঁদে পড়িয়া সেই ধনীর দশা এমন হইয়াছে। দুর্বলতাবশতঃ সে যেন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর চাঁদের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ তন্ময়তা হইয়াছে বলিয়া শ্রীরাধা যেন বিকারের রোগীর মতো ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকান, নিজের সখীদিগকে চিনিতে পারেন না। মেয়েরা হুঙ্কার করে এ-কথা কখনও শোনা যায় না, কিন্তু শ্রীরাধা এমন হুঙ্কার করিতেছেন যে, তাহা শুনিয়া ধন্দ লাগিয়া যায়। প্রেমরূপ মত্তহস্তী তাহাকে দলিত করিয়াছে। তাই জীবনের উপর যেন ধিক্কার জন্মিয়াছে। মাধব, তুমি তাহার অন্তরে এতই গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছ যে, তোমাকে অন্তর হইতে বাহির করিবার জন্য শত চেষ্টা করিয়াও সে সফল হইতেছে না। রাধামোহন নিজেই এই পদের টীকায় বলিয়াছেন 'লালসামারভ্য ব্যাধিপর্যন্তাং দশাং সবৃত্তান্তাং পুনরাহ।' ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, শ্রীরূপ-বর্ণিত ব্যাধির ব্যাখ্যা ও উদাহরণস্বরূপে রাধামোহন পদটি লিখিয়াছেন।

অষ্টম দশা 'উন্মাদ'। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

> সর্বাবস্থাসু সর্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
> অতস্মিংস্তদিতিভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্তিতঃ॥
> অত্রেষ্টদ্বেষ-নিঃশ্বাস নিমেষ বিরহাদয়ঃ॥ (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৫৪)

অর্থাৎ—সকল অবস্থায়, সর্বত্র ও সব সময় তদ্গতচিত্ততাহেতু যে বস্তু যাহা নহে তাহাতে সেইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইলে (অবস্থাটি) 'উন্মাদ' বলিয়া কীর্তিত হয়। ইহাতে ইষ্টের প্রতি দ্বেষ, নিশ্বাস, নিমেষবিরহাদি প্রকাশ পায়।

শ্রীরূপের সংজ্ঞাটির অনুবাদ করিতে গিয়া শচীনন্দন লিখিয়াছেন—

> সকল অবস্থাতে হয় কৃষ্ণগত মন।
> শীতলাদি বস্তুতে হয় তীক্ষ্ণেত্যাদি ভ্রম॥
> রসশাস্ত্রে 'উন্মাদ' বলিয়া তাবে কয়।
> ইষ্টদ্বেষ, নিশ্বাস, নিমেষ-বিরহ সম্ভবয়॥
>
> (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৬৭)

শ্রীরূপ কেবল সকল অবস্থায় বলেন নাই, 'সর্বত্র' ও 'সদা' শব্দ দুইটিও ব্যবহার করিয়াছেন, অনুবাদক এইগুলি পরিহার করিয়া আইনের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা-দোষ আনিয়াছেন। এক বস্তুতে অন্যরূপ ভ্রান্তির বিষয়টি বুঝাইতে অনুবাদক দৃষ্টান্তের আশ্রয় কৈবল্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, তাহাতে সূত্রের ব্যাপকতা খণ্ডিত হইয়াছে।

উন্মাদ-দশা সম্বন্ধে গোবিন্দদাসের বিখ্যাত পদ—

আঁচরে মুখশশি গোয়।
ঝর ঝর লোচনে রোয়॥
কারণ বিনু খেনে হসই।
উতপত দীঘ নিশসই॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমক ইহ পরিণাম॥
তাতল তনু নাহি ছুটই।
সতত মহীতলে লুঠই॥
কাহুক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই॥
জগভরি কুলবতি বাদ।
কা দেই কহই সম্বাদ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে॥

(ক্ষণদা ১২।৪, সমুদ্র ৬২, গীতচন্দ্রোদয় ২৩৪, তরু ১৭৪)

'তদেকাত্মশরণা' শ্রীরাধা অঞ্চলের দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া ঝর ঝর ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। তিনি বিনা কারণে হাসেন, দীর্ঘ ও উত্তপ্ত নিশ্বাস ছাড়েন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হন। শ্রীরাধার এই যে অবস্থা ইহার রূপায়ণে পদকর্তা শ্রীরূপের নির্দেশিত উন্মাদ-দশার উপর নির্ভর করিয়াছেন।

যদুনন্দন পদে লিখিয়াছেন—

খেনে হাসয়ে খেনে রোয়।
দিশি দিশি হেরই তোয়॥
খেনে আকুল খেনে থির।
খেনে ধাবই খেনে গীর॥

খেনে খেনে হরি হরি বোল।
সহচরী ধরি করু কোর ॥
ঐছন হেরি অগেয়ান।
সবহুঁ দগধ করু প্রাণ ॥
গুরুজন-ভয়ে সখি মেল।
মন্দির মাঝহিঁ গেল ॥
তাহি সোয়াথ নাহি পায়।
যদুনন্দন মুখ চায় ॥ (গীতচন্দ্রোদয় ১২১, তরু ১৭৫)

পূর্বরাগানুলিপ্তা শ্রীরাধা ক্ষণে হাসিতেছেন, ক্ষণে ক্রন্দন করিতেছেন। কখনও তিনি স্থির আছেন, আবার পরক্ষণেই ধাবিত হইতেছেন। শ্রীরাধার এই জাতীয় সমস্ত কাজই তাঁহার উন্মাদ-দশার পরিচায়ক। সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণভ্রমে তিনি যখন 'সহচরী ধরি করু কোর' অর্থাৎ সহচরীকে ধরিয়া কোলে করেন, তখন শ্রীরূপ-নির্ণীত উন্মাদ-দশার লক্ষণই প্রকটিত হইয়া পড়ে।

নরহরি চক্রবর্তীর পদ—

মাধব ! ধনী উনমাদিনী ভেলি।
যব ধরি স্বপনে দরশ তুহুঁ দেলি ॥
তোহারি নামগুণ সঘনে আলাপি।
চহুদিশ চাহি চৌকি ঘন কাঁপি ॥
বিষম নিশাস তেজই খণে ধন্দ।
খণে মহি গিরই ঝরই দিঠি মন্দ ॥
খণে উহ নীপবিপিনে চলি যায়।
সহচরী যতনে রোকি রহু তায় ॥
খল খল হাসি বয়নে দেই বাস।
মৌন গহই খণে মানই তরাস ॥
নরহরি পেখি আয়ল পরমাদ।
তিলে তিলে বাঢ়ই বিরহ বিষাদ ॥ (গীতচন্দ্রোদয় ১২১)

'গীতচন্দ্রোদয়' সঙ্কলন-গ্রন্থে পদটির উপরে 'অথোন্মাদঃ' লিখিয়া সঙ্কলয়িতা নরহরি চক্রবর্তী 'উজ্জ্বলনীলমণি' হইতে উন্মাদ-দশার লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ,

পদটির প্রথম হইতেই 'ধনী উনমাদিনী ভেলি' পদকর্তা নরহরি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, পদের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখি, শ্রীরাধা চতুর্দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন, ভীষণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, কখনও তিনি মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, আবার কখনও বা কদম্ব-কাননের দিকে ধাবিত হইতেছেন, তিনি কখনও মূক, পরক্ষণেই ত্রস্ত। অর্থাৎ, শ্রীরূপের নির্দেশমতো শ্রীরাধার সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থা। এই ত্রিবিধ যুক্তিতেই পদটির উপর শ্রীরূপের প্রভাব অনস্বীকার্য।

'উন্মাদ' দশার পরে 'মোহ'। শ্রীরূপ যে 'মোহোবিচিত্ততাপ্রোক্তা নৈশ্চল্য পতনাদিকৃৎ' বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—বিরুদ্ধচিত্ততাকে মোহ বলে, ইহা নিশ্চলতা পতনাদি ঘটায়।

দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীরূপ স্বরচিত 'নাসাশ্বাসপরাঙ্মুখী বিঘটতে দৃষ্টীস্বুবায়াঃ কথং' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকটিকে ভাষান্তরিত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—নাসিকায় শ্বাস না (বহিতে) এবং চক্ষু বিবর্তিত হইতে দেখিয়া ভগিনী (ননদিনী জটিলা) হায় ধিক কিরূপে ইহা হইল (মনে করিয়া) বলিল, আমার হাতে কিছু কৃষ্ণতিল দাও, আমি অমঙ্গল দূর করিব। হে অচ্যুত, কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটি কর্ণকুহরে প্রবেশ করামাত্র শ্রীরাধার যে কম্পন উপস্থিত হইল, তাহাতে তুমিই যে হেতু তাহা শ্রীরাধা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

'মোহে'র বিষয় লিখিতে গিয়া ঘনশ্যাম শ্রীরূপের উপরি-উক্ত শ্লোকের অনুসরণে পদ রচনা করিয়াছেন—

পহিলহি পিরীতি　　আরতি নাহি টুটই
কত সহে জীবন জারা।
বিরহক দাহ　　দহনে তনু দাহই
ক্ষিতিতলে লুটই বালা॥
দেখ সখি জটিলা আওল পাশ।
হেরইতে রাইক　　ঐছে বিপতি পুন
কণ্ঠহি গদ গদ ভাষ॥
চমক হোয় মুঝে　　কাহে কমলমুখি
শ্বাস পরাঙ্মুখী নাসা।
বিঘটন নয়ন　　বয়ন পুলকাইত
না জানি কি দৈব দুরাশা॥

ললিতা ধিক রহু জীবন কৃষ্ণতিল
করে আনি সমর্পহ মোয়।
রাইক ব্যাধি সমাপন করু যব
সরুপহি কহিলাম তোয়॥
পরশিতে নাম সুধাময় মাধুরি
শ্রবণ মাতায়ল তাত্রি।
পৈঠল হৃদয়ে দ্রবায়ল সব তনু
থরহরি কাঁপই রাই॥
কানুক পাশে সি ধাবল সহচরি
অনুভব ঐছন জানি।
কহ ঘনশ্যাম দাস রসমাধুরি
ত্রিভুবনে কো না বাখানি॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৬৫-৬৬)

শ্রীরূপের শ্লোকের প্রত্যেকটি কথা স্বীকার করিয়া সেইগুলিকে কবিত্ব-সুষমায় ঘনশ্যাম অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছেন।

অজ্ঞাতনামা কোন পদকারের পদে রহিয়াছে—

তোহারি বিরহময় বাধা।
মুরছলি মুগধিনী রাধা॥
বরজমঙ্গল তুয়া নাম।
মোহে অব বিপরীত ভাণ॥
নবমী দশা অব ভেল।
গদ গদ নিশবদ কেল॥
তিরি-বধ লাগব তোয়।
সমুঝি করহ অব সোয়॥ (গীতচন্দ্রোদয় ১২১, তরু ১৭৮)

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে মুগ্ধা শ্রীরাধা মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন—পদকার ইহাই কেবল বলেন নাই, তিনি স্পষ্ট জানাইয়াছেন—'নবমী দশা অব ভেল, গদ গদ নিশবদ কেল।' শ্রীরূপের গ্রন্থানুসরণে পদকর্তা মোহকে নবমী দশা বলিয়াছেন এবং নৈঃশব্দ্য যে তাহার লক্ষণ, তাহাও ব্যঞ্জিত করিয়াছেন।

পদকর্তা রাধামোহন লিখিয়াছেন—

যব তুয়া নয়ন মুরলি-বিষ জারল
তব মন-মোহন ভেল।
নিচল কলেবর পড়ল ধরণীতল
পরিজনে লাগল শেল ॥
আন উপদেশে তোহারি নাম তৈখনে
দৈবহি উপনীত কেল।
সোই শবদ পুন কাণে সান্ধায়ল
ঐছন চেতন ভেল ॥
মাধব, কি কহব সো অনুরাগ।
ঐছন ভাতি দিশই মোহে পুন পুন
না বুঝিএ জাগ না জাগ ॥
কিএ জানি দশমী- দশা যদি নীচয়ে
ইছয়ে তুয়া অভিলাষে।
আশা পরম দুখদ পুন মেটউ
নহ কহ সুখদ নৈরাশে ॥
যাচিত লখিমী উপেখয়ে যো জন
কভু নহে তাক কল্যাণ।
অতএ তুরিতে চল রমণী-রতনে মিল
রাধামোহন রস গান ॥ (সমুদ্র ৬৩, তরু ১৭৭)

পদটির মধ্যে প্রথমতঃ পদকর্তা রাধামোহন প্রকারান্তরে বলিয়া দিতেছেন 'মোহন ভেল' অর্থাৎ মোহ দশা সমুপস্থিত ; মোহের দুইটি লক্ষণও তিনি বলিয়াছেন 'নিচল কলেবর' ও 'পড়ল ধরণীতল' কথায়। দ্বিতীয়তঃ, সখী যে আশঙ্কা করিতেছে 'কিএ জানি দশমী দশা যদি নীচয়ে ইছয়ে তুয়া অভিলাষে', কি জানি তোমার অভিলাষে (শ্রীরাধা) যদি নিশ্চিত করিয়া দশমী দশাই (মৃত্যু) ইচ্ছা করে, এই আশঙ্কার মাধ্যমে শ্রীরাধা যে নবমী দশায় আছেন তাহা পদকর্তা বলিয়া দিয়াছেন। এখন শ্রীরূপের 'উজ্জ্বলনীল-মণি' অনুসারেই মোহ নবমী দশা। সুতরাং দুইটি যুক্তিতেই পদটির উপর শ্রীরূপের প্রভাব প্রমাণিত হইতেছে।

দশমী দশা—'মৃত্যু'। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

> তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ।
> কন্দর্পবাণকদনাত্তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ॥
> তত্র স্বপ্রিয়বস্তূণাং বয়স্যাসু সমর্পণং।
> ভৃঙ্গমন্দানিলজ্যোৎস্না-কদম্বানুভবাদয়ঃ॥ (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৫৭)

অর্থাৎ—সেই সেই প্রতীকার (দূতীপ্রেরণ, পত্রে প্রেমপীড়াজ্ঞাপন প্রভৃতি) করা হইলেও যদি (শ্রীকৃষ্ণের) সমাগম না ঘটে, তাহা হইলে কন্দর্পবাণপীড়নহেতু (শ্রীরাধার) মরণের ইচ্ছা হয়। সেখানে নিজ প্রিয়বস্তুগুলি বয়স্যাদের দেওয়া এবং ভৃঙ্গ, মন্দপবন, জ্যোৎস্না ও কদম্বাদি অনুভব হয়।

সংজ্ঞাটির অনুবাদকল্পে শচীনন্দন লিখিয়াছেন—

> বহু যত্নে নাহি হয় কৃষ্ণসমাগম।
> তবে গোপীকার হয় মরণ-উদ্যম॥
> নিজ প্রিয়বস্তু সখীরে করে দান।
> ভৃঙ্গ, মন্দানিল, জ্যোৎস্না, কদম্ব সন্ধান॥ (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৬৮)

কন্দর্পবাণপীড়নহেতুই যে গোপীকার মরণ-উদ্যম হয়, তাহা অনুবাদক বলিতে ভুলিয়াছেন। ইহার তুলনায় 'রসবিলাসবল্লী'-কারের অনুবাদ অধিকতর সঙ্গত।

> প্রিয় যদি যতনে না করে আগমন।
> কামবাণে মৃত্যু ইচ্ছা করয়ে তখন॥
> যত প্রিয়বস্তু সমর্পয়ে সখিস্থানে।
> কদম্বকৌমুদি ভৃঙ্গ করযে আওভানে॥
> মৃদু মৃদু অনিল ইছয়ে সুধামুখি।
> মৃত্যুর লক্ষণ গ্রন্থ অনুসারে লিখি॥ (পৃঃ ৬৬)

মৃত্যুদশায় শ্রীরাধা যে বস্তুগুলি অনুভব করেন, তাহার ক্রমভঙ্গ ছাড়া অনুবাদে অন্য কিছু বড় রকম ত্রুটি ঘটে নাই।

এই দশার দৃষ্টান্তে শ্রীরূপ 'রাধারোধসি রোপিতাং মুকুলিনী' ইত্যাদি শ্লোক লিখিয়াছেন। শ্লোকটির অর্থ—যমুনাতীরে নিজের রোপিত মুকুলিত মল্লীলতাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রশস্ত হীরক-হারটি ললিতার হাতে দিয়া মধুকর-গুঞ্জিত কদম্ববনে প্রবেশপূর্বক শ্রীরাধা মূর্ছিত হইলেন, প্রিয়সখীরা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

শ্লোকটির অনুসরণে ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

কত পরকারে যতন কত করতহি
যা কর পিরিতিক আশে।
সো যব বিমুখ অবহু নাহি মিলব
পহিলহি করল নিরাশে॥
সজনী জিবইতে কি সুখ আর।
মনমথ বাণ- দহনে তনু তেজব
দূরকর পুন প্রতিকার॥
ফুটক কদম্ব গান কর মধুকর
চলু ঘন মলয়বাতাস।
হিমকর কিরণ গগন পরকাশ
উত্তরিতে পূরয়ে জনু আশ॥
কহইতে বচন কণ্ঠ সব ঘর ঘর
প্রেমে তনু পুলকিত ভেল।
মুকুলিত মল্লী লতা হেরি সুন্দরি
সঘন আলিঙ্গন দেল॥
হীরক হার সোঁপি ললিতা করে
মৃদু মৃদু চলতহি রাই।
অলিকুল মিলিত কদম্বক কানন
তহি পরবেশ নিজাই॥
হা হরি হরি বলি পড়ল ধরণিতল
মুরুছিত হরল গেয়ান।
চৌদিগে বেড়ি রোয় সব সহচরি
শ্রবণে কহই শ্যামনাম॥
সুধাময় শ্যাম- নাম শ্রবণপথে
হৃদয় পরশ যব কেল।
বিঘটন শ্বাস বাহুড়ি পুন আওল
ঐছন অনুভব ভেল॥

সখিগণ যতনে শুতায়লী পুনতহি
সাজি কমলদল পাত।
হেরি ঘনশ্যাম দাস অছু বীপতি
রহতহি অবনত মাথ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৬৬-৬৭)

শ্রীরূপের রসঘন শ্লোকটি পাঠককে অনেকখানি ঘটনা কল্পনা করিয়া লইবার সুযোগ দেয়। শ্রীরাধা নিজের হাতে যে মল্লিকালতাটি রোপণ করিয়াছিলেন, আজ তাহা মুকুলিত হইয়াছে। তাঁহার মনে কত আশা ছিল যে, ঐ মল্লিকার লতায় ফুল ফুটিলে তিনি নিজ হাতে মালা গাঁথিয়া তাঁহার দয়িতের গলায় পরাইয়া দিবেন। কিন্তু কোথায় সে দয়িত? তাঁহাকে যদি নাই পাওয়া গেল, তাহা হইলে বৃথা জীবনধারণ করিয়া ফল কি। তাই প্রাণত্যাগ করিবার পূর্বে শ্রীরাধা একবার সেই মল্লিকার লতাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের শতস্মৃতিমাখা কদম্বের বনে গিয়া শ্রীরাধা প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীরাধার গভীর মূর্ছা ভাঙ্গাইবার জন্য সখীরা মৃতসঞ্জীবনী সুধাতুল্য শ্রীকৃষ্ণনাম তাঁহার কানের কাছে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নামের প্রভাবে শ্রীরাধা যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন।

ঘনশ্যাম শ্রীরূপের শ্লোকটিকে সহজবোধ্য করিবার জন্য ভূমিকা হিসাবে শ্রীরাধার মুখ দিয়া সখীদিগকে বলাইতেছেন—যে প্রিয়তমের প্রীতির আশায় কত প্রকার যত্নই না করিয়াছি, সে যখন আজ আমার প্রতি বিরূপ হইল, এখনো আসিয়া দেখা দিল না, প্রেমের প্রথম অবস্থায় যে প্রত্যাশা জানাইয়াছিল তাহা যখন নিরাশায় পরিণত হইল, তখন হে সখি, বাঁচিয়া আর কি সুখ! আমি মন্মথের বাণের তীব্র দহনে দেহত্যাগ করিব। তোমরা যেন আমাকে আর বাঁচাইতে চেষ্টা করিও না। এখন মদনের উদ্দীপন মলয় বাতাস বহিয়া চলুক, কদম্ব ফুল ফুটুক, ভ্রমর গান করুক, চন্দ্রের কিরণে আকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক—তাহাতে আমি যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি। এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীরাধার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং শেষ দশার উপস্থিতিতে যেন গলার ভিতর ঘর ঘর শুনা গেল। শ্রীরূপ যেখানে প্রথমেই মল্লিকালতাকে আলিঙ্গন করার কথা বলিয়াছেন, ঘনশ্যাম সেখানে সেই ঘটনাটিকে শ্রীমতীর শেষ দশায় ঘটাইয়াছেন। আর শ্রীরূপ যে ঐ মল্লীলতা শ্রীরাধার স্বহস্তে রোপিত বলিয়াছেন, সেই কথাটি না বলিয়া ঘনশ্যান ভাল করেন নাই। ঘনশ্যামের পদটি সুন্দর হইলেও শ্রীরূপের মূল শ্লোকের কাছে নিষ্প্রভ মনে হয়।

যত্নুনন্দন দাসের পদে রহিয়াছে—

মোরে উপেখিল শ্যাম সুনাগর
এ সব শুনিলুঁ কাণে।
দুরাশা বিরোধী হৈয়া নিরবধি
তথাপি দগধে মনে॥
সখিহে দঢ়াইলু এই সার।
সে হরি দুর্লভ না হয় সুলভ
মরণ সে প্রতিকার॥

(গীতচন্দ্রোদয় ২৪৮, তরু ১৮৪)

শ্যামকে না পাওয়ার ফলে দুরাশা নিরবধি শ্রীরাধাকে দগ্ধ করিতেছে, সেইজন্য শ্রীরাধা মরণকে একমাত্র প্রতিকাররূপে গণ্য করিতেছেন। এক্ষেত্রে শ্রীরাধার মরণেচ্ছা রূপায়ণে পদকর্তা শ্রীরূপের নির্দেশকেই ভিত্তি করিয়াছেন।

নরহরি চক্রবর্তী অন্য একটি পদে শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি-ধৃত পূর্বোক্ত শ্লোকের কিছু অনুসরণে লিখিয়াছেন—

মাধব ! অব কি কহব তুয়া পাশ।
সো বিরহিণী ধনী হোওল নিরাশ॥
জানি এ নিকরুণ চরিত তোহার।
তেজব দেহ করল নিরধার॥
তুরিত কণ্ঠসঞে হার উতারি।
সোঁপল সখীক করহি কর ধারি॥
নিজকর রোপিত মল্লী নব বেলী।
বহি কত তাহে আলিঙ্গন দেলি॥
চললি একেলি নীপবনকুঞ্জ।
যহি মৃদু পবন চলই অলিপুঞ্জ॥
মুরুছব সময়ে ভণই তুয়া নাম।
নরহরি রোই রহল তহিঁ ঠাম॥ (গীতচন্দ্রোদয়, ১২২-১২৩)

ঘনশ্যাম কবিরাজ অপেক্ষা নরহরি চক্রবর্তীর কবি-প্রতিভা অনেক নিম্নস্তরের বলিয়া, তাঁহার ভাবানুবাদের মধ্যে শ্রীরূপের কবি-প্রতিভার অতি অল্প নিদর্শনই পাওয়া যায়।

নরহরি চক্রবর্তী নিতান্ত গদ্যময় শব্দ 'নির্ধারণ'কে 'করল নিরধার' রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। গভীরভাবে মূর্ছিতা শ্রীরাধার কর্ণে শ্রীকৃষ্ণনাম প্রবেশ করায় মূর্ছাভঙ্গের ভিতর যে অনুপম কবিত্ব আছে, নরহরি তাহা বুঝিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন—'মুরছব সময়ে ভণই তুয়া নাম' অর্থাৎ মূর্ছা যাইবে এই রকম সময়ে তোমার নাম বলায় তিনি আর মূর্ছা গেলেন না।

গোপালদাস বা রামগোপালদাস শ্রীরাধাকে একেবারে শ্বাসবিহীনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণ একেবারে কণ্ঠাগত হইয়াছে। দূতী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, কেহ কেহ মনে করিতেছে শ্রীরাধার উপর বুঝি অপদেবতার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাই রামনাম জপ করিতেছে। কেহ বা শ্রীরাধার গ্রহশান্তি করাইবার জন্য জ্যোতিষী আনাইয়া নবগ্রহপূজা করাইতেছে, কেহ বা নাসায় তূলা দিয়া প্রাণ আছে কিনা পরীক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহারা কেহই জানে না যে, তোমার বিরহে শ্রীরাধার এই দশা হইয়াছে। এখন কেবলমাত্র তোমার স্পর্শ পাইলেই শ্রীরাধা প্রাণলাভ করিতে পারে—অন্য কোন উপায়ে নহে। এই পদে দূতী কৌশলে মাধবকে জানাইয়া দিতেছেন যে, তাঁহার প্রতি শ্রীরাধার প্রেম কত গভীর। শুধু তাহাই নহে, চতুরা দূতী শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনসাধনেরও উপায়বিধান করিতেছেন।

লুঠত ধরণী ধরি সোই।
শ্বাসবিহীন হেরি সহচরী রোই॥
মুরছলি কণ্ঠে পরাণ।
ইহপর কো গতি দৈবে সে জান॥
এ হরি পেখলুঁ সোমুখ চাই।
বিনহি পরশে তুয়া না জীবই রাই॥
কেহ কেহ জপয়ে দেব-দিঠি জানি।
কেহ নবগ্রহে পূজে জোতিখ আনি॥
কেহ নাসা ধরি শ্বাস বিচারি।
বিরহ বিঘিন কেহ লখই না পারি॥
শেষ দশা যব সো সব জান।
কহই গোপাল কি হই পরিণাম॥

(গীতচন্দ্রোদয় ১৪৮, তরু ১৮০)

প্রৌঢ় পূর্বরাগের দশ দশা বর্ণনা করার পর শ্রীরূপ সমঞ্জস ও সাধারণ পূর্বরাগের বিবিধ

দশা বর্ণনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের গীতাবলীমুখর, সেখানে প্রৌঢ়া রতিরই বিস্তার, সমঞ্জস ও সাধারণ রতির প্রশ্রয় কিছুমাত্র নাই। সেইজন্য বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যে শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট সমঞ্জস ও সাধারণ পূর্বরাগের প্রভাবও একেবারেই অনুপস্থিত।

॥ পূর্বরাগে নায়ক-নায়িকার কৃত্য ॥

পূর্বরাগে নায়ক ও নায়িকার কৃত্যবিশেষ বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ বয়স্যাদির হস্তে কামলেখ, মাল্য ও অপূর্ব উপহার প্রভৃতি প্রেরণের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরূপ জানাইয়াছেন এই প্রেরণ উভয়তঃই হইতে পারে।

এমন 'কৃত্যবিশেষ' রূপায়ণের জন্য নরহরি চক্রবর্তী পদ লিখিয়াছেন। 'কামলেখ' বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন—

রাইক রীত কহব কত কান।
লেখন লিখন করহ অবধান ॥
নিশি দিশি বিন্ধসি হৃদয় নিশঙ্ক।
অতি অবিচার এ মদনে কলঙ্ক ॥
দিশই সকল দিশা অনিবার।
কতিহু না দিশই মদন উদার ॥
নরহরি অরু কি জানায়ব কাজ।
করহ উচিত ইথে না কর বিয়াজ ॥

(গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১২১)

'মাল্যার্পণ' বিষয়েও তিনি ঘনশ্যাম ভণিতায় লিখিয়াছেন—

খঞ্জননয়নী রমণীমণি রাই।
রোয়ত নিশি দিশি তুয়া গুণ গাই ॥
রোপি যতনে নবমালতি বেলি।
নয়নবারি সঞে সিঞ্চন কেলি ॥
থোরি দিবসে উহ কুসুমিত ভেল।
মরমক বাত বেকত ভই গেল ॥
নিচই বিরহজ্বরে জীবন যাব।
তব ইহ পুহুপ কৈছে পহিরাব ॥

ঐছে বিচারি কুসুম তহি তোড়ি।
বিরচল মাল দেয়ল করে মোরি ॥
পহিরহ এ ঘনশ্যামর নাহ।
তেজহি নিরদরপণ মনমাহ ॥

(গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১২২)

॥ মান ॥

পূর্বরাগের পর শ্রীরূপ বিপ্রলম্ভের দ্বিতীয় বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন 'মান'। উজ্জ্বলনীলমণির অন্তর্গত 'মান' বিষয়ক আলোচনায় মনোনিবেশ করিলে আমরা দেখি, মানের শ্রেণী-বিভাগ, হেতু-বৈচিত্র্য ও উপসমের উপায়গুলি নির্ণয়ের বিষয়ে শ্রীরূপ যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইয়াছেন।

শ্রীরূপের পূর্বে আলঙ্কারিকদের মধ্যে একমাত্র 'দশরূপক'-কার ধনঞ্জয় মানের শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি 'মনোঽপি প্রণয়ের্ষয়োঃ' বলিয়া প্রণয় ও ঈর্ষা—মানের এই দুইটি বিভাগ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরূপ ইহা মানিয়া লইতে পারেন নাই, কারণ মানের মূল ভিত্তি প্রণয়ে এবং প্রণয়হীন ঈর্ষাও নিছক শত্রুতা। শ্রীরূপ নূতন করিয়া মানের শ্রেণী বলিয়াছেন 'সহেতু' ও 'নির্হেতু'।

'সহেতু মান' প্রসঙ্গে শ্রীরূপ বলিয়াছেন—

হেতুরীর্ষ্যা বিপক্ষাদে র্বৈশিষ্ট্যেপ্রেয়সা কৃতে।
ভাবঃ প্রণয়মুখ্যোঽয়মীর্ষ্যামানত্বমৃচ্ছতি ॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৭১)

অর্থাৎ—প্রিয়জনের দ্বারা বিপক্ষের (নায়িকার) বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত হইলে যে ঈর্ষা হয়, তাহাই (মানের) হেতু বা কারণ। প্রণয়প্রধান এই ঈর্ষারূপ ভাবই ঈর্ষা-মানত্ব আনে।

শ্রীরূপ ঈর্ষার বিষয় সহেতু মানের মধ্যেই স্বীকার করিয়াছেন এবং স্পষ্টই বলিয়া লইয়াছেন যে, মানের অন্তর্গত ঈর্ষাও প্রণয়প্রধান। এখানে আমরা দেখিতেছি, শ্রীরূপ আলঙ্কারিক ধনঞ্জয়ের ন্যায় ভুল করেন নাই।

সহেতু মানের কারণ নির্দেশে শ্রীরূপ যে বিপক্ষবৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা তিন প্রকার হইতে পারে জানাইয়াছেন। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—'শ্রুতং চানুমিতং দৃষ্টং তদ্বৈশিষ্ট্যং ত্রিধা মতং' অর্থাৎ—শ্রুত, অনুমিত ও দৃষ্টভেদে বিপক্ষবৈশিষ্ট্য তিন প্রকার।

প্রথমতঃ, শ্রুত। 'শ্রবণন্ত প্রিয়সখীশুকাদীনাং মুখাদ্‌ভবেৎ' সূত্রে শ্রীরূপ জানাইয়া ছেন—প্রিয়সখী ও শুকাদির মুখ হইতেই শ্রুত বা শ্রবণ হয়।

প্রিয়সখী মুখ হইতে শ্রবণের বিষয়টি লইয়া শ্রীরূপ-প্রভাবে সহেতু মানের পদ অনেক পদকারই রচনা করিয়াছেন।

উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন—

প্রিয়-সখি নিকটে যাই কহে দ্রুত-গতি
শুন ধনি চতুরিণি রাধে।
চন্দ্রাবলি সঞে কানু রজনি আজু
কামে পুরায়ল সাধে॥
ঐছন শুনইতে বাত।
অরুণিত লোচন গরগর অন্তর
রোখে পুরল সব গাত॥
আপনক কামে কামি যেই কামিনী
রসিক মরম নাহি জান।
সো মঝু বিদগধ নাহক বলে ছলে
কত না কয়ল অপমান॥
চঞ্চল মনহি থীর নাহি হোয়ত
কামে লুবধ-চিত কান।
ঐছন নাহক বদন না হেরব
উদ্ধব দাস পরমাণ॥ (তরু ৫২৬)

পদের মধ্যে বর্ণিত রহিয়াছে যে, সখী যখন প্রিয়সখী শ্রীরাধার নিকট গিয়া কানু চন্দ্রাবলীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করিয়াছে জানাইল, তখন এই কথা শুনিয়াই শ্রীরাধার 'অরুণিত লোচন গরগর অন্তর', তিনি দুর্জয় মান করিলেন। শ্রীরাধা শেষ পর্যন্ত সঙ্কল্প করিলেন 'ঐছন নাহক বদন না হেরব'। সখীমুখে শুনিয়া এই যে মানের সঞ্চার, ইহা শ্রীরূপানুসারী।

'শ্রবণে'র দ্বিতীয় প্রকার—'শুকমুখে শ্রবণ'। শ্রীরূপ 'আস্তে কাচিৎ দয়িত কলহা' ইত্যাদি শ্লোকে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, 'রসবিলাসবল্লী'-কার তাহা ছন্দে লিখিয়াছেন—

দয়িত কলহ তোর কোন প্রিয় সখি।
নিষ্ঠুর হৃদয়ে পড়াইল শুকপাখি।
বিহঙ্গবদনে শুনি আমা কৃত দোষ।
না কর বিশ্বাস মোরে ক্ষমা কর রোষ॥ (পৃঃ ৭০)

শ্রীরূপ-উপস্থাপিত বিষয়টি লইয়া উদ্ধবদাস পদ রচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

তরুপর রৈয়া শুক ফুকারিয়া
কহয়ে আপনস্বরে।
কানুরে লইয়া চলিল ধাইয়া
পদ্মা সহচরী ঘরে॥
শুকের বচন শুনি বিনোদিনী
অরুণ যুগল আঁখি।
অবনত-মুখে মুকুলিত স্বরে
কহে গদ গদ ভাখি॥ (তরু ৫৬৫)

আলোচ্য পদে শুকের মুখে শ্রীরাধা শুনিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পদ্মার কুঞ্জে গমন করিয়াছেন। তৎশ্রবণেই শ্রীরাধার মান হইয়াছে। এইরূপ সহেতু মান শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট।

উদ্ধবদাসের অন্য পদে 'সহচব লইয়া যেখানে বসিয়া আছয়ে নাগররাজ' ইত্যাদিতে (তরু ৫৬৬) মানিনী শ্রীরাধার দ্বারা প্রেরিত হইয়া দূতী শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করিয়া বলিয়াছে যে, শুকের মুখে 'আন সঞে তুয়া কাম' শুনিয়া শ্রীরাধা দ্বিগুণ মান করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নামও শুনিতেছেন না। এই পদেও শুকের মুখে শুনিয়া শ্রীরাধার মান হইয়াছে।

উদ্ধবদাস পদান্তরে (তরু ৫৬৭) লিখিয়াছেন, দূতীমুখে শ্রীরাধার মানের বিষয় অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকটে গিয়া বলিয়াছেন—

সুন্দরি, দূরে কর বিপরীত রোষ।
বনচর পাখী- বচন শুনি মানিনী
না বিচারি গুণ কিএ দোষ॥
যো যৈছে পাখীক পাঠ পঢ়ায়ত
তৈছনে কহতহিঁ ভাখি।
কাঁহা সোই কাঁহা মুঞি কাঁহা বিলসন ভই
এ তুয়া সহচরী সাখী॥

এখানে শুকপক্ষীর (টিয়াপাখীর) মুখে শুনিয়া শ্রীরাধার মানের কথা বলাতে উজ্জ্বল-নীলমণির প্রভাব তো দৃষ্ট হয়ই, উপরন্তু মানিনী শ্রীরাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীরবের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টাও উজ্জ্বলনীলমণি হইতে কিছু পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিতে শুকমুখে শুনিয়া নায়িকার মানের কথা বলিতে গিয়া শ্রীরূপ নিম্নোক্ত গল্পটি গঠন করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ মানিনী শ্যামলার নিকট বলিয়াছেন, হে শ্যামলে, তোমার কলহপ্রিয়া ও ক্রূরচিত্তা এক সখী আছেন যিনি এই বন্য শুককেও নিশ্চয়ই পাঠ দিয়াছেন। তুমি অন্তরীক্ষচারী এই পক্ষীর নিষ্প্রয়োজন বাক্য অতিশয় বিশ্বাস করিয়া মানারম্ভে আর মন করিও না, আমি কাতর প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।

উজ্জ্বলনীলমণি অনুসারে যে বাক্যগুলি শ্রীকৃষ্ণ শ্যামলার নিকট বলিয়াছেন, সেইগুলি উদ্ধবদাসের আলোচ্য পদে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন। কথাগুলিরও কিছু রূপান্তর ঘটিয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে শুককে মিথ্যাবাক্য শেখানোর জন্য কলহপ্রিয়া ও ক্রূরচিত্তা এক সখীকে দায়ী করা হইয়াছে, কিন্তু আলোচ্য পদে কোন একজনের কুশিক্ষাকে ব্যঞ্জনায় রাখিয়া সাধারণীকরণ করিয়া বলা হইয়াছে—'যো যৈছে পাখীক পাঠ পঢ়ায়ত, তৈছনে কহতহি ভাখি।'

সহেতু মানের দ্বিতীয় কারণ 'অনুমিতি'। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন 'ভোগাঙ্কগোত্রস্খলন স্বপ্নৈরনুমিতি স্ত্রিধা', অর্থাৎ—ভোগাঙ্ক, গোত্রস্খলন ও স্বপ্ন—এই ভেদে অনুমিতি তিন প্রকার।

ভোগাঙ্ক-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, 'ভোগাঙ্কো দৃশ্যতে গাত্রে বিপক্ষস্য প্রিয়স্যচ'। ইহার অর্থ—বিপক্ষ বা প্রিয়জনের গাত্রে (রতির) যে চিহ্ন দেখা যায়, তাহাকে ভোগাঙ্ক বলে।

শ্রীরূপকে অনুসরণ করিয়া এই ভোগাঙ্কের বিষয় লইয়া অনেক পদকর্তা পদ লিখিয়াছেন। সাধারণতঃ খণ্ডিতার পদে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ সারারাত্র অন্যত্র বিলাস করিয়া দেহে সেই বিলাসের চিহ্ন বহন করিয়া প্রভাতে শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং এই খণ্ডিতার পদে ভোগাঙ্কদর্শনে মান সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ অনন্তদাসের পদে রহিয়াছে—

নিকুঞ্জ কাননে সঙ্কেত করিয়া
তাঁহা জাগাইলে মোরে।
আন ধরি সনে সো নিশি বঞ্চিয়া
বিহানে মিলল দূরে॥
সিন্দূর কাজর সব অঙ্গ পর
কপটে মিনতি কেল।
ছল করি শির- সিন্দূর কাজর
আমার চরণে দিল॥ (তরু ৫৫৪)

চম্পতি লিখিয়াছেন, শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—

সুন্দর সিন্দুর নয়নক অঞ্জন
সঞ্চরু দশনক রেখা।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
প্রাতঃ সময়ে দিল দেখা ॥
দশ গুণ অধিক অনলে তনু দহিল
রতিচিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে। (তরু ৪৮১)

এখানেও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অন্যনায়িকাসম্ভোগজনিত ভোগাঙ্ক দর্শন করিয়া শ্রীরাধা মান করিতেছেন। বিপক্ষগাত্রে ভোগাঙ্ক দর্শনের বিষয় শ্রীরূপ নির্ণয় করিয়া দিলেও তাহা পদকর্তাদের প্রভাবিত করিতে পারে নাই। কেননা, শ্রীরূপের ভজনরীতি অনুসরণ করিয়া পদকর্তারা নিজেকে শ্রীরাধার দাসী বা মঞ্জরী বলিয়া মনে করিতেন; সুতরাং তাঁহারা চন্দ্রাবলীর অঙ্গে ভোগচিহ্ন আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা অকর্তব্য বিবেচনা করিতেন।

'অনুমিতি'র দ্বিতীয় প্রকার 'গোত্রস্খলন'। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

বিপক্ষসংজ্ঞয়াহ্বানমীর্ষ্যাতিশয়কারণং।
আসাং তু গোত্রস্খলনং দুঃখদং মরণাদপি ॥ (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৮০)

অর্থাৎ—বিপক্ষের নামে আহ্বান ঈর্ষাতিরেকের কারণ, যেহেতু গোত্রস্খলন মরণাধিক দুঃখপ্রদ।

দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছেন—

অহহ বিলসত্যগ্রে চন্দ্রাবলী বিমলদ্যুতিঃ
কিতব কলিতা তারা সাত্র ত্বয়া ক নু ষোড়শী।
তিমিরমলিনাকার ক্ষিপ্রং ব্রজারুণমণ্ডলা
মম সহচরী যাবন্মন্যুদ্যুতিং ন বিমুঞ্চতি ॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৮১-৮৮২)

অর্থ—অহে ধূর্ত, সম্মুখে বিমলকান্তি চন্দ্রাবলী (চন্দ্রশ্রেণী, পক্ষে শ্রীচন্দ্রভানুসুতা) বিরাজ করিতেছেন, এখানে তুমি ষোড়শী তারা (বিশাখা নাম্নী রাধাকে) কোথায় দেখিলে? ওহে তিমিরাধিক মলিনমূর্তি, শীঘ্রই এই স্থান হইতে প্রস্থান কর, কারণ এখনি আমার সহচরী চন্দ্রাবলী রক্তমুখী হইয়া (পক্ষে—উদয়কালীন রক্তিমবর্ণমণ্ডল ধারণ করিয়া) ক্রোধ (কিরণ) বিস্তার করিবেন।

'রসবিলাসবল্লী'-কার পূর্বোক্ত শ্লোকটিকেই যেন ভণিতাহীন একটি পদে রূপ দিয়া লিখিয়াছেন—

হের মোর অগ্রে চন্দ্রাবলী বিলসয়।
যাহার বিমল দ্যুতি উপমা না হয়॥
শুন হে কিতব শীঘ্র যাহ অন্যস্থান।
ষোড়শী রাধিকা ইথে কাহা বিদ্যমান॥
তিমির মলিনাকার মূরতি তোমার।
অরুণমণ্ডল যেন সখী যে আমার॥
যাবৎ না করে মন্দ দ্যুতি পরকাশ।
অন্যস্তরে তাবৎ চলহ পীতবাস॥ (পৃঃ ৭২)

উদ্ধবদাস শ্রীরূপকে অনুসরণ করিয়া গোত্রস্খলনে শ্রীরাধার মান বর্ণনা করিয়াছেন। রাই ও কানু একদা নির্জনে বসিয়া রসপ্রসঙ্গ কহিতেছিলেন, হঠাৎ বাক্যস্খলিত হইল।

কহে তুয়া মুখ বলি যাই
কত চন্দ্রাবলী নিছাই।
শ্যামবদনে শুনিতে বচনে
কোপে ভরল রাই॥ (তরু ৫৭১)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সোহাগভরেই বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, শ্রীরাধার মুখ অতি সুন্দর, তাহার জন্য চন্দ্রশ্রেণীকেও নির্মঞ্ছন বা মুছিয়া ফেলিতে তিনি প্রস্তুত। চন্দ্রশ্রেণী অর্থে শ্রীকৃষ্ণ কিছু অসতর্কভাবে চন্দ্রাবলী কথাটি ব্যবহার করিতেই শ্রীরাধা প্রতিনায়িকার বিষয় চিন্তা করিয়া মান করিয়াছেন।

'অনুমিতি'র তৃতীয় প্রকার 'স্বপ্নদর্শন'। 'হরের্বিদূষকস্যাপি' কথায় (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৮২) এই স্বপ্ন যে হরি ও বিদূষক দুইজনেই দেখিতে পারে, তাহা শ্রীরূপ বলিয়াছেন।

পদকর্তা গৌরীচরণ তাঁহার একটি পদে লিখিয়াছেন—

আপন মন্দিরে শুতিয়া সুন্দরী
দেখই ঘুমের ঘোরে।
কানু আন সঞে রভস করই
করিয়া আপন কোরে॥
আন রমণী বিহরে রজনী
হামারি নাগর কোর।
দেখিতে দেখিতে পাইয়া চেতন
মান ভরমে ভোর॥ (তরু ৫৭২)

শ্রীরাধা এই যে স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ অন্য রমণীর সহিত বিহাররত এবং ইহা দেখিয়া তিনি (শ্রীরাধা) যে মান করিতেছেন, এই সমস্তই শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের পরোক্ষ প্রভাবে পরিকল্পিত। শ্রীরূপ 'শপে ত্বভ্যং রাধে ত্বমসি' ইত্যাদি চরণে (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৮৩) যে স্বপ্নের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। স্বপ্নে নায়িকাপাশে নায়ক অন্য নায়িকার সহিত বিহারের স্বপ্ন দেখিতেছেন, সেই স্বপ্নের এক-আধটি কথা শুনিয়া নায়িকা মান করেন। শ্রীরূপ-বর্ণিত স্বপ্ন পদটির মধ্যে অনুস্যূত হয় নাই বটে, কিন্তু শ্রীরূপের চিন্তানুক্রমেই অন্যবিধ স্বপ্নের কথা পদকর্তা কল্পনা করিয়াছেন।

বিদূষকের স্বপ্নের ফলে নায়িকার মানোদ্ভবের কথা শ্রীরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রভাবে কোন পদ রচিত হয় নাই।

সহেতু মানের তৃতীয় কারণ 'দর্শন'। প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অন্য নায়িকার সহিত বিহাররত অবস্থায় দেখিয়া শ্রীরাধা যে মান করিতেছেন, এমন বিষয়ে কোন পদ দেখা যায় না। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়কে বৈচিত্র্য ও প্রগাঢ়তা দেওয়ার জন্যই মানের পরিকল্পনা হইয়াছে। সেক্ষেত্রে পরোক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অন্য নায়িকাবিলাস বর্ণনা করায় পদকর্তাদের পূর্বোক্ত লক্ষ্যটি দ্বিধাগ্রস্ত হয় নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষে অন্য বিলাস দেখাইতে লক্ষ্য কেন্দ্রচ্যুত হইবে, বোধ করি এইরূপ চিন্তা করিয়াই পদকর্তারা বিষয়টি অবলম্বন করেন নাই।

সহেতু মানের পর 'নির্হেতু মান'। সহেতু মান প্রসঙ্গে ভোগাঙ্কাদির বিষয়ে শ্রীরূপ পূর্ববর্তী পদ-রচয়িতা জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে কিছু পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু নির্হেতু মানের উল্লেখ তাঁহার সম্পূর্ণ স্বকীয়। এই নির্হেতু মান সম্পর্কে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

> অকারণাদ্দ্বয়োরেব কারণাভাসতস্তথা।
> প্রোদ্যন্ প্রণয় এবায়ং ব্রজেন্নির্হেতুমানতাং। (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৮৬)

অর্থাৎ—দুইজনের (নায়ক-নায়িকার) অকারণে বা কারণাভাসে যে প্রণয়ের (অভিমানের) উদ্রেক, তাহাই নির্হেতু মানে পর্যবসিত হয়।

নির্হেতু মান প্রসঙ্গে শ্রীরূপ প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন। এই বলার পিছনে একটা কারণ আছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তদ্গতপ্রাণা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সহেতু মানে আশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব নহে। শ্রীরূপ সেইজন্য সহেতু মান প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মানের কথা বলিতে পারেন নাই। নির্হেতু মানের ক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মানের সম্ভাবনা দেখামাত্র শ্রীরূপ তাহা বর্ণনা করিতে ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীরূপের

বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের এই স্বতন্ত্র মানও শ্রীরাধার ওই তদ্গতচিত্ততার জন্যই পদকারদের তেমন প্রভাবিত করিতে পারে নাই।

শ্রীরাধার নির্হেতু মানের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া শ্রীরূপ স্বরচিত 'উদ্ধবসন্দেশ' হইতে 'তিষ্ঠন্ গোষ্ঠাঙ্গনভুবি মুহুর্লোচনান্তং নিধত্তে' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকটির অর্থ—হে সখি, তুমিও ব্যর্থ মানবুদ্ধিতে অভিভূত হইয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠাঙ্গনে অবস্থান করার সময় উৎকণ্ঠাবশতঃ চত্বর-সন্নিহিত ভূখণ্ডের দিকে বারংবার তির্যক্ দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন, আর তুমি গবাক্ষরন্ধ্রে চোখ রাখিয়া কেন নিজের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছ? বাহিরে যাইয়া প্রাণনাথকে সন্তুষ্ট কর।

'রসবিলাসবল্লী'-কার শ্রীরূপের শ্লোকটির অনুবাদ করিয়াছেন—

গোষ্ঠাঙ্গনে কৃষ্ণ যদি খেদযুক্ত হয়্যা।
বহির্দ্বার নিরক্ষয়ে তোমার পথ চায়্যা॥
তুমিহ গবাক্ষদ্বার কর নিরীক্ষণ।
মিথ্যা মানে মন গ্লানি ইথে কি কারণ॥ (পৃঃ ৭৫)

গোবিন্দদাসের একটি পদে পূর্বোক্ত বিষয়টির কিছু ছায়া পড়িয়াছে। সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান।
সো সুখে তুহুঁ ধনি ভেলি অগেয়ান॥
ধরণি-বিলম্বিত বিরস-বয়ান।
কাহে বাঢ়াহ অকারণ মান॥
শ্যাম-কলেবর ধূলিক সাত।
মলিন বদন ভেল দূবর গাত॥ (তরু ৬০৫)

উপরি-ধৃত পদে শ্রীরূপ-বর্ণিত পরস্থিতির প্রভাব অস্পষ্ট হইলেও, পদকর্তা গোবিন্দদাস শ্রীরূপের প্রভাবেই যে পদ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা প্রমাণ করিতেছে পদের অন্তর্গত 'অকারণ মান' কথাটি।

শ্রীরাধার কারণাভাস-জনিত নির্হেতু মানের বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ 'অহমিহ বিচিনোমি ত্বদ্গিরৈব প্রসূনং' ইত্যাদি (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৯১) লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধার নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণ পুষ্প চয়ন করিতে গিয়াছিলেন, পুষ্প চয়ন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শ্রীরাধা মানবতী হইয়াছেন।

শ্রীরূপের দৃষ্টান্তটি কোন পদকার অনুসরণ করেন নাই; তবে কারণাভাসে শ্রীরাধার

নির্হেতু মান অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস পদকল্পতরু ৫৮৮ ও ৫৯৯-সংখ্যক পদে, উদ্ধবদাস ওই গ্রন্থের ৫৮৭ ও ৫৯০-সংখ্যক পদে, প্রেমদাস ৫৯২-সংখ্যক পদে এবং বলরাম কবিরাজ ৫৯১-সংখ্যক পদের মধ্যে শ্যাম-অঙ্গে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া শ্রীরাধার মান হইল বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ মান বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা শ্রীরূপের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া বা শ্রীরাধার নির্হেতু মান বর্ণনা করার পর শ্রীরূপ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যুগলমিলন বিবৃত করিয়াছেন। ইহার প্রভাব পদাবলীসাহিত্যে ব্যাপকভাবে দেখা গিয়াছে।

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

রসবতি রাধা রসময় কান।
কো জানে কাহে কয়ল দুহুঁ মান॥
দুহুঁ অতি রোখে বিমুখ ভই বৈঠ।
দুহুঁ চললী যমুনা-জলে পৈঠ॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
কিয়ে কিয়ে অদ্ভুত দুহুঁক বিলাস॥ (সমুদ্র ২০৭, তরু ৫৯৯)

পদস্থিত 'কো জানে কাহে কয়ল দুহুঁ মান' শ্রীরাধাকৃষ্ণের নির্হেতু মানের দ্যোতক।

গোবিন্দদাসের অন্য একটি পদে রহিয়াছে—

ইহ মধু-যামিনি মাহ।
কাহে লাগি মান- দহনে তনু দহি দহি
দুহুঁ মুখ দুহুঁ নাহি চাহ॥ (তরু ৬০২)

শেখরের পদে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়ের মান-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

বড় অপরূপ পেখলুঁ হাম।
কি লাগিয়া দুহুঁ কয়ল মান॥
বিবরি কহিবে সজনি হে।
এ কথা শুনিলে আউলায় দে॥
এত অদভুত কোথা না শুনি।
নাগরী উপরে নাগর মানি॥
এহো অপরূপ কোথা না দেখি।
হেন প্রেমে দুহুঁ শেখর সাখী॥ (তরু ৫৯৫)

'কি লাগিয়া দুহুঁ কয়ল মান' বলিয়া পদকর্তা বুঝাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা দুইজনের মানই নির্হেতু। শ্রীরূপানুসরণে ইহা পরিকল্পিত।

ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

তুহ রসময় তুহুঁ রসগুণ আগর
তুহা তুহা প্রেম অধীন।
তুহু বিদগধ তুহু চতুরশিরোমণি
তুহু সব ধীর প্রবীণ॥
মাধব ইথে কিয়ে অপরূপ রঙ্গ।
একবেরি মান তুহুক উপজায়ল
বোধল বচন বিভঙ্গ॥
কো যছু হৃদয় কঠিন ইথে সহচরি
কেলি কলহ অনুসারি।
বিঘটল প্রেম শিথিল পথ বারণ
অন্তর জ্বলত হামারি॥
পিরীতিক রীত সোই কিয়ে সমুঝব
সহজই কুটিল বেভার।
কহ ঘনশ্যাম দাস ইথে কি করব
দৈব শকতি তুরবার॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৭৬)

'মানোপশম-প্রকার' বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, নির্হেতু মান স্বয়ং উপশান্ত হয়, নায়কের (নায়িকা সন্নিধানে) গিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি দান এবং নায়িকার মৃদুহাস্য ও অশ্রুপাত-পর্যন্তই এই মানের স্থায়িত্ব (উজ্জ্বলনীলমণি, পৃঃ ৮৯৪)।

নির্হেতু মানোপশমের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

রোষস্তবাভূদ্‌যদি রাধিকেঽধিকস্তথাস্তু গণ্ডঃ কথমুচ্ছ্বসিত্যসৌ।
স্বনর্ম্মণেথং তুরপহ্নবস্মিতাং প্রিয়ামচুম্বৎ পশুপেন্দ্রনন্দনঃ॥

(উজ্জ্বল, ৮৯৫)

অর্থাৎ—হে রাধে, তোমার রোষ যদি অধিক হইয়া থাকে তাহা হইলে গণ্ডস্থল কি করিয়া এমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। (শ্রীকৃষ্ণের) এইরূপ পরিহাসে প্রিয়তমা হাস্য সংবরণ করিতে অসমর্থ হইলে গোপরাজতনয় তাহাকে চুম্বন করিলেন।

'রসবিলাসবল্লী'-কার শ্লোকটির সুন্দর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন—

যদি মোরে অতি রোষে কৈলে আচম্বিত।
তবে কেন গণ্ড তোমার হইল উলসিত॥
কৃষ্ণবাক্যে রাইমুখে হাস্য উপজিল।
রাইমুখ হেরি কৃষ্ণ চুম্বন করিল॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৭৭)

শ্রীরূপ নির্হেতু মান উপশমের উপায় হিসাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রভাবে উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন—

নিজ প্রতিবিম্ব রাই যব শুনল
অবনত করু মুখ লাজে।
নিরহেতু হেতু জানি হাম রোখলুঁ
তেজলুঁ নাগররাজে॥
এত কহি রাই চীরে মুখ ঝাঁপল
বয়নে না নিকসয়ে বাণী।
রসিক-শিরোমণি কোরে আগোরোল
রাইক অন্তর জানি॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
সবহুঁ সখীগণ চিত পুতলি যেন
হেরত দুহুঁক চরিত॥
পুন সভে হাসি মন্দির সঞে নিকসল
দুহুঁ জন ভেল একুঠাম।
মদন মহোদধি নিমগন দুহুঁ জন
উদ্ধবদাস গুণগান॥ (তরু ৫৯০)

উদ্ধবদাসের এই পদে মানবতী শ্রীরাধা তাঁহার নির্হেতু মানের জন্য লজ্জায় অবনত-মুখী হইয়াছেন। তাঁহার অন্তর জানিয়া রসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়াছেন। ইহাতেই মান উপশান্ত হইয়াছে। পদস্থিত ক্রোড়ে করার ব্যাপারটি শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট আলিঙ্গনের পর্যায়ভুক্ত।

গোপীকান্ত দাসের পদে (তরু ৫৯৭) রহিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা একদা পরস্পর রসালাপে ব্যাপৃত ছিলেন। হঠাৎ পরস্পরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া পরস্পর প্রেম-কলহে লিপ্ত হইলেন। দুইজনেরই মান হইল। দুইজনে যথেচ্ছক্রমে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীরাধা একটি তরুর মূলে বসিয়া ঝর ঝর নয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানেই আসিয়া পড়িলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ 'হেরত তরুমূলে রোয়ত রাই।' তাহা দেখিয়া—

কানুক নয়নে ঝরয়ে তব লোর।
ধীরে ধীরে যাই রাই করু কোর॥

সুতরাং এখানেও শ্রীরূপানুসরণে মানোপশম ঘটিয়াছে।

গোবিন্দদাস তাঁহার পদে (তরু ৫৯৯) লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা মান করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন এক নিকুঞ্জে প্রবেশ করিলে উভয়েই একে অপরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। দুইজনেই নিজ নিজ সহচরীর নামোল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন এবং উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া প্রিয়সখীজ্ঞানে একে অপরকে আলিঙ্গন করিয়াছেন।

যব দুহুঁ মেলি আলিঙ্গন দেল।
গোবিন্দদাস কহ তব কিয়ে ভেল॥

শ্রীরূপের সূত্রানুযায়ী আলিঙ্গনের দ্বারা মানের উপশম ঘটাইয়াছেন গোবিন্দদাস।

ঘনশ্যাম শ্রীরূপের 'কুঞ্জদ্বারিনিবিষ্টয়োস্তরণিজাতীরে' ইত্যাদি শ্লোকের (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৯৩) অনুসরণে লিখিয়াছেন—

কুসুমিত মন্দ- পবন ঘনকানন
মোহন কালিন্দীতীরে।
অন্তর রোষ অবশ দুহু দুহু দিশি
কুঞ্জ দুয়ারে বহু ঠাড়ে॥
সজনী আজুক অপরূপ রঙ্গ।
নিকটহি কোই হেরত নাহি কাহুক
ভেল দুহু মৌন বিভঙ্গ॥
দুহু দুহা পিরীতি আরতি নাহি টুটই
অকারণ রোষ আভাষ।
কর গহিকরক কহহি তছু সোঁপল
পরশহি উপজল হাস॥
তছু মুখ কমল হেরি তনু পুলকিত
লোচন তিরপিত ভেল।
কহ ঘনশ্যাম দাস তব মাধব
হাসি আলিঙ্গন দেল॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৭৬)

সহেতু মানের উপশমের বিষয়ে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

হেতুর্যস্তু শমং যাতি যথাযোগ্যং প্রকল্পিতৈঃ।
সামভেদক্রিয়াদাননত্যুপেক্ষারসান্তরৈঃ॥
মানোপশমনস্যাঙ্কা বাষ্পমোক্ষস্মিতাদয়ঃ। (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৯৫)

অর্থাৎ—

সকারণ মান যায় উচিত কল্পনে।
'সাম', 'ভেদক্রিয়া', 'দান', 'নতি', 'উপেক্ষণে'॥
'রসান্তর' হৈলে হয় মানের বিনাশ।
মান নাশে অশ্রু নেত্রে, মুখে মৃদু হাস॥ (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৭৭)

প্রথম উপায় 'সাম'। 'প্রিয়বাক্যস্য রচনং যত্তু তৎ সাম গীয়তে' (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৯৬) সূত্রে শ্রীরূপ বলিয়াছেন যে, প্রিয় বাক্যের রচনা 'সাম' নামে কীর্তিত হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীরূপ 'জাতং সুন্দরি তথ্যমেব পৃথুনা' ইত্যাদি (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৯৬) চরণে যে শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন তাহার অর্থ—সুন্দরী রাধে, সত্যই আমার গুরুতর অপরাধে এই মান জন্মিয়াছে, কিন্তু তোমার (স্বাভাবিক) স্নেহই আমার আশ্রয়। হরির এই কথা শুনিয়া নতমুখী (শ্রীরাধা) অশ্রুধারায় অনঙ্গোৎসব-রঙ্গক্ষেত্রের মঙ্গল-ঘটের মতো কুচদ্বয়কে পূর্ণ করিলেন।

ঘনশ্যাম শ্লোকটির অনুসরণে লিখিয়াছেন—

না জানিয়া পরিণাম তুয়া গুণ অনুপাম
যদি মুঞি কৈল অপরাধ।
তথাপি ভরসা মোর আমা প্রতি স্নেহ তোর
কখন না হয় অবসাদ॥
প্রিয়ে তুয়া পায় কি বলিব আর।
ক্ষমহ সকল দোষ পরিহর অতি রোষ
মুখ তুলি চাহ একবার॥
তোমার কমল মুখ না দেখিয়া তিল এক
কত কোটি যুগ করি মানি।
তুমি মোর সরবশ আমি সে তোমার বশ
তুয়া বিনু অন্যে নাহি জানি॥

কহে ঘনশ্যাম দাস শুনিয়া মধুর ভাষ
অবনত দুটি আঁখি ঝুরে।
দ্রবিল হৃদয় রাধা যত মনে ছিল বাধা
অভিমান সহ গেল দূরে॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৭৭-৭৮)

উপরি-ধৃত পদটিতে শ্লোকোক্ত শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাবে ধরা হইয়াছে। পদে শ্রীরাধার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনাটি বাদ পড়িলেও শ্রীরূপ-কথিত 'সামের' দৃষ্টান্তটি উদাহৃত।

যদুনন্দন দাস তাঁহার পদে (তরু ৪৬০) লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের দূতী শ্রীরাধার মান-ভঞ্জনে ব্যর্থ হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীকৃষ্ণকে যখন নিবেদন করিল, তখন দূতীর বচন শুনিয়া 'রসিক-শিরোমণি' তাহার সহিত শ্রীরাধার নিকটে আসিলেন। দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া দুর্জয়মানযুক্তা শ্রীরাধা মস্তক অবনত করিলেন। তখন—

করযোড়ে সাধয়ে কান।
হাম তুয়া কিঙ্কর পড়িরে চরণতল
তেজ ধনি দারুণ মান॥

শ্রীকৃষ্ণ এই যে নিজেকে শ্রীরাধার কিঙ্কর বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, এক্ষেত্রে মান উপশমের উপায় হিসাবে শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট সামের অবতারণা হইয়াছে।

উদ্ধবদাসের পদে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

তুয়া বিনে নয়নে আন নাহি হেরিয়ে
না কহিয়ে আন সঞে বাত।
তোহারি সখিনি বিনে বাত না পুছিয়ে
না বসিয়ে কাহুক সাথ॥
তব তুহুঁ কাহে মান মুঝে করতহি
না বুঝিয়ে তুয়া মন-কাজে॥ (তরু ৫৮৯)

এই যে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়বাক্য দ্বারা শ্রীরাধার মানভঞ্জনের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা 'সাম' ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

সহেতু মানোপশমের দ্বিতীয় উপায় 'ভেদ'। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

ভেদো দ্বিধা স্বয়ং ভঙ্গ্যা স্বমাহাত্ম্যপ্রকাশনং।
সখ্যাদিভিরুপালম্ভপ্রয়োগশ্চেতি কীর্ত্যতে॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৯৬)

অর্থ—ভঙ্গী দ্বারা আপনি আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং সখীগণ-কর্তৃক উপালম্ভপ্রয়োগ —এই দুই প্রকারে ভেদ সাধিত হয়।

প্রথমতঃ, ভঙ্গী দ্বারা আপনি আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করা।

শ্রীরূপ দৃষ্টান্তপ্রদানচ্ছলে যে 'রূক্ষা ষন্ময়ি বর্তসে ত্বমভিতঃ' ইত্যাদি (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৯৯) লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ—আমি সর্বপ্রকারে স্নিগ্ধ হইলেও তুমি যখন আমার প্রতি রুক্ষ তখন ইহা তোমার দোষ নয়, আমারই দোষ; কারণ, দশমীদশাপ্রাপ্ত দেবাঙ্গনাদের উপেক্ষা করিয়া আমি যখন তোমাকে ভজনা করিয়াছি, তখন এই অনুচিত কাজেরই ফল। হে সুমুখি, তুমি কেবল প্রেমপীড়িত ব্রজযুবতিত্বকেই সেবা করিতেছ।

ঘনশ্যাম শ্রীরূপের শ্লোকটির অনুসরণে লিখিয়াছেন—

দশমিদশা কত কত সুরনাগরি
গণি গণি পিরীতি চরিত।
তুয়া অনুরাগেতে আগিলু সো সব
তুহু পুন ভেলি বিপরীত॥
মানিনী কাহে করসি মোহে রোখ।
বিনু অপরাধ বাদ করু যো জন
সো পুন তা কর দোখ॥
গোকুল বসতি কত এ নব নাগরী
পূরল নব অনুরাগে।
সো হাম পালটি নয়নে নাহি হেরলু
তুয়া ধনী পিরীতি সোহাগে॥
তুহু অবিচার হৃদয়ে যব ধারলি
না জানি কৈছে অভিলাষ।
পিরীতিক রীত বিরতি নাহি সহই
কহ ঘনশ্যাম দাস॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৭৯)

শ্রীরূপের শ্লোকে কেবল তথ্য-বিবৃতিই ছিল, পদকর্তা তথ্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্বেদনাকে কিছু বেশী পরিমাণে যুক্ত করিয়া অনবদ্য পদটি সৃষ্টি করিয়াছেন। পদে তথ্যের বিষয়েও কেবল সুরাঙ্গনাদের অনুরাগের কথা নহে, গোকুলের নবনাগরীদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিও বর্ণিত হইয়াছে।

ভেদের দ্বিতীয় প্রকার—সখীগণ কর্তৃক উপালম্ভ প্রয়োগ। শ্রীরূপ 'কর্তুং সুন্দরি শঙ্খচূড়মথনে নাস্মিন্ন পেক্ষোচিতা' ইত্যাদিতে (উজ্জ্বল, পৃঃ ৮৯৯) বলিয়াছেন যে, হে সুন্দরি, যিনি সকল ব্রজবাসীরই অভয়প্রদানরূপ ব্রতে দীক্ষিত হইয়া শঙ্খচূড়কে বধ করিয়াছেন—সেই প্রিয়তমের প্রতি তোমার উপেক্ষা উচিত নহে। সখীরা কথাগুলি ভদ্রাবলীকে বলিয়াছেন।

ঘনশ্যাম পদে লিখিয়াছেন—

যো করু নাশ শঙ্খচূড় জীবন।
যো জন ত্রিভুবন জন ভয় মোচন ॥
সুন্দরি অতয়ে জানবি নিজ দোখ।
অবিচারে তা সোঁ করলি যব রোখ ॥
ঐছন কোন কুমতি তোহে দেল।
ছোড়ি প্রেমবর মানিনী ভেল ॥
সখীমুখে ঐছন শুনইতে বাণী।
রোষে কমলমুখী সজল নয়ানী ॥
কহ ঘনশ্যাম দাস ঝরতহি নীরে।
মুকুতা ফলল জনু নাসা-শিখরে ॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৭৯)

পদকার প্রথম চারিটি চরণে শ্লোকোক্ত বিষয়টি বলিয়া লইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রেও 'সকল ব্রজবাসীরই অভয়প্রদানরূপ ব্রতে দীক্ষিত' বিষয়টি আরও ব্যাপ্তি পাইয়া হইয়াছে 'ত্রিভুবনজনভয় মোচন'। এই ব্যাপ্তকরণে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাই সুপ্রকাশিত হইয়াছে। শেষ ছয়টি চরণে পদকর্তা ঘনশ্যাম মানবতী শ্রীরাধার ক্ষেত্রে উপালম্ভ প্রয়োগের ফল কী হইল, তাহা স্বাধীনভাবে সুন্দর কবিত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরাধার অশ্রু দেখিয়া পদকার যে বলিয়াছেন—'মুকুতা ফলল জনু নাসা-শিখরে' তাহাতে কাব্যিক উৎকর্ষের পরিচয় রহিয়াছে।

শেখরের পদে সখী ললিতা ক্রন্দনপরা মানিনী শ্রীরাধাকে বলিতেছে—

তুহুঁ রসবতী জগতে খেয়াতি
রূপে গুণে নাহি সীমা।
সো বহুবল্লভ আনের দুর্লভ
জানিয়া না দেহ ক্ষেমা ॥
শত গুণ যার এক দোষ তার
ছাড়িতে উচিত নয়। (তরু ৪৮৭)

এখানেও সখী একের পক্ষে যিনি প্রায় দুর্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রীরাধাকে মান করিতে নিষেধ করিতেছেন। ইহা উপালম্ভ ছাড়া আর কি?

শ্রীরূপের নির্দেশক্রমে সহেতু মানের উপশমের তৃতীয় উপায়—'দান'। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন 'ব্যাজেন ভূষণাদীনাং প্রদানং দানমুচ্যতে' অর্থাৎ—ছল করিয়া যে ভূষণাদি প্রদান তাহাকেই 'দান' বলে।

শ্রীরূপ 'কামো নাম সুহৃন্মমাস্তি ভবতীমাকর্ণ্য মৎপ্রেয়সীং' ইত্যাদি (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯০০) শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পদ্মাকে বলিলেন—আমার কাম নামে একজন বন্ধু আছে; তুমি যে আমার প্রেয়সী এই কথা শুনিয়া আমার হার সঙ্গমোৎসবে থাকুক এই অভিপ্রায়ে তোমার বক্ষে সে এই হার অর্পণ করিয়াছে। বাহু-দুইটি তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে মাননিগ্রহহেতু পদ্মার মুখে ঈষৎ হাস্য দেখা দিল, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গিয়া তাঁহার (পদ্মার) গণ্ডস্থলে চুম্বন করিলেন।

শ্রীরূপের শ্লোকটি সম্মুখে রাখিয়া 'রসবিলাসবল্লী'-কার লিখিয়াছেন—

মোর অতি প্রিয় রাধে জানিয়া তোমারে।
সুহৃদ মদন অতি আনন্দ অন্তরে॥
হের দেখ দিল হার যতনে গাঁথিয়া।
সকল করহ নিজ বক্ষ সঙ্গ দিয়া॥
এত কহি রাই কণ্ঠে মাল্য সমর্পিতে।
হস্ত পসারিয়া কৃষ্ণ চলিলা অগ্রেতে॥
দেখিয়া পদ্মার মুখে হাস্য উপজিল।
প্রিয়ামুখ হেরি কৃষ্ণ চুম্বন করিল॥ (পৃঃ ৮০)

অনূদিত পয়ারে কথাগুলি পদ্মার পরিবর্তে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। বিপুল পদাবলীসাহিত্যের উদ্ভবের ক্ষেত্রে এমন বিষয় প্রায়শঃই দেখা যায়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্বাদনকারী বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্য নায়িকার সহিত বিলাসের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তনক্রমে শ্রীরাধার সহিত বিলাসই কল্পনা করিয়াছেন। পয়ারের রচয়িতা শেষে পদ্মার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে দুইটি অর্থ বুঝা যায়—(১) সখী পদ্মার হাস্য দেখিয়া উৎসাহিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ামুখে (শ্রীরাধার আননে) চুম্বন করিলেন, (২) শ্রীরাধাই লক্ষ্মী বা পদ্মা। তাঁহার মুখে হাস্য ফুটিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চুম্বন করিলেন।

শ্রীরূপের এই পরিকল্পনাটি অবলম্বন করিয়া পদাবলীসাহিত্যে কোন পদ রচিত

হইতে দেখি না। ব্যাজের অর্থাৎ ছলনার বিষয়টি বাদ দিয়া জ্ঞানদাস 'দান'কে সাধারণ অর্থে ধরিয়া পদমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সংলাপ লিখিয়াছেন—'লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী' (তরু ৫১৩)। সাধের মুরলীটি দান করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মানভঞ্জন করিতে চাহেন।

দানের পর 'নতি'। এই 'নতি' সম্বন্ধে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন 'কেবলং দৈন্যমালম্ব্য পাদপাতো নতির্মতা' অর্থাৎ, কেবল দৈন্য অবলম্বন করিয়া চরণদ্বয়ে যে পতন তাহাই 'নতি'।

শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

ক্ষিতিলুণ্ঠিত শিখণ্ডাপীড়মারান্মুকুন্দে
রচয়তি রতিকান্তস্তোমকান্তে প্রণামং।
নয়নজলধরাভ্যাং কুর্বতী বাষ্পবৃষ্টিং
বরতনুরিহ মানগ্রীষ্মনাশং শশংস॥ (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯০১)

অর্থাৎ—রতিকান্ত (মদন) সমূহের কান্ত মুকুন্দ ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ভূমিতে লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম রচনা করিলে শ্রীরাধার নয়নমেঘ হইতে বাষ্পবারি বর্ষিত হইতে লাগিল। হে বরতনু, তাহাতে মানরূপ গ্রীষ্মের উপশম হইল।

শচীনন্দন কথাগুলির অনুবাদ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

রাইক হৃদয় মান জানি মাধব
পড়ল চরণতল পাশে।
নয়ন জলদজল বরিখনে ধনি করু
মান-হুতাশ বিনাশে॥ (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৭৮)

শ্রীরাধার নয়নবারিতে মানরূপ গ্রীষ্মের দাবদাহ অপনোদিত হইয়াছে, এই মর্মে শ্রীরূপ যে কবিত্বের উৎসার ঘটাইয়াছেন তাহার পূর্ণ পরিচয় অনূদিত পয়ারের মধ্যে ফুটে নাই।

বিষয়টি লইয়া ঘনশ্যাম পদ লিখিয়াছেন—

কত কত মিনতি সমাদব বাদর
কতরূপে করল মাধাই।
হৃদয় বিষাদ আধ দিঠি অঞ্চলে
পালটি না হেরই রাই॥
দেখ সখি প্রেমক গতি অনুপাম।
রাইক চরণ কমলে পুন মাধব
সাদরে করু পরণাম॥

ধরণি লোটাই মুকুট মণি কুণ্ডল
তনু ঘন পুলক অথির।
সুন্দরি মান সমাপন কহ যব
লোচন ঢরকত নীর॥
কতয়ে পিরীতি কত আরতি তুহুঁ তুহুঁ
অনুভব কোই না জান।
প্রেম পরাণ প্রেম পয়ে শীতল
ঘনশ্যাম ভালে অনুমান॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৮০)

শ্রীরূপের শ্লোকশেষের কবিত্বটুকু উপরি-ধৃত পদের মধ্যে স্পষ্ট প্রকাশিত না হইলেও, শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতিগূঢ় প্রেমের ব্যঞ্জনা ঘনশ্যাম নিপুণতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন— 'কতয়ে পিরীতি কত, আরতি তুহুঁ তুহুঁ, অনুভব কোই না জান।'

নতি দ্বারা শ্রীরাধার মানভঞ্জনের বিষয়টি শ্রীরূপের দ্বারা প্রবর্তিত নহে। শ্রীরূপের পূর্বে জয়দেব গীতগোবিন্দে ইহার অবতারণা করিয়াছেন। সুতরাং এই বিষয়ে পদাবলীসাহিত্যে শ্রীরূপের প্রভাব অনুসন্ধান করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

সহেতু মানোপশমের চতুর্থ উপায়—'উপেক্ষা'। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

সামাদৌ তু পরিক্ষীণে স্যাদুপেক্ষাঽবধীরণং।
উপেক্ষা কথ্যতে কৈশ্চিৎ তূষ্ণীম্ভাবতয়া স্থিতিঃ॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৯০১)

অর্থাৎ—সাম প্রভৃতি উপায় নষ্ট হইলে যে অবজ্ঞা হয় তাহারই নাম 'উপেক্ষা'। কেহ কেহ নীরবতাকেও অবজ্ঞা (উপেক্ষা) বলে।

উপেক্ষা-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ যে 'সুনুর্বল্লভ এষ বল্লবপতেঃ' ইত্যাদি শ্লোক (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯০২) রচনা করিয়াছেন তাহার অর্থ—গোপরাজের পুত্র ইনি (শ্রীকৃষ্ণ) প্রিয়, বীরাগ্রগণ্য, তদুপরি কন্দর্পকুলবিজয়ীর বেশে বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁর প্রতি সখীর (শ্রীরাধার) সাম্প্রতিক রুক্ষতা মঙ্গলজনক নহে। দেখ, ইনি নিষ্ঠুরমনে দূরে যাইতেছেন। ইহাতে (শ্রীরাধার এমন ব্যবহারে) যুক্তিযুক্ততা কি আছে ?

শ্লোক ধৃত কথাগুলি বৃন্দা যে বিশাখার সখীদের বলিয়াছে সেই বিষয়ে 'আনন্দ-চন্দ্রিকাটীকা'-কার লিখিয়াছেন—'বৃন্দা বিশাখাদ্যাঃ সখীরাহ শৃনুরীতি।' (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯০২)। কিন্তু 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা'-কার লিখিয়াছেন—বিশাখার সখীগণ-প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-

উক্তিচ্ছলে বৃন্দা (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৭৯) অর্থাৎ বিশাখার সখীদের কাছে বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের উক্তিই অবিকৃতভাবে প্রয়োগ করিয়া বলিতেছে। এই অর্থের ক্ষেত্রে 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা'-কার কিছু আত্মনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন; কারণ, শ্লোকটির মধ্যে উত্তম পুরুষে কোন কথা ব্যক্ত হয় নাই, তাহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে মানিনীর সম্মুখে এমন আত্ম-গৌরব বর্ণনা ঈষৎ অসঙ্গত।

ঘনশ্যাম শ্রীরূপের শ্লোকটির সঙ্গত অর্থ লইয়াই 'উপেক্ষা'র বিষয়ে পদ রচনা করিয়াছেন—

কোটি মদন রূপে মোহন যো জন
গুণইতে সুরগণ ভাগে।
যো তুয়া চরণ পরশ রস ললাসে
অবিরত করু অনুরাগে॥
মানিনি সো ব্রজরাজকুমার।
তোমারি কঠিন পণ হেরইতে ঐছন
দূরে চলত পরিহার॥
ঝামরু বদন সজলদ লোচন
কান্তিহীন ক্ষীণ দেহা।
কিয়ে চতুরাই রাই তুয়া অন্তর
না বুঝিয়ে কৈছন লেহা॥
লুবধ চকোর নেহারই হিমকর
রস পিবইতে অভিলাষ।
তহি যব জলদ অগোরল কি করব
এ ঘনশ্যাম দাস॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৮১)

শ্লোকের কথা-কয়টি লইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ সুন্দর একটি পদ-রচনায় ঘনশ্যাম অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শেষ স্তবকটিতে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার প্রয়োগে কাব্যিক উৎকর্ষ বর্ধিত হইয়াছে।

সহেতু মানোপশমের পঞ্চম বা সর্বশেষ উপায় 'রসান্তর'। শ্রীরূপ রসান্তর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

আকস্মিকভয়াদীনাং প্রস্তুতিঃ স্যাদ্রসান্তরং।
যাদৃচ্ছিকং বুদ্ধিপূর্বমিতি দ্বেধা তদুচ্যতে॥ (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯০৪)

অর্থাৎ—আকস্মিক ভয় প্রভৃতির যে সমাবেশ তাহাই 'রসান্তর'। ইহা যাদৃচ্ছিক ও বুদ্ধিপূর্বক এই দুই ভাগে বিভক্ত।

'যাদৃচ্ছিক'। 'উপস্থিতমকস্মাদ্‌যত্তদ্‌যাদৃচ্ছিকমুচ্যতে' লিখিয়া শ্রীরূপ বলিয়াছেন যে, যাহা অকস্মাৎ উপস্থিত হয় তাহার নাম যাদৃচ্ছিক।

দৃষ্টান্ত হিসাবে 'অপি গুরুভিরুপায়ৈরন্য সামাদিভির্যা' ইত্যাদি শ্লোকে (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯০৪) শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—আজ শ্রীকৃষ্ণ গুরুতর উপায় দ্বারা ভদ্রার মানভঞ্জন করিতে থাকিলে এই মান কোনক্রমে ভঙ্গ হইল না, কিন্তু হঠাৎ মেঘের গর্জন হওয়াতে ভদ্রা ভীত হইয়া সম্মুখে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ নিজের বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীরূপের এই শ্লোকটির অনুবাদ করিতে গিয়া উজ্জ্বলচন্দ্রিকা-কার উজ্জ্বলনীলমণিস্থ পরবর্তী শ্লোক 'উপায়েষু ব্যর্থোন্নতিষু' ইত্যাদির (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯০৫) দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন, সেইজন্য অনবধানতাবশতঃ তিনি বৃষাসুরের গর্জনে মানভঙ্গের বিষয়টি ভদ্রা হইতে পদ্মার উপরে আনিয়া লিখিয়াছেন—

পদ্মার মান দেখি হরি অনেক বিনয় করি
বহু যত্নে নারিল খণ্ডিতে।
সখীর বিনয় বাতে উত্তর না দিল তাথে
মৌন করি রহিল মানেতে॥
হেনকালে দৈবদোষে অরিষ্ট অসুর এসে
বজ্রতুল্য শব্দ করিল।
তাথে মান ছাড়িয়া ভযেতে কম্পিত হয়া
আলিঙ্গিয়া কৃষ্ণেরে ধরিল॥

(উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৮০)

ঘনশ্যাম কিন্তু ভদ্রা কিংবা পদ্মার নাম করেন নাই। সুতরাং তাঁহার পদটি শ্রীরাধার সম্বন্ধেও বুঝিবার সুযোগ আছে। তিনি শ্রীরূপের শ্লোকের অনুসরণে লিখিয়াছেন—

যতনহি সাম ভেদ নতি আদর
সাদরে সাধল নাহ।
রোধক শেষ লেশ নাহি হোয়ল
বাঢ়ল অন্তরদাহ॥
সজনি হের দেখ অপরূপ রঙ্গ।
নূতন জলদ শবদ শুনি হঠ সঞে
ভৈগেল মানক ভঙ্গ॥

চমকি চকিত অতি কাতরে নাগরি
পৈঠল নাগর কোর।
দেই আলিঙ্গন ইন্দুবদন ঘন
চুম্বই কানু চকোর॥
অপরূপ প্রেম দুহুক দুহু সমুঝই
কোই না সমুঝই আন।
কহ ঘনশ্যাম দাস দুহু বিদগধ
এক তনু একোই পরাণ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৮২-৮৩)

রসান্তরের দ্বিতীয় বিভাগ 'বুদ্ধিপূর্বক'। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন 'বুদ্ধিপূর্বস্তু কান্তেন প্রত্যুৎপন্নধিয়া কৃতং' অর্থাৎ—প্রত্যুৎপন্নমতি কান্তের দ্বারা যাহা করা হয় তাহাই 'বুদ্ধিপূর্বক'।

এই বিষয়ে শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে যে সব দৃষ্টান্ত দিয়াছেন সেইগুলির অন্যতম—

পাণৌ পঞ্চমুখেন দুষ্টকৃমিণা দষ্টোঽস্মি রোষাদিতি
ব্যাজাৎ কূণিতলোচনং ব্রজপতৌ ব্যাভুজ্য বক্ত্রং স্থিতে।
সদ্যঃ প্রোজ্‌ঝিতরোষবৃত্তিরসকৃৎ কিং বৃত্তমিত্যাকুলা
জল্পন্তী স্মিতবঙ্কুরাস্যমমুনা গান্ধর্বিকা চুম্বিতা॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৯০৬)

ভাষান্তরে—অকস্মাৎ আমার হাতে দুষ্ট পঞ্চবদন কীট দংশন করিল, ব্রজপতি (শ্রীকৃষ্ণ) এই বলিয়া ছলনাপূর্বক চক্ষু সঙ্কুচিত করিয়া বিমর্ষবদনে অবস্থান করিতে থাকিলে গান্ধর্বিকা (শ্রীরাধা) তৎক্ষণাৎ রোষ পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুল হইয়া কী হইল, কী হইল বলিয়া মুখে মুখ দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ (সুযোগ বুঝিয়া শ্রীরাধাকে) চুম্বন করিলেন।

শ্রীরূপের শ্লোকটি উপজীব্য করিয়া রায়শেখর পদ লিখিয়াছেন। তাঁহার পদের শেষাংশ এইরূপ—

কুঞ্জ-অঙ্গনে কুঞ্জ-রাজ।
কাঁপি পড়ল ক্ষিতি মাঝ॥
ফেরি নেহারত রাই।
মরি মরি করত কাহ্নাই॥

ভুজগে কাটল তনু-ওর।
কপটহি মুরুছল ভোর॥
বজর পড়ল শুনি বোলে।
ধাই ধনি ধরি করু কোলে॥
উঠল নাগর-বর শূর।
মান-গরব ভেল চূর॥
মন্ত্র-শিরোমণি ব্রজচাঁদ।
সোই পড়ল পুন ফাঁদ॥
ধনি-মুখ মোছল বাসে।
চুম্বন কয়ল বহু আশে॥ (তরু ৩৮৯)

এখানেও আমরা দেখিতেছি, মানিনী শ্রীরাধার মানভঞ্জন সহজে করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ কপটতার আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি ভূমিতে পড়িয়া সর্পদষ্ট হওয়ার কথা বলিয়াছেন, ফলে মানবতীর মান গিয়াছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দ্রুত গিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তৎপরে উঠিয়া শ্রীরাধাকে চুম্বন করিয়াছেন। পদটির বর্ণনা শ্রীরূপের শ্লোকের সহিত পুরাপুরি মিলিয়া যায়; সুতরাং এক্ষেত্রে শ্লোকের প্রভাব অনস্বীকার্য।

অন্য উপায় ব্যতীত দেশ, কাল বা মুরলীর শব্দেও যে ব্রজসুন্দরীদের নির্হেতু মানের উপশম ঘটে, তাহা বলিতে গিয়া শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিয়াছেন—

দেশকালবলেনৈব মুরলীশ্রবণেন চ।
বিনাপ্যুপায়ং কাপ্যেষ লীয়তে ব্রজসুভ্রুবাং॥ (পৃঃ ৯০৭)

প্রথমতঃ, দেশবল। 'অলঙ্কীর্ণং চন্দ্রাবলিরলিঘটাঝঙ্কৃতিভরৈঃ' ইত্যাদি শ্লোকে (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯০৭) শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, ভ্রমরসমূহের ঝঙ্কারে পরিব্যাপ্ত এবং বিবিধ কুসুমে সুশোভিত বৃন্দাবনকে দর্শন করিয়া, আরও কদম্বতরুস্থিত প্রিয়তম হরির সহাস্য বদন দেখিয়া চন্দ্রাবলী মান পরিহারপূর্বক সখীর প্রতি সতৃষ্ণনেত্রে চাহিলেন।

এই দৃষ্টান্তটি অনুসরণে ঘনশ্যাম পদে লিখিয়াছেন—

সজনি অপরূপ কেলি কদম্বতরুছায়।
শ্যাম মনোহর মুরলী বাজায়॥
মৃদু মৃদু হাস বিকাশ বয়ান।
হেরি হেরি মানিনি তেজল মান॥

আরতি কান্ত সঙ্গসুখ রঙ্গ।
সহচরি হেরি নয়ন করু ভঙ্গ॥
বাঢ়ল প্রেম মান বহু দূর।
ঘনশ্যাম যতনে মনোরথ পূর॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৮৪-৮৫)

প্রথমতঃ, ভ্রমরঝঙ্কারমুখর ও কুসুমশোভিত বৃন্দাবনের বর্ণনা পদটিতে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ঘনশ্যাম চন্দ্রাবলীর নাম করেন নাই। শ্রীরূপকে খণ্ডন করিয়া শ্রীরাধার নাম বসাইবার সাহস তাঁহার নাই, অথচ চন্দ্রাবলী বা তাঁহার কোন সখীর সঙ্গে বিলাসের ইঙ্গিত পর্যন্ত দিতে তাঁহার প্রাণে কষ্ট হয়। তাই পদকর্তা নীরব রহিয়াছেন, যে যেমন বুঝ ব্যাখ্যা করিয়া লও।

দ্বিতীয়তঃ, কালবল। শ্রীরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, একদিন মানিনী শ্রীরাধা দূতীমুখে-বর্ণিত শারদ-চন্দ্রের কিরণে উদ্ভাসিত রাত্রির সৌন্দর্যের কথা শুনিয়া মান পরিত্যাগ করিলেন (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯০৮)।

বিষয়টির স্পষ্ট প্রভাব পদাবলীসাহিত্যে বিশেষ পড়ে নাই। বল্লভদাসের একটি পদে ইহার কিছু আভাষ আছে। যথা—

কিসের লাগিয়া রাই হইলা মানিনী।
ভাগ্যে মিলয়ে হেন মধুর যামিনী॥ (তরু ৬০৩)

পদের মধ্যে দূতী মানবতী শ্রীরাধাকে এই যে মধুর যামিনীর কথা বলিয়া তাঁহার মান ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা অনেকখানি শ্রীরূপের নির্দেশানুরূপ। পদে আমরা আরও দেখি, দূতীর এইরূপ কথায় সত্যই মানের উপশম ঘটিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মুরলীশব্দ। শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া মানবতী শ্রীরাধা চঞ্চল হইয়া উঠেন, তিনি মান পরিহার করেন—এইরূপ ব্যঞ্জনা শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণিতে রহিয়াছে (পৃঃ ৯০৯)। বিষয়টি পদাবলীসাহিত্যকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই।

॥ প্রেমবৈচিত্ত্য ॥

বিপ্রলম্ভের তৃতীয় বিভাগ প্রেমবৈচিত্ত্য। বোপদেবের মুক্তাফল অনুসারে শ্রীমদ্-ভাগবতের দশম স্কন্ধে রুক্মিণী প্রভৃতির বিলাপের মধ্যে ঐ ভাব স্বল্প পরিমাণে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। হেমাদ্রি মুক্তাফলের টীকায় বিষয়টি সুস্পষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে ইহা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলা হইয়াছে। শ্রীরূপ ভাবটিকে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া অলৌকিকত্ব দান করিয়াছেন।

'প্রেমবৈচিত্ত্যে'র স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিতে গিয়া শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯১২)

অর্থাৎ—প্রেমোৎকর্ষের স্বভাবহেতু প্রিয়জন (একান্ত) সন্নিকটে থাকিলেও, বিচ্ছেদভয়ে যে আর্তি (উদ্ভূত হয়), তাহাকে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' বলে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীরূপ 'আভীরেন্দ্রসুতে স্ফুরত্যপি পুরঃ' ইত্যাদি শ্লোকে (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯১৩) লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে বিরাজ করিলেও শ্রীরাধা অনুরাগজনিত বিচ্ছেদজ্বরে বিবশবুদ্ধি ও উদ্‌ঘূর্ণিত হইয়া, 'সখি, কান্তকে দর্শন করাও' কথাটি বলিয়া দন্তে তৃণ লইতে চেষ্টা করিলেন (অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন)। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হইলেন।

শ্রীরূপ-প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণে বল্লভদাস লিখিয়াছেন—

শ্যামরচন্দ গোরি যব বৈঠল
নিধুবনে সখিগণ সঙ্গ।
চাতুরি রভস কলা কত কৌশল
কিয়ে কিয়ে মদন-তরঙ্গ॥
সজনী কো পয়ে ঐছন জান।
পিয় পিয় পিপিয়- নাদ শুনি আকুল
মুরছি আনত ভই আন॥
ঢর ঢর লোরে নয়ন বহি যাওত
কত কত করুণা-কোটি।
দন্তে তৃণহুঁ কহি প্রিয় দরশন দেহ
না হেরিয়া হিয়া যাউ ফোটি॥
বহুত মিনতি করে সখির করে ধরে
কোরহি শ্যাম না জান।
বিপরিত অচল সচল দেখি ঐছন
বল্লভ দাস রস গান॥

(কীর্তনানন্দ, পৃঃ ৩১৯; তরু ৭৬৯)

পদটির মধ্যে শ্রীরূপের শ্লোকোক্ত 'দন্তে তৃণ' করার কথা আসিয়াছে, সখীর কাছে শ্যাম দর্শন করাইবার জন্য শ্রীরাধার সনির্বন্ধ অনুরোধও ব্যক্ত হইয়াছে।

গোবিন্দদাস শ্রীরূপকে অনুসরণ করিয়া প্রেমবৈচিত্ত্যের বহু পদ লিখিয়াছেন। যেমন—

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাহাঁ গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানলুঁ রে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরি নাহি জান॥ (তরু ৭৬৬)

অথবা—

রসবতি বৈঠি রসিকবর পাশ।
রোই কহই ধনি বিরহ-হুতাশ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহ-জলধি কত পউরব হাম॥
নিকটহি নাহ না হেরই রাই।
সহচরি কত পরবোধই তাই॥
কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর॥ (তরু ৭৬৭)

কিংবা—

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজ-পাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরি
দারুণ বিরহ-হুতাশে॥
এ সখি আরতি কহনে না যাই।
আঁচলক হেম আঁচলে রহু যৈছন
খোঁজি খিরত আন ঠাঞি॥

রাইক বিরহে কানু ভেল সচকিত
বয়ানে বাণি নাহি ফূর॥ (তরু ৭৭১)

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যও বহু পদকার বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস, রাধাবল্লভ দাস, মাধবী দাস যথাক্রমে পদকল্পতরুর ৭৭৩, ৭৭৪ ও ৭৭৫-সংখ্যক পদে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যের চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রীরূপের প্রভাব লক্ষণীয়।

॥ প্রবাস ॥

বিপ্রলম্ভ-ভাবের শেষ বিভাগ 'প্রবাস'। শ্রীরূপ প্রবাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্যতে ॥

(উজ্জ্বলনীলমণি, ৯১৫)

বঙ্গার্থ—পূর্বে যাঁহাদের মিলন হইয়াছে এমন যুবক-যুবতীর মধ্যে দেশান্তরাদির দ্বারা উদ্ভূত ব্যবধানকেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রবাস বলিয়া থাকেন।

শ্রীরূপ আরও বলিয়াছেন—

হর্ষগর্বমদব্রীড়া বর্জয়িত্বা সমীরিতাঃ।
শৃঙ্গারযোগ্যাঃ সর্বেঽপি প্রবাসে ব্যভিচারিণঃ ॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৯১৫)

অর্থাৎ—হর্ষ, গর্ব, মত্ততা ও লজ্জা বর্জন করিয়া শৃঙ্গারযোগ্য সমস্তই প্রবাসে (অর্থাৎ প্রবাসের ক্ষেত্রে) ব্যভিচারী ভাব।

শ্রীরূপের মতে এই প্রবাস দ্বিবিধ—বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক।

প্রথমতঃ, বুদ্ধিপূর্বক। 'দূরে কার্যানুরোধেন গমঃ' অর্থাৎ কার্যানুরোধে দূরে গমনের ফলে যে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস হয়, শ্রীরূপ তাহা বলিয়াছেন। তিনি এই জাতীয় প্রবাসকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর।

কিঞ্চিদ্দূরের দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীরূপ যে 'দৃষ্টিং নিধায় সুরভীনিকুরম্ববীথ্যাং' (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯১৬) ইত্যাদি শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তাহা বাংলাভাষায় অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়, হে কৃষ্ণ, শ্রীরাধা আজ সুরভীদের আগমন-পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মুখে অনবরত শ্রীকৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন, বংশীধ্বনি শ্রবণের জন্য কর্ণযুগলকেও প্রস্তুত রাখিয়াছেন; এইভাবে শ্রীরাধা তোমার সুখেই মন দিয়াছেন।

শ্রীরূপের শ্লোকটির অনুসরণক্রমে ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

তোহারি বিরহ বেদনে সো ধনি
সঘন অথির বাসে।
সুরভি সমূহ পথ নিরখিয়ে
তোহারি দরশ আশে ॥

শুনহ গোকুলচন্দ্র ।
একলি দুখ নিরমণি তেজিয়া
না বুঝি কেমন ছন্দ ॥
সে যে আন নাহি মনে সদাই রসনে
জপই তোহারি নাম ।
মধুর মুরলী শবদ শুনিতে
সঘনে পাতই কান ॥
দুঃখ নিবারণ বদন তোহার
সদাই ভাবয়ে চিতে ।
দেখিয়া বিপতি দাস ঘনশ্যাম
আইল তোহার ভিতে ॥ (রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৮৯)

ঘনশ্যাম এই পদে নিছক অনুবাদ করেন নাই। প্রথমতঃ, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, সেই ধনী (শ্রীরাধা) তোমার বিরহ-বেদনায় 'সঘন অথির বাসে' তাহা সম্পূর্ণ নিজস্ব উক্তি। দ্বিতীয়তঃ, 'শুনহ গোকুলচন্দ্র' হইতে 'না বুঝি কেমন ছন্দ' —ধ্রুবপদটি পদকর্তার মৌলিক সংযোজনা। তৃতীয়তঃ, শ্রীরাধার মনে শ্রীকৃষ্ণচিন্তা ছাড়া অন্য কিছু যে নাই তাহাও শ্রীরূপ বলেন নাই, ঘনশ্যামই ব্যক্ত করিয়াছেন। চতুর্থতঃ, শ্রীরূপ শ্লোকে যেখানে বলিয়াছেন শ্রীরাধা তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) সুখেই মন দিয়াছেন, সেখানে ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন শ্রীরাধা 'দুঃখ নিবারণ, বদন তোহার, সদাই ভাবয়ে চিতে'। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, পদটির মধ্যে পদকর্তার মৌলিকতা যথেষ্টই রহিয়াছে; শ্লোকের কায়াকল্প অতিক্রম করিয়া ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক পদে রূপায়িত হইয়াছে।

শ্রীরূপের দৃষ্টান্ত অনুসরণে ঘনশ্যামের পদটি ভিন্ন অন্য কোন পদ রচিত হয় নাই সত্য, কিন্তু কিঞ্চিদ্দূর বিষয়টি লইয়া কালীয়দমন ও নন্দমোক্ষণাদির পদ (তরু ১৫৮৭—৯৬) রচিত হইয়াছে।

সুদূর প্রবাস-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

ভাবী ভবংশ্চ ভূতশ্চ ত্রিবিধঃ স তু কীর্ত্যতে॥ (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯১৬) অর্থাৎ— ভাবী, ভবন ও ভূত—প্রবাস এই তিন প্রকার বলিয়া কীর্তিত। ভাবী :—শ্রীরূপ তাঁহার রচিত 'উদ্ধবসন্দেশ' হইতে উদাহরণ দিয়াছেন। অনেকাংশে সেই উদাহরণ অনুসরণ করিয়াই গোবিন্দদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

না জানি কো মথুরা সঙ্গে আয়ল
তাহে হেরি কাহে জিউ কাঁপি।
তব ধরি দখিণ পয়োধর ফুরয়ে
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি॥
সজনি অকুশল-শত নাহি মানি।
বিপদক লাখ তৃণহুঁ করি না গণিয়ে
কানু-বিচ্ছেদ হয়ে জানি॥ (তরু ১৬০০)

অক্রূর আসিয়াছেন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইবার জন্য। তাহাতে শ্রীরাধার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। তিনি প্রিয়তমের আসন্ন বিচ্ছেদ চিন্তা করিয়া শোকে মুহ্যমান। গোবিন্দদাস-পরিকল্পিত শ্রীরাধার ভাবী বিরহের এই বর্ণনা শ্রীরূপের অনুসারী।

'ভবন' প্রবাসের দৃষ্টান্ত-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ 'ললিতমাধব'-এর 'ভানোর্বিম্বে ত্বরিতমুদয়-প্রস্থিতঃ' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা অনেকখানি অনুসরণ করিয়া গোবিন্দদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

অতমিত যামিনী কান্ত।
বিফল ভেল মণিমন্ত॥
উদয়াচল বরণারুণ।
উয়ল দিনমণি দারুণ॥
দেখ সখি পাপী অক্রূর।
হরি লেই চলু মধুপুর॥
দ্বিজকুল মঙ্গল উচার।
চলু সব গোপ গোঙার॥
কোই না কহ অছু বাত।
হরি জনি মাথুর যাত॥
ব্রজপতি দম্পতি চিতে।
কোন কয়ল বিপরীতে॥
তে বুঝি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দদাস দুখ-গাথা॥ (তরু ১৬২৩)

শ্রীরূপের শ্লোক ও গোবিন্দদাসের পদ—উভয় ক্ষেত্রেই পূর্বাচলে অরুণোদয়ের কথা, অক্রূরসহ শ্রীকৃষ্ণ গোকুল হইতে প্রস্থানোন্মুখ—এই সমস্ত বিবৃত হইয়াছে। পার্থক্যের

মধ্যে এই, শ্রীরূপের শ্লোকে অক্রূর মঙ্গলাচরণ করিবেন কথা আছে, পদে কিন্তু বলা হইয়াছে 'দ্বিজকুল মঙ্গল উচার'। শ্রীরূপের শ্লোকে যেখানে শ্রীরাধার হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ার কথা রহিয়াছে, গোবিন্দদাসের পদে সেখানে আর সকলের দুঃখ বর্ণিত।

'ভূত' প্রবাস শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় চলিয়া যাইবার পরের বিষয়। শ্রীরূপ বিষয়টি স্পষ্ট করিতে দুইবার 'উদ্ধবসন্দেশে'র এবং একবার 'পদ্যাবলী'র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের অনুসরণ করিয়া বিদ্যাপতি শ্রীরাধাকে নিজের নয়নজলের তটিনীতে স্নান করাইয়াছেন এবং অঙ্গুরী বলয়ে পরিণত হইয়াছে বলিয়াছেন। শ্রীরূপের মাথুর-বর্ণনায় যে গাঢ়তা ও আন্তরিকতা আছে, তাহা পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় বিরল। শ্রীরূপ-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব মহাজনগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনসাধনের জন্য দূতীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরিবার জন্য সাধিতেছেন দেখা যায়।

বুদ্ধিপূর্বক প্রবাসের পর অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাসের কথা। অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়া শ্রীরূপ বলিয়াছেন—

> পারতন্ত্র্যোদ্‌ভবো যস্তু প্রোক্তঃ সোঽবুদ্ধিপূর্বকঃ।
> দিব্যাদিব্যাদিজনিতং পারতন্ত্র্যমনেকধা॥ (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯২০)

অর্থাৎ—যাহা পরতন্ত্র বা পরাধীনতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে অবুদ্ধিপূর্বক বলে। দিব্য ও অদিব্যাদিজনিত এই পারতন্ত্র্য অনেক প্রকার হয়। শ্রীরূপ এই জাতীয় প্রবাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে শঙ্খচূড়-কর্তৃক শ্রীরাধাহরণের একটি শ্লোক দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখি, এই পরিকল্পনাটি পদকর্তৃগণকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করিতে পারে নাই। কেননা, কোন পদকার স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন যে, তাঁহাদের স্বামিনী শ্রীরাধা সামান্য কোন অসুরের দ্বারা নির্যাতিত হইতে পারেন।

প্রবাস-বিপ্রলম্ভের দশ দশা নির্ণয় করিয়া শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

> চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
> প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যু র্দশা দশ॥ (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯২১)

অর্থাৎ—প্রবাস নামক বিপ্রলম্ভে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব বা কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশা হয়। পূর্বরাগেও আমরা প্রায় অনুরূপ দশটি দশা দেখিয়াছি। প্রবাসের দশাগুলির সহিত তাহাদের প্রকারগত পার্থক্য তেমন নাই, যত-কিছু প্রভেদ মাত্রাগত। পূর্বরাগের দশাগুলি হইতে প্রবাসের এই দশাগুলির গভীরতা (Intensity) অনেক বেশী।

শ্রীরূপ-নির্ণীত প্রত্যেকটি দশা অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালের পদকর্তৃগণ সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপের চিন্তা দশার উদাহরণ কি করিয়া পদাবলীসাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা হংসদূতের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছি।

শ্রীরূপ-লিখিত জাগর দশার অনুসরণে গোবিন্দদাস কবিরাজ, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি পদ রচনা করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

গুরুজন গঞ্জন বোল।
গৃহপতি গরজন ঘোর॥
গণইতে গোপ-কিশোরী।
গহন-গেহ-গহ ছোড়ি॥
গোবিন্দ গুণবতী সোই।
গুণি গুণি যামিনী রোই॥ (তরু ১৮১০)

পদটির শেষ চরণে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের আশায় দণ্ড পল গুণিয়া গুণিয়া শ্রীরাধা ক্রন্দনে রাত্রি অতিবাহিত করিতেছেন কথা রহিয়াছে, সেখানে স্পষ্ট জাগর দশা সূচিত হইতেছে।

রাধামোহনের পদটি এইরূপ—

যদবধি যদুপুর তুহু যাই ভোর।
যুবতী যামিনী কত জাগই জোর॥
যদুপতি ইথে যদি জানহ আন।
যাই যতন করি জান পরমাণ॥
যব কোই জল সঞে জলজ বিছায়।
যতনহি যদি তহি যবহি শুতায়॥
জরি জরি জারত মরমহি তায়।
যাও রাধামোহন মরি যাহে গায়॥ (তরু ১৮৮৯)

জাগর দশার পর উদ্বেগ। শ্রীরূপানুসরণে গোবিন্দদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

হৃদয় বিদারক মনমথ-বাণ।
কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম॥
জলু বিরহানল মন মাহা গোয়।
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয়॥

কাহে সমুঝায়ব মরমক খেদ।
মরত না জীয়ত কানু-বিচ্ছেদ॥
যো মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ।
পুন হেরব বলি তাহে পরবোধ॥
হেরইতে কুসুমিত কেলি-নিকুঞ্জ।
শুনইতে পিকবর অলিকুল-গুঞ্জ॥
অনুভবি মালতি-পরিমল এহা।
কেহ জানে জীউ রহত ইহ দোহা॥
জানইতে কানুক সো আশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস॥ (তরু ১৬৪৬)

মদন-বাণাহত শ্রীরাধার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মনে বিরহানল জ্বলিতেছে, তথাপি তাঁহার (শ্রীরাধার) কঠিন দেহ কেন ভস্মীভূত হইতেছে না? শ্রীরাধা কাহাকে মরমের খেদ জানাইবেন! কুসুমিত কুঞ্জ, পিকরব, মালতী-ফুলের পরিমল এই সমস্তে শ্রীরাধার জীবন রাখা দায়। গোবিন্দদাসের এইরূপ বর্ণনায় শ্রীরাধার উদ্বেগ দশাই ব্যক্ত হইয়াছে।

তানব দশায় শরীরের কৃশতাই বর্ণিত।

দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

উদঞ্চদ্বক্ত্রাম্ভোরুহবিকৃতিরন্তঃকলুষিতা
সদাহারভাবগ্রপিতকুচকোকা যদুপতে।
বিশুষ্যন্তী রাধা তব বিরহতাপাদনুদিনং
নিদাঘে কুল্যেব ক্রশিমপরিপাকং প্রথয়তি॥ (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯২৪)

অর্থাৎ—হে যদুপতে, তোমার বিরহে শ্রীরাধার মুখপদ্ম ম্লান হইয়াছে, তাঁহার অন্তঃকরণে মালিন্য জন্মিয়াছে, আহারের অভাবে তাঁহার কুচরূপ চক্রবাক-দুইটি হইয়াছে গ্লানিযুক্ত। তোমার বিরহ-তাপে শ্রীরাধা গ্রীষ্মের কৃত্রিম ছোট নদীর মতো শুকাইয়া গিয়া কৃশতার ফল প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীরূপের শ্লোকটির অনুসরণে ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

তুহুঁ সুপুরুখ সুখ সময় গোঙায়সি
পরগরি সঞে রস অবগাই।
সময় নিদাঘ সরোবর শোষই
ঐছন দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল রাই॥

মাধব তুয়া দিন কহই না যাই।

জল বিনু জীবন কমল জনু নিবসল

ঐছন বদন কমল ভেল তাঞি॥

বিগলিত বসন ভূষণ বলয়াঙ্গদ

তিল এক যতনে না বান্ধই থেহ।

কুচযুগ কোক ভোগ বিনু আকুল

হারভার জনু লাগই দেহ॥

পহিলহি পিরিতি কি রীতি করি মানল

এ তুয়া সরস বচনে লুবধাই।

অব বিরহানলে তনু মন দাহই

ঘনশ্যাম দাস রহল মুখ চাই॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৯৪)

পদে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মূল শ্লোকে নাই। শ্লোকে গ্রীষ্মের কৃত্রিম ছোট নদীর উপমা রহিয়াছে, পদে কিন্তু 'সময় নিদাঘ, সরোবর শোখই' বলা হইয়াছে। পদে শ্রীরাধার বসন, ভূষণ, বলয়াঙ্গদ প্রভৃতির বিগলিত হওয়ার, এক তিলও স্থৈর্য ধারণ করিতে না পারা, আরও 'হারভার জনু লাগই দেহ'—এই সমস্ত যে বলা হইয়াছে সবগুলিই পদকর্তা ঘনশ্যামের মৌলিক সৃষ্টি, শ্লোকানুসরণের অনিবার্য ফল নহে। এই দশা নির্ণয় শ্রীরূপের মৌলিক কিছু নহে। শ্রীরূপের পূর্বেই বিদ্যাপতি এই বিষয়টি লইয়া পদ (তরু ১৮৯৯ ও ১৯০০) রচনা করিয়াছেন। সুতরাং পদকর্তা গোবিন্দ-দাসের উপর শ্রীরূপেরই প্রভাব পড়িয়াছে বলা যায় না।

পঞ্চম দশা মলিনাঙ্গতা। শ্রীরূপ এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া 'হিমবিসরবিশীর্ণা-ম্ভোজতুল্যাননশ্রীঃ' ইত্যাদি (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯২৪-৯২৫) শ্লোক লিখিয়াছেন। শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ—উদ্ধব বলিতেছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বিরহবিপত্তিতে বিশাখা যে কিরূপ মলিন হইয়া গিয়াছে তাহা শোন। বিশাখার মুখশ্রী হিমের পদ্মের মতো শীর্ণ হইয়াছে, ওষ্ঠ খরবায়ুসংশ্লিষ্ট বন্ধুজীবের মতোই হইয়াছে শুষ্ক, চোখ দুইটি শরৎকালের সূর্যের তাপে দগ্ধ কুমুদের ন্যায় মলিন দেখাইতেছে। অতএব সখা, তোমার কাছে বিশাখার দশা আর কি বর্ণনা করিব।

শ্রীরূপের শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

পুরনাগরি গুরু গৌরবে আগরি
তুহু মধুপুর দূরদেশ।
সো ব্রজনাগরি তোহারি ধেয়ান করি
বিরহ জলধি পরবেশ॥
মাধব নিকরুণ তোহাঁরি চরিত।
যো অব ঐরি বিনাশল অনিমিখে
তাহে কি গণিয়ে বিপরীত॥
সো মুখ তুহিন পতনে জনু কমলিনী
সহজে মলিন ভই গেল।
তোহারি বয়ান কোটি চান্দ বিরাজিত
দশদিশ দীপতি কেল॥
সো মৃদু অধর পবনে ভেল চালিত
যৈছন বান্ধুলী ফুল।
এ তুয়া অধর অরুণরুচিগঞ্জন
উজ্জ্বল গণ্ড দুকূল॥
ও দিঠি শবদ তপনে জনু দগধল
ইন্দীবর রূপরাশি।
তোহারি নয়ন নট খঞ্জন গঞ্জন
ঐছে রহল পরকাশি॥
অবিরত সরস পরশ রস আবেশে
পূবসি হিয় অভিলাষ।
সো ধনি বিমতি সমতি নাহি দেয়ত
ভণ ঘনশ্যামর দাস॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৯৪)

বিশাখার নাম অনুল্লিখিত থাকায় পদটিতে শ্রীরাধা সম্বন্ধে বলা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এই পদে শ্লোকের অনুসরণ অপেক্ষা পদকর্তার মৌলিক পরিকল্পনাই বেশী। প্রথমেই ঘনশ্যাম যে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিয়াছেন পুরনাগরীদের গুরু গৌরবে বর্ধিত তুমি দূরদেশ মধুপুরে চলিয়া গিয়াছ, অথচ ব্রজনারীরা তোমার ধ্যান করিয়া বিরহ-

সাগরে নিমগ্ন, ইহা মূল শ্লোকের কোথাও নাই। দ্বিতীয়তঃ, হে মাধব, তোমার চরিত্র অতি নির্দয় প্রভৃতি বলিয়া যে ধ্রুবপদটি রচনা করা হইয়াছে, তাহাও পদকর্তার মৌলিক সৃষ্টি। তৃতীয়তঃ, শ্লোকানুসরণে বিরহতাপিতা নায়িকার মুখ, অধর ও দৃষ্টি যথাক্রমে তুহিন-ম্লান পদ্ম, বাতাসে ম্রিয়মাণ বান্ধুলীফুল ও শরতের তপনে দগ্ধ ইন্দীবরের সহিত তুলিত হইলেও, সঙ্গে সঙ্গে বৈপরীত্য বুঝাইবার জন্য পদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখ, অধর ও নয়নের সুন্দর অবস্থার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পদকর্তার নিজস্ব সংযোজনা। পদের ভণিতা-সম্বলিত শেষ স্তবকটিও পদকর্তার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ কল্পনা-বিস্তারের ফল। শ্রীরূপের নির্ণীত বিষয়টি লইয়া অনেক বৈষ্ণব পদকর্তাই পদ রচনা করিয়াছেন। কবি শঙ্কর ঘোষ লিখিয়াছেন—

কেমনে গোঙাব এ দিন রজনী
তাহার দরশ বিনে।
বিরহ-দহনে যে দেহ মলিন
আকুল হইনু দিনে॥

অন্তর বাহির মলিন শরীর
জীবনে নাহিক আশ।
শুনি বেয়াকুল হইয়া ধাইয়া
চলিল শঙ্কর দাস॥ (তরু ১৬৪৯)

শঙ্করদাস এই পদের মধ্যে বিরহিণী শ্রীরাধার 'দেহ মলিন' বা 'মলিন শরীর'-এর কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশের কবি গোবিন্দদাস চাতুর্যের সঙ্গে বিরহাতুরা শ্রীরাধার মলিনাঙ্গতা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

এতদিনে গগনে অখিণ রহু হিমকর
জলদে বিজুরি রহু থির।
চামরী চমরু নগরে পরবেশউ
মদন ধনুয়া ধরু ফীর॥

মাধব বুঝলুঁ তোহে অবগাই।
এক বিয়োগে বহুত সিধি সাধলি
অতয়ে উপেখলি রাই॥

কুমুদিনী বৃন্দ দিনহুঁ সব হাসউ
বাঁধুলি ধরু নব রঙ্গ।
মোতিম পাঁতি কাঁতি ধরু উজোর
কুঞ্জর চলি গতি ভঙ্গ॥
তুয়া অনুরূপ রসিক বর নাগরী
কো ধনি মিললি না জানি।
গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ না জানহ
কুবজা অব নবরাণী॥ (তরু ১৯০৪)

পদটির অর্থ—হে মাধব, তোমাকে বিচার করিয়া বুঝিলাম, তুমি একের বিয়োগে অনেকের সিদ্ধি আনিয়া দিয়াছ, সেইজন্যই শ্রীরাধাকে উপেক্ষা করিয়াছ। শ্রীরাধার সেই কান্তি আর নাই। তাঁহার মুখদীপ্তিতে আকাশের চাঁদ ক্ষীণ হইয়াছিল, এতদিনের পর তাহাকে আর ক্ষীণ হইতে হইবে না। বিদ্যুৎ শ্রীরাধার কান্তি দেখিয়া চঞ্চল হইত, আজ মেঘমধ্যে সে স্থির থাকুক। শ্রীরাধার কবরীর ভয়ে চামরী নগর ছাড়িয়া বনে পলায়ন করিয়াছিল, এখন সে নগরে ফিরিয়া আসুক। মদনের ধনুর অপেক্ষাও শ্রীরাধার ভ্রূযুগলের শোভা ছিল, তাহা দেখিয়া মদন ধনুর্বাণ পরিহার করিয়াছিল, এখন সে আবার তাহা গ্রহণ করুক। কুমুদিনী শ্রীরাধার কান্তি দেখিয়া দিনমানে মুদিত থাকিত, এখন তাহারা দিনে হাসুক। মোতির হার শ্রীরাধার দন্তপংক্তির নিকট ম্লান হইয়া যাইত, এখন উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করুক। হস্তীও শ্রীরাধার সুন্দর গমনভঙ্গীতে লজ্জা পাইত, এখন অসঙ্কোচে চলুক। এই সবের মধ্য দিয়া গোবিন্দদাস কবিরাজ একটি কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, শ্রীরাধার সর্বাঙ্গে মালিন্য আসিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন—

হরি হরি কি কহব বিপতি বিশেষ।
হেরইতে পরিজন তনু ভেল শেষ॥
হরিণী নয়নী যছু নব নব রঙ্গ।
হত বিধি কয়ল মলিন তছু অঙ্গ॥
হিম ঋতু হিম-হত জনু অরবিন্দ।
হেম বরণ মুখ ভেল তছু মন্দ॥
হেন নাহি অঙ্গ মলিন ভেল কোই।
হীন রাধামোহন দাস কহ সোই॥ (তরু ১৯০৫)

পদটিতে শ্রীরাধার মলিনাঙ্গতার বর্ণনাই শুধু দেওয়া হয় নাই, 'অঙ্গ মলিন ভেল' কথাগুলিও ব্যবহার করা হইয়াছে।

অতঃপর প্রলাপ। শ্রীরূপ প্রলাপের উদাহরণ হিসাবে স্বরচিত 'ললিতমাধব'-এর 'ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীরূপের শ্লোকটি অনুসরণ করিয়াই কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিম্নোক্ত পদটি লিখিয়াছেন—

ব্রজেন্দ্র-কুল দুগ্ধ-সিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু
জন্মি কৈল জগত উজোর।
যার কান্ত্যমৃত পিয়ে নিরন্তর পিয়া জীয়ে
ব্রজজন-নয়ন-চকোর॥
সখিহে কোথা কৃষ্ণ করাও দরশন।
তিলেক যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন॥
এই ব্রজের রমণী কামার্ক-তপ্ত কুমুদিনী
নিজ করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই
দেখাই সখি রাখ মোর প্রাণ॥
কাহাঁ সে চূড়ার ঠান শিখি-পুচ্ছের উড়ান
নব মেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বক-পাঁতি
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু॥
একবার যার নয়নে লাগে সদা তার হৃদয়ে জাগে
কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা।
নারীর মনে পৈশে যায় যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে সেহাকুলের কাঁটা॥
জিনিয়া তমাল-দ্যুতি ইন্দ্রনীল-সম কাঁতি
যে কান্তিতে জগত মাতায়।
শৃঙ্গার-রস ছানি তাহে চন্দ্র-জ্যোৎস্না আনি
জানি বিধি নিরমিল তায়॥

কাঁহা সে মুরলীধ্বনি নবাভ্র-গর্জন জিনি
জগতাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উড়ি যায় ব্রজ-জন তৃষিত চাতকগণ
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃত ধার॥

মোর সেই কলানিধি প্রাণ-রক্ষা-মহৌষধি
সখি তোমার তেঁহো সুহৃত্তম।
যেই জীয়ে তাহা বিনে ধিক্ সেই জীবনে
বিহি করে এত বিড়ম্বন॥

(চৈতন্যচরিতামৃত : অন্ত্য, ১৯ পরি ; তরু ১৬৫১)

এই পদটিতে শ্রীরূপের শ্লোকটির বিস্তার ঘটিয়াছে। শ্রীরূপ শ্লোকে লিখিয়াছেন—সখি, নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? কবিরাজ গোস্বামী ইহার বিস্তার ঘটাইয়াই 'ব্রজেন্দ্র-কুল দুগ্ধ-সিন্ধু' হইতে 'কাঁহা মোর চন্দ্র সেই, দেখাই সখি রাখ মোর প্রাণ' পর্যন্ত রচনা করিয়াছেন। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিই বা কোথায়? ইহাকে উপজীব্য করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন 'কাহাঁ সে চূড়ার ঠান' হইতে 'নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু' পর্যন্ত। যাঁহার মুরলীরব গভীর তিনিই বা কোথায়?—শ্রীরূপের এই শ্লোকোক্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে পদকর্তা 'কাঁহা সে মুরলীধ্বনি' ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, শ্লোকের ইন্দ্রনীলমণি-দ্যুতি, রসতাণ্ডবী, জীবন-রক্ষার মহৌষধি, সুহৃত্তম প্রভৃতির অনিন্দ্য রূপায়ণ হইয়াছে উপরি-ধৃত শ্লোকের মধ্যে।

নরোত্তম দাস শ্রীরাধার প্রলাপ ছন্দোবন্ধনে ধরিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

নবঘন-শ্যাম ওহে প্রাণ-বন্ধুয়া
আমি তোমা পাসরিতে নারি।
তোমার বদন-শশী অমিয়া-মধুর হাসি
তিল আধ না দেখিলে মরি॥

তোমার নামের আকৃতি হৃদয়ে লিখিতাম যদি
তবে তোমা দেখিতাম সদাই।
এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি
এবে তোমা দেখিতে না পাই॥

এমত বেথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয়
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিলুঁ তোরে পরাণ কেমন করে
কি কহিব কহন না যায়॥

এবে সে বুঝিলুঁ সখি পরাণ-সংশয় দেখি
মনে মোর কিছু নাহি ভায়।
যে কিছু মনের সাধ বিধাতা পাড়িলে বাজ
নরোত্তম জীবন-অপায়॥ (তরু ১৬৫৪)

গোবিন্দদাস চক্রবর্তী শ্রীরূপের প্রলাপ-পরিকল্পনাটি অনুসরণ করিয়া সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥
মো যদি জানিতাম পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥
এইখানে করিত কেলি রসিয়া নাগর-রাজ।
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥
সে প্রিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলজ পরাণী॥
চরণে ধরিয়া কাঁদে গোবিন্দ দাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥ (তরু ১৬৫৫)

প্রবাস-বিপ্রলম্ভের সপ্তম দশা ব্যাধি। উদাহরণ হিসাবে শ্রীরূপ তাঁহার 'ললিতমাধব' হইতে শ্রীরাধার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীরূপ-নির্ণীত ব্যাধি-পরিকল্পনাটি লইয়া জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস প্রচুর পদ লিখিয়াছেন।

জ্ঞানদাসের একটি পদ এইরূপ—

সোনার বরণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ॥
গলয়ে সঘনে লোর।
মুরছে সখিক কোর॥
দারুণ বিরহ-জ্বরে।
সো ধনি গেয়ান হরে॥
জীবনে নাহিক আশ।
কহয়ে এ জ্ঞানদাস॥ (তরু ১৯১৫)

গোবিন্দদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

করতলে বদন চাঁদ রহু থির।
অহর্নিশি লোচনে বহতহি নীর॥
বিগলিত নিঁদ বহই ঘন-শ্বাস।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন নৈরাশ॥
এ হরি অবহু অবধি বহি যাই।
বিঘটনে শপতি মরয়ে জনু রাই॥
কমলিনী কিশলয় শেজ বিছাই।
সহচরী মেলি শুতায়লি তাই॥
শতগুণ মদন দহন তহিঁ ভেল।
সো তনু তাপে ভসম ভৈ গেল॥
চন্দন পরশে চমকি ঘন উঠই।
হিমকর কিরণে মূরছি তনু লুঠই॥
গোবিন্দদাস কহ নিরদয় কান।
এত পরমাদ তুহুঁ কিয়ে নাহি জান॥ (তরু ১৯১০)

শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট এক ব্যাধিদশাকে উপজীব্য করিয়া পদ প্রণয়ন করিলেও জ্ঞানদাসের উপরি-ধৃত পদে কাব্যিক উৎকর্ষ তেমন নাই, অতি-সংহতিই হয়তো ইহার কারণ; কিন্তু গোবিন্দদাসের পদটি আলঙ্কারিক চাতুর্যে ও কাব্যিক উৎকর্ষে অতুলনীয়।

অতঃপর অষ্টম দশা উন্মাদ। গোবিন্দদাস কবিরাজ এই পরিকল্পনাটি লইয়া লিখিয়াছেন—

ভ্রমই ভবন-বনে জনু অগেয়ান।
ভাগল ভয় গুরু-গৌরব মান॥
ভাবে ভরল মন হাসি হাসি রোই।
চীত্ত পুতলি সম তুয়া পথ জোই॥

(তরু ১৯২২)

এখানে দেখি, শ্রীরাধা গৃহরূপ বনে অজ্ঞানের মতো ভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীরূপ তাঁহার শ্লোকে (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯২৬) বলিয়াছেন 'ভ্রমতি ভবনগর্ত্তে', ইহারই অনুসরণক্রমে যেন গোবিন্দদাস শ্রীরাধার গৃহরূপ বনে ভ্রমণ করার কথা লিখিয়াছেন। 'নির্নিমিত্তং হসন্তী' শ্রীরাধার সম্বন্ধে এই কথাও বলিয়াছেন শ্রীরূপ; গোবিন্দদাস পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 'হাসি হাসি রোই' লিখিয়াছেন। সুতরাং পদটির মধ্যে শ্লোকের প্রভাব অনস্বীকার্য।

ঘনশ্যাম শ্রীরূপের শ্লোকটির যেন অনুবাদ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

অবিরত উনমত ভরমই ভবনে।
কারণ বিনহি হাস ঘন বদনে॥
মাধব কি কহব সো দুরদিন।
দিনে দিনে রাইক তনু ভেল ক্ষীণ॥
কবহি অচেতন চেতন চাহি।
তুয়া পরসঙ্গ পুছই মুখ লাই॥
কবহি ধরণীতল লুঠই গোরী।
কবহি নাম ধরি রোই তোরি॥
ক্ষেণে তনু কাঁপই ক্ষেণে রহে থীর।
ক্ষেণে ক্ষেণে লোচনে ঢরকত নীর॥
ক্ষেণে ক্ষেণে উতপত বহই নিশাস।
ঘনশ্যাম দাস আওল তুয়া পাশ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৯৬)

পদটি মূল শ্লোকের কথা-কয়টি অন্তরে ধারণ করিয়া থাকিলেও, পদকর্তার সুচারু কল্পনা-বিস্তারে বেশ ঋদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরাধার দেহ দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া গেল—শ্রীরূপের শ্লোকে এমন কথা নাই। ইহা ছাড়া, শ্লোকে শ্রীরাধার ধরণীতলে লুণ্ঠিত হওয়ার কথা আছে সত্য, কিন্তু কখনও কখনও তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের নাম ধরিয়া

ক্রন্দন করেন তাহা নাই। পদের শেষ চারি চরণ পদকর্তার কবি-কৃতির মৌলিক অথচ শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

উন্মাদের পর মোহ। শ্রীরূপ এই বিষয়ে 'নিরুদ্ধে দৈন্যাব্ধিং হরতি গুরুচিন্তাপরিভবং' ইত্যাদি যে শ্লোক (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯২৭) রচনা করিয়াছেন, তাহার অর্থ—হে কংসারি শ্রীকৃষ্ণ, এখন কেবল তোমার বিরহজনিত মূর্ছা নীলোৎপলাক্ষীর সহচরী হইয়া তাহার সাহায্য করিতেছে। কারণ, উহা তাহার বিষাদরূপ সাগরকে রোধ করিতেছে, গুরুতর চিন্তাজনিত ক্লেশকে হরণ করিতেছে, উন্মত্তভাবকে বিলুপ্ত করিতেছে এবং বলপূর্বক অশ্রু-প্রবাহকে স্থগিত করিতেছে।

শ্রীরূপের এই শ্লোকটির অনুসরণক্রমে পদকর্তা ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

ক্ষেণে ক্ষেণে পুলকিত ক্ষেণে ক্ষেণে সচকিত
ক্ষেণে ক্ষেণে উনমত ধায়।
ক্ষেণে ক্ষেণে ত্রাস হাস মুখ ঘন ঘন
ক্ষেণে ক্ষেণে তুয়া গুণ গায়॥
কি কহিব বিপতি রাধার।
হেরইতে পথিক রোয় দিনযামিনী
ধৈরজ রহই না পার॥
ক্ষেণে ক্ষেণে দীন ক্ষীণ তনু ক্ষেণে ক্ষেণে
লোচনে ঢরকত নীর।
ক্ষেণে তনু তাপ সহই না পারই
ক্ষেণে ক্ষেণে হোয় অথীর॥
ক্ষেণে হুঙ্কার সঘন ঘন গরজন
ক্ষেণে গুণ সঙরিয়া রোয়।
সো অব বিঘিনী বিনাশলি তুহু সব
অতয়ে নিবেদহুঁ তোয়॥
যো তুয়া বিরহে মোহ উপজায়ল
সো প্রিয় সহচরী ভেল।
অব তনু চারি গারি ভেল মূরছিত
সবহি বিপদ দূর গেল॥

তুহু রসময় রস রসিক শিরোমণি
নিজগুণ করলি প্রকাশ।
সো অব বেকত জগ ভরি পূরল
চলু ঘন শ্যামর দাস ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৯৬-৯৭)

পদটিতে শ্লোকের অনুবাদ খুব সামান্যই আছে ; 'যো তুয়া বিরহে, মোহ উপজায়ল, সো প্রিয় সহচরী ভেল' এবং তাহার ফলে 'সবহি বিপদ দূর গেল'—এই দুইটি কথায় শ্লোকের অনুবাদ। ইহা ছাড়া, সমুদয় কথায় পদকর্তার স্বাধীন কল্পনা-বিস্তার আমরা লক্ষ্য করি। পদটির প্রথমাংশে বিরহবিহ্বলা শ্রীরাধার উন্মাদ-দশার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। শেষ চরণ দুইটিতে রসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়াই পদকর্তা যেন শ্রীরাধার জন্য অপূর্ব মমতা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে করুণ আবেদন জানাইয়াছেন।

দশমী দশা মৃত্যু। শ্রীরূপের নির্দিষ্ট এই মৃত্যুর স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন 'মৃতিদশা ইব দশা' অর্থাৎ মৃত্যুদশার মতো দশা ; সুতরাং একেবারে যে মৃত্যু নয় তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীরূপ এই বিষয়ে 'হংসদূত' হইতে যে শ্লোক 'অয়ে রাসক্রীড়া-রসিক' ইত্যাদি (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯২৮) উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে হংস দ্বারা তিরস্কার করিয়া ললিতা বলিয়াছেন, শ্রীরাধাকেই ধিক, কারণ শ্রীকৃষ্ণ উদাসীন বা নিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এখনও তাঁহার (শ্রীরাধার) শ্বাস প্রশ্বাস তুলাখণ্ডের দ্বারা পরীক্ষা করা যাইতেছে।

গোবিন্দদাস পরিকল্পনাটির অনুসরণে লিখিয়াছেন—

গুনিক পুতলি তনু মহিতলে শূতলি
দারুণ বিরহ-হুতাশে।
জীবন আশে শ্বাস বহ না বহ
পরিখত গোবিন্দদাসে ॥ (তরু ১৯৩৪)

এখানেও শ্রীরূপের শ্লোকের আদর্শে বিরহিণী শ্রীরাধার শ্বাস বহিতেছে কি বহিতেছে না, তাহা পরীক্ষা করিতেছেন পদকর্তা গোবিন্দদাস।

অন্য একটি পদে গোবিন্দদাস দশমী দশার উল্লেখও করিয়াছেন—

অঙ্গে অনঙ্গ-জ্বর মরমে বিষম শর
কণ্ঠহি জীবন জারা।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীঝর
কুচযুগে কাজর-হারা ॥
মাধব তুহুঁ মধুপুর দুর দেশ।
ও অবলা চির বিরহ-বেয়াধিনি
দশমি-দশা পরবেশ ॥ (তরু ১৯৩৮)

এই সমস্ত মনে হয় শ্রীরূপের প্রভাবের পরিচায়ক।

শ্রীরূপ প্রবাস-বিপ্রলম্ভের দশটি দশা বর্ণনা করিবার পর বলিয়াছেন—

প্রবাসবিপ্রলম্ভেঽস্মিন্ দশান্তান্তা হরেরপি। (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯২৮)

অর্থাৎ—এই প্রবাস-বিপ্রলম্ভে হরি বা শ্রীকৃষ্ণেরও ঐ দশাগুলি (চিন্তা হইতে মৃত্যু পর্যন্ত) হইয়া থাকে।

শ্রীরূপের এইরূপ উক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই যত্নন্দন শ্রীকৃষ্ণের দশা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

রাইক দশা শুনি কান।
মুরছিত হরল গেয়ান ॥
দোতি করল নিজ কোর।
লোচনে ঝর ঝর লোর ॥
বহুখণে চেতন ভেল।
কহে মঝু রাই কাহাঁ গেল ॥
পুন কিয়ে পায়ল পরাণ।
কহ সখি তুহুঁ কিয়ে জান ॥
শুনি কহে চেতনা-বাণি।
যদুনন্দন অনুমানি ॥ (তরু ১৯৪১)

॥ সম্ভোগ ॥

শ্রীরূপ সম্ভোগের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন—

দর্শনালিঙ্গনাদীমানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে ॥ (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯৪১)

বাংলায়—দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আনুকুল্যের দ্বারা যে সেবা তাহাতে যুবক-যুবতীর উল্লাসের উপর ভাব উত্থিত হইলে সম্ভোগ বলে। শ্রীরূপের বিচারে পণ্ডিতগণ এই সম্ভোগকে মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুই প্রকার বলিয়াছেন। জাগ্রদবস্থায় মুখ্য সম্ভোগ আবার চারি প্রকার; পূর্বরাগ, মান, কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর ভেদে যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্ হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ, সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ॥ (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯৪২)

অর্থাৎ—লজ্জা ও ভয়হেতু যে সম্ভোগে যুবক-যুবতী ভোগাঙ্গ অল্পমাত্র ব্যবহার করে, তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে।

শ্রীরূপের আদর্শে পরবর্তী কালের পদকর্তৃগণ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই সলজ্জভাবের কথায় সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

কি কহব রে সখি কহই না জান।
পহিল সমাগম রাধা কান॥
যব দুহুঁ নয়নে নয়নে ভেল ভেট।
সচকিত-নয়নে বয়ন করু হেট॥
সোঁপলু যবহি করহি কর আপি।
সাধসে ধয়ল দুহুঁক তনু কাঁপি॥ (তরু ১১৫)

কেবলমাত্র লজ্জা ও ভয়ের প্রকাশই নহে, অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশও পরবর্তী কালের সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের পদে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাধামোহনের একটি পদে রহিয়াছে—

দেখ দেখ অনুপম দুহুঁ মুখ ইন্দু।
দুহুঁক দরশাবেশে ভোর লহরি সঞে
উছলত প্রেমক সিন্ধু॥
দুহুঁক অবলোকনে দুহুঁ পুলকায়িত
লোচনে আনন্দ লোর।
বিবরণ কাঁপ ঘাম ভেল গদ গদ
স্তবধ ভেল পুন ভোর॥ (তরু ২৭৩)

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে এমন অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশের কথা শ্রীরূপ বলেন নাই। তবে তিনি দুই পক্ষের যে লজ্জানম্র ভাবটি ব্যক্ত করেন, তাহার পরিণতিক্রমেই পরে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের ক্ষেত্রে আসিয়া গিয়াছে। ইহা শ্রীরূপের পরোক্ষ প্রভাব বলা যায়।

অতঃপর সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ।

শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

যত্র সঙ্কীর্যমানাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৯৪৪)

অর্থাৎ—যেখানে নায়কের বিপক্ষের গুণকীর্তন এবং নিজের বঞ্চনা প্রভৃতি স্মরণের ফলে আলিঙ্গন চুম্বনাদি উপকরণগুলি সঙ্কীর্ণ, সেইখানেই সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ জন্মে; যেমন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ।

শ্রীরূপের ব্যবহৃত 'তপ্তেক্ষুপেশলঃ' ইত্যাদি বাক্যটিকে আত্মসাৎ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনুপম ত্রিপদী লিখিয়াছেন—

এই প্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥ (চৈ. চ. ২।২)

শ্রীরূপ সঙ্কীর্ণ সম্ভোগের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া শ্লোক রচনা করিয়াছেন—

বক্ত্রং কিঞ্চিদবাঞ্চিতং বিবৃণুতে নাতিপ্রসাদোদয়ং
দৃষ্টির্ভুগ্নতটা ব্যনক্তি শনকৈরীর্ষ্যাবশেষচ্ছটাং।
রাধায়াঃ সখি সূচয়ত্যবিশদাবাগপ্যসূয়াকলাং
মানান্তং ব্রুবতী তথাপি মধুরা কৃষ্ণং ধিনোত্যাকৃতিঃ॥

(উজ্জ্বল, পৃঃ ৯৪৫)

বাংলায় ভাষান্তরিত করিলে দাঁড়ায়,—

মান নিবৃত্ত হইলেও শ্রীরাধার মুখপদ্ম কিছু বক্র হইয়াই রহিল, প্রসন্নতা বিস্তার করে নাই, দৃষ্টি কুঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে ঈর্ষ্যার ছটাই প্রকাশ করিতে লাগিল এবং কথাও মলিন হইয়া অসূয়ার কলাই সূচনা করিল। অতএব হে সহচরি, যদিও শ্রীরাধার মধুরাকৃতি মানের অন্ত্য-পরিচয় দিল, তথাপি তাহা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিয়াছিল।

শ্লোকটির অনুসরণে রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন—

দেখ রাধা মাধব খারি।
রতি-রণ মান- বিরামক যৈছন
চরবণ তপত কুশারি॥
হরিমুখ হেরইতে সুমুখি অবাঞ্চই
চাহনি কুটিলহি ভাতি।
গদ গদ বচন অসূয়া কছু সূচন
ততহি মনোমথে মাতি॥
নখ-শর-ঘাত তৈছে সুখাবহ
চুম্বন কুণ্ঠ পরসাদ।
রম্ভণ শূন পুলক কচুঁক-বর
ভেদই রস-মরিয়াদ॥
ও সুখ-সিন্ধু মগন ভেল মাধব
কামিনি কছু কছু বুর।
ভণ রাধামোহন সঁভোগ সঁকীরণ
তুহুঁক মনোরথ পূর॥ (তরু ৪৫০)

এখানেও শ্রীরূপের তপ্ত ইক্ষুচর্বণের উপমাটি সুকৌশলে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্লোকের আদর্শে পদের মধ্যেও শ্রীরাধার চাহনি কুটিলরূপে প্রকাশ পাইতেছে এবং মাধব ওই সুখের সাগরে মগ্ন হইয়া গেলেন।

এই সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ বিষয়ে পরবর্তী কালের অনেক পদকর্তা পদ রচনা করিয়াছেন। রায়শেখর লিখিয়াছেন—

কুঞ্জ অঙ্গনে কুঞ্জরাজ।
কাঁপি পড়ল ক্ষিতিক মাঝ॥
ফেরি নেহারত রাই।
মরি মরি করত কাহাই॥
ভুজগে কাটল তনু মোর।
কপটহি মূরছল ভোর॥

বজর পড়ল শুনি বোলে।
ধাই ধনী করু বঁধু কোলে॥
উঠল নাগরবর শূর।
মান গরল ভেল চুর॥
মন্ত্র শিরোমণি ব্রজচান্দ।
সোই পড়ল পুন ফান্দ॥
ধনীমুখ পোছল বাসে।
চুম্বন করল বহু আশে॥
নিরমল হেরি বিহান।
সব রস করু সমাধান॥
কো সমুঝব ইহ নেহা।
দুহুঁ তনু বান্ধল থেহা॥
কবিশেখর রস গায়।
দুহুঁ জন প্রেম সহায়॥ (তরু ৩৮৯)

সঙ্কীর্ণের পর সম্পন্ন সম্ভোগ।

শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ।
দ্বিধা স্যাদাগতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চেতি স সঙ্গমঃ॥ (উজ্জ্বল, পৃঃ ৯৪৬)

অর্থাৎ—প্রবাস হইতে আসিয়া কান্ত মিলিত হইলে সম্পন্ন সম্ভোগ হয়। এই সম্ভোগ আগতি ও প্রাদুর্ভাব ভেদে দুই প্রকার।

লৌকিক ব্যবহার দ্বারা আগমন হইলে হয় আগতি। আর অলৌকিক প্রেমে সহসা দয়িতের আবির্ভাব ঘটিলে প্রাদুর্ভাব সম্ভোগ জন্মে।

আগতি অবলম্বনে অনেক পদ রচিত হইয়াছে। অজ্ঞাতনামা এক কবি লিখিয়াছেন—

রাধিকা চাতকী হাসি শ্যাম সনে মিলে আসি
পিয়ে সুধা হরষিত মনে।
দূরে দুহুঁ দোহেঁ দেখি পালটিতে নারে আঁখি
হানিল কুসুমশর বাণে॥

অবশ হইল গা　　　　চলিতে না পারে পা
　　পুলকে পূরল দুহুঁ তনু।
সুবল সময় জানি　　　　হাথসানে বোধি ধনী
　　লইয়া চলিলা তবে কানু॥　　(তরু ২৬৮৫)

প্রাদুর্ভাব বিষয়ে গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

মথুরা সঞে হরি　　　　করি পথ চাতুরী
　　মিলল নিরজন কুঞ্জে।
দ্রুম পশু পাখীকুল　　　　বিরহে বেয়াকুল
　　পাওল আনন্দ পুঞ্জে॥
বরজ-নারীগণ　　　　বিরহে অচেতন
　　পুন কিয়ে পাওল পরাণ।
দাব-দগধ যেন　　　　ছটফটি জীবন
　　যৈছন অমিয়া সিনান॥
　　দেখ রাধামাধব মেলি।
দরশে পুলক দেহ　　　　ঘামহি নদী বহ
　　চিত্তপুতলি সম ভেলি॥
কাঁপয়ে ঘন ঘন　　　　অনিমিখ লোচন
　　ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর।
কহইতে থর থর　　　　থকিত কণ্ঠস্বর
　　দুহুঁ বিবরণ দুহুঁ ভোর॥
হোই সচেতন　　　　কি কহব নাহি জান
　　যৈছন দারিদ হেম।
গোবিন্দদাস কহ　　　　ইহ অনুপম নহ
　　প্রাণদ ঐছন ক্ষেম॥　　(তরু ১৯৮৪)

গোবিন্দদাসের এই পদে মাথুর-বিরহের পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ব্রজভূমিতে পদার্পণ করিয়াছেন; তাঁহার আকস্মিক আবির্ভাবে অতিশয় বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছেন শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্শনে শ্রীরাধার দেহ পুলকিত, এত অধিক পরিমাণে স্বেদবারি নিঃসৃত হইতেছে যে 'ঘামহি নদী বহ', চিত্র-পুত্তলিকা শ্রীরাধা ঘন ঘন কাঁপিতেছেন, তাঁহার

অনিমেষ-লোচনে অবিশ্রান্ত ধারায় অশ্রু পড়িতেছে, কথা বলিতে গিয়াও তিনি বলিতে পারিতেছেন না, বাক্‌স্তম্ভ উপস্থিত। এই সমস্তই প্রাদুর্ভাব সম্ভোগের সম্ভাব্য লক্ষণ হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাদুর্ভাবের পর অর্থাৎ সম্পন্ন সম্ভোগের দ্বিতীয় বিভাগের পরে তৃতীয় প্রকার মুখ্য সম্ভোগ—সমৃদ্ধিমানের আলোচনার প্রয়োজন।

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের সংজ্ঞা-দানচ্ছলে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

দুর্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥

(উজ্জ্বলনীলমণি, পৃঃ ৯৫০)

অর্থাৎ—পরাধীনতার জন্য নায়ক-নায়িকার (পারস্পরিক) দর্শনও যেখানে দুর্লভ, সেখানে উপভোগের অতিরেক ঘটিলেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়।

শ্রীরূপের নির্দিষ্ট এই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বিষয়ে আরও চিন্তা করিতে গিয়া পরবর্তী কালের মহাজনেরা ইহাকে আটটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যেমন—স্বপ্নসম্ভোগ, কুরুক্ষেত্রে মিলন, বাক্যে বিলাস, ব্রজে আগমন, কৌতুকভোজন, একত্র নিদ্রা প্রভৃতি ও স্বাধীনভর্তৃকা। (সংকীর্তনামৃত, পৃঃ ১২)

॥ পদ্যাবলীর প্রভাব ॥

একশত পঁচিশ জনেরও অধিক কবির রচনা হইতে মোট তিনশত ছিয়াশিটি শ্লোক সংগ্রহ করিয়া শ্রীরূপ 'পদ্যাবলী' প্রণয়ন করেন। বিল্বমঙ্গল, জয়দেব প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদের রচনা গ্রন্থের আকারে রক্ষিত ছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অখ্যাত কবিদের ক্ষুদ্র খণ্ড রচনা বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া যাইতেছিল। শ্রীরূপ প্রধানতঃ সেইগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে কোন বৌদ্ধ সংগ্রাহক যেমন নিজের ধর্মগত মত-পথকে স্বীকৃতি দিয়া সংস্কৃত ভাষায় প্রথম শ্লোক-সঙ্কলন গ্রন্থ 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' প্রণয়ন করেন, তেমনি (বোধ করি তাহা অপেক্ষাও বেশী) নিজের স্বীকৃত বৈষ্ণব তত্ত্ব ও রসকে স্পষ্ট বুঝাইতেই শ্রীরূপ গোস্বামী 'পদ্যাবলী' রচনা করিয়াছেন। এই সঙ্কলন-গ্রন্থে শ্রীরূপ তাঁহার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক অবৈষ্ণব কবিদেরও শ্লোক গ্রহণ করিয়াছেন, তবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুরলীলার আস্বাদকের দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া অনেকক্ষেত্রেই কিছু কিছু শব্দ পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন।[১]

১। ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের সম্পাদিত পদ্যাবলী ভূমিকা, পৃঃ ১১২।

শ্রীরূপের স্ব-রচিত শ্লোকের চৌত্রিশটি মাত্র এই গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। শ্রীরূপের নিজের রচনা হউক বা না হউক, তিনি সঙ্কলন-গ্রন্থে যে সমস্ত শ্লোককে স্থান দিয়াছেন বৈষ্ণব সাধক-কবিদের স্বভাবতঃই সেইগুলির দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। ফলে কবিরা রচনার ক্ষেত্রে শ্লোকগুলির দ্বারা, ব্যাপক কথায় সমগ্র 'পদ্যাবলী'র দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছেন। সেইজন্য আমরা পদাবলীসাহিত্যের উপর 'পদ্যাবলী'-গ্রন্থের প্রভাবকে শ্রীরূপের পরোক্ষ প্রভাব বলিয়া ধরিতেছি।

পদাবলীসাহিত্যে 'পদ্যাবলী'র প্রভাব দুই জাতীয়। প্রথমতঃ, 'পদ্যাবলী' পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদ-সঙ্কলয়িতাদের পথ দেখাইয়াছে। শ্রীরূপের পূর্বে 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়', 'সুভাষিতাবলী', 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতি সঙ্কলিত হইলেও, ইহাদের কোনটিই বৈষ্ণব অনুমত সঙ্কলন-গ্রন্থ নহে। শ্রীরূপই প্রথম শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিচিত্র লীলাবিলাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া শ্লোক সঙ্কলন করেন। তাঁহার আদর্শে প্রধানতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আজ পর্যন্ত বহু বৈষ্ণব পদের সঙ্কলন-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রথমদিকের কয়েকখানি পদ-সঙ্কলন-গ্রন্থের উল্লেখ করি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃতসমুদ্র', বিশ্বনাথের শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম) 'গীতচন্দ্রোদয়', দীনবন্ধু দাস 'সঙ্কীর্তনামৃত', গৌরসুন্দর দাস 'কীর্তনানন্দ' এবং বৈষ্ণবদাস 'পদকল্পতরু' সঙ্কলন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'পদরসসার', 'পদরত্নাকর' প্রভৃতি প্রণীত হয়। এই সব সঙ্কলন-গ্রন্থের পিছনে শ্রীরূপের 'পদ্যাবলী'র প্রভাব যে অবশ্যই আছে, তাহার অন্যতম প্রমাণ কোন কোন সঙ্কলন-গ্রন্থে মূলতঃ বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদ সংগৃহীত হইলেও শ্রীরূপের 'পদ্যাবলী'র দুই-চারিটি শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে। যেমন—'পদ্যাবলী'তে সঙ্কলিত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর দুইটি শ্লোক 'অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি' ইত্যাদি এবং 'অয়ি দীন-দয়ার্দ্র নাথ হে' ইত্যাদি 'পদকল্পতরু'র যথাক্রমে ১৬৫২ ও ১৬৫৩-সংখ্যক পদ হিসাবে স্থান পাইয়াছে।

'পদ্যাবলী'র দ্বিতীয় প্রকার প্রভাব শ্লোকের অনুসরণ সম্বন্ধীয়। এই সঙ্কলন-গ্রন্থে গৃহীত কতকগুলি শ্লোকের অনুসরণে বৈষ্ণব পদকারগণ সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থের ১৫৯-সংখ্যক শ্লোকে সর্ববিদ্যাবিনোদ নামে এক কবি লিখিয়াছেন—

> ইন্দীবরোদরসহোদরমেদুরশ্রী-
> র্বাসো দ্রবৎকণকবৃন্দনিভং দধানঃ।
> আমুক্তমৌক্তিকমনোহরহারবক্ষাঃ
> কোঽয়ং যুবা জগদনঙ্গময়ং করোতি॥ (পদ্যাবলী, পৃঃ ৬৮)

অর্থাৎ—হে সখি, পদ্মের দেহের মতো যাঁহার কান্তি, যিনি গলিত সোনার রঙের কাপড় পরিয়াছেন, যাঁহার গলার মুক্তামালায় বক্ষস্থল সুন্দর, আরও জগৎকে যিনি প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন, এমন এই যুবাটি কে ?

শ্লোকে সাক্ষাদ্ দর্শনজনিত পূর্বরাগ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শ্লোকটির অনুসরণে ঘনশ্যাম কবিরাজ লিখিয়াছেন—

কীয়ে ইন্দীবর উদর সহোদর
ঐছন রূপক ভাঁতি।
বিনিহিত পীত বসন কটি শোহন
জনু দ্রব কাঞ্চন কাঁতি॥
সজনি কোহছু নব যুবরাজ।
দরশনে মদন ভরল সব ভুবন
দূরে গেল ধৈরজ লাজ॥
কি মোহন বিমল ললিত উরলম্বিত
অবিচল গজমতি হার।
চূড়হিঁ চারু শিখণ্ডিক মণ্ডিত
বেড়ল মালতি মাল॥
কর পদ অরুণ কমল কিয়ে বিকসল
কত মণি আভরণ তায়।
কহ ঘনশ্যাম দাস রূপ মাধুরি
এক মুখে বরণি না যায়॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৫৫)

পদের প্রথমদিকে শ্লোকের কথাগুলি যথাযথ উপস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ধ্রুবপদের মধ্যে পূর্বরাগিণী তাঁহার সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—সখি, এই নব যুবরাজ কে? ইহার দরশনে সমস্ত জগৎ প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। আমার সংযম ও লজ্জা আমাকে ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিল। এখানে জগতের কথাটিই শ্লোক হইতে লওয়া হইয়াছে, অন্যগুলি পদকর্তার নিজের সংযোজনা। শ্লোকের অনুসরণে পদের মধ্যে গজমতিহারের কথা আসিয়াছে, কিন্তু ময়ূরপুচ্ছে শোভিত মালতীমালা-জড়ানো সুন্দর চূড়ার কথা পদের নিজস্ব সম্পদ্‌রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। পদে পূর্বরাগিণী বলিতেছেন, নব যুবার হাত ও পায়ের তলা রক্তবর্ণ, উহাতে মনে হইতেছে পদ্মফুল যেন ফুটিয়া

উঠিয়াছে। এই হাত-পায়ে মণিমুক্তার অলঙ্কারও শোভা পাইতেছে। পূর্বরাগিণীর এই কথাগুলি এবং চরণের শেষে ঘনশ্যাম যে বলিতেছেন ওই রূপমাধুর্য এক মুখে বর্ণনা করা যায় না, সমস্তই পদকর্তার মৌলিক সৃষ্টি। শ্লোকের মতো পদটির মধ্যেও পূর্বরাগিণীর নামের উল্লেখ নাই।

'পদ্যাবলী'-ধৃত জয়ন্তের পদে রহিয়াছে—

অকস্মাদেকস্মিন্ পথি সখি ময়া যামুনতটীং
ব্রজন্ত্যা দৃষ্টোঽয়ং নবজলধরশ্যামলতনুঃ।
স দৃগ্ভঙ্গ্যা কিংবাঽকুরুত ন হি জানে তত ইদং
মনো মে ব্যালোলং ক্বচন গৃহকৃত্যে ন লগতে॥

বাংলায় অর্থ—যমুনাতীরে যাইতে যাইতে পথে হঠাৎ নূতন মেঘের মতো শ্যামলমূর্তি ইহাকে দেখিলাম। ইনি নয়নভঙ্গী করিয়া কী যে করিলেন জানি না; কিন্তু হে সখি, সেই হইতে আমার মন অস্থির হইয়াছে, গৃহকাজে আর তাহা (মন) বসিতেছে না।

এই পদের অনুসরণে গোবিন্দদাস যে লিখিয়াছেন 'মরকত-দরপণ বরণ উজোর' ইত্যাদি সুবিখ্যাত পদ (ক্ষণদা ৭।৩, গীতচন্দ্রোদয় ২৬০, তরু ৭৫, সং ৩৫৩), তাহার অংশবিশেষ—

না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ান।
হানল অতয়ে কুসুম-শরবাণ॥

এখানে কি জয়ন্তের রচনার অন্তর্গত নয়নভঙ্গী মনে পড়িতেছে না?

হরের রচিত ২০৫-সংখ্যক শ্লোকে রহিয়াছে—

সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্বতো
দ্বারোন্মোচনলোল-শঙ্খবলয়ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভ-জরতীবাক্যেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণকোণকেলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্বরী॥

(পদ্যাবলী, পৃঃ ৮৮)

অর্থাৎ—কোকিল প্রভৃতির ডাকের অনুকরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেত করিলে শ্রীরাধা বারবার দুয়ার খুলিবার চেষ্টা করায়, তাঁহার চঞ্চল শাঁখা ও বালার শব্দ শ্রীকৃষ্ণ শুনিতে লাগিলেন। কে, কে দুয়ার খুলিতেছে—বৃদ্ধা জটিলা এইরূপ চীৎকার করিতে থাকিলে ব্যথিত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার গৃহপ্রাঙ্গণের বদরী বৃক্ষের তলায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিলেন।

শ্লোকটির অনুসরণ করিয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

সজনী কি কহিব রাইক সোহাগী।
যাকর দেহলি বদরির কোরে হরি
রজনি পোহায়ল জাগি॥
কোকিল সম হরি সঙ্কেত রবইতে
দ্বার খসাইতে রাধা।
কঙ্কণ ঝণকিতে গুরুজন জাগল
পড়ি গেও দারুণ বাধা॥
ননদিনি বলে ধনি কো বাহিরায়ত
ভীত-পুতলি সম দেহা।
লোরে মিটায়ল পীন পয়োধর
মৃগমদ-কুঙ্কুম-রেহা॥
বিঘটি মনোরথ আন চলল হরি
তাহি঻ঁ তুহুঁ সঙ্কেত রাখি।
কুসুম-হার অরু মুকুলিত সরসিজ
গোবিন্দদাস এক সাথী॥ (তরু ৭১৬)

হে সখি, শ্রীরাধার সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব। যাঁহার বাহির-বাড়ীর বদরী বৃক্ষের ক্রোড়ে শ্রীহরি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন। শ্রীহরি কোকিলের ডাকে সঙ্কেত করিলে শ্রীরাধা ঘরের দ্বার খুলিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার হাতের কাঁকণের শব্দে গুরুজনেরা জাগিয়া উঠিল; ফলে শ্রীরাধার বাহির হওয়ার পক্ষে ভীষণ বাধা পড়িয়া গেল। এই পর্যন্ত পদকর্তা গোবিন্দদাস শ্লোকের খুবই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি বলিয়াছেন, ননদিনী অর্থাৎ কুটিলা বলিয়া উঠিল—কে বাহির হইতেছে; তাহাতে শ্রীরাধা ভয় পাইয়া পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া গেলেন অর্থাৎ একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চোখের জলে উন্নত স্তনের উপরকার মৃগমদ ও কুঙ্কুমের রেখা মুছিয়া গেল। মনোরথ ব্যর্থ হওয়ায় শ্রীহরি সেখানে ফুলের মালা ও ফোটা পদ্মফুল সঙ্কেত হিসাবে রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন, গোবিন্দদাস ইহার একমাত্র সাক্ষী রহিলেন। এই কথাগুলিতে পদকর্তা সম্পূর্ণ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সুন্দর কবিত্ব-মণ্ডিত হইয়াছে।

'পদ্যাবলী'র ২১০-সংখ্যক শ্লোকে অজ্ঞাতনামা কোন কবি লিখিয়াছেন—

লজ্জৈবোদ্‌ঘটিতা কিমত্র কুলিশোদ্বদ্ধা কবাটস্থিতি—
মর্যাদৈব বিলঙ্ঘিতা সখি পুনঃ কেয়ং কলিন্দাত্মজা।
আক্ষিপ্তা খলদৃষ্টিরেব সহসা ব্যালাবলী কীদৃশী
প্রাণা এব সমর্পিতাঃ সখি চিরং তস্মৈ কিমেষা তনুঃ॥

(পদ্যাবলী, পৃঃ ৯১)

অর্থাৎ—সখি, আমি যখন লজ্জা ত্যাগ করিয়াছি, তখন বদ্ধ কবাটে আমার কি হইবে? যখন আমি মর্যাদাও লঙ্ঘন করিয়াছি, তখন সামান্য যমুনা আমার কি করিবে? খল ব্যক্তির দৃষ্টিই যখন তুচ্ছ করিয়াছি, তখন সর্পকুল আমার কি (অনিষ্ট) করিবে? আমি যখন চিরতরে প্রাণ সমর্পণ করিয়া বসিয়াছি, তখন দেহখানি যে দিব তাহাতে আর কথা কি? শ্লোকটিকে আদর্শরূপে ধরিয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

কুলবতী কঠিন কবাট উদ্‌ঘাটলু
তাহে কি কণ্টক বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে ডারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সজনি, মঝু পরিখন করু দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছু পর
তাহে জলদজল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজরকি আগি॥
যছু পদতলে হাম জীবন সোপালু
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ॥ (তরু ৯৮৮)

শ্রীরাধা বলিতেছেন—সখি, পথে কণ্টকের ভয় রহিয়াছে কি বলিতেছ; যে কুলবতী হওয়া সত্ত্বেও ঘরের কবাট খুলিয়া বাহির হইয়াছে, সে কি কাঁটার ভয় করে? তুমি নদীতে অগাধ জল রহিয়াছে বলিয়া পার হওয়া অসম্ভব বলিতেছ, কিন্তু (যাহা সহজে

ত্যাগ করা যায় না এমন) কুলমর্যাদাকে যে সমুদ্রে বিসর্জন দিয়াছে, তাহার কাছে নদীর জল আর অগাধ কি? এতদূর পর্যন্ত গোবিন্দদাস শ্লোকের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরে পদের মধ্যে শ্রীরাধা বলিয়াছেন—সখি, আমাকে আর বৃথা পরীক্ষা করিও না। আমি সঙ্কেত করার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে আসিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে কেমন করিয়া আমার পথ চাহিয়া রহিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া আমার (চোখ দুইটিই নহে) মন কাঁদিতেছে। যাহার উপর মদন কোটি তীর নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার আবার বর্ষাধারায় ভয় কি? বজ্রেও কোন ভয় নাই। যাহার হৃদয় প্রেমের দহন সহ্য করিতেছে, তাহার বজ্রে আর ভয় কি? গোবিন্দদাস এই সমস্ত সুন্দর কবিত্বময় কথা লিখিয়া শ্লোকের খল ব্যক্তিদের দৃষ্টি ও সর্পের প্রসঙ্গ পরিহার করিয়াছেন। পদের শেষে শ্রীরাধা বলিয়াছেন—যাহার চরণতলে আমি জীবন সমর্পণ করিলাম, তাহাকে দেহটি দান করিতে আর (অসুবিধা) কি? এই কথা সম্পূর্ণ শ্লোকানুসারী। তবে গোবিন্দদাস যে শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, হে প্রেমৈশ্বর্যবতী, তুমি অভিসারে গমন কর, সখী এইবার (তোমার বিষয়ে সম্ভব-অসম্ভব) বুঝিয়াছে, তাহাতে মৌলিকতাই সূচিত হইয়াছে।

২৭৩-সংখ্যক শ্লোকে অজ্ঞাতনামা কোন কবি লিখিয়াছেন—

বাচা তবৈব যদুনন্দন গব্যভারো
হারোঽপি বারিণি ময়া সহসা বিকীর্ণঃ।
দূরীকৃতঞ্চ কুচয়োরনয়োর্দুকূলং
কূলং কলিন্দদুহিতুর্ন তথাপ্যদূরম্॥ (পদ্যাবলী, পৃঃ ১২৩)

অর্থাৎ—হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার কথায় তাড়াতাড়ি ঘৃতদুগ্ধের পশরা ও (গলার) হার যমুনার জলে ফেলিয়া দিয়াছি, এই স্তনদ্বয়ের উপরকার আবরণখানিও দূর করিয়াছি, তথাপি নৌকাখানি যমুনার কূলে পৌঁছাইল না।

শ্লোকটির অনুসরণ করিয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

এ নব নাবিক শ্যামর-চন্দ।
কৈছন তোহারি হৃদয়-অনুবন্ধ॥
তুয়া বোলে গোরস যমুনহি ঢার।
ফারলুঁ কাঁচুলি ডারলুঁ হার॥
কর অবসর নাহি সিঁচইতে নীর।
অতি খণে তবহুঁ না পাওল তীর॥

হাম নিরস তুহুঁ হাসি উতরোল।
কেহ জিউ তেজই কেহ হরি বোল॥
এত দিনে কুলবতি-কুলে পড়ু বাজ।
চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ॥
উতরি পার যব যো তুহুঁ মাগ।
কাহু সঞে মাগি ধরব তুয়া আগ॥
গোবিন্দদাস কহ সময়ক কাজ॥
নাবিক বেওন নাওক মাঝ॥ (তরু ১৪২২)

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে নূতন নাবিক শ্যামচন্দ্র, তোমার প্রকৃত মনোভাবটি কি বল। তোমার কথায় ঘৃত-দধি-দুগ্ধ প্রভৃতি গব্য পদার্থ ও হার যমুনায় ফেলিয়া দিলাম, কাঁচুলিও ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, নৌকার জল সেচিতে হাত দুইটিরও অবসর নাই, তথাপি এই সময়ের মধ্যে তীরে পৌঁছানো গেল না। এই কথাগুলি অধিকাংশই শ্লোকের অনুসরণে লেখা হইয়াছে; তবে শ্যামচন্দ্রের মনোভাব জিজ্ঞাসা বিষয়টি পদকর্তার মৌলিক সংযোজনা। নৌকার ভিতরকার জলসেচনের প্রসঙ্গটি উপরি-ধৃত শ্লোক হইতে না হইলেও, ২৭৫-সংখ্যক শ্লোক হইতে কিছু অনুবাদক্রমেই আসিয়াছে।[১] পদের মধ্যে শ্রীরাধা আরও বলিয়াছেন—আমরা বিমর্ষ, অথচ তুমি উৎফুল্ল হইয়া হাস্য করিতেছ; এ যেন কাহারও প্রাণ যায়, আর কেহ বা (মজা করিয়া) 'হরি' বলে। এই নৌকায় চড়িয়া লজ্জাসরম সব গেল, এতদিনে কুলবতীর কুলে বাজ পড়িল। আমাদের পার করিয়া দিয়া, হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি যাহা চাহিবে, নিজেদের তাহা না থাকিলেও অপরের কাছ হইতে চাহিয়া লইয়াও তোমার সম্মুখে ধরিব। শ্রীমতীর এই সমস্ত কথায় শ্লোকের কিছুমাত্র অনুসরণ নাই। ভণিতায় গোবিন্দদাস নিজের উক্তিতে মৌলিকতা দেখাইয়া বলিয়াছেন—রাধে, সময়োচিত কাজ কর, নাবিকের বেদন নৌকার মধ্যে, অর্থাৎ রসময় শ্রীকৃষ্ণ-নাবিকের সহিত নৌকার মধ্যে মিলিত হইয়াই তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে পার।

১। ২৭৫-সংখ্যক শ্লোকে কবি মনোহর লিখিয়াছেন—

পানীয় সেচনবিধৌ মম নৈব পাণী
বিশ্রাম্যতস্তদপি তে পরিহাসবাণী।
জীবামি চেৎ পুনরহং ন তদা কদাপি
কৃষ্ণ ত্বদীয়তরণৌ চরণৌ দদামি। (পদ্যাবলী, পৃঃ ১২৫)

অর্থাৎ—হে কৃষ্ণ, আমার হাত-দুইটি আর জলসেচন করিতে পারিতেছে না। তথাপি তোমার পরিহাসের শেষ নাই। বাঁচিয়া থাকিলেও আমি কখনও তোমার নৌকায় পা দিব না।

'পদ্যাবলী'র ৩২২-সংখ্যক শ্লোকে ধন্য নামে এক কবি লিখিয়াছেন—

যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ।
অস্মাকন্তু গতে কৃষ্ণে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী ॥

(পদ্যাবলী, পৃঃ ১৪৫)

অর্থাৎ—যে সকল নারী স্বপ্নে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তাঁহারা ধন্য। শ্রীকৃষ্ণের (মথুরায়) গমন করার পর আমাদের (প্রিয় মিলনের দিনের) শত্রু নিদ্রাও চলিয়া গিয়াছে।

এই সংহত অথচ সুন্দর শ্লোকটি সম্মুখে রাখিয়া ঘনশ্যাম কবিরাজ লিখিয়াছেন—

সজনি এ দুখ কহিতে নাহি ঠাঞি।
বিরহ পয়োধি হেরি হিয় চমকাই
নিশি দিশি জাগিয়া পোহাই ॥
সো সব নারি ভাগি করি মানিয়ে
স্বপনে হেরই নিতি কান।
হাম দুখিনী দুখ সহই না পারই
অবিরত ঝরত নয়ান।
যো হাম নিন্দ বৈরি করি তেজল
কানুক দরশন লাগি।
সো যব যতনে নিকট নাহি আয়ত
অতয়ে সে মানি অভাগী ॥
অবিরত দহই হৃদয় মদনানল
কি ভেল পাপ পরাণ।
পিরিতি বিয়োগ ঐছে দুখ জানবি
ঘনশ্যাম দাস পরমাণ ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৯৩)

শ্রীরাধা সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—আমার এই দুঃখ বলিবার কোন স্থান নাই, অর্থাৎ আমার সমব্যথী এমন কেহ নাই যাহাকে নিজের দুঃখের কথা বলিয়া হৃদয়ের ভার কিছু লঘু করিতে পারি। বিরহের অকূল সমুদ্র দেখিয়া আমার হৃদয় চমকাইয়া উঠিতেছে, আমি দিবারাত্র জাগিয়া কাটাইতেছি। এই সমস্ত কথা শ্লোকে নাই, তবে শ্লোকোক্ত কথা পরিবর্তিত করিয়া লিখিতে গিয়া পদকর্তা স্বয়ং কল্পনা

করিয়াছেন। পদে শ্রীরাধা বলিয়াছেন—যে সব নারী নিত্য শ্রীকৃষ্ণকে স্বপ্নে দর্শন করেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করি। আমি নিতান্ত দুঃখিনী, দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিতেছি না; অবিরত আমার চোখ হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। এখানে শ্রীরাধার নিজের সম্বন্ধে যে কথাগুলি রহিয়াছে, তাহা শ্লোকানুসরণে রচিত হয় নাই। পরে অবশ্য শ্রীরাধা বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিবার জন্য যে নিদ্রাকে আমি শত্রু মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাকে এখন যত্ন করা সত্ত্বেও সে নিকটে আসিতেছে না; সুতরাং নিজেকে অভাগ্যই মনে করিতেছি। বলা বাহুল্য, এই কথাগুলি শ্লোকানুসারী। তাহার পর শ্রীরাধার যে কথাগুলি রহিয়াছে, তাহা ঘনশ্যামের সম্পূর্ণ নিজস্ব সংযোজনা। সেখানে শ্রীরাধা বলিয়াছেন—আমার হৃদয় সর্বদা প্রেমের আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে, প্রাণ কি পাপী (সেইজন্য এত দুঃখেও বাহির হইতেছে না)। ঘনশ্যাম ভণিতায় নিজের উক্তিও মৌলকভাবে সংযোজিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন হে রাধে, প্রেমের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদে এই রূপই দুঃখ হয় জানিবে।

রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন—

যো ধনি সপনে নাহ মুখ হেরই
সো পুণবতি ব্রজ মাঝ
ধনি ধনি তাক সফল বরু জীবন
দেহ গেহ তছু কাজ ॥
সজনি নিন্দ বৈরিণি মুঝে ভেল।
যো দিন অবধি ছোড়ল ব্রজনন্দন
তাকর সঙ্গহি গেল ॥
শয়নক সাধ বাদ করু যো বিধি
সো বিপরিত মতি মন্দ।
সহজে অভাগিনি মোহে পুন বঞ্চই
দরশনে ও মুখ চন্দ্র ॥
কৈছনে ঐছন দরশন পাইয়ে
সুন্দর বিদগধ শ্যাম।
রাধা মোহন পহুঁ কঠিন উজাগর
তিল এক নহত বিরাম ॥ (তরু ১৬৪৪)

শ্রীরাধা বলিতেছেন—যে নারী স্বপ্নে নাথের মুখখানি দেখে, ব্রজের মধ্যে সে পুণ্যবতী। তাহাকে ধন্য ধন্য করি। (তাহার) জীবন, দেহ, গৃহ ও কার্য অনেকখানি সফল। মূলে শ্লোক অনুসরণ করিলেও, রাধামোহন এই কথাগুলির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-কারিণীর সৌভাগ্যে ভক্তিমতী শ্রীরাধার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ভাবের যেন ছবি আঁকিয়াছেন; ঘনশ্যাম এতখানি পারেন নাই। ধ্রুবপদটিতে শ্রীরাধা বলিতেছেন—হে সখি, নিদ্রা আমার শত্রু হইয়া বসিল, যেদিন হইতে ব্রজনন্দন ব্রজভূমি ছাড়িয়া গিয়াছেন সেই দিন হইতে নিদ্রাও তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে অর্থাৎ আমাদের সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়াছে। এখানে শ্লোকের অনুসরণ আছে সত্য, কিন্তু একটি অতি গূঢ় কথা বাদ পড়িয়াছে। শ্লোকে আমরা দেখি, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে বলিয়া শ্রীরাধার কাছে নিদ্রা পূর্ব হইতেই শত্রু। সেই শত্রু শ্রীকৃষ্ণের সহিত চলিয়া গিয়াছে এই কথাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন। পদে কিন্তু যাহা বুঝান হইয়াছে তাহা এইরূপ যে, নিদ্রা শত্রুতা করিয়াই চলিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে রাধামোহনের পদটি কিছু কাব্য-সুষমা হারাইয়াছে। পদের শেষের দিকে (৮ম হইতে ১১শ চরণ পর্যন্ত) শ্রীরাধা বলিতেছেন—(ঘুম না থাকার জন্য) যে বিধাতা আমার শোওয়ার ইচ্ছায় বাদ সাধিয়াছে সে অত্যন্ত দুষ্টবুদ্ধি ও অনিষ্টকারী; আমি একে দুর্ভাগিনী, তাহার উপর সে আবার আমাকে সেই মুখচন্দ্রের দর্শন হইতে বঞ্চিত করিতেছে! কি করিলে সুন্দর ও সুরসিক শ্যামের দর্শন পাই। শ্রীরাধার এই কথাগুলি অতি মর্মস্পর্শী। এইগুলি নিঃসন্দেহে রাধামোহন ঠাকুরের নিজস্ব সংযোজনা। আমরা দেখিতেছি, রাধামোহন ঠাকুরের এই পদটি উপরি-ধৃত ঘনশ্যামের পদটিকে উৎকর্ষের দিক হইতে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

৩৭৬-সংখ্যক শ্লোকে পঞ্চতন্ত্র নামক নীতিশাস্ত্রকার লিখিয়াছেন—

কালিন্দ্যাঃ পুলিনং প্রদোষমরুতো রম্যাঃ শশাঙ্কাংশবঃ
সন্তাপং ন হরন্তু নাম নিতরাং কুর্বন্তি কস্মাৎ পুনঃ।
সন্দিষ্টং ব্রজযোষিতামিতি হরেঃ সংশৃণ্বতোঽন্তঃপুরে
নিশ্বাসাঃ প্রসৃতা জয়ন্তি রমণীসৌভাগ্যগর্বচ্ছিদঃ॥

(পদ্যাবলী, পৃঃ ১৭১)

অর্থাৎ—যমুনার তীর, প্রদোষকালের বাতাস, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ এই সমস্তও আমাদের সন্তাপ হরণ করিতেছে না—ব্রজসুন্দরীরা এইরূপ কথা বলিলে দ্বারকার অন্তঃপুরে মহিষীদের গর্ব নষ্ট করিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছিল তাহার জয় হউক।

এই শ্লোকের অনুসরণে ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

তুয়া বিনু কাতর অন্তর জর জর
পাজর ধস ধস বাধা।
বিরহ সমাধি ব্যাধি অছু দারুণ
সহই না পারই রাধা॥
মাধব পেখলু ধনি মতিহীন।
তুহিন পতনে জনু মলিনী নলিনী তনু
ঐছন দিনে দিনে ক্ষীণ॥
কালিন্দি পুলিন শরদ শশী নূতন
মলয়জ মন্দ সমীর।
ছোড়ল নিজ গুণ তপন কিরণ হেন
দাহই সঘন শরীর॥
সহচরি কতয়ে ঢুলায়ত বীজন
মানত অধিক উত্তাপ।
কহ ঘনশ্যাম আশ নাহি জীবনে
কা সঙে না করু আলাপ॥

(রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৯১-৯২)

শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বিরহে শ্রীরাধা অত্যন্ত কাতর; তাঁহার অন্তর জর জর হইয়াছে, বুকের ভিতর ধস্ ধস্ করিতেছে। বিচ্ছেদ-দুঃখে তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। সুতরাং ব্যাধি ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, শ্রীরাধা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। হে মাধব, দেখিলাম প্রেমৈশ্বর্যবতী শ্রীরাধা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন। শিশির পড়িলে পদ্মের দেহ যেমন ম্লান হইয়া যায়, শ্রীরাধার দেহও তেমনি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। এই কথাগুলিতে বিরহিণী শ্রীরাধার অমিত দুঃখের নিখুঁত চিত্র দেওয়া হইয়াছে। শ্লোকে এই সব বর্ণনা একেবারে নাই, এমনকি শ্রীরাধার উল্লেখ বা ব্যঞ্জনা কোথাও দেখা যায় না। এই অংশের পরে দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—যমুনার তীর, শরৎকালের নূতন চাঁদ, মৃদুমন্দ দক্ষিণ-বাতাস—এই সমস্তই নিজেদের গুণ ছাড়িয়া সূর্যকিরণের মতো শ্রীরাধার দেহ পুড়াইয়া দিতেছে। শ্লোকে বিরহিণী ব্রজসুন্দরীদের সকলের ক্ষেত্রে যে কথাগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে, এখানে সেইগুলি একমাত্র শ্রীরাধার সম্পর্কে ব্যবহৃত। পদে দেখা যায়, সহচরীরা শ্রীরাধাকে পাখা দিয়া বাতাস করিতেছেন, তথাপি শ্রীরাধা উত্তাপই বোধ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে পদকর্তা ঘনশ্যাম বলিতেছেন—শ্রীরাধা

কাহারও সহিত কথা বলিতেছেন না, তাঁহার জীবনের আর কোন আশা নাই। নিজের পরিকল্পনামতো লিখিলেও, পদকর্তার এই মাথুর বর্ণনা যে কত সুন্দর তাহা সুরসিক পাঠকদের আর বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

'পদ্যাবলী'র ৩৮০-সংখ্যক শ্লোকে কবি শুভ্র লিখিয়াছেন—

আনন্দোদ্‌গতবাষ্পপূরপিহিতং চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতুং।
বাহূ সীদত এব কম্পবিধুরৌ শক্তৌ ন কণ্ঠগ্রহে॥
বাণীসম্ভ্রমগদ্‌গদাক্ষরপদা সংক্ষোভলোলং মনঃ
সত্যং বল্লভসঙ্গমোঽপি সুচিরাজ্জাতো বিয়োগায়তে॥

(পদ্যাবলী, পৃঃ ১৭৩-১৭৪)

অর্থাৎ—বহুকাল পরে (কুরুক্ষেত্রে) শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন ঘটিলেও তাহা বিচ্ছেদের মতোই রহিল। আনন্দে চক্ষু বাষ্পাকুল হওয়ায় (কিছু) দেখা যাইতেছে না, সর্বদা কাঁপিয়া কাঁপিয়া হাত-দুইটি অবশ হইয়া পড়ার ফলে গলা ধরা অসম্ভব হইতেছে, সম্ভ্রমে কথা গদগদ, আর মন ক্ষোভে হইয়াছে অত্যন্ত চঞ্চল। শ্লোকটির অনুসরণ করিয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপি।
করইতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপি॥ (তরু ২৩৩)

এই দুইটি চরণে শ্লোকে যেমনটি আছে ঠিক সেইরূপ দর্শন ও স্পর্শের কথা কি বলা হয় নাই?

॥ উপসংহার ॥

চৈতন্যোত্তর পদাবলীসাহিত্য শ্রীরূপের প্রভাবে সম্পূর্ণ না হইলেও, অনেকাংশে নবরূপ পরিগ্রহ করে। হালের 'গাথা সপ্তশতী'র সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনার সময় পর্যন্ত শ্রীরাধা ছিলেন সাধারণ গোপকন্যা ও গোপবধূ। তিনি ঘর-সংসারের কাজকর্ম করেন, যমুনা হইতে জল আনেন, মাথায় করিয়া দধি-দুগ্ধ লইয়া হাটে-বাজারে ও মথুরায় বিক্রয় করিতে যান।

গৃহস্থ ঘরের অতি সাধারণ এই বধূটিকে শ্রীরূপ শুধু বৃষভানুরাজকুমারীরূপে নহে, ধনী ও অভিজাত গৃহের ঐশ্বর্যময়ী বধূরূপেও চিত্রিত করিলেন। শ্রীরূপ 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীরাধার দাসীগণের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার

রাগলেখা, কলাকেলি, ভূরিদা প্রভৃতি দাসী আছে। তাঁহার পায়ে আলতা পরাইবার জন্য ও নখ কাটিবার জন্য সুগন্ধা ও নলিনী নামে দুই নাপিতকন্যা এবং কাপড় কাচিবার জন্য মঞ্জিষ্ঠা ও রঙ্গরাগা নামে দুই রজককন্যা আছে। পালিন্দ্রী নামক এক দাসী তাঁহার দেহে গন্ধদ্রব্য লেপন করে। চিত্রী নামে তাঁহার এক খাস চিত্রকারিণী আছে। মানত্রিকী ও তান্ত্রিকী নামে দুইজন ফলিত জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শিনী তাঁহাকে ভবিষ্যতাদি গণনা করিয়া বলিয়া দেয়। তাঁহার দুই খাস মেথরানীর নাম ভাগ্যবতী ও পুঞ্জপুণ্যা। ভৃঙ্গা, মল্লী ও মতল্লী নামে তিনজন পুলিন্দ-কন্যাও তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য সর্বদা উপস্থিত থাকে। ইহা ছাড়া, কতকগুলি ছোট ছোট মেয়েও তাঁহার ছোটখাট আদেশ পালন করিবার জন্য নিকটেই থাকে; তাহাদের নাম তুঙ্গী, পিবঙ্গী, কলকন্দলা, মঞ্জুলা, বিন্দুলা, সন্ধ্যা, মৃদুলা ইত্যাদি।

শ্রীরূপ 'শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীরাধার মণিমুক্তায় খচিত নানা আভরণের বর্ণনা তো দিয়াছেনই, উপরন্তু ফুলের তৈয়ারী নানারকম সাজসজ্জার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। ফুলের চন্দ্রাতপ, ফুলের বালিশ, ফুলের মুকুট প্রভৃতি অসংখ্য শিল্পোপ-করণের বিশদ্ বর্ণনা ওই গ্রন্থে দেখা যায়। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে শ্রীরাধার দূতী চেটী সখী নর্মসখী প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিয়াও মনে হয় যে, তিনি অসংখ্য পরিজনে পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। শ্রীরূপ স্বয়ং সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত বংশের সন্তান। ভোগৈশ্বর্যের মধ্যেই তিনি লালিত পালিত হইয়াছেন। আবার পরাক্রান্ত সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রীরূপেও বহু বিলাস-ঐশ্বর্য দেখিয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনায় শ্রীরাধা সেইজন্য অভিজাত বংশের কন্যা ও বধূরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। তাই 'গীতাবলী'র ২৬-সংখ্যক গীতে তিনি শয্যা রচনার কথায় বলিয়াছেন—

কুসুমাবলিভিরুপস্কুরু তল্পং।
মাল্যঞ্চামলমণি সরকল্পং॥

শয্যার পার্শ্বে যে পানের ডিবাটি থাকিবে, তাহাও মণিময় সম্পুট হওয়া দরকার। শ্রীরাধার গলায় সর্বদাই মুক্তার হার (শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ যুগল নামাষ্টকম্, শ্লোক-১)। খণ্ডিতা-নামক শ্লোকমালায় তিনি শ্রীরাধার কিঙ্করীগণের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীরূপের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জাদুমন্ত্রের প্রভাবে যে গোয়ালার বউটি ধনীগৃহের বধূরূপে পরিণত হইল, ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে তাহারই চিত্রণ পদাবলী-সাহিত্যে প্রায় একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিল। শ্রীরূপের রচনা যখন বাংলাদেশে পৌঁছায় নাই, তখন পর্যন্ত শ্রীরাধা সকাল-সন্ধ্যায় কলসী করিয়া যমুনার জল ভরিতে

যান। যথা—যদুরামানন্দের পদে—'সাঝের বেলা গিয়াছিলাম জলে' (মাধুরী ১।১৩৫)। জ্ঞানদাসের শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া বলেন—'কেনে গেলাম জল ভরিবারে' (ঐ ১১২) অথবা 'জল ভরিয়া যাই, ফিরিয়া ফিরিয়া চাই' (ঐ ১০৪)। কিন্তু রায়শেখর, গোবিন্দদাস, ঘনশ্যাম কবিরাজ, রাধামোহন ঠাকুর, বিশ্বনাথ ও নরহরি চক্রবর্তীর কোন পদে শ্রীরাধার কলসী কাঁখে জল ভরিবার কথা পাওয়া যায় না। গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা কচিৎ কখনো একলা যমুনার ঘাটে স্নান করিতে যান। 'একলা যাইতে যমুনা ঘাটে' (মাধুরী ২।৬২৬), 'সিনান দোপর সময় জানি' (ঐ ৬২৭)। রায়শেখরের শ্রীরাধা বড় একটা যমুনার জলে স্নান করিতে যান না। তাঁহার জন্য দাসীরা নির্মল জল সুগন্ধি করিয়া ভরিয়া রাখে—

নির্মল সলিল সুগন্ধি শীতল
পূরিয়া গাগরী ঝারি।
মুখ পাখালিতে সিনান করিতে
বেদীর উপরে ধরি ॥
গামছা কাচিয়া নিজল করিয়া
রাখল পৃথক করি।
এ তৈল আমলা আনল শ্যামলা
বিনিয়া বিনিয়া ভরি ॥ (তরু ২৫১৭)

যখন তিনি যমুনায় যান তখনও একা নহে—

সকালে সিনানে চলিলা গোরী।
সখিগণ সঞে আনন্দে ভরি ॥ (মাধুরী ১।৪০০)

গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা শুধু ইষ্টক-নির্মিত অট্টালিকায় বাস করেন না। তিনি—'রঙ্গিনী সঙ্গে তুঙ্গ মণিমন্দিরে' (মাধুরী ১।১৯০) বসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাস-বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীসমস্ত নিজ নিজ গৃহকর্ম অসমাপ্ত রাখিয়া অভিসারে ছুটিলেন। কেহ বা গরু দোহাইতেছিলেন, কেহ বা দুধ জ্বাল দিতেছিলেন, কেহ বা পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেছিলেন, সব-কিছু ছাড়িয়া তাঁহারা রাসস্থলীতে ছুটিলেন। গোবিন্দদাস বংশীধ্বনির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বিস্রস্ত বসনভূষণে গোপীদের ছুটিবার কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কোনরূপ গৃহকর্ম করার কথা উল্লেখ করেন নাই। ইহা শ্রীরূপের পরিদৃষ্ট আভিজাত্য-মূলক আবেষ্টনীরই যে এক প্রভাব, তাহা না বলিলেও চলে। গোবিন্দদাসের গুরু

শ্রীনিবাস আচার্য শ্রীরূপ-বর্ণিত সামন্ততান্ত্রিক অবরোধের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া শ্রীরাধার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

অনুক্ষণ ঘরে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ার বাহিরে পরবাস।

(মনোহর দাস-কৃত রাগবল্লী)

অর্থাৎ—শ্রীরাধা বস্ত্রাদিতে দেহ আবৃত করিয়া ঘরের কোণে থাকেন এবং তাঁহার আঙ্গিনার দুয়ারের বহির্দেশকেই প্রবাস বলিয়া মনে করেন। বলা বাহুল্য, এরূপ সুকঠোর অন্তঃপুরিকা যে বাজারে দই-দুধ বিক্রয় করিতে যাইবেন, তাহা অসম্ভব।

অথচ দানলীলার লৌকিক কাহিনী অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ডঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীসাহিত্যে' দেখাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু পূর্বে গুজরাটী কবি নরসিংহ মেহতা দানলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরূপের 'দানকেলিকৌমুদী'তে দেখা যায় যে, শ্রীরাধা দই-দুধ বিক্রয় করিতে যাইতেছেন না, গোবিন্দকুণ্ডে যজ্ঞ উপলক্ষে গব্য ঘৃত দান করিতে যাইতেছেন। এই কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবি যদুনাথ কবিচন্দ্র বলেন যে, শ্রীরাধার 'ঘৃতের পশরা মাথে' (মাধুরী ৩।২৩), কিন্তু গোবিন্দদাস একটি ছোট ঘটি, তাহাও স্বর্ণ-নির্মিত, শ্রীরাধার হাতে দিয়া সখীগণ সঙ্গে পাঠাইতেছেন। জগন্নাথ দাস কিন্তু সহ্য করিতে পারেন না যে, শ্রীরাধা নিজের হাতে ঘটিটিও বহন করিয়া লইয়া যান—তাহা সোনার ঘটি হউক না কেন। তাঁহার বর্ণনায় দেখা যায় যে, শ্রীরাধা দাসীদের মাথায় ঘৃত, দধি, ছানা প্রভৃতি চাপাইয়া এবং তাহার উপরে নানা রঙের উড়ানি বিছাইয়া চলিতেছেন।

সুবর্ণের ভাণ্ড ভরি ঘৃত দধি ছেনা পুরি
সারি সারি পসরা উপর।
তাহাতে উড়নি ডালি বিচিত্র নেতের ফালি
দাসী শিরে করে ঝলমল॥

(মাধুরী ৩।৩৫৩)

শ্রীরূপ গোস্বামী শুক-সারী, কক্ষটী নামে বানরী প্রভৃতিকে লীলাসহায়করূপে ...না করিয়াছেন। ইহাদের কথা শ্রীচৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যে অনেক ...স বর্ণিত হইয়াছে—শুক-সারীর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। রায়শেখরের পদ হইতে ...ক্ষটীর কাজের বর্ণনা একটু তুলিয়া দিতেছি—

কক্খটী উঠায়ে তান কি করহ রাধা কান
শো তেজি করহ পয়ান।
রায়েরে না দেখি ঘরে জটিলা লগুড় করে
বনে আসি করয়ে সন্ধান॥
কক্খটী কপট কথা শুনি বৃষভানুসুতা
তরাসে তরল ভেল মন।
রাধাকানু সখী সাথে চলিলা গোপ পথে
তুরিতে তেজল সেই বন॥ (তরু ২৫০৬)

'ললিতমাধব' নাটকে শ্রীরূপ কুন্দলতার চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সৃজনী-প্রতিভার অনবদ্য সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। কুন্দলতা নন্দের ভ্রাতা উপনন্দের পুত্রবধূ এবং সুভদ্রের স্ত্রী (১১৭০)। সুভদ্র শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ; কেননা, কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণকে দেবর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন (১১৭৭)। বলা বাহুল্য যে, 'বিষ্ণুপুরাণ', 'শ্রীমদ্‌ভাগবত', 'পদ্মপুরাণ' ও 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' সুভদ্র ও কুন্দলতার কোন প্রকার উল্লেখ নাই। সেইজন্য চরিত্রটি শ্রীরূপের নিজস্ব সৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কুন্দলতা বিদুষী, তিনি সংস্কৃতে কথাবার্তা বলিতে পারেন। তাঁহাকে একদিকে যেমন যশোদা ভালবাসেন, অন্যদিকে শ্রীরাধার শাশুড়ী জটিলাও ভালবাসেন। জটিলা সূর্যপূজা করাইবার জন্য যে কুন্দলতাকেই একজন ব্রাহ্মণ আনিয়া দিতে বলিলেন, তাহা আমরা পূর্বে ললিতমাধব-প্রসঙ্গে বলিয়াছি। কুন্দলতা পরিহাস-নিপুণা। তিনি একদিকে চন্দ্রাবলীকে, অন্যদিকে শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীবৃন্দকে স্নিগ্ধ পরিহাসে অভিষিক্ত করেন।

কুন্দলতার চরিত্রটি রায়শেখর শ্রীরূপের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কয়েকটি পদে সুন্দর ফুটাইয়াছেন। মা যশোদা কুন্দলতাকে জটিলার বাড়ী হইতে শ্রীরাধাকে আনিতে আদেশ করিলেন। কাজটি বড় সহজ নহে, কিন্তু কুন্দলতা জটিলাকে নমস্কারাদির দ্বারা খুশী করিয়া লইয়া আসিলেন। শ্রীরাধা আসিয়া স্বহস্তে অন্নাদি তৈয়ারি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিতেন—শ্রীরাধার রন্ধন খাইলে নাকি আয়ু বর্ধিত হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি ছিল। মা যশোদা জানেন যে, জটিলার মতো জবরদস্ত শাশুড়ীর নিকট হইতে রোজ রোজ শ্রীরাধাকে আনা একমাত্র কুন্দলতার পক্ষেই সম্ভব। তাই—

কুন্দলতা সহ কথা কহে নন্দরাণী।
রায়েরে লইযা বাছা চলহ আপনি॥
যতন করিযা বধূ সঁপিবে তাহারে।
কহিবে সকল কথা বিনয়-বেভারে॥

জটিলা তোমারে সদা করে পরতীত।
বুঝিয়া কহিবে সব যে হয় উচিত॥
রাধিকা আমার যেন নিতি আইসে যায়।
ললিতা বিশাখা লইয়া থাকিয়া সদায়॥ (তরু ২৫৮১)

কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণের বৌদিদি। তাঁহার পক্ষপাত শ্রীরাধার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই বেশী। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীদের সহিত তাঁহার পার্থক্য এইখানে। রায়শেখর 'ললিতমাধব'-এর সূর্যপূজার দৃশ্য অবতারণা করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনসাধন করাইয়াছেন। তাহাতে মুখ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছেন কুন্দলতা।

ছন্দ ধরি রঙ্গ করি
কহে কুন্দলতা।
ভানুর কোলে কানু খেলে
এই সে ভাল কথা॥

এখানে ভানুর কোলে বলিতে বোধ হয় বৃষভানুর কন্যা শ্রীরাধার কোলে এই ইঙ্গিত কুন্দলতা করিয়াছেন। পাশাখেলার সময় শ্রীকৃষ্ণ পণ রাখিবেন যে, যদি তিনি হারেন তাহা হইলে আগে তিনি শ্রীরাধাকে শতেক চুম্বন দান করিবেন, আর শ্রীরাধা যদি হারেন তাহা হইলে তাঁহাকে (শ্রীরাধাকে) আগে শত চুম্বন দিতে হইবে।

পণ শুনিয়া রাধা কহে বারে বার।
যে খেলিবে খেলুক মুঞি না খেলিব আর॥
কুন্দলতা কহে ধনি না খেলিবে কেনে।
উত্তম হইল পণ খেল দুই জনে॥

(রায়শেখরের পদাবলী, পৃঃ ২৩৪)

ললিতা কিন্তু এইরূপ পণে রাজী হইলেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া শর্ত করাইয়া লইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি হারেন তাহা হইলে তাহাকে ভৃঙ্গীর বদন চুম্বন করিতে হইবে। খেলায় শ্রীরাধা হারিয়া গেলেন। তখন কুন্দলতা বলিলেন যে, এইবার শ্রীরাধাকে ভৃঙ্গের অধর রস পান করিতে হইবে।

কুন্দলতা কহে ধনি কর অবধান।
ভৃঙ্গের অধর রস কর তুমি পান॥